আরো

সত্যজিৎ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

এই লেখকের অন্যান্য বই

আরো একডজন
আরো বারো
একডজন গপ্‌পো
একের পিঠে দুই
এবারো বারো
কৈলাসে কেলেঙ্কারী
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
গোরস্থানে সাবধান
ছিন্নমস্তার অভিশাপ
জয় বাবা ফেলুনাথ
টিনটোরেটোর যীশু
ডবল ফেলুদা
তারিণীখুড়োর কীর্তকলাপ
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
দার্জিলিং জমজমাট
নয়ন রহস্য
পুনশ্চ প্রোফেসর শঙ্কু
প্রোঃ শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা
ফটিকচাঁদ
ফেলুদা এন্ড কোং
ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু
ফেলদা প্লাস ফেলুদা
বাক্স-রহস্য
বাদশাহী আংটি
ব্রেজিলের কালো বাঘ
মহাসংকটে শঙ্কু
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প
যখন ছোট ছিলাম
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে
রয়েল বেঙ্গল রহস্য
শঙ্কু একাই ১০০
স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু
সুজন হরবোলা
সেরা সত্যজিৎ
সেরা সন্দেশ (সম্পাদিত)
সোনার কেল্লা
হত্যাপুরী
প্রোফেসর শঙ্কু
একেই বলে শুটিং
পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য
বিষয় চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)
কাঞ্চনজঙ্ঘা (চিত্রনাট্য)
নায়ক (চিত্রনাট্য)

সূচীপত্র

গ ল্প

অনাথবাবুর ভয়

অনাথবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ট্রেনের কামরায়। আমি যাচ্ছিলাম রঘুনাথপুর হাওয়াবদলের জন্য। কলকাতায় খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। গত ক-মাস ধরে কাজের চাপে দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাছাড়া আমার লেখার শখ, দু-একটা গল্পের প্লটও মাথাও ঘুরছিল, কিন্তু এত কাজের মধ্যে কি আর লেখার ফুরসত জোটে ? তাই আর সাত-পাঁচ না ভেবে দশদিনের পাওনা ছুটি আর দিস্তেখানেক কাগজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এত জায়গা থাকতে রঘুনাথপুর কেন তারও অবিশ্যি একটা কারণ আছে। ওখানে বিনা-খরচায় থাকার একটা ব্যবস্থা জুটে গেছে। আমার কলেজের সহপাঠী বীরেন বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে রঘুনাথপুরে। কফি হাউসে বসে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়, এই আলোচনাপ্রসঙ্গে বীরেন খুব খুশি হয়ে ওর বাড়িটা অফার করে বলল, 'আমিও যেতুম, কিন্তু আমার এদিকের ঝামেলা, বুঝতেই তো পারছিস। তবে তোর কোনোই অসুবিধা হবে না। আমাদের পঞ্চাশ বছরের পুরনো চাকর ভরদ্বাজ রয়েছে ও-বাড়িতে। ও-ই তোর দেখাশুনো করবে। তুই চলে যা।'

গাড়িতে যাত্রী ছিল অনেক। আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসে ছিলেন অনাথবন্ধু মিত্র। বেঁটেখাটো মানুষটি, বছর পঞ্চাশেক আন্দাজ বয়স। মাঝখানে টেরিকাটা কাঁচাপাকা চুল, চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ, আর ঠোঁটের কোণে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচেকানাচে সদাই কোনো মজার চিন্তা ঘোরাফেরা করছে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম : ভদ্রলোককে হঠাৎ দেখলে মনে হবে তিনি যেন পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনো নাটকের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সেজেগুজে তৈরি হয়ে এসেছেন। ওরকম কোট, ও ধরনের শার্টের কলার, ওই চশমা, আর বিশেষ করে ওই বুট জুতো—এসব আর

আজকালকার দিনে কেউ পরে না।

অনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জানলাম তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। কিংবা এও হতে পারে যে ট্রেনের শব্দের জন্য তিনি আমার প্রশ্ন শুনতে পাননি।

বীরেনের পৈতৃক ভিটেটি দেখে মনটা খুশি হয়ে উঠল। বেশ বাড়ি। সামনে একফালি জমি—তাতে সবজি ও ফুলগাছ দুই-ই হয়েছে। কাছাকাছির মধ্যে অন্য কোনো বাড়িও নেই, কাজেই পড়শীর উৎপাত থেকেও রক্ষা।

আমি আমার থাকার জন্য ভরদ্বাজের আপত্তি সত্ত্বেও ছাতের চিলেকোঠাটি বেছে নিলাম। আলো বাতাস এবং নির্জনতা, তিনটেই অপর্যাপ্ত পাওয়া যাবে ওখানে। ঘর দখল করে জিনিসপত্র গোছাবার সময় দেখি আমার দাড়ি কামানোর ক্ষুর আনতে ভুলে গিয়েছি। ভরদ্বাজ শুনে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে খোকাবাবু। এই তো কুণ্ডুবাবুর দোকান, পাঁচ মিনিটের পথ। সেখানে গেলেই পাবে'খন বিলেড।'

বিকেল চারটে নাগাদ চা-টা খেয়ে কুণ্ডুবাবুর দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি সেটি একটি ভালো আড্ডার জায়গা। দোকানের ভিতর দুটি বেঞ্চিতে বসে পাঁচ-সাতটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রীতিমতো গল্প জমিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিতভাবে বলছেন, 'আরে বাপু, এ তো আর শোনা কথা নয়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। আর তিরিশ বছর হয়ে গেল বল্লেই কি সব মন থেকে মুছে গেল ? এসব স্মৃতি অত সহজে ভোলবার নয়, আর বিশেষ করে যখন হলধর দত্ত ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মৃত্যুর জন্য আমি যে কিছু অংশে দায়ী, সে বিশ্বাস আমার আজও যায়নি।'

আমি এক প্যাকেট সেভন-ও-ক্লক কিনে আরো দু-একটা অবান্তর জিনিসের খোঁজ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক বলে চললেন, 'ভেবে দেখুন, আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গে মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাতে গেল ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না, ফেরে না, ফেরে না—শেষটায় আমি, জিতেন বক্সি, হরিচরণ সা, আর আরো তিন-চারজন কে ছিল ঠিক মনে নেই—গেলুম হালদারবাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছেন, তাঁর চোখ চাওয়া, দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যা নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কী ভাবব বলুন ? গায়ে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আঁচড় নেই, সাপের ছোবল নেই, কিচ্ছু নেই। আপনারাই বলুন এখন কী বলবেন।'

আরো মিনিট পাঁচেক দোকানে থেকে আলোচনার বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হল। ব্যাপারটা এই—রঘুনাথপুরের দক্ষিণপ্রান্তে হালদারবাড়ি বলে

একটি দুশো বছরের পুরনো ভগ্নপ্রায় জমিদারী প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে—বিশেষ করে তার দোতলার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে—নাকি অনেক কালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায়নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের অস্তিত্ব মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে। আর বিশ্বাস করার কারণও আছে যথেষ্ট। একে তো হলধর দত্তের রহস্যজনক মৃত্যু, তার উপর এমনিতেই হালদারবংশের ইতিহাসে নাকি খুনখারাপি, আত্মহত্যা ইত্যাদির অনেক নজির পাওয়া যায়।

মনে মনে হালদারবাড়ি সম্পর্কে বেশ খানিকটা কৌতূহল নিয়ে দোকানের বাইরে এসেই দেখি আমার ট্রেনের আলাপী অনাথবন্ধু মিত্র মশাই হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে বললেন, 'শুনছিলেন ওদের কথাবার্তা ?'

বললাম, 'তা কিছুটা শুনেছি।'

'বিশ্বাস হয় ?'

'কী ? ভূত ?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপার কী জানেন—ভূতের বাড়ির কথা তো অনেকই শুনলাম, কিন্তু সেসব বাড়িতে থেকে নিজের চোখে ভূত দেখেছে এমন লোক তো কই আজ অবধি একটিও মীট করলাম না। তাই ঠিক—'

অনাথবাবু একটু হেসে বললেন, 'একবার দেখে আসবেন নাকি ?'

'কী ?'

'বাড়িটা।'

'দেখে আসব মানে—'

'বাইরে থেকে আর কি। বেশি দূর তো নয়। বড় জোর মাইলখানেক। এই রাস্তা দিয়ে সোজা গিয়ে জোড়াশিবের মন্দির ছাড়িয়ে ডানহাতি রাস্তায় ঘুরে পোয়াটাক পথ।'

ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আর তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করব ? তাই চললাম তাঁর সঙ্গে।

হালদারদের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশে বড় বড় গাছের জঙ্গল। তবে বাড়ির গেটের মাথাটি দেখা যেতে থাকে পৌঁছনোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক, মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা। ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকদূর রাস্তা গিয়ে তবে সদর দালান। দু-তিনটে মূর্তি আর ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ দেখে বুঝলাম যে বাড়ির আর ফটকের

মাঝখানের এই জায়গাটা আগে বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোনো বাহার নেই তার কোনো জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকোচৌকো ভাব। বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে তার শেওলাবৃত দেয়ালে।

মিনিটখানেক চেয়ে থাকার পর অনাথবাবু বললেন, 'আমি যতদূর জানি, রোদ থাকতে ভূত বেরোয় না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'একবার চট করে সেই ঘরটা দেখে এলে হত না ?'

'সেই উত্তর-পশ্চিমের ঘর ? যে ঘরে—'

'হ্যাঁ। যে ঘরে হলধর দত্তের মৃত্যু হয়েছিল।'

ভদ্রলোকের তো এসব ব্যাপারে দেখছি একটু বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ !

অনাথবাবু বোধহয় আমার মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরেই বললেন, 'খুব আশ্চর্য লাগছে, না ? আসলে কী জানেন ? আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই—আমার রঘুনাথপুর আসার একমাত্র কারণই হল ওই বাড়িটা।'

'বটে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যে ভূতের বাড়ি, আমি কলকাতায় থাকতে সে খবরটা পেয়ে ওই ভূতটিকে দেখব বলে এখানে এসেছি। আপনি সেদিন ট্রেনে আমার আসার কারণটা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর না দিয়ে অভদ্রতা করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলাম যে উপযুক্ত সময় এলে—অর্থাৎ আপনি কীরকম লোক সেটা আরেকটু জেনে নিয়ে, আসল কারণটা নিজে থেকেই বলব।'

'কিন্তু তাই বলে ভূতের পেছনে ধাওয়া করে একেবারে কলকাতা ছেড়ে—'

'বলছি, বলছি। ব্যস্ত হবেন না। আমার কাজটা সম্বন্ধেই তো বলা হয়নি এখনো আপনাকে। আসলে আমি ভূত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। আজ পঁচিশ বছর ধরে এ-ব্যাপার নিয়ে বিস্তর রিসার্চ করেছি। শুধু ভূত কেন—ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভ্যাম্পায়ার, ওয়্যারউল্ফ, ভুডুইজম ইত্যাদি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে বইয়ে যা লেখে তার প্রায় সবই পড়ে ফেলেছি। সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে এইসব বই পড়ার জন্য। পরলোকতত্ত্ব নিয়ে লন্ডনের প্রফেসার নর্টনের সঙ্গে আজ তিন বছর ধরে চিঠি লেখালেখি করছি। আমার লেখা প্রবন্ধ বিলেতের সব নামকরা কাগজে বেরিয়েছে। আপনার কাছে বড়াই করে কী লাভ, তবে এটুকু বলতে পারি যে এদেশে এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক বোধহয় আর নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে তিনি যে মিথ্যে বলছেন বা বাড়িয়ে বলছেন এটা আমার একবারও মনে হয় না। বরং তাঁর সম্বন্ধে খুব সহজেই একটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল।

'একটা গন্ধ পাচ্ছেন ?'

'কী গন্ধ ?'

'মাদ্রাজী ধূপ, মাছের তেল, আর মড়াপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ ।'

আমি বার দু'-এক বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস টানলাম। অনেকদিনের বন্ধ ঘর খুললে যে একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, সে গন্ধ ছাড়া কোনো গন্ধই পেলাম না। তাই বললাম, 'কই, ঠিক বুঝতে পারছি না তো ।'

অনাথবাবু আরো একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বাঁ হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, 'বহুত আচ্ছা ! এ গন্ধ আমার চেনা গন্ধ। এ বাড়িতে ভূত অবশ্যম্ভাবী। তবে বাবাজী দেখা দেবেন কি না-দেবেন সেটা কাল রাত্রের আগে বোঝা যাবে না। চলুন ।'

অনাথবাবু স্থির করে ফেললেন যে, পরদিনই তাঁকে এ ঘরে রাত্রিবাস করতে হবে। ফেরার পথে বললেন, 'আজ থাকলুম না কারণ কাল অমাবস্যা—ভূতের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত তিথি। তাছাড়া দু'-একটি জিনিস সঙ্গে রাখা দরকার। সেগুলো বাড়িতে রয়ে গেছে, কাল নিয়ে আসব। আজ সার্ভেটা করে গেলুম আর কি ।'

ভদ্রলোক আমায় বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'আর কাউকে আমার এই প্ল্যানের কথা বলবেন না যেন। এদের কথাবার্তা তো শুনলুম আজকে—যা ভয় আর যা প্রেজুডিস এদের, জানলে পরে হয়তো বাধাটাধা দিয়ে আমার প্ল্যানটাই ভেস্তে দেবে। আর হ্যাঁ, আরেকটা কথা। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে বললুম না বলে কিছু মনে করবেন না। এসব ব্যাপার, বুঝলেন কিনা, একা না হলে ঠিক জুতসই হয় না।'

পরদিন দুপুরে কাগজকলম নিয়ে বসলেও লেখা খুব বেশিদূর এগোল না। মন পড়ে রয়েছে হালদারবাড়ির ওই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটায়। আর রাত্রে অনাথবাবুর কী অভিজ্ঞতা হবে সেই নিয়ে একটা অশান্তি আর উদ্বেগ রয়েছে মনের মধ্যে।

বিকেলে অনাথবাবুকে হালদারবাড়ির ফটক অবধি পৌঁছে দিলাম। ভদ্রলোকের গায়ে আজ একটা কালো গলাবন্ধ কোট, কাঁধে জলের ফ্লাস্ক আর হাতে সেই কালকের তিন সেলের টর্চ। ফটক দিয়ে ঢুকবার আগে কোটের দু' পকেটে দু' হাত ঢুকিয়ে দুটো বোতল বার করে আমায় দেখিয়ে বললেন, 'এই দেখুন—এটিতে রয়েছে আমার নিজের ফরমুলায় তৈরি তেল—শরীরের অনাবৃত অংশে মেখে নিলে আর মশা কামড়াবে না। আর এই দ্বিতীয়টিতে হল

কারবলিক অ্যাসিড, ঘরের আশেপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপের উৎপাত থেকে নিশ্চিন্ত।' এই বলে বোতল দুটো পকেটে পুরে, টর্চটা মাথায় ঠেকিয়ে আমায় একটা সেলাম ঠুকে ভদ্রলোক বুট জুতো খটখটিয়ে হালদারবাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাত্রে ভালো ঘুম হল না।

ভোর হতে না হতে ভরদ্বাজকে বললাম আমার থার্মস ফ্লাস্কে দু'জনের মতো চা ভরে দিতে। চা এলে পর ফ্লাস্কটি নিয়ে আবার হালদারবাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

হালদারবাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে দেখি চারিদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। অনাথবাবুর নাম ধরে ডাকব, না সটান দোতলায় যাব তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম—'ও মশাই, এই যে এদিকে।'

এবার দেখতে পেলাম অনাথবাবুকে—প্রাসাদের পুবদিকের জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে হেঁটে আসছেন। তাঁকে দেখে মোটেই মনে হয় না যে রাত্রে তাঁর কোনো ভয়াবহ বা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আমার কাছে এসে হাসতে হাসতে হাতে একটা নিমের ডাল দেখিয়ে বললেন, 'আর বলবেন না মশাই! আধ ঘন্টা ধরে বনেবাদাড়ে ঘুরছি এই নিমডালের খোঁজে। আমার আবার দাঁতনের অভ্যেস কিনা।'

ফস করে রাত্রের কথাটা জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকল। বললাম, 'চা এনেছি। এখানেই খাবেন, না বাড়ি যাবেন?'

'চলুন না, ওই ফোয়ারার পাশটায় বসে খাওয়া যাক।'

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তিসূচক 'আঃ' শব্দ করে আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে অনাথবাবু বললেন, 'খুব কৌতূহল হচ্ছে, না?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ, মানে, তা একটু—'

'বেশ। তবে বলছি শুনুন। গোড়াতেই বলে রাখি—এক্সপিডিশন হাইলি সাক্সেসফুল। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে।' অনাথবাবু এক মগ চা শেষ করে দ্বিতীয় মগ ঢেলে তাঁর কথা শুরু করলেন:

'আপনি যখন আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন তখন পাঁচটা। আমি বাড়ির ভেতরে ঢোকার আগে এই আশপাশটা একটু সার্ভে করে নিলুম। অনেক সময় ভূতের চেয়ে জ্যান্ত মানুষ বা জানোয়ার থেকে উপদ্রবের আশঙ্কা বেশি থাকে। যাই হোক, দেখলুম কাছাকাছির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

'বাড়িতে ঢুকে একতলার ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো খোলা হয়েছে সেগুলোও একবার দেখে নিলুম। জিনিসপত্তর তো আর অ্যাদ্দিন ধরে বিশেষ পড়ে থাকার

কথা নয়। একটা ঘরে কিছু আবর্জনা, আর আরেকটার কড়িকাঠে গুটি চারেক ঝুলন্ত বাদুড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বাদুড়গুলো আমায় দেখেও নড়ল না। আমিও তাদের ডিসটার্ব করলুম না।

'সাড়ে ছ'টা নাগাদ দোতলার ওই আসল ঘরটিতে ঢুকে রাত কাটানোর আয়োজন শুরু করলুম। একটা ঝাড়ন এনেছিলুম, তাই দিয়ে প্রথম আরামকেদারাটিকে ঝেড়েপুঁছে সাফ করলুম। কদ্দিনের ধুলো জমেছিল তাতে কে জানে?

'ঘরের মধ্যে একটা গুমোট ভাব ছিল, তাই জানালাটা খুলে দিলুম। ভূতবাবাজী যদি সশরীরে আসতে চান তাই বারান্দার দরজাটাও খোলা রাখলুম। তারপর টর্চ ও ফ্লাস্কটা মেঝেতে রেখে ওই বেতছেঁড়া আরামকেদারাতেই শুয়ে পড়লুম। অসোয়াস্তি হচ্ছিল বেশ, কিন্তু এর চেয়েও আরো অনেক বেয়াড়া অবস্থায় বহুবার রাত কাটিয়েছি, তাই কিছু মাইন্ড করলুম না।

'আশ্বিন মাস, সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেই সঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি এমনিতে খুব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা এক্সাইটেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভেতরে ভেতরে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।

'সময়টা ঠিক বলতে পারি না, তবে আন্দাজে মনে হয় ন'টা কি সাড়ে ন'টা নাগাদ জানালা দিয়ে একটা জোনাকি ঘরে ঢুকেছিল। সেটা মিনিটখানেক ঘোরাঘুরি করে আবার জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল।

'তারপর কখন যে শেয়াল, ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, আর কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি সে খেয়াল নেই।

'ঘুমটা ভাঙল একটা শব্দে। ঘড়ির শব্দ। ঢং ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। মিঠে অথচ বেশ জোর আওয়াজ। জাত ঘড়ির আওয়াজ, আর সেটা আসছে বাইরের বারান্দা থেকে।

'কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমটা ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে আরো দুটো জিনিস লক্ষ করলুম। এক—আমি আরামকেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেঁড়াটা তো নেইই, বরং উলটে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে গেছে। আর দুই—আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালর সমেত আস্ত নতুন টানাপাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি দুলিয়ে আমায় চমৎকার বাতাস করছে।

'আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ ফিরে দেখি কে জানি একটি আলবোলা রেখে গেছে, আর তার থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।'

অনাথবাবু একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'বেশ মনোরম পরিবেশ নয় কি ?'

আমি বললাম, 'শুনে তো ভালোই লাগছে। আপনার রাতটা তাহলে মোটামুটি আরামেই কেটেছে ?'

আমার প্রশ্ন শুনে অনাথবাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললাম, 'তাহলে কি সত্যি আপনার কোনো ভয়ের কারণ ঘটেনি ? ভূত কি আপনি দেখেননি ?'

অনাথবাবু আবার আমার দিকে চাইলেন। এবার কিন্তু আর ঠোঁটের কোণে সে হাসিটা নেই। ধরা গলায় ভদ্রলোকের প্রশ্ন এল, 'পরশু যখন আপনি ঘরটায় গেলেন, তখন কড়িকাঠের দিকটা ভালো করে লক্ষ করেছিলেন কি ?'

আমি বললাম, 'তেমন ভালো করে দেখিনি বোধহয়। কেন বলুন তো ?'

অনাথবাবু বললেন, 'ওখানে একটা বিশেষ ব্যাপার রয়েছে, সেটা না দেখলে ঘটনাটা বোঝাতে পারব না। চলুন।'

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অনাথবাবু কেবল একটি কথা বললেন, 'আমার আর ভূতের পেছনে ধাওয়া করতে হবে না সীতেশবাবু। কোনোদিনও না। সে শখ মিটে গেছে।'

বারান্দা দিয়ে যাবার পথে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম সেরকমই ভাঙা অবস্থা।

ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে অনাথবাবু বললেন, 'চলুন।'

দরজাটা ভেজানো ছিল। আমি হাত দিয়ে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। তারপর দু'পা এগিয়ে মেঝের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরে একটা বিস্ময় ও আতঙ্কের শিহরন খেলে গেল।

বুট জুতো পরা ও কে পড়ে আছে মেঝেতে ?

আর বারান্দার দিক থেকে কার অট্টহাসি হালদারবাড়ির আনাচেকানাচে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছে ? তাহলে কি— ?

আর কিছু মনে নেই আমার।

যখন জ্ঞান হল, দেখি ভরদ্বাজ আমার খাটের পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমায় হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ভবতোষ মজুমদার। আমায় চোখ খুলতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'ভাগ্যে সিধুচরণ আপনাকে দেখেছিল ও
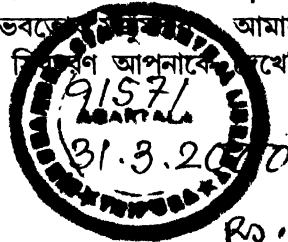
বাড়িতে ঢুকতে, নইলে যে কী দশা হত আপনার জানি না। ওখানে গেস্‌লেন কোন্ আক্কেলে?'

আমি বললাম, 'অনাথবাবু যে রাত্রে—'

ভবতোষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আর অনাথবাবু! কাল যে অতগুলো কথা বললুম সেসব বোধহয় কিছুই বিশ্বাস করেননি ভদ্রলোক। ভাগ্যে আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাত কাটাতে যাননি ও বাড়িতে। দেখলেন তো ওঁর অবস্থা। হলধরের যা হয়েছিল, এঁরও ঠিক তাই। মরে একেবারে কাঠ, আর চোখ ঠিক সেইভাবে চাওয়া, সেই দৃষ্টি, সেই কড়িকাঠের দিকে।...'

আমি মনে মনে বললাম, না, মরে কাঠ নয়। মরে কী হয়েছেন অনাথবাবু তা আমি জানি। কালও সকালে গেলে দেখতে পাব তাঁকে—গায়ে কালো কোট, পায়ে বুট জুতো—হালদারবাড়ির পুব দিকের জঙ্গল থেকে নিমের দাঁতন হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন।

বাতিকবাবু

বাতিকবাবুর আসল নামটা জিজ্ঞেস করাই হয়নি। পদবী মুখার্জি। চেহারা একবার দেখলে ভোলা কঠিন। প্রায় ছ' ফুট লম্বা, শরীরে চর্বির লেশমাত্র নেই, পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা, হাতে পায়ে গলায় কপালে অজস্র শিরা উপশিরা চামড়া ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। টেনিস কলারওয়ালা সাদা শার্ট, কালো ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, সাদা মোজা সাদা কেড্‌স—দার্জিলিঙের গ্রীষ্মকালে এই ছিল তাঁর মার্কামারা পোশাক। এছাড়া তাঁর হাতে থাকত মজবুত লাঠি। বনবাদাড়ে এবড়ো-খেবড়ো জমিতে ঘোরা অভ্যাস বলেই হয়তো লাঠিটার প্রয়োজন হত।

আমার সঙ্গে বাতিকবাবুর আলাপ দশ বছর আগে। কলকাতায় ব্যাঙ্কে চাকরি করি, দিন দশেকের ছুটি জমেছে, বৈশাখের মাঝামাঝি গিয়ে হাজির হলাম আমার প্রিয় দার্জিলিঙ শহরে। আর প্রথম দিনই দর্শন পেলাম বাতিকবাবুর। কী করে সেটা হল বলি।

চা খেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়েছি বিকেল সাড়ে চারটায়। দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আবার কখন হবে বলা যায় না, তাই রেনকোটটা গায়ে দিয়েই বেরিয়েছি। দার্জিলিঙের সবচেয়ে মনোরম, সবচেয়ে নিরিবিলি রাস্তা জলাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা মোড়ের মাথায় একটি ভদ্রলোক রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠির উপর ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভারী মনোযোগ দিয়ে কী যেন দেখছেন। দৃশ্যটা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হল না। জংলি ফুল বা পোকামাকড় সম্বন্ধে আগ্রহ থাকলে লোক ওইভাবে ঘাসের দিকে চেয়ে থাকতে পারে। আমি ভদ্রলোকের দিকে একটা মৃদু কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে আবার এগোতে শুরু করলাম।

কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মনে হল ব্যাপারটাকে যতটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল ততটা নয়। অবাক লাগল ভদ্রলোকের একাগ্রতা দেখে। আমি পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাবভাব লক্ষ করছি, অথচ, উনি আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সেই একইভাবে সামনে ঝুঁকে ঘাসের দিকে চেয়ে আছেন। শেষটায় বাঙালী বুঝে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'কিছু হারালেন নাকি ?'

কোনো উত্তর নেই। লোকটা কি কালা ?

আমার কৌতূহল বাড়ল। ঘটনার শেষ না দেখে যাব না। একটা সিগারেট ধরালাম। মিনিট তিনেক পরে ভদ্রলোকের অনড় দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হল। তিনি আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে তাঁর ডান হাতটা ঘাসের দিকে বাড়ালেন। ঘন ঘাসের ভিতর তাঁর হাতের আঙুলগুলো প্রবেশ করল। তারপর হাতটা উঠে এল। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে একটা ছোট্ট গোল চাকতি। ভালো করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা বোতাম। প্রায় একটা আধুলির মতো বড়ো। সম্ভবত কোটের বোতাম।

ভদ্রলোক বোতামটা চোখের সামনে এনে প্রায় মিনিটখানেক ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জিভ দিয়ে চারবার ছিক্‌ছিক্ করে আক্ষেপের শব্দ করে সেটাকে শার্টের বুকপকেটে পুরে আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ম্যালের দিকে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে ম্যালের মুখে ফোয়ারার ধারে দার্জিলিঙের পুরনো বাসিন্দা ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হল। ইনি কলেজে বাবার সহপাঠী ছিলেন, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁকে আজ বিকেলের ঘটনাটা না বলে পারলাম না। ভৌমিক শুনেটুনে বললেন, 'চেহারা আর হাবভাবের বর্ণনা থেকে তো বাতিকবাবু বলে মনে হচ্ছে।'

'বাতিকবাবু ?'

'স্যাড কেস। আসল নাম ঠিক মনে নেই, পদবী মুখার্জি। বছর পাঁচেক হল দার্জিলিঙে রয়েছে। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছেই একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজে ফিজিক্স পড়াতো। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে। শুনেছি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। চাকরি-বাকরি ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে বোধহয়।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ আছে ?'

'গোড়ার দিকে একবার আমার কাছে এসেছিল। রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে সেপটিক হবার জোগাড়। সারিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু বাতিকবাবু নামটা... ?'

ভৌমিক হো হো করে হেসে উঠলেন। 'সেটা হয়েছে ওর এক উদ্ভট শখের জন্য। অবিশ্যি নামকরণটা কে করেছে বলা শক্ত।'

'শখটা কী ?'

'তুমি তো নিজের চোখে দেখলে—রাস্তা থেকে একটা বোতাম তুলে পকেটে নিয়ে নিল। ওইটেই ওর শখ বা হবি। যেখান সেখান থেকে জিনিস তুলে নিয়ে এসে সযত্নে রেখে দেয়।'

'যে-কোনো জিনিস ?' কেন জানি না, আমার লোকটা সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছিল।

ডাঃ ভৌমিক বললেন, 'আমরা বলব যে-কোনো জিনিস, কিন্তু ভদ্রলোক ক্লেম করবেন সেগুলো অত্যন্ত প্রেশাস, কারণ সে সব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা ঘটনা জড়িয়ে আছে।'

'কিন্তু সেটা উনি জানেন কী করে ?'

ডাঃ ভৌমিক তাঁর হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সেটা তুমি ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না। উনি ভিজিটর পেলে খুশিই হন—কারণ ওঁর গপ্পের স্টক প্রচুর। ওঁর কালেকশনের প্রত্যেকটি জিনিসকে নিয়ে একেকটি গপ্প তো! ওয়াইল্ড ননসেন্স, বলা বাহুল্য, তবে উনি সেগুলো বলতে পারলে খুশিই হন। অবিশ্যি তুমি শুনে খুশি হবে কি না সেটা আলাদা কথা...'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছে বাতিকবাবুর বাড়ি চিনে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না, কারণ পাড়ার সকলেই ভদ্রলোককে চেনে। সতের নম্বর বাড়ির দরজায় টোকা মারতেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, এবং আশ্চর্য এই যে আমায় দেখেই চিনলেন।

'কাল আপনি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমার তখন উত্তর দেবার অবস্থা ছিল না। ওই সময়টা কন্‌সেনট্রেশন নষ্ট হতে দিলেই সর্বনাশ। ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল আলমারি। বাঁ দিকের দেয়ালের অর্ধেকটা অংশ জুড়ে একটা কাঁচে ঢাকা আলমারির প্রতিটি তাকে পাশাপাশি রাখা অতি সাধারণ সব জিনিস, যেগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই। একবার চোখ বুলিয়ে একটা শেল্‌ফে পাশাপাশি চোখে পড়ল—একটা গাছের শেকড়, একটা মর্চে ধরা তালা, আদ্যিকালের গোল্ড ফ্লেকের টিন, একটা উল বোনার কাঁটা, একটা জুতোর বুরুশ, একটা টর্চলাইটের ব্যাটারি। আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'ওগুলো দেখে আপনি বিশেষ আনন্দ পাবেন না, কারণ ওসব জিনিসের মূল্য কেবল আমিই জানি।'

আমি বললাম, 'শুনেছি এসব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা বিশেষ ঘটনার

কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মনে হল ব্যাপারটাকে যতটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল ততটা নয়। অবাক লাগল ভদ্রলোকের একাগ্রতা দেখে। আমি পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাবভাব লক্ষ করছি, অথচ, উনি আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সেই একইভাবে সামনে ঝুঁকে ঘাসের দিকে চেয়ে আছেন। শেষটায় বাঙালী বুঝে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'কিছু হারালেন নাকি?'

কোনো উত্তর নেই। লোকটা কি কালা?

আমার কৌতূহল বাড়ল। ঘটনার শেষ না দেখে যাব না। একটা সিগারেট ধরালাম। মিনিট তিনেক পরে ভদ্রলোকের অনড় দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হল। তিনি আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে তাঁর ডান হাতটা ঘাসের দিকে বাড়ালেন। ঘন ঘাসের ভিতর তাঁর হাতের আঙুলগুলো প্রবেশ করল। তারপর হাতটা উঠে এল। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে একটা ছোট্ট গোল চাকতি। ভালো করে দেখে বুঝলাম সেটা একটা বোতাম। প্রায় একটা আধুলির মতো বড়ো। সম্ভবত কোটের বোতাম।

ভদ্রলোক বোতামটা চোখের সামনে এনে প্রায় মিনিটখানেক ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে জিভ দিয়ে চারবার ছিক্‌ছিক্ করে আক্ষেপের শব্দ করে সেটাকে শার্টের বুকপকেটে পুরে আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ম্যালের দিকে চলে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলা ফেরার পথে ম্যালের মুখে ফোয়ারার ধারে দার্জিলিঙের পুরনো বাসিন্দা ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হল। ইনি কলেজে বাবার সহপাঠী ছিলেন, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। তাঁকে আজ বিকেলের ঘটনাটা না বলে পারলাম না। ভৌমিক শুনেটুনে বললেন, 'চেহারা আর হাবভাবের বর্ণনা থেকে তো বাতিকবাবু বলে মনে হচ্ছে।'

'বাতিকবাবু?'

'স্যাড কেস। আসল নাম ঠিক মনে নেই, পদবী মুখার্জি। বছর পাঁচেক হল দার্জিলিঙে রয়েছে। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছেই একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজে ফিজিক্স পড়াতো। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে। শুনেছি ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। চাকরি-বাকরি ছেড়ে এখানে চলে এসেছে। পৈতৃক সম্পত্তি কিছু আছে বোধহয়।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?'

'গোড়ার দিকে একবার আমার কাছে এসেছিল। রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে সেপটিক হবার জোগাড়। সারিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কিন্তু বাতিকবাবু নামটা... ?'

ভৌমিক হো হো করে হেসে উঠলেন। 'সেটা হয়েছে ওর এক উদ্ভট শখের জন্য। অবিশ্যি নামকরণটা কে করেছে বলা শক্ত।'

'শখটা কী ?'

'তুমি তো নিজের চোখে দেখলে—রাস্তা থেকে একটা বোতাম তুলে পকেটে নিয়ে নিল। ওইটেই ওর শখ বা হবি। যেখান সেখান থেকে জিনিস তুলে নিয়ে এসে সযত্নে রেখে দেয়।'

'যে-কোনো জিনিস ?' কেন জানি না, আমার লোকটা সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ছিল।

ডাঃ ভৌমিক বললেন, 'আমরা বলব যে-কোনো জিনিস, কিন্তু ভদ্রলোক ক্লেম করবেন সেগুলো অত্যন্ত প্রেশাস, কারণ সে সব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা ঘটনা জড়িয়ে আছে।'

'কিন্তু সেটা উনি জানেন কী করে ?'

ডাঃ ভৌমিক তাঁর হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'সেটা তুমি ওঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না। উনি ভিজিটর পেলে খুশিই হন—কারণ ওঁর গপ্পের স্টক প্রচুর। ওঁর কালেকশনের প্রত্যেকটি জিনিসকে নিয়ে একেকটি গপ্প তো! ওয়াইল্ড ননসেন্স, বলা বাহুল্য, তবে উনি সেগুলো বলতে পারলে খুশিই হন। অবিশ্যি তুমি শুনে খুশি হবে কি না সেটা আলাদা কথা...'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের কাছে বাতিকবাবুর বাড়ি চিনে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না, কারণ পাড়ার সকলেই ভদ্রলোককে চেনে। সতের নম্বর বাড়ির দরজায় টোকা মারতেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, এবং আশ্চর্য এই যে আমায় দেখেই চিনলেন।

'কাল আপনি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু আমার তখন উত্তর দেবার অবস্থা ছিল না। ওই সময়টা কন্‌সেনট্রেশন নষ্ট হতে দিলেই সর্বনাশ। ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল আলমারি। বাঁ দিকের দেয়ালের অর্ধেকটা অংশ জুড়ে একটা কাঁচে ঢাকা আলমারির প্রতিটি তাকে পাশাপাশি রাখা অতি সাধারণ সব জিনিস, যেগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই। একবার চোখ বুলিয়ে একটা শেল্‌ফে পাশাপাশি চোখে পড়ল—একটা গাছের শেকড়, একটা মর্চে ধরা তালা, আদ্যিকালের গোল্ড ফ্লেকের টিন, একটা উল বোনার কাঁটা, একটা জুতোর বুরুশ, একটা টর্চলাইটের ব্যাটারি। আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, 'ওগুলো দেখে আপনি বিশেষ আনন্দ পাবেন না, কারণ ওসব জিনিসের মূল্য কেবল আমিই জানি।'

আমি বললাম, 'শুনেছি এসব জিনিসের সঙ্গে নাকি একেকটা বিশেষ ঘটনার

সম্পর্ক রয়েছে ?'

'আছে বৈকি।'

'কিন্তু সেরকম তো সব জিনিসের সঙ্গেই থাকে। যেমন আপনি যে ঘড়িটা হাতে পরেছেন—'

ভদ্রলোক হাত তুলে আমার কথা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'ঘটনা জড়িয়ে থাকে অবশ্যই, কিন্তু সব জিনিসের উপর সে ঘটনার ছাপ থেকে যায় না। ক্বচিৎ কদাচিৎ একেকটা জিনিস মেলে যার মধ্যে সে ছাপটা থাকে। যেমন কালকের এই বোতামটা—'

ঘরের ডানদিকে একটা রাইটিং ডেস্কের উপর বোতামটা রাখা ছিল। ভদ্রলোক সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। খয়েরি রঙের কোটের বোতাম। তার মধ্যে কোনোরকম বিশেষত্ব আমার চোখে ধরা পড়ল না।

'কিছু বুঝতে পারছেন ?'

বাধ্য হয়েই না বলতে হল। বাতিকবাবু বললেন, 'এই বোতাম একটি সাহেবের কোট থেকে এসেছে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে জলাপাহাড় রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। বয়স ষাটের কাছাকাছি, রাইডিং-এর পোশাক পরা, সবল সুস্থ মিলিটারি চেহারা। যেখানে বোতামটা পেলুম, সেইখানটায় এসে ভদ্রলোকের স্ট্রোক হয়। ঘোড়া থেকে পড়ে যান। দুজন পথচারী দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসে, কিন্তু তিনি অলরেডি ডেড। ঘোড়া থেকে পড়ার সময়ই বোতামটা কোট থেকে ছিঁড়ে রাস্তার ধারে পড়ে যায়।'

'এসব কি আপনি দেখতে পান ?'

'ভিভিড়লি। যত বেশি মনঃসংযোগ করা যায়, তত বেশি স্পষ্ট দেখি।'

'কখন দেখেন ?'

'এই জাতীয় বিশেষ গুণসম্পন্ন কোনো বস্তুর কাছে এলেই আমি প্রথমে একটা মাথার যন্ত্রণা অনুভব করি। তারপর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, মনে হয় পড়ে যাব, সাপোর্ট দরকার। কিন্তু তারপরেই দৃশ্য দেখা শুরু হয়, আর পাও স্টেডি হয়ে যায়। এই এক্‌সপিরিয়েন্সের ফলে আমার শরীরের টেম্পারেচার বেড়ে যায় প্রতিবার। কাল প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত একশ দুই জ্বর ছিল। অবিশ্যি জ্বরটা বেশিক্ষণ থাকে না। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

ব্যাপারটা আজগুবি হলেও আমার বেশ মজা লাগছিল। বললাম, 'আরো দু-একটা উদাহরণ দিতে পারেন ?'

বাতিকবাবু বললেন, 'আলমারি ভর্তি উদাহরণ। ওই যে খাতা দেখছেন, ওতে প্রত্যেকটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে। আপনি কোন্‌টা জানতে চান বলুন।'

আমি কিছু বলার আগে ভদ্রলোক আলমারির কাঁচ সরিয়ে তাক থেকে দুটো জিনিস বার করে টেবিলের উপর রাখলেন—একটা বহু পুরনো চামড়ার দস্তানা, আর একটা চশমার কাঁচ।

'এই যে দস্তানাটা দেখছেন,' বাতিকবাবু বললেন, 'এটা আমার প্রথম পাওয় জিনিস ; অর্থাৎ আমার সংগ্রহের প্রথম আইটেম। এটা পাই সুইটজারল্যান্ডের লুসার্ন শহরের বাইরে একটা বনের মধ্যে। তখন আমার মারবুর্গে পড়া শেষ হয়েছে, আমি দেশে ফেরার আগে একটু কন্টিনেন্টটা ঘুরে দেখছি। লুসানে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছি। নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। একটু বিশ্রাম নেব বলে একটা বেঞ্চিতে বসেছি, এমন সময় পাশেই একটা গাছের গুঁড়ির ধারে ঘাসের ভিতর দস্তানার বুড়ো আঙুলটা চোখে পড়তেই মাথা দপ্ দপ্ করতে আরম্ভ করল। তারপর দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল : তারপর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবি। একটি সুবেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, মুখে লম্বা ব্যাঁকানো সুইস পাইপ। দস্তান পরা হাতে ছড়ি নিয়ে হেঁটে চলেছেন রাস্তা দিয়ে। আচমকা ঝোপের পিছন থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করল। ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে হাত পা ছুঁড়লেন। ধ্বস্তাধ্বস্তির ফাঁকে তিনি তাঁর ডান হাতের দস্তানাটি হারালেন, দুর্বৃত্তেরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁর কোটের পকেট থেকে টাকাকড়ি ও হাত থেকে সোনার ঘড়িটি নিয়ে পালাল।'

'সত্যিই এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি ?'

'আমি তিন দিন হাসপাতালে ছিলুম। জ্বর, ডিলিরিয়াম, আর আরো অনেক কিছু। ডাঃ স্টাইনিট্স রোগ ধরতে পারেননি। তারপর আপনিই সেরে উঠে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে অনুসন্ধান আরম্ভ করি। দু বছর আগে ওই বনে ঠিক ওই জায়গায় কাউন্ট ফার্ডিনান্ড মুস্যাপ বলে একজন ধনী ব্যক্তি ঠিক ওইভাবেই খুন হয়। তার ছেলে দস্তানাটা চিনতে পারে।'

ভদ্রলোক এমন সহজভাবে ঘটনাটা বলে গেলেন যে তাঁর কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। বললাম, 'আপনি সেই তখন থেকেই আপনার সংগ্রহ শুরু করেন ?'

বাতিকবাবু বললেন, 'এই দস্তানাটা পাবার পর প্রায় দশ বছর আর ও ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। ততদিনে আমি দেশে ফিরে কটকের কলেজে প্রফেসারি আরম্ভ করেছি। ছুটিতে এখানে ওখানে বেড়াতে যেতাম। একবার ওয়ালটেয়ারে গিয়ে দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটা হয়। সমুদ্রের তীরে একটা পাথরের খাঁজে এই চশমার কাঁচটা পাই। দেখতেই পাচ্ছেন প্লাস পাওয়ারের কাঁচ। একটি মাদ্রাজি ভদ্রলোক চশমা খুলে রেখে জলে নেমেছিলেন স্নান করতে। তিনি আর জল থেকে ফেরেননি। পায়ে ক্র্যাম্প ধরার ফলে তাঁর সলিল সমাধি

হয়। জলের ভিতর থেকে হাত তুলে হেল্‌প হেল্‌প চিৎকার—ভারী মর্মান্তিক। তাঁরই চশমার এই কাঁচটি চার বছর পরে আমি পাই। এটাও যে সত্যি ঘটনা সেটা আমি যাচাই করে জেনেছি। ওয়েল নোন ড্রাউনিং কেস। মৃত ব্যক্তি কোয়েম্বাটোরে থাকতেন, নাম শিবরমণ।'

ভদ্রলোক দস্তানা ও চশমার কাঁচ যথাস্থানে রেখে আবার জায়গায় এসে বসলেন। 'আমার এই আলমারিতে কতগুলো জিনিস আছে জানেন? একশো বাহাত্তরটা। আমার গত ত্রিশ বছরের সংগ্রহ। বলুন তো, এরকম সংগ্রহের কথা আর শুনেছেন কি?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'আপনার এই হবিটি যে একেবারে ইউনীক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গেই কি মৃত্যুর একটা সম্পর্ক রয়েছে?'

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাই তো দেখছি। শুধু মৃত্যু নয়—আকস্মিক, অস্বাভাবিক মৃত্যু। খুন, আত্মহত্যা, অপঘাত মৃত্যু, হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া—এই জাতীয় ঘটনার সঙ্গে যোগ থাকলে তবেই একেকটা জিনিস আমার মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।'

'এগুলোর সবই কি রাস্তায় বা মাঠে-ঘাটে পাওয়া?'

'অধিকাংশই। আর বাকিগুলো পাওয়া চোরাবাজারে, নীলামে, কিউরিওর দোকানে। এই যে কাট-গ্লাসের সুরাপাত্রটি দেখছেন, এটা পাই কলকাতার রাসেল স্ট্রীটের একটা নীলামের দোকানে। এই পাত্রতে ব্র্যান্ডির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটি বিশালবপু সাহেবের মৃত্যু হয় কলকাতা শহরে।'

আমি কিছুক্ষণ থেকেই আলমারি জিনিসপত্র ছেড়ে ভদ্রলোকের নিজের চেহারার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলাম। অনেক লক্ষ করেও তাঁর মধ্যে ভণ্ডামির কোনো চিহ্ন ধরা পড়ল না। পাগলামির কোনো লক্ষণ রয়েছে কি! মনে তো হয় না। চোখে উদাস ভাবটা যেমন পাগলদের মধ্যে সম্ভব, তেমনি কবি, ভাবুক বা সাধকদের মধ্যেও সম্ভব।

আমি আর বেশিক্ষণ বসলাম না। বিদায় নিয়ে চৌকাঠ পেরোবার সময় ভদ্রলোক বললেন, 'আবার আসবেন। আপনাদের মতো লোকের জন্য আমার দরজা সব সময়েই খোলা। কোথায় উঠেছেন আপনি?'

'অ্যালিস ভিলা হোটেল।'

'ও। তাহলে তো দশ মিনিটের হাঁটা পথ। বেশ লাগল আপনার সঙ্গ। কোনো কোনো লোককে আদৌ বরদাস্ত করতে পারিনি। আপনাকে সহৃদয় সমঝদার বলে মনে হয়।'

•

বিকেলে ডাঃ ভৌমিক চায়ে বলেছিলেন। আমি ছাড়া নিমন্ত্রিত আরো দুটি ভদ্রলোক। চায়ের সঙ্গে চানাচুর আর কেক খেতে খেতে বাতিকবাবুর প্রসঙ্গটা না তুলে পারলাম না। ভৌমিক বললেন, 'কতক্ষণ ছিলে ?'

'ঘণ্টাখানেক।'

'ওরে বাবা !' ডাঃ ভৌমিকের চোখ কপালে। 'এক ঘণ্টা ধরে ওই বুজরুকের কচকচি শুনলে ?'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'যা প্যাচপেচে বৃষ্টি—স্বচ্ছন্দে বেড়ানোর তো উপায় নেই। হোটেলের ঘরে বন্দী হয়ে থাকার চেয়ে ওঁর গল্প শোনা বোধহয় ভালো।'

'কার কথা হচ্ছে ?'

প্রশ্নটা এল একটি বছর চল্লিশেকের ভদ্রলোকের কাছ থেকে। মিস্টার খাস্তগির বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ডাঃ ভৌমিক। বাতিকবাবুর বাতিকের বর্ণনা শুনে খাস্তগির একটা বেঁকা হাসি হেসে বললেন, 'এসব লোককে এখানে আস্তানা গাড়তে দিয়ে দার্জিলিঙের বায়ু দূষিত করেছেন কেন ডাঃ ভৌমিক ?'

ডাঃ ভৌমিক হালকা হেসে বললেন, 'এত বড় একটা শহরের বায়ু দূষিত করার ক্ষমতা কি লোকটার আছে ? বোধহয় না।'

মিস্টার নস্কর নামক তৃতীয় ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষে বুজরুকদের কুপ্রভাব সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়েছিলেন। শেষকালে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে বাতিকবাবু যেহেতু নেহাতই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন, তাঁর বুজরুকির প্রভাব আর পাঁচজনের উপর পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ভৌমিক দার্জিলিঙে রয়েছেন প্রায় ত্রিশ বছর। খাস্তগির অনেকদিনের বাসিন্দা। শেষ পর্যন্ত এদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। 'জলাপাহাড় রোডে কোনো অশ্বারোহী সাহেব হার্টফেল করে মারা যায়, এমন কোনো ঘটনা জানা আছে আপনাদের ?'

'কে, মেজর ব্র্যাডলে ?' প্রশ্ন করলেন ডাঃ ভৌমিক। 'সে তো বছর আষ্টেক আগেকার ঘটনা। স্ট্রোক হয়েছিল। সম্ভবত জলাপাহাড় রোডেই। হাসপাতালে এনেছিল, কিন্তু তার আগেই মারা যায়। কেন বল তো ?'

আমি বাতিকবাবুর বোতামের কথাটা বললাম। মিস্টার খাস্তগির একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'লোকটা এইসব বলে অলৌকিক ক্ষমতা ক্লেম করছে নাকি ? এ তো একের নম্বরের শয়তান দেখছি হে ! সে নিজে দার্জিলিঙে রয়েছে অ্যাদ্দিন। ঘোড়ার পিঠে সাহেব মরেছে সে খবর তো এমনিতেই তার কানে পৌঁছুতে পারে। সেখানে অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োজনটা আসছে কোত্থেকে ?'

কথাটা অবিশ্যি আমারও মনে হয়েছিল। দার্জিলিঙে থেকে দার্জিলিঙেরই একটি ঘটনার কথা জানতে পারা বাতিকবাবুর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। আমি তাই আর প্রসঙ্গটা বাড়ালাম না।

চায়ের পর্ব এবং পাঁচরকম এলোমেলো কথাবার্তা শেষ হবার পর আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিস্টার নস্করও উঠে পড়লেন। বললেন উনিও অ্যালিস ভিলার দিকটাতেই থাকেন, তাই আমার সঙ্গে একসঙ্গেই হেঁটে ফিরবেন। আমরা ডাঃ ভৌমিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমি দার্জিলিঙে আসার পর এই প্রথম দেখলাম আকাশের ঘন মেঘে ফাটল ধরেছে, আর সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি মঞ্চের স্পট লাইটের মতো শহর ও তার আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে পড়েছে।

মিস্টার নস্করকে দেখে বেশ মজবুত মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি চড়াই উঠতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। হাঁপানির মধ্যেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার এই ভদ্রলোকটি কোথায় থাকেন?'

বললাম, 'দেখা করবেন নাকি?'

'না না। এমনি কৌতূহল হচ্ছিল।'

বাতিকবাবুর বাড়ির হদিস দিয়ে বললাম, 'ভদ্রলোক বেড়াতে-টেড়াতে বেরোন। হয়তো পথেই দেখা হয়ে যাতে পারে।'

কী আশ্চর্য, হলও তাই। কথাটা বলার দু মিনিটের মধ্যেই একটা মোড় ঘুরতেই সামনে বিশ হাত দূরে দেখি বাতিকবাবু ডান হাতে তাঁর লাঠি আর বাঁ হাতে একটা খবরের কাগজের মোড়ক নিয়ে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে সামনে দেখতে পেয়ে ভদ্রলোকের মুখের যে ভাবটা হল সেটাকে যদিও হাসি বলা চলে না, কিন্তু সেটা অপ্রসন্নভাব নয় নিশ্চয়ই। বললেন, 'বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি ফেল হয়েছে ভাই, তাই মোমবাতি কিনে নিয়ে যাচ্ছি।'

ভদ্রতার খাতিরে মিস্টার নস্করের সঙ্গে আলাপটা না করিয়ে পারলাম না। 'মিস্টার নস্কর—মিস্টার মুখার্জি।'

নস্কর দেখলাম সাহেবী মেজাজের লোক। নমস্কার না করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। বাতিকবাবু মুখে কোনোরকম সৌজন্য প্রকাশ না করে হাতটা ধরে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার তো বটেই, মিস্টার নস্করেরও নিশ্চয়ই বেশ অপ্রস্তুত লাগছিল। প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থাকার পর আর না পেরে নস্কর বললেন, 'ওয়েল—আমি তাহলে এগোই। আপনার কথা শুনছিলাম, লাকিলি আলাপ হয়ে গেল।'

•

'চলি, মিস্টার মুখার্জি।' আমাকেও বাধ্য হয়েই কথাটা বলতে হল। বাতিকবাবুকে এবার সত্যিই পাগল বলে মনে হচ্ছিল। রাস্তার মাঝখানে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে কী যে ভাবছেন তা উনিই জানেন। আমাদের দুজনের বিদায় নেওয়াটা উনি যেন গ্রাহ্যই করলেন না। নস্করকে না হয় পছন্দ না হতে পারে, আমার সঙ্গে তো আজ সকালেই দিব্যি ভালো ব্যবহার করেছেন। ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ফিরে দেখলাম তিনি এখনো ঠিক সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন। নস্কর মন্তব্য করলেন, 'আপনার কাছে শুনে যতটা ছিটগ্রস্ত মনে হয়েছিল, এখন দেখছি তার চেয়েও বেশ কয়েক কাঠি বেশি।'

রাত ন'টা। সবেমাত্র ডিনার শেষ করে একটা পান মুখে দিয়ে গোয়েন্দা উপন্যাসটা নিয়ে বিছানায় ঢুকব ভাবছি, এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল একজন লোক নাকি আমার খোঁজ করছে। বাইরে বেরিয়ে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম। এত রাত্রে বাতিকবাবু আমার কাছে কেন? আজই সন্ধ্যেবেলা ভদ্রলোকের যে মুহ্যমান ভাবটা দেখেছিলাম, সেটা যেন এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি। বললেন, 'একটু বসবার জায়গা হবে ভাই—নিরিবিলি? বাইরে দাঁড়াতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে।'

ভদ্রলোককে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'পাল্‌সটা একবার দেখ তো। তোমায় তুমি বলছি কিছু মনে করো না।'

গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলাম। রীতিমতো জ্বর। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'একটা অ্যানাসিন দেব? আমার সঙ্গেই আছে।'

বাতিকবাবু হেসে বললেন, 'কোনো সিনেই কাজ দেবে না। জ্বর থাকবে এ রাতটা। কাল রেমিশন হয়ে যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা জ্বর নয়। তোমার কাছে চিকিৎসার জন্য আসিনি। আমার যেটা দরকার সেটা ওই আংটিটা।'

আংটি? কোন্ আংটির কথা বলছেন ভদ্রলোক?

আমার হতভম্ব ভাব দেখে ভদ্রলোক যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন, 'ওই যে লস্কর না তস্কর কী নাম বললে। তাঁর হাতের আংটিটা দেখনি? সস্তা আংটি—পাথর-টাথর নেই, কিন্তু ওটি আমার চাই।'

এখন মনে পড়ল মিস্টার নস্করের ডান হাতে একটা রূপোর সিগনেট রিং লক্ষ করেছিলাম বটে।

বাতিকবাবু বলে চলেছেন, 'হ্যান্ডশেকের সময় হাতের তেলোয় ঠেকে গেল আংটিটা। মনে হল শরীরের ভেতর একটা এক্সপ্লোশন হয়ে গেল। তারপর যা হয় তাই। রাস্তার মাঝখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখতে আরম্ভ করেছিলুম, এমন সময় উল্টোদিক থেকে একটা জীপ এসে দিলে সব মাটি

করে।'

'তার মানে ঘটনাটা আপনার দেখা হয়নি ?'

'যতদূর দেখেছি তাতেই যথেষ্ট। খুনের ব্যাপার। আততায়ীর মুখ দেখিনি। আংটিসমেত হাতটা এগিয়ে যাচ্ছে একটা লোকের গলার দিকে। ভিকটিম অবাঙালী। মাথায় রাজস্থানী টুপি, চোখে সোনার চশমা। চোখ বিস্ফারিত। চেঁচাবে বলে মুখ খুলেছে। তলার পাটির একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো...ব্যস্, এই পর্যন্ত। ও আংটি আমার চাই।'

আমি কয়েক মুহূর্ত বাতিকবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বাধ্য হয়েই বললাম, 'দেখুন মিস্টার মুখার্জি—আংটির যদি আপনার প্রয়োজন হয় তো আপনি নিজেই মিস্টার নস্করের কাছে চেয়ে দেখুন না। আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ সামান্যই। আর যতদূর বুঝেছি, তিনি আপনার হবির ব্যাপারটা তেমন সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না।'

'তাহলে আমি চেয়ে কী লাভ সেটা বল ? তার চেয়ে বরং—'

'ভেরি সরি মিস্টার মুখার্জি—' আমি ভদ্রলোককে বাধা দিয়ে স্পষ্ট কথাটা না বলে পারলাম না—'আমি চাইলেও কোনো ফল হবে বলে মনে হয় না। এসব আংটি-টাংটির প্রতি একেক সময় মানুষের কী রকম মমতা থাকে সেটা তো আপনি জানেন। উনি যদি জিনিসটা ব্যবহার না করতেন তাহলে তবু...'

ভদ্রলোক আর বসলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যেই অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। আমি মনে মনে বললাম, ভদ্রলোকের আবদারটা একটু বেয়াড়া রকমের। রাস্তা থেকে জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু লোকের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস নিয়ে তাঁর কালেকশন বাড়ানোর প্রয়াসটা অন্যায় প্রয়াস। এ ব্যাপারে কেউই তাঁকে সাহায্য করত না, আমিই বা করি কী করে ? আর নস্কর এমনিতেই বেশ কাঠখোট্টা লোক। তাঁর কাছে চেয়ে ওই আংটি পাবার আশা করাটাই ভুল।

পরদিন সকালে মেঘ কেটে গিয়ে দিন ফরসা হয়েছে দেখে চা খেয়ে বার্চ হিলের উদ্দেশে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। খটখটে দিন। ম্যাল লোকে লোকারণ্য, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ও চেঞ্জারদের সঙ্গে কোলিশন বাঁচিয়ে ক্রমে গিয়ে পড়লাম অবজারভেটরি হিলের পশ্চিম দিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তাটায়। কাল রাত থেকেই মাঝে মাঝে বাতিকবাবুর করুণ মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, আর মনে মনে একটা ইচ্ছে দানা বাঁধছিল যদি ঘটনাচক্রে নস্করের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে একবার আংটির কথাটা বলে দেখব। হয়তো আংটিটার প্রতি তাঁর তেমন টান নেই, চাইলে দিয়ে দেবেন।' সেটা বাতিকবাবুর হাতে তুলে দিতে পারলে তাঁর মুখের ভাব যে কেমন হবে সেটা বেশ

বুঝতে পারছিলাম। ছেলেবেলায় ডাক টিকিট জমাতাম, কাজেই হবির নেশা যে কী জিনিস সেটা আমার জানা ছিল। আর বাতিকবাবু লোকটা সাতেও নেই পাঁচেও নেই, নিজের উদ্ভট শখ নিয়েই মেতে আছেন। গায়ে পড়ে কাউকে দলে টানবার চেষ্টা করছেন না, হয়তো জীবনে এই প্রথম অন্যের একটা জিনিসের প্রতি লোভ দেখাচ্ছেন—তাও সেটা এমন মহামূল্য কিছুই নয়। সত্যি বলতে কি, কাল রাত্রের পরে আমার ধারণা হয়েছে যে ভদ্রলোকের অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা কিছুই নেই, ওঁর শখের সমস্ত ব্যাপারটাই ওঁর আধপাগলা মনের কল্পনার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু তাতেই যদি এই নিঃসঙ্গ লোকটি খুশি থাকে, তাতে আর কী এসে যাচ্ছে ? কিন্তু বার্চ হিলের রাস্তায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুরেও নস্করের সঙ্গে দেখা হল না। ম্যালে যখন এসে পৌঁছেছি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ভিড় তখনো রয়েছে, কিন্তু যাবার সময় যেমন দেখে গেছি, তার চেয়ে যেন একটু তফাত। এদিকে ওদিকে ইতস্তত ছড়ানো দশ-বিশ জনের জটলা, এবং সেই জটলার মধ্যে কী নিয়ে যেন উত্তেজিত আলোচনা চলেছে। এগিয়ে যেতে 'পুলিশ' 'তদন্ত' 'খুন' ইত্যাদি কথাগুলো কানে আসতে লাগল। একটি অপরিচিত প্রৌঢ় বাঙালীকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার মশাই ? কিছু হয়েছে-টয়েছে নাকি ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কলকাতা থেকে কে এক সাস্‌পেক্টেড ক্রিমিন্যাল নাকি এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছিল। তাকে ধাওয়া করে পুলিশ এসেছে, খানাতল্লাসী চলেছে !'

'লোকটার নাম জানেন ?'

'আসল নাম জানি না। এখানে নাকি নস্কর বলে পরিচয় দিয়েছে।'

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। একটিমাত্র লোকই আসল খবরটা দিতে পারবেন—ডাঃ ভৌমিক।

তাঁর বাড়ি পর্যন্ত আর যেতে হল না। লেডেন-লা রোডে রিকশার স্ট্যান্ডের কাছে খাস্তগির ও ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললেন, 'ভাবতে পার ! লোকটা কাল বিকেলে আমার বাড়িতে বসে চা খেয়ে গেল। পেটে একটা পেন হচ্ছে বলে তিন দিন আগে আমার কাছে এসেছিল চিকিৎসার জন্য, আমি ওষুধ দিয়েছি। একা লোক, নতুন এসেছে, তাই তাকে বাড়িতে খেতে ডাকলাম, আর আজ এই ব্যাপার !'

'লোকটা ধরা পড়েছে ?' উদ্‌গ্রীবভাবে প্রশ্ন করলাম।

'এখনো পড়েনি। সকাল থেকে মিসিং। পুলিশ খুঁজে চলেছে। তবে এই শহরেই তো আছে, যাবে আর কোথায়। কিন্তু কী সাংঘাতিক ব্যাপার বল তো !...'

ভৌমিক আর খাস্তগির চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার নাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শুধু নস্কর ক্রিমিন্যাল বলে নয়, বাতিকবাবুর আংটির প্রতি লোভের কথা ভেবে। খুনীর হাতের আংটি—ভদ্রলোক বলেছিলেন। তাহলে কি সত্যিই লোকটার মধ্যে একটা অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে ?

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ইচ্ছে করল বাতিকবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করি। ভদ্রলোক কি খবরটা পেয়েছেন ? একবার খোঁজ করে দেখা দরকার।

কিন্তু সতের নম্বর বাড়ির দরজায় বার তিনেক টোকা দিয়েও কোনো উত্তর পেলাম না। এদিকে আবার মেঘ করে এসেছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে আমার হোটেলে চলে এলাম। আধঘণ্টার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝলমলে সকালটা এক নিমেষে একটা সুদূর অতীতের ঘটনায় পরিণত হল। পুলিশ সার্চ চালিয়ে চলেছে। কোথায় গা ঢাকা দিলেন মিস্টার নস্কর ? কাকে খুন করলেন ভদ্রলোক ? কীভাবে খুন ?

সাড়ে তিনটার সময় আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মিঃ সোন্ধি খবরটা আনলেন। নস্কর যে বাড়িটায় ছিল, তার ঠিক পিছনেই পাহাড়ের খাদে ত্রিশ হাত নীচে মাথা থেঁতলানো অবস্থায় নস্করের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আত্মহত্যা, মস্তিষ্কবিকৃতি, পালাতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি নানা রকম কারণ অনুমান করা হচ্ছে। ব্যবসাগত ব্যাপারে পার্টনারের সঙ্গে শত্রুতা। সেই থেকে খুন, মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলে দার্জিলিঙে এসে গা ঢাকা, পুলিশ কর্তৃক কলকাতায় মৃতদেহ আবিষ্কার, ইত্যাদি।

নাঃ—বাতিকবাবুর সঙ্গে একবার দেখা না করলেই নয়। লোকটাকে আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সুইটজারল্যান্ড ওয়ালটেয়ারের ঘটনা মনগড়া হতে পারে, দার্জিলিঙের ঘটনা তিনি আগে থেকে জেনে থাকতে পারেন, কিন্তু নস্কর যে খুনী সেটা তিনি জানলেন কী করে ?

পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরতেই তাঁর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। বাতিকবাবু হেসে বললেন, 'এসো ভায়া, ভেতরে এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

ভেতরে ঢুকলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতিকবাবুর টেবিলের উপর টিমটিম করে একটা মোমবাতি জ্বলছে। 'আজও ইলেকট্রিসিটি আসেনি,' ম্লান হাসি হেসে বললেন ভদ্রলোক। আমি বেতের চেয়ারে বসে বললাম, 'খবর পেয়েছেন ?'

'তোমার সেই তস্করের খবর ? খবরে আর আমার কী হবে বল, আমি সবই জানতে পেরেছিলাম। তবে, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞ ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'আমার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি সে আমাকে দিয়ে গেছে।'

'দিয়ে গেছে ?' আমার গলা শুকনো।

'ওই দেখ না টেবিলের উপর।'

আবার টেবিলের দিকে চাইতে মোমবাতির পাশেই খোলা খাতার সাদা পাতার উপর আংটিটা চোখে পড়ল।

'ঘটনার বর্ণনাটা লিখে রাখছি। আইটেম নম্বর ওয়ান সেভেন থ্রী,' বাতিকবাবু বললেন। আমার মাথার মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরছে। 'দিয়ে গেছে মানে ? কখন দিয়ে গেল ?'

'এমনিতে কি দিতে চায় ? বাতিকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'জোর করে নিতে হল।'

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। ঘরের ভিতর একটা টাইমপিস টিক্‌টিক্ করে বেজে চলেছে।

'তুমি এসে ভালোই হল,' বাতিকবাবু বললেন, 'একটা জিনিস তোমাকে দিচ্ছি, সেটা তোমার কাছেই রেখে দিও।'

বাতিকবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের উল্টোদিকে অন্ধকার কোণটায় চলে গেলেন। সেখান থেকে খুটখুট শব্দ এলো, আর তার সঙ্গে তাঁর কথা—

'এটাও আমার সংগ্রহে রাখার উপযুক্ত, কিন্তু এটার প্রভাব আমি সহ্য করতে পারছি না। বার বার জ্বর আসছে, আর একটা ভারী অপ্রীতিকর দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।'

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে রয়েছেন তিনি। সেই হাতে ধরা রয়েছে তাঁর অতি পরিচিত লাঠিটা।

মোমবাতির এই ম্লান আলোতেও বুঝতে পারলাম যে লাঠির হাতলের মাথায় যে লাল দাগটা রয়েছে, সেটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ ছাড়া আর কিছুই না।

বারীন ভৌমিকের ব্যারাম

কন্‌ডাক্টরের নির্দেশমতো 'ডি' কামরায় ঢুকে বারীন ভৌমিক তাঁর সুটকেসটা সিটের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন। ওটা পথে খোলার দরকার হবে না। ছোট ব্যাগটা হাতের কাছে রাখা দরকার। চিরুনি, বুরুশ, টুথ-ব্রাশ, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, ট্রেনে পড়ার জন্য হ্যাড়লি চেজের বই—সবই রয়েছে ঐ ব্যাগে। আর আছে থ্রোট পিল্‌স। ঠাণ্ডা ঘরে ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে কাল গান খুলবে না। চট করে একটা বড়ি মুখে পুরে দিয়ে বারীন ভৌমিক ব্যাগটাকে জানালার সামনে টেবিলটার উপর রেখে দিলেন।

দিল্লীগামী ভেস্টিবিউল ট্রেন, ছাড়তে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি, অথচ তাঁর কামরায় আর প্যাসেঞ্জার নেই কেন? এতখানি পথ কি তিনি একা যাবেন? এতটা সৌভাগ্য কি তাঁর হবে? এ যে একেবারে আয়েশের পরাকাষ্ঠা! অবস্থাটা কল্পনা করে বারীন ভৌমিকের গলা থেকে আপনিই একটা গানের কলি বেরিয়ে পড়ল—বাগিচায় বুলবুল তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল!

বারীন ভৌমিক জানালা দিয়ে বাইরে হাওড়া স্টেশন প্ল্যাটফর্মের জনস্রোতের দিকে চাইলেন। দুটি ছোক্‌রা তাঁর দিকে চেয়ে পরস্পরে কী যেন বলাবলি করছে। বারীনকে চিনেছে তারা। অনেকেই চেনে। অন্তত কলকাতা শহরের, এবং অনেক বড় বড় মফস্বল শহরের অনেকেই শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর নয়, তাঁর চেহারার সঙ্গেও পরিচিত। প্রতি মাসেই পাঁচ-সাতটা ফাংশনে তাঁর ডাক পড়ে। বারীন ভৌমিক—গাইবেন নজরুলগীতি ও আধুনিক। খ্যাতি ও অর্থ—দুই-ই এখন বারীন ভৌমিকের হাতের মুঠোয়। অবিশ্যি এটা হয়েছে বছর পাঁচেক হল। তার আগে কয়েকটা বছর তাঁকে বেশ, যাকে বলে, স্ট্রাগলই করতে হয়েছে। গানের জন্য নয়। গাইবার ক্ষমতাটা তাঁর সহজাত। কিন্তু শুধু গাইলেই তো আর হয় না। তার সঙ্গে চাই কপালজোর, আর চাই ব্যাকিং।

বারীন ভৌমিকের ব্যারাম
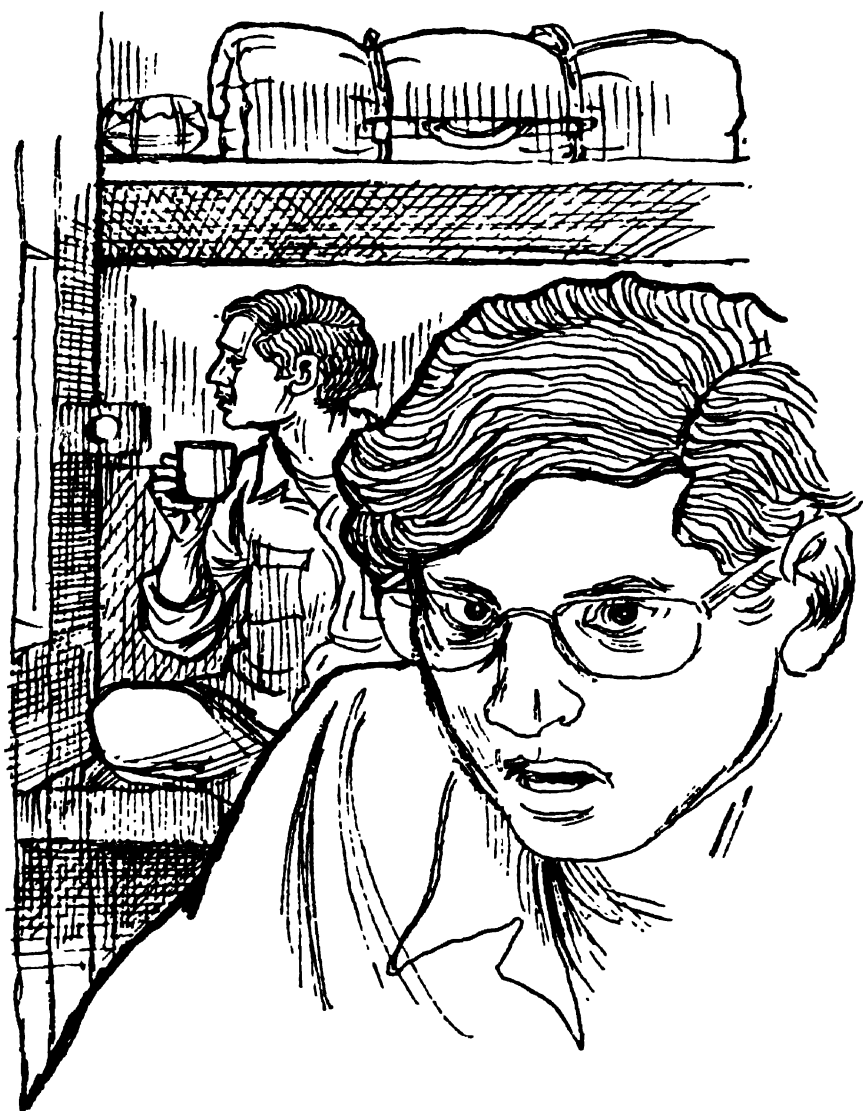
উনিশ শো সাতষট্টি সালে উনিশ পল্লীর পুজো প্যান্ডেলে ভোলাদা—ভোলা বাঁড়ুজ্যে—তাঁকে দিয়ে যদি না জোর করে 'বসিয়া বিজনে' গানখানা গাওয়াতেন...

বারীন ভৌমিকের দিল্লী যাওয়াটাও এই গানেরই দৌলতে। দিল্লীর বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ফার্স্ট ক্লাসের খরচ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জুবিলী অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে। থাকার ব্যবস্থাও অ্যাসোসিয়েশনই করবে। দুদিন দিল্লীতে থেকে তারপর আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি দেখে ঠিক সাতদিন পরে আবার কলকাতায় ফিরবেন বারীন ভৌমিক। তারপর পুজো পড়ে গেলে তাঁর আর অবসর নেই ; প্রহরে প্রহরে হাজিরা দিতে হবে গানের আসরে, শ্রোতাদের কানে মধুবর্ষণ করার জন্য।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা স্যার...'

কন্‌ডাক্টর গার্ড এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কী পাওয়া যায় ?' বারীন প্রশ্ন করলেন।

'আপনি নন-ভেজিটেরিয়ান তো ? দিশি খাবেন না ওয়েস্টার্ন স্টাইল ? দিশি হলে আপনার...'

বারীন নিজের পছন্দমতো লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে সবেমাত্র একটি থ্রী কাস্‌লস ধরিয়েছেন, এমন সময় আরেকটি প্যাসেঞ্জার এসে কামরায় ঢুকলেন, এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর গাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে তার যাত্রা শুরু করল।

নবাগত যাত্রীটির সঙ্গে চোখাচুখি হতেই তাঁকে চেনা মনে হওয়ায় বারীনের মুখে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়ে আগন্তুকের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। বারীন কি তাহলে ভুল করলেন ? ছি ছি ছি ! এই অবিবেচক বোকা হাসিটার কী দরকার ছিল। কী অপ্রস্তুত ! মনে পড়ল একবার রেসের মাঠে একটি ব্রাউন পাঞ্জাবীপরা প্রৌঢ় ভদ্রলোককে পিছন দিক থেকে 'কী খ্‌খবো-র ত্রিদিবদা' বলে পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মারার পরমুহূর্তেই বারীন বুঝেছিলেন তিনি আসলে ত্রিদিবদা নন। এই লজ্জাকর ঘটনার স্মৃতি তাঁকে অনেক দিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছিল। মানুষকে অপদস্থ করার জন্য কত রকম ফাঁদ যে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে !

বারীন ভৌমিক আরেকবার আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ভদ্রলোক স্যান্ডাল খুলে সিটের উপর পা ছড়িয়ে বসে সদ্য কেনা ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লিটা নেড়ে-চেড়ে দেখছেন। কী আশ্চর্য ! আবার মনে হচ্ছে তিনি লোকটিকে আগে দেখেছেন। নিমেষের দেখা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশিক্ষণের দেখা। কিন্তু কবে ? কোথায় ? ঘন ভুরু, সরু গোঁফ, পমেড দিয়ে পালিশ করা চুল, কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট আঁচিল। এ মুখ তাঁর চেনা। নিশ্চয়ই চেনা। তিনি যখন সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফে চাকরি করতেন তখনকার চেনা কি ? কিন্তু একতরফা

চেনা হয় কী করে ? ওঁর হাবভাব দেখে তো মনে হয় না যে তিনি কস্মিনকালেও বারীন ভৌমিককে দেখেছেন।

'আপনার লাঞ্চের অর্ডারটা...'

আবার কন্‌ডাক্টর গার্ড। বেশ হাসিখুশি হৃষ্টপুষ্ট অমায়িক ভদ্রলোকটি।

'শুনুন,' আগন্তুক বললেন, 'লাঞ্চ তো হল—আগে এক কাপ চা হবে কি ?'

'সার্টেনলি।'

'শুধু একটা কাপ আর লিকার দিলেই হবে। আমি র' টী খাই।'

বারীন ভৌমিকের হঠাৎ মনে হল তাঁর তলপেট থেকে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়ে জায়গাটা একদম খালি হয়ে গেছে। আর তার পরেই মনে হল তাঁর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ হাত-পা গজিয়ে ফুসফুসের খাঁচাটার মধ্যে লাফাতে শুরু করেছে। শুধু গলার স্বর নয়, ওই গলার স্বরে বিশেষভাবে বিশেষ জোর দিয়ে বলা শুধু একটি কথা—র' টী—ব্যাস্। ওই একটি কথা বারীনের মনের সমস্ত অনিশ্চয়তাকে এক ধাক্কায় দূর করে দিয়ে সেই জায়গায় একটি স্থির প্রত্যয়কে এনে বসিয়ে দিয়েছে।

বারীন যে এই ব্যক্তিটিকে শুধু দেখেছেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে ঠিক এই একইভাবে দিল্লীগামী ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় মুখোমুখি বসে একটানা প্রায় আট ঘণ্টা ভ্রমণ করেছেন। তিনি নিজে যাচ্ছিলেন পাটনা, তাঁর আপন মামাতো বোন শিপ্রার বিয়েতে। তার তিন দিন আগে রেসের মাঠে ট্রেব্‌ল টোটে একসঙ্গে সাড়ে সাত হাজার টাকা জিতে তিনি জীবনে প্রথমবার প্রথম শ্রেণীতে ট্রেনে চড়ার লোভ সামলাতে পারেননি। তখনও তাঁর গাইয়ে হিসেবে নাম হয়নি ; ঘটনাটা ঘটে সিক্সটি-ফোরে। —ন'বছর আগে। ভদ্রলোকের পদবীটাও যেন আবছা-আবছা মনে পড়ছে। 'চ' দিয়ে। চৌধুরী ? চক্রবর্তী ? চ্যাটার্জি ?...

কন্‌ডাক্টর গার্ড লাঞ্চের অর্ডার নিয়ে চলে গেলেন। বারীন অনুভব করলেন তিনি আর এই লোকটার মুখোমুখি বসে থাকতে পারছেন না। বাইরে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালেন, দরজার মুখ থেকে পাঁচ হাত ডাইনে, 'চ'-এর দৃষ্টির বেশ কিছুটা বাইরে। কোইন্সিডেন্সের বাংলা বারীন ভৌমিক জানেন না, কিন্তু এটা জানেন যে, প্রত্যেকের জীবনেই ও জিনিসটা বার কয়েক ঘটে থাকে। কিন্তু তা বলে এই রকম কোইন্সিডেন্স ?

কিন্তু 'চ' কি তাঁকে চিনেছেন ? না-চেনার দুটো কারণ থাকতে পারে। এক, হয়তো 'চ'-এর স্মরণশক্তি কম ; দুই, হয়তো এই ন'বছরে বারীনের চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে দেখতে দেখতে বারীন ভাবতে চেষ্টা করলেন, তাঁর ন'বছর আগের চেহারার সঙ্গে

আজকের চেহারার কী তফাত থাকতে পারে।

ওজন বেড়েছে অনেক, সুতরাং অনুমান করা যায় তাঁর মুখটা আরো ভরেছে। আর কী ? চশমা ছিল না, চশমা হয়েছে। গোঁফ ? কবে থেকে গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন তিনি ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। খুব বেশিদিন নয়। হাজরা রোডের সেই সেলুন। একটা নতুন ছোক্‌রা নাপিত। দুপাশের গোঁফ মিলিয়ে কাটতে পারল না। বারীন নিজে ততটা খেয়াল করেননি, কিন্তু আপিসের সেই গোপ্‌পে লিফ্‌টম্যান শুকদেও থেকে শুরু করে বাষট্টি বছরের বুড়ো ক্যাশিয়ার কেশববাবু পর্যন্ত যখন সেই নিয়ে মন্তব্য করলেন তখন বারীন মরিয়া হয়ে তাঁর সাধের গোঁফটি কামিয়ে ফেলেন। সেই থেকে আর রাখেননি। এটা চার বছর আগের ঘটনা।

গোঁফ বাদ, গালে মাংসযোগ, চোখে চশমাযোগ। বারীন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার কামরায় এসে ঢুকলেন।

বেয়ারা একটা ট্রেতে চায়ের কাপ আর টি-পট 'চ'-এর সামনে পেতে দিয়ে চলে গেল। বারীনও পানীয়ের প্রয়োজনবোধ করছিলেন—ঠাণ্ডা হোক, গরম হোক—কিন্তু বলতে গিয়েও বললেন না।

যদি গলার স্বরে চিনে ফেলে !

আর চিনলে পরে যে কী হতে পারে সেটা বারীন কল্পনাও করতে চান না। অবিশ্যি সবই নির্ভর করে 'চ' কি রকম লোক তার উপর। যদি অনিমেষদার মতো হন, তাহলে বারীন নিস্তার পেলেও পেতে পারেন। একবার বাসে একটা লোক অনিমেষদার পকেট হাতড়াচ্ছিল। টের পেয়েও লজ্জায় তিনি কিছু বলতে পারেননি। মানিব্যাগ সমেত চারটি দশ টাকার করকরে নোট তিনি পকেটমারটিকে প্রায় একরকম দিয়েই দিয়েছিলেন। পরে বাড়িতে এসে বলেছিলেন, 'পাবলিক বাসে একগাড়ি লোকের ভেতর একটা সীন হবে, আর তার মধ্যে একটা প্রমিনেন্ট পার্ট নেব আমি—এ হতে দেওয়া যায় না।' এই লোক কি সেই রকম ? না হওয়াটাই স্বাভাবিক ; কারণ অনিমেষদার মতো লোক বেশি হয় না। তাছাড়া চেহারা দেখেও মনে হয় এ-লোক সে-রকম নয়। ওই ঘন ভুরু, ঠোক্কর খাওয়া নাক, সামনের দিকে বেরিয়ে থাকা থুতনি—সব মিলিয়ে মনে হয়, এ-লোক বারীনকে চিনতে পারলেই তার লোমশ হাত দিয়ে শার্টের কলারটা খামচে ধরে বলবে, 'আপনিই সেই লোক না ?—যিনি সিক্সটি-ফোরে আমার ঘড়ি চুরি করেছিলেন ? স্কাউন্ড্রেল ! এই ন'বছর ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি। আজ আমি তোমার...'

আর ভাবতে পারলেন না বারীন ভৌমিক। এই ঠাণ্ডা কামরাতেও তাঁর কপাল ঘেমে উঠেছে। রেলওয়ের রেক্সিনে মোড়া বালিশে মাথা দিয়ে তিনি

সটান সিটের উপর শুয়ে পড়ে বাঁ হাতটা দিয়ে চোখটা ঢেকে নিলেন। চোখ দেখেই সবচেয়ে সহজে মানুষকে চিনতে পারা যায়। বারীনও প্রথমে চোখ দেখেই 'চ'কে চিনতে পেরেছিলেন।

প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর মনে পড়ছে। শুধু 'চ'-এর ঘড়ি চুরির ঘটনা না। সেই ছেলে-বয়েসে যার যা কিছু চুরি করেছেন সব তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। একেক সময় খুবই সামান্য সে জিনিস। হয়তো একটা সাধারণ ডট পেন (মুকুলমামার), কিংবা একটা সস্তা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস (তাঁর স্কুলের সহপাঠী অক্ষয়ের), অথবা ছেনিদার একজোড়া হাড়ের কাফলিংক্‌স, যেটার কোনোও প্রয়োজন ছিল না বারীনের, কোনোদিন ব্যবহারও করেননি। চুরির কারণ এই যে, সেগুলো হাতের কাছে ছিল, এবং সেগুলো অন্যের জিনিস। বারো বছর বয়স থেকে শুরু করে পঁচিশ বছর পর্যন্ত কমপক্ষে পঞ্চাশটা পরের জিনিস বারীন ভৌমিক কোনো না কোনো উপায়ে আত্মসাৎ করে নিজের ঘরে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। একে চুরি ছাড়া আর কী বলা যায়? চোরের সঙ্গে তফাত শুধু এই যে, চোর চুরি করে অভাবের তাড়নায়, আর তিনি করেছেন অভ্যাসের বশে। লোকে তাঁকে কোনোদিন সন্দেহ করেনি, তাই কোনোদিন ধরা পড়তে হয়নি। বারীন জানেন যে এইভাবে চুরি করাটা একটা ব্যারাম বিশেষ। একবার কথাচ্ছলে এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে তিনি ব্যারামের নামটাও জেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু এখন মনে পড়ছে না।

তবে ন'বছর আগে 'চ'-এর ঘড়ি নেওয়ার পর থেকে আজ অবধি এ কাজটা বারীন আর কক্ষনো করেননি। এমন কি করার সেই সাময়িক অথচ প্রবল আকাঙ্ক্ষাটাও অনুভব করেননি। বারীন জানেন যে এই উৎকট রোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

তাঁর অন্যান্য চুরির সঙ্গে ঘড়ি চুরির একটা তফাত ছিল এই যে, ঘড়িটায় তাঁর সত্যিই প্রয়োজন ছিল। রিস্টওয়াচ না; সুইজারল্যান্ডে তৈরি একটি ভারী সুন্দর ট্র্যাভলিং ক্লক। একটা নীল চতুষ্কোণ বাক্স, তার ঢাকনাটা খুললেই ঘড়িটা বেরিয়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অ্যালার্ম ঘড়ি, আর সেই অ্যালার্মের শব্দ এতই সুন্দর যে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কান জুড়িয়ে যায়। এই ন'বছর সমানে সেটা ব্যবহার করেছেন বারীন ভৌমিক। তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই সঙ্গে গেছে ঘড়ি।

আজকেও সে ঘড়ি তাঁর সঙ্গেই আছে। জানালার সামনে ওই টেবিলের উপর রাখা ব্যাগের মধ্যে।

'কদ্দূর যাবেন?'

বারীন তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলেন। লোকটা তাঁর সঙ্গে কথা বলছে,

তাঁকে প্রশ্ন করছে।

'দিল্লী।'

'আজ্ঞে ?'

'দিল্লী।'

প্রথমবার অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে একটু বেশি আস্তে উত্তর দিয়ে ফেলেছিলেন বারীন।

'আপনার কি ঠাণ্ডায় গলা বসে গেল নাকি।'

'নাঃ

'ওটা হয় মাঝে মাঝে। অ্যাকচুয়েলি এয়ার কন্ডিশনিং-এর একমাত্র লাভ হচ্ছে ধুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। নাহলে আমি এমনি ফার্স্ট ক্লাসেই যেতুম।'

বারীন চুপ। পারলে তিনি 'চ'-এর দিকে তাকান না, কিন্তু 'চ' তাঁর দিকে দেখছে কিনা সেটা জানার দুর্নিবার কৌতূহলই তাঁর দৃষ্টি বার বার ভদ্রলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'চ' নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত। অভিনয় কী ? সেটা বারীন জানেন না। সেটা জানতে হলে লোকটিকে আরো ভালো করে জানা দরকার। বারীন যেটুকু জানেন সেটা তাঁর গতবারের জানা। এক হল দুধ-চিনি ছাড়া চা-পানের অভ্যাস। আরেক হল স্টেশন এলেই নেমে গিয়ে কিছু না কিছু খাবার জিনিস কিনে আনা। নোন্‌তা জিনিস, মিষ্টি নয়। মনে আছে গতবার বারীন ভৌমিকের অনেক রকম মুখরোচক জিনিস খাওয়া হয়ে গিয়েছিল 'চ'-এর দৌলতে।

এছাড়া তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিক প্রকাশ পেয়েছিল পাটনা স্টেশনের কাছাকাছি এসে। এটার সঙ্গে ঘড়ির ব্যাপারটা জড়িত। তাই ঘটনাটা বারীনের স্পষ্ট মনে আছে। সেবার গাড়িটা ছিল অমৃতসর মেল। পাটনা পৌঁছবে ভোর পাঁচটায়। কন্‌ডাক্টর এসে সাড়ে চারটেয় তুলে দিয়েছেন বারীনকে। 'চ'ও আধ-জাগা, যদিও তিনি যাচ্ছেন দিল্লী। গাড়ি স্টেশনে পৌঁছাবার ঠিক তিন মিনিট আগ হঠাৎ ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ব্যাপার কী ? লাইনের উপর দিয়ে ল্যাম্প ও টর্চের ছুটোছুটি দেখে মনে হল কোনো গোলমাল বেধেছে। শেষটায় গার্ড এসে বললেন একটা বুড়ো নাকি লাইন পার হতে গিয়ে এঞ্জিনে কাটা পড়েছে। তার লাশ সরালেই গাড়ি চলবে। 'চ' খবরটা পাওয়ামাত্র ভারি উত্তেজিত হয়ে স্লিপিং সুট পরেই অন্ধকারে নেমে চলে গেলেন ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে আসতে।

এই সুযোগেই বারীন তাঁর বাক্স থেকে ঘড়িটি বার করে নেন। সেই রাত্রেই 'চ'কে দেখেছিলেন সেটায় দম দিতে। লোভও যে লাগেনি তা নয়, তবে

সুযোগের অভাব হবে জেনে ঘড়ির চিন্তা মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে সে সুযোগ এসে পড়াতে সে-লোভ এমনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে, বাঙ্কের উপর অন্য একটি ঘুমন্ত প্যাসেঞ্জার থাকা সত্ত্বেও তিনি ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেননি। কাজটা করতে তাঁর লাগে মাত্র পনের-বিশ সেকেন্ড। 'চ' ফিরলেন প্রায় পাঁচ মিনিট পরে।

'হরিব্‌ল ব্যাপার! ভিখিরি। ধড় একদিকে, মুড়ো একদিকে। সামনে কাউক্যাচার থাকতে কাটা যে কেন পড়ে বুঝতে পারি না মশাই। ওটার উদ্দেশ্য তো লাইনে কিছু পড়লে সেটাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেওয়া!...'

পাটনায় নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মেজোমামার মোটরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বারীন ভৌমিকের তলপেটের অসোয়াস্তিটা ম্যাজিকের মতো উবে যায়। তাঁর মন বলে, ঘড়ির মালিকের সঙ্গে এতকাল যে ব্যবধান ছিল—কেউ কারুর নাম শোনেনি, কেউ কাউকে দেখেনি—গত আট ঘণ্টার আকস্মিক সান্নিধ্যের পর আবার সেই ব্যবধান এসে পড়েছে। এর পরে আবার কোনো দিন পরস্পরের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোটিতে এক। কিংবা হয়তো তার চেয়েও কম।

কিন্তু এই তিলপ্রমাণ সম্ভাবনাই যে ন'বছর পরে হঠাৎ সত্যে পরিণত হবে সেটা কে জানত? বারীন মনে মনে বললেন, এই ধরনের ঘটনা থেকেই মানুষ কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়ে।

'আপনি কি দিল্লীর বাসিন্দা, না কলকাতার?'

বারীনের মনে পড়ল সেবারও লোকটা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করেছিল। এই গায়ে পড়া আলাপ করার বাতিকটা বারীন পছন্দ করেন না।

'কলকাতা,' বারীন জবাব দিলেন। তাঁর অজান্তেই তাঁর স্বাভাবিক গলার স্বরটা বেরিয়ে পড়েছে। বারীন নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ভবিষ্যতে তাঁকে আরো সতর্ক হতে হবে।

কিন্তু এ কী! ভদ্রলোক তাঁর দিকে এভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন কেন? সহসা এ হেন কৌতূহলের কারণ কী? বারীন অনুভব করলেন তাঁর নাড়ি আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'আপনার কি রিসেন্টলি কোনো ছবি বেরিয়েছে কাগজে?'

বারীন বুঝলেন এ ব্যাপারে সত্য গোপন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ট্রেনে অন্যান্য বাঙালী যাত্রী রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ তাঁকে চিনে ফেললেও ফেলতে পারে। এর কাছে নিজের পরিচয়টা দিলে ক্ষতি কী? বরং বারীন যে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি সেটা জানলে পরে ন'বছর আগের সেই ঘড়ি-চোরের সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখা 'চ'-এর পক্ষে আরো অসম্ভব হবে।

'কোথায় দেখেছেন আপনি ছবি?' বারীন পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি গান করেন কি ?' আবার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, তা একটু-আধটু...'

'আপনার নামটা... ?'

'বারীন্দ্রনাথ ভৌমিক।'

'তাই বলুন। বারীন ভৌমিক। তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। আপনি তো রেডিওতেও গেয়ে থাকেন মাঝে মাঝে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার স্ত্রী আপনার খুব ভক্ত। দিল্লী যাচ্ছেন কি গানের ব্যাপারে ?'

'হ্যাঁ।'

বেশি ভেঙে বলবেন না বারীন। শুধু হ্যাঁ বা না-য়ে যদি উত্তর হয়, তবে তাই বলবেন।

'দিল্লীতে এক ভৌমিক আছে—ফিনান্সে। স্কটিশে পড়ত আমার সঙ্গে। নীতীশ ভৌমিক। আপনার কোনো ইয়ে-টিয়ে নাকি ?'

ইয়ে-টিয়েই বটে। বারীনের খুড়তুতো দাদা। কড়া সাহেবী মেজাজের লোক, তাই বারীনের আত্মীয় হলেও সমগোত্রীয় নয়।

'আজ্ঞে না। আমি চিনি না।'

এখানে মিথ্যে বলাটাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন বারীন। লোকটা এবার কথা বন্ধ করলে পারে। এত জেরা কেন রে বাপু।

যাক্, লাঞ্চ এসে গেছে। আশা করি কিছুক্ষণের জন্য প্রশ্নবাণ বন্ধ হবে।

হলও তাই। 'চ' ভোজনরসিক্। একবার মুখে খাদ্য প্রবেশ করলে কথার রাস্তা যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বারীন ভৌমিকের ভয় খানিকটা কেটে গেলেও একটা অসোয়াস্তি এখনো রয়ে গেছে। এখনো বিশ ঘণ্টার পথ বাকি। মানুষের স্মৃতিভাণ্ডার বড় আশ্চর্য জিনিস। কিসে খোঁচা মেরে কোন্ আদ্যিকালের কোন্ স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলবে তার কিচ্ছু ঠিক নেই। ওই যেমন র' টী। বারীনের বিশ্বাস ওই বিশেষ কথাটা না শুনলে যে সেই ন'বছর আগের ঘড়ির মালিক 'চ' সে ধারণা কিছুতেই ওর মনে বদ্ধমূল হত না। সে-রকম বারীনেরও কোনো কথায় বা কাজে যদি তাঁর পুরনো পরিচয়টা 'চ'-এর কাছে ধরা পড়ে যায় ?

এইসব ভেবে বারীন স্থির করলেন যে তিনি কথাও বলবেন না, কাজও করবেন না। খাবার পর মুখের সামনে হ্যাড়লি চেজের বইটা খুলে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে রইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদটা শেষ করে সাবধানে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন যে 'চ' ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। ইলাস্ট্রেটেড

উইক্লিটা হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে, চোখ দুটো হাতে ঢাকা, কিন্তু বুকের ওঠা-নামা দেখে ঘুমন্ত লোকের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস বলেই মনে হয়। বারীন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। মাঠ-ঘাট, গাছপালা, খোলার বাড়ি মিলিয়ে বেহারের রুক্ষ দৃশ্য। জানালার ডবল কাঁচ ভেদ করে ট্রেনের শব্দ প্রায় পাওয়াই যায় না। যেন দূর থেকে শোনা অনেক মৃদঙ্গে একইসঙ্গে একই বোল তোলার শব্দ—ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্ ধাদ্ধিনাক্ নাদ্ধিনাক্...

এই শব্দের সঙ্গে এবার যোগ হল আরেকটি শব্দ, 'চ'-এর নাসিকাধ্বনি।

বারীন ভৌমিক অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। নজরুলের একটা বাছাই করা গানের প্রথম লাইনটা গুনগুন করে দেখলেন। সকালের মতো অতটা মসৃণ না হলেও, গলাটা তাঁর নিজের কানে খারাপ লাগল না। এবার বেশি শব্দ না করে গলাটা খাঁক্রে তিনি গানটা আবার ধরলেন। এবং ধরেই তৎক্ষণাৎ তাঁকে থেমে যেতে হল।

একটা চরম বিভীষিকাজনক শব্দ তাঁর গলা শুকিয়ে দিয়ে গান বন্ধ করে দিয়েছে।

ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজার শব্দ।

তাঁর ব্যাগের মধ্যে রাখা সুইস ঘড়িতে কেমন করে জানি অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। এবং বেজেই চলেছে। বারীন ভৌমিকের হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে গেছে। তাঁর দেহ কাষ্ঠবৎ। তাঁর দৃষ্টি ঘুমন্ত 'চ'-এর দিকে নিবদ্ধ।

'চ'-এর হাত যেন একটু নড়ল। বারীন প্রমাদ গুনলেন।

'চ'-এর ঘুম ভেঙেছে। চোখের উপর থেকে হাত সরে এল।

'গেলাসটা বুঝি ? ওটাকে নামিয়ে রাখুন তো—ভাইব্রেট করছে।'

বারীন ভৌমিক দেয়ালে লাগানো লোহার আংটার ভেতর থেকে গেলাসটা তুললেই শব্দটা থেমে গেল। সেটা টেবিলে রাখার আগে তার ভিতরের জলটুকু খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে তিনি খানিকটা আরাম পেলেন। তবু গানের অবস্থায় আসতে দেরি আছে।

হাজারিবাগ রোডের কিছু আগে চা এল। পর পর দু পেয়ালা গরম চা খেয়ে এবং 'চ'-এর কাছ থেকে আর কোনোরকম জেরা বা সন্দেহের কোনো লক্ষণ না পেয়ে বারীনের গলা আরো অনেকটা খোলসা হল। বাইরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ আর দূরের টিলার দিকে চেয়ে গাড়ির ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে একটা আধুনিক গানের খানিকটা গুনগুন করে গেয়ে আসন্ন বিপদের শেষ আশঙ্কাটুকু তাঁর মন থেকে কেটে গেল।

গয়াতে 'চ' তাঁর ন'বছরের আগের অভ্যাস অনুযায়ী প্ল্যাটফর্মে নেমে সেলোফোনে মোড়া দু প্যাকেট চানাচুর কিনে এনে তার একটা বারীন ভৌমিককে

দিলেন। বারীন দিব্যি তৃপ্তির সঙ্গে সেটা খেলেন। গাড়ি ছাড়ার মুখে সূর্য ডুবে গেল। ঘরের বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে 'চ' বললেন—

'আমরা কি লেট রান করছি ? আপনার ঘড়িতে কটা বাজে ?'

এই প্রথম বারীন ভৌমিকের খেয়াল হল যে 'চ'-এর হাতে ঘড়ি নেই। ব্যাপারটা অনুধাবন করে তিনি বিস্মিত হলেন এবং হয়তো সে বিস্ময়ের খানিকটা তাঁর চাহনিতে প্রকাশ পেল। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল 'চ'-এর প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি। নিজের ঘড়ির দিকে একঝলক দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'সাতটা পঁয়ত্রিশ।'

'তাহলে তো মোটামুটি টাইমেই যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ।'

'আমার ঘড়িটা আজই সকালে...এইচ এম টি...দিব্যি টাইম দিচ্ছিল...বিছানার চাদর ধরে এমন এক টান দিয়েছে যে ঘড়ি একেবারে...'

বারীন চুপ। তটস্থ। ঘড়ির প্রসঙ্গ তাঁর কাছে ষোল আনা অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছনীয়।

'আপনার কী ঘড়ি ?'

'এইচ এম টি।'

'ভালো সার্ভিস দিচ্ছে ?'

'হুঁ।'

'আসলে আমার ঘড়ির লাক্‌টাই খারাপ।'

বারীন ভৌমিক একটা হাই তুলে নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা চোয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মুখ খুলল না। শ্রবণশক্তি লোপ পেলে তিনি সবচেয়ে খুশি হতেন, কিন্তু তা হবার নয়। 'চ'-এর কথা দিব্যি তাঁর কানে প্রবেশ করছে—

'একটা সুইস ঘড়ি, জানেন—সোনার—ট্র্যাভলিং ক্লক—জিনিভা থেকে এনে দিয়েছিল আমার এক বন্ধু—এক মাসও ব্যবহার করিনি...ট্রেনে যাচ্ছি দিল্লী—বছর আষ্টেক আগে—এই যে আমি-আপনি ট্র্যাভ্‌ল করছি, সেই রকম একটা কামরায় আমরা দুজন—আমি আর একটি ভদ্রলোক—বাঙালী...কী ডেয়ারিং ভেবে দেখুন ! হয়তো বাথরুমে-টাথরুমে গেছি, কি স্টেশন এসেছে, প্ল্যাটফর্মে নেমেছি—আর সেই ফাঁকে ঘড়িটাকে বেমালুম ঝেপে দিল ! অথচ দেখে বোঝার জো নেই—ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে, দিব্যি ভদ্দ্‌রলোকের মতো চেহারা। খুন-টুন যে করে বসেনি এই ভাগ্যি। তারপর থেকে তো আর ট্রেনেই চড়িনি। এবারও প্লেনেই যেতুম, কিন্তু পাইলটদের স্ট্রাইকটা দিল ব্যাগড়া...'

বারীন ভৌমিকের গলা শুক্‌নো, ঠোঁটের চারপাশটা অবশ। অথচ তিনি বেশ

বুঝতে পারছেন যে এতগুলো কথার পর কিছু না বললে অস্বাভাবিক হবে, এমন কি সন্দেহজনকও হতে পারে। প্রাণান্ত চেষ্টা করে, অসীম মনোবল প্রয়োগ করে, অবশেষে কয়েকটি কথা বেরোল মুখ দিয়ে—

'আপনি খোঁ-খোঁজ করেননি ?'

'আ-র খোঁজ ! এসব কি আর খোঁজ করে ফেরত পাওয়া যায় ? তবে লোকটার চেহারা মনে রেখেছিলুম অনেক দিন। এখনো আবছা-আবছা মনে পড়ে। মাঝারি রঙ, গোঁফ আছে, আপনারই মতো হাইট হবে, তবে রোগা। আর একটিবার যদি তার সাক্ষাৎ পেতুম তো বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম। এককালে বক্সিং করতুম, জানেন ? লাইট হেভি-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলুম। সে লোকের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে আর দ্বিতীয়বার আমার সামনে পড়েনি...'

ভদ্রলোকের নামটাও মনে পড়ে গেছে। চক্রবর্তী। পুলক চক্রবর্তী। আশ্চর্য ! ওই বক্সিং-এর কথাটা বলামাত্র নামটা সিনেমার টাইটেলের মতো যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন বারীন ভৌমিক। গতবারও বক্সিং নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন পুলক চক্রবর্তী।

কিন্তু নামটা জেনেই বা কী হবে ? ইনি তো আর কোনো অপরাধ করেননি। অপরাধী বারীন নিজে। আর সেই অপরাধের বোঝা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। সব স্বীকার করলে কেমন হয় ? ঘড়িটা ফেরত দিলে কেমন হয় ? হাতের কাছে ব্যাগটা খুললেই তো—

দূর—পাগল ! এসব কী চিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বারীন ভৌমিক ? নিজেকে চোর বলে পরিচয় দেবেন ? প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী তিনি, তিনি না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়ার কথা স্বীকার করবেন ? তার ফলে তাঁর নাম যখন ধুলোয় লুটোবে তখন আর গানের ডাক আসবে কোত্থেকে ? তাঁর ভক্তের দলই বা কী ভাববে, কী বলবে ? ইনি নিজেই যে সাংবাদিক নন, বা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত নন, তারই বা গ্যারান্টি কোথায় ? না। স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না।

হয়তো স্বীকার করার প্রয়োজনও নেই। পুলক চক্রবর্তী ঘন ঘন চাইছেন তাঁর দিকে। আরো ষোল ঘণ্টা আছে দিল্লী পৌঁছাতে। কোনো এক বীভৎস মুহূর্তে ফস্ করে চিনে ফেলার দীর্ঘ সুযোগ পড়ে আছে সামনে। আরে এই তো সেই লোক !—বারীন কল্পনা করলেন তাঁর গোঁফ খসে পড়ে গেছে, গাল থেকে মাংস ঝরে গেছে, চোখ থেকে চশমা খুলে গেছে ; পুলক চক্রবর্তী এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তাঁর ন'বছর আগের চেহারাটার দিকে, তাঁর ঈষৎ কটা চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে, তাঁর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি ফুটে উঠছে। হুঁ হুঁ বাছাধন ! পথে এস এবার ! অ্যাদ্দিন বাদে বাগে পেয়েছি তোমায় ! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখনি...

দশটা নাগাৎ বারীন ভৌমিকের কম্প দিয়ে জ্বর এলো। গার্ডকে বলে তিনি একটি অতিরিক্ত কম্বল চেয়ে নিলেন। তারপর দুটি কম্বল একসঙ্গে পা থেকে নাক অবধি টেনে নিয়ে শয্যা নিলেন। পুলক চক্রবর্তী কামরার দরজা বন্ধ করে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিলেন। বাতি নেভাতে গিয়ে বারীনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। ওষুধ খাবেন ? ভালো বড়ি আছে আমার কাছে, দুটো খেয়ে নিন। এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভ্যাস নেই বোধহয় ?'

ভৌমিক বড়ি খেলেন। একমাত্র ভরসা যে ঘড়ি-চোর বলে চিনতে পারলেও তাঁকে অসুস্থ দেখে অনুকম্পাবশত পুলক চক্রবর্তী কঠিন শাস্তি থেকে বিরত হবেন। একটা ব্যাপার তিনি ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন। পুলক তাঁকে চিনতে না পারলেও, কাল দিল্লী পৌঁছবার আগে কোনো এক সুযোগে সুইস ঘড়িটি তার আসল মালিকের বাক্সের মধ্যে চালান দিতে হবে। যদি সম্ভব হয় তো মাঝরাত্রেই কাজটা সারা যেতে পারে। কিন্তু জ্বরটা না কমলে কম্বলের তলা থেকে বেরনো সম্ভব হবে না। এখনো মাঝে মাঝে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে।

পুলক তাঁর মাথার কাছে রীডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁর হাতে খোলা একটা পেপার-ব্যাক বই। কিন্তু তিনি কি সত্যিই পড়ছেন, না বইয়ের পাতায় চোখ রেখে অন্য কিছু চিন্তা করছেন ? বইটা একভাবে ধরা রয়েছে কেন ? পাতা উলটোচ্ছেন না কেন ? কতক্ষণ সময় লাগে পাশাপাশি দুটো পাতা পড়তে ?

এবার বারীন লক্ষ করলেন যে, পুলকের দৃষ্টি বইয়ের পাতা থেকে সরে আসছে। তাঁর মাথাটা ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঘুরল। দৃষ্টি ঘুরে আসছে বারীনের দিকে। বারীন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। এখনও কি পুলক চেয়ে আছে তাঁর দিকে ? খুব সাবধানে চোখের পাতা দুটোকে যৎসামান্য ফাঁক করলেন বারীন। আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে নিলেন। পুলক সটান চেয়ে আছে তাঁর দিকে। বারীন অনুভব করলেন তাঁর বুকের ভিতরে সেই ব্যাঙটা আবার লাফাতে শুরু করেছে। পাঁজরার হাড়ে আবার ধাক্কা পড়ছে—ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...ধুক্‌পুক্‌...। দাদ্‌রার ছন্দ। ট্রেনের চাকার গম্ভীর ছন্দের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সে ছন্দ।

একটা মৃদু 'খচ্‌' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বারীন বুঝতে পারলেন যে কামরার শেষ বাতিটাও নিভে গেছে। এবার সাহস পেয়ে চোখ খুলে বারীন দেখলেন যে দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা ক্ষীণ আলো কামরার অন্ধকারকে জমাট বাঁধতে দেয়নি। সেই আলোয় দেখা গেল পুলক চক্রবর্তী তাঁর হাতের বইটা বারীনের ব্যাগের পাশে রাখলেন। তারপর কম্বলটাকে একেবারে থুতনি অবধি টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বারীনের মুখোমুখি হয়ে একটা

সশব্দ হাই তুললেন।

বারীন ভৌমিক টের পেলেন তাঁর হৃৎস্পন্দন ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কাল সকালে—হ্যাঁ, কাল সকালে—পুলকের ট্র্যাভলিং ক্লক তাঁর নিজের ব্যাগ থেকে পুলকের সুটকেসের জামা-কাপড়ের তলায় চালান দিতে হবে। সুটকেসে চাবি লাগানো নেই। একটুক্ষণ আগেই পুলক স্লিপিং সুট বার করে পরেছে। বারীনের কাঁপুনি বন্ধ হয়ে গেছে। বোধহয় ওষুধে কাজ দিয়েছে। কী ওষুধ দিলেন ভদ্রলোক ? নামটা তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। অসুস্থতার ফলে দিল্লীর সংগীত-রসিকদের বাহবা থেকে যাতে বঞ্চিত না হন, সেই আশায় অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে পুলক চক্রবর্তীর দেওয়া বড়ি গিলেছেন তিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...

নাঃ, এসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবেন না তিনি। গেলাসের ঠুনঠুনিকে অ্যালার্ম ক্লক ভেবে কী অবস্থা হয়েছিল। এসবের জন্য দায়ী তাঁর অপরাধবোধ-জর্জরিত অসুস্থ মন। কাল সকালে তিনি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। মন খোলসা না হলে গলা খুলবে না, গান বেরোবে না। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন...

চায়ের সরঞ্জামের টুংটাং শব্দে বারীন ভৌমিকের ঘুম ভাঙল। বেয়ারা এসেছে ট্রে নিয়ে চা রুটি মাখন ডিমের অমলেট। এসব তাঁর চলবে কি ? জ্বর আছে কি এখনো ? না, নেই। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে। মোক্ষম ওষুধ দিয়েছিলেন পুলক চক্রবর্তী। ভদ্রলোকের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাব জেগে উঠল বারীনের মনে।

কিন্তু তিনি কোথায় ? বাথরুমে বোধহয়। নাকি করিডরে ? বেয়ারা চলে গেলে পর বারীন বাইরে বেরোলেন। করিডর খালি। কতক্ষণ হল বাথরুমে গেছেন ভদ্রলোক ? একটা চান্স নেওয়া যায় কি ?

বারীন চান্সটা নিলেন বটে, কিন্তু সফল হলেন না। ব্যাগ থেকে ঘড়ি বার করে পুলক চক্রবর্তীর সুটকেস টেনে বার করার জন্য নিচু হতে না হতেই ভদ্রলোক তোয়ালে ও ক্ষৌরীর সরঞ্জাম হাতে কামরায় এসে ঢুকলেন। বারীন ভৌমিক তাঁর ডান হাতটা মুঠো করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

'কেমন আছেন ? অলরাইট ?'

'হ্যাঁ। ইয়ে...এটা চিনতে পারছেন ?'

বারীন তাঁর মুঠো খুলে ঘড়ি সমেত হাতটা পুলকের সামনে ধরলেন। তাঁর মনে এখন একটা আশ্চর্য দৃঢ়তা এসেছে। চুরির ব্যারাম তিনি অনেক দিন কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু এই যে লুকোচুরি, সেটাও তো চুরি ! এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কিন্তু-কিন্তু করছি-করব ভাব, এই তলপেট-খালি, গলা-শুকনো, কান-গরম,

বুক-ধুক্‌পুক্—এটাও তো একটা ব্যারাম। এটাকে কাটিয়ে না উঠলে নিস্তার নেই, সোয়াস্তি নেই।

পুলক চক্রবর্তী হাতের তোয়ালের একটা অংশ তাঁর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে সবেমাত্র কানের মধ্যে গুঁজেছিলেন, এমন সময় বারীনের হাতে ঘড়িটা দেখে হস্ত তাঁর কানেই রয়ে গেল। বারীন বললেন, 'আমিই সেই লোক। মোটা হয়েছি, গোঁফটা কামিয়েছি, আর চশমা নিয়েছি। আমি পাটনা যাচ্ছিলাম, আপনি দিল্লী। সিক্সটি-ফোরে। সেই যে একটি লোক কাটা পড়ল, আপনি দেখতে নামলেন, সেই সুযোগে আমি ঘড়িটা নিয়ে নিই।'

পুলকের দৃষ্টি এখন ঘড়ি থেকে সরে গিয়ে বারীনের চোখের উপর নিবদ্ধ হল। বারীন দেখলেন তাঁর কপালের মাঝখানে নাকের উপর দুটো সমান্তরাল খাঁজ, চোখের সাদা অংশটা অস্বাভাবিক রকম প্রকট, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে কিছু বলার জন্য তৈরি হয়েও কিছু বলতে পারছে না। বারীন বলে চললেন—

'আসলে ওটা আমার একটা ব্যারাম, জানেন। মানে, আমি আসলে চোর নই। ডাক্তারিতে এর একটা নাম আছে, এখন মনে পড়ছে না। যাই হোক, এখন আমি একেবারে, মানে, নরম্যাল। ঘড়িটা অ্যাদ্দিন ছিল, ব্যবহার করেছি, আজও সঙ্গে রয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—প্রায় মিরাক্‌লের মতো—তাই আপনাকে ফেরত দিচ্ছি। আশা করি আপনার মনে কোনো...ইয়ে থাকবে না।'

পুলক চক্রবর্তী একটা অস্ফুট 'থ্যাঙ্কস' ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর হারানো ঘড়ি তাঁর নিজের কাছে ফিরে এসেছে, হতভম্বভাবে সেটি হাতে নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বারীন তাঁর ব্যাগ থেকে দাঁতের মাজন, টুথব্রাশ ও দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বার করে তোয়ালেটা র‍্যাক্ থেকে নামিয়ে নিয়ে কামরার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নজরুলের 'কত রাতি পোহায় বিফলে' গানের খানিকটা গেয়ে বুঝলেন যে তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সাবলীলতা তিনি ফিরে পেয়েছেন।

ফাইনান্সের এন. সি. ভৌমিককে টেলিফোনে পেতে প্রায় তিন মিনিট সময় লাগল। শেষে একটা পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠে শোনা গেল 'হ্যালো'।

'কে, নীতীশদা? আমি ভোঁদু।'

'কীরে, তুই এসে গেচিস? আজ যাব তোর গলাবাজি শুনতে। তুইও একটা কেউকেটা হয়ে গেলি শেষটায়? ভাবা যায় না!...যাক, কী খবর বল্। হঠাৎ নীতীশদাকে মনে পড়ল কেন?'

'ইয়ে—পুলক চক্রবর্তী বলে কাউকে চিনতে? তোমার সঙ্গে নাকি স্কটিশে

পড়ত। বক্সিং করত।'

'কে, ঝাড়ুদার ?'

'ঝাড়ুদার ?'

'ও যে সব জিনিসপত্তর ঝেড়ে দিত। এর-ওর ফাউন্টেন পেন, লাইব্রেরির বই, কমন-রুম থেকে টেবিল-টেনিস ব্যাট। আমার প্রথম রনসনটা তো ওই ঝেড়েছিল। অথচ অভাব-টভাব নেই, বাপ রিচ ম্যান। ওটা এক ধরনের ব্যারাম, জানিস তো ?'

'ব্যারাম ?'

'জানিস না ? ক্লেপ্‌টোমেনিয়া। কে-এল-ই-পি...'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বারীন ভৌমিক তাঁর খোলা সুটকেসটার দিকে দেখলেন। হোটেলে এসে সুটকেস খুলতেই কিছু জিনিসের অভাব তিনি লক্ষ করেছেন। এক কার্টন থ্রী কাস্‌লস সিগারেট, একটা জাপানী বাইনোকুলার, পাঁচটা একশো টাকার নোট সমেত একটা মানি-ব্যাগ।

ক্লেপ্‌টোমেনিয়া। বারীন নামটা জানতেন, কিন্তু ভুলে গেছিলেন। আর ভুলবেন না।

ভূতো

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রূরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। অক্রূর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ, কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রূরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপ্রর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হরনাথ, কেমন আছ ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'রাগ সংগীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।'

'গান করো ?'

'আজ্ঞে না।'

'যন্ত্র সংগীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী যন্ত্র ? সেতার ?'

'আজ্ঞে না।'

'সরোদ ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কী বাজাও ?'

'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রূরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রূর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না ? নবীনের পড়াশুনায় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু অক্রূর চৌধুরীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল যে অক্রূরবাবু থাকেন কলকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন ?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্প শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন বলল, সে কী করে।

'এই সব শখ হয়েছে কেন ?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল।—'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রূরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায়নি। যদি পার তো নিজে চেষ্টা করে দেখ।'

নবীন সেদিনের মতো উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট

লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রূরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরো বিপর্যয়। এবার অক্রূরবাবু একরকম বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাবো না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝোনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনোরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুসড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রূর চৌধুরী। সে যদি না শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম সম্বন্ধে একটা বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প বর্গের প ফ ব ভ ম, কেবল এই ক'টা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই ক'টা অক্ষর না থাকলে যে কোনো কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অথচ না নাড়িয়ে বলা যায়। কোনো কথায় প বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ' কথাটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে বলা যায়, তাহলে আর ঠোঁট নাড়াবার কোনো দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ ম-য়ের জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ ?' 'ভালো আছি,' 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।'—তাহলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ ?' 'ঘালো আছি, 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে তাই না ?' 'তা কড়েছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা'।

আরো আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্‌ট্রিলোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় জাদুকর। মনে হয় জাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন পনের ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রূর চৌধুরীর মতো। অর্থাৎ অক্রূর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্রূর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল।—'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্রূর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটাও অক্রূর চৌধুরীর মতো ; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল ; তাদের একটা ফাংশনে শশধরকে ধরে তার ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌মের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হচ্ছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টগেংগল আর ঙোহনগাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষই করেনি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনো চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রূর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথাবার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রূরবাবু উপস্থিত ছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন।

সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জানো তো ভূতো ?'

'কই, না তো।'

'সে কী, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জানো না ?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উহুঁ, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল ?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কী ?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসট্রামে ভিড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রূরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অক্রূরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অক্রূরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রূরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলেনি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে ?'

অক্রূরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন ?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধহয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রূরবাবু এখনো ভূতোর দিক থেকে চোখ সরাননি। বললেন. 'তুমি জানো

কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে কর ? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে ? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব ?'

সময়টা সন্ধ্যা। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রূরবাবুর চোখ দুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেই ভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক।

'তুমি জানো কি না জানি না,' বললেন অক্রূরবাবু, 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মেই কিন্তু আমার জাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয়; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে জাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনো?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে জাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম যেমন তোমাকে আমি শেখাইনি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায়নি। পেশাদারী জাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনোদিনই শেখায়নি। ম্যাজিকের রাস্তা জাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রূরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ।.. যাক, আমি তাহলে আসি।'

অক্রূরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ করেনি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিয়ে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ চোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভালো করে দেখেনি।

কিন্তু তাও মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে

কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেঝেতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া ?'

আদিনাথ পাল ভারী অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেননি। বললে কাঁচা পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনো অসুবিধে ছিল না। দু'রকম চুলই তো আছে স্টকে ; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি ?'

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি ? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে ; আপনি টের পাননি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোড শেডিং নিয়ে রসাল কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সব সময় তৈরি কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরিজি শব্দ ঢুকে পড়ছে যেগুলো নবীন কখনো ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারী পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরিজি কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভালো লাগেনি। তার সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য একজন কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে ? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ করেছে অক্রূরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখে পড়ার মতো নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেই সঙ্গে আরো কিছু।

আরো খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।

এই কালি আগে ঠিক ছিল না।

নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারী অস্থির

লাগছে। ম্যাজিকের পূজারী সে, কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অশুভ। ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে কোনো পুতুলের মতোই অসাড়, নির্জীব।

অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে পরিবর্তনগুলো অক্রুর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়ছে।

ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম থেকেই যেমন—

'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো ?'

'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'

'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'

'কুতুলের আগার ঘাঙ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !'

আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।—

'এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো ?'

উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

'কর্ঙখল, কর্ঙখল !'

কর্মফল।

নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে, যেমন হয় স্টেজে, কিন্তু উত্তরটা তার জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।

সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিচ্ছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালোই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। এগারোটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে।

ঘরে কে কাশল ?

সে নিজে কি ? কিন্তু তার তো কাশি হয়নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা জ্বালালো নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।

নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্ ঠক্। দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়িতে কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রীটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল, এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কত্থক নাচ ও তারপর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্য যা করার সবই করেছে নবীন। গলাটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার, কারণ সূক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমন কি ভূতোকে প্রথম প্রশ্ন করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছাবে না, কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লীজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র, তাই তাঁরা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি

ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমতো অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তার পুতুলের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময়, কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্য যেন তার জেদ চেপে গেছে।

দু'পা-র বেশি এগোনো সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তার চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি !

হ্যাঁ, যাচ্ছে বৈ কি। ট্র্যাফিক-বিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির বদলে দুটি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো !'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোষের দিকে—

'ভূতো নয় ! আমি অক্রূর চৌধুরী !'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রূর চৌধুরী কোনো এক আশ্চর্য জাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রূর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায়নি। এই জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা ?

চাপ বাড়াতে গিয়ে ভূতোর মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

*　　　　*　　　　*

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়,' বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন ?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রূর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি ?'—নবীন এখনো কাগজ দেখেনি।—'কিসে গেলেন ?'

'হৃদ্‌রোগ', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাৎ জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গত কাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

সাধনবাবুর সন্দেহ

সাধনবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন মেঝেতে একটা বিঘতখানেক লম্বা সরু গাছের ডাল পড়ে আছে। সাধনবাবু পিটপিটে স্বভাবের মানুষ। ঘরে যা সামান্য আসবাব আছে—খাট, আলমারি, আলনা, জলের কুঁজো রাখার টুল—তার কোনোটাতে এক কণা ধুলো তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, ফুলকারি করা টেবিল ক্লথ—সবই তক্‌তকে হওয়া চাই। এতে ধোপার খরচটা বাড়ে, কিন্তু সেটা সাধনবাবু গা করেন না। আজ ঘরে ঢুকেই গাছের ডাল দেখে তাঁর নাক কুঁচকে গেল।

'পচা!'

চাকর পচা মনিবের ডাকে এসে হাজির।

'বাবু, ডাকছিলেন?'

'কেন, তোর কি সন্দেহ হচ্ছে?'

'না বাবু, তা হবে কেন?'

'মেঝেতে গাছের ডাল পড়ে কেন?'

'তা তো জানি না বাবু। কাক-চড়ুইয়ে এনে ফেলেছে বোধহয়।'

'কেন, ফেলবে কেন? কাক-চড়ুই তো ডাল আনবে বাসা বাঁধার জন্য। সে ডাল মাটিতে ফেলবে কেন? ঝাড়ু দেবার সময় লক্ষ করিসনি এটা? নাকি ঝাড়ুই দিসনি?'

'ঝাড়ু আমি রোজ দিই বাবু। যখন দিই তখন এ-ডাল ছিল না।'

'ঠিক বলছিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।'

'তাজ্জব ব্যাপার তো!'

পরদিন সকালে আপিসে যাবার আগে একটা চড়ুইকে তাঁর জানালায় বসতে দেখে সাধনবাবুর সন্দেহ হল ইনিই বাসা বাঁধার ফিকির খুঁজছেন। কিন্তু কোথায় ? ঘরের মধ্যে জায়গা কোথায় ? ঘুলঘুলিতে কি ? তাই হবে।

তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির সাতখানা ঘরের মধ্যে তাঁর ঘরের দিকেই চড়ুই-এর দৃষ্টি কেন এই নিয়েও সাধনবাবুর মনে খট্‌কা লাগল। এমন কিছু আছে কি তাঁর ঘরে যা পাখিদের অ্যাট্র্যাক্ট করতে পারে ?

অনেক ভেবে সাধনবাবুর সন্দেহ হল—ওই যে নতুন কবরেজী তেলটা তিনি ব্যবহার করেছেন—যেটা দোতলার শখের কবিরাজ নীলমণিবাবুর মতে খুস্‌কির মহৌষধ—সেটার উগ্র গন্ধই হয়তো পাখিদের টেনে আনছে। সেই সঙ্গে এমনও সন্দেহ হল যে এটা হয়তো নীলমণিবাবুর ফিচলেমি, সাধনবাবুর ঘরটাকে একটা পক্ষিনিবাসে পরিণত করার মতলবে তিনি এই তেলের গুণগান করছেন।...

আসলে সতেরর-দুই মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটবাড়ির সকলেই সাধনবাবুর সন্দেহ বাতিকের কথা জানেন, এবং আড়ালে এই নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। আজ কী কী সন্দেহের উদয় হল আপনার মনে ?'—এ জাতীয় প্রশ্ন দিনের শেষে সাধনবাবুকে প্রায়ই শুনতে হয়।

শুধু প্রশ্ন নয়, অন্যভাবেও তাঁকে নিয়ে লেগ-পুলিং চলে। একতলার নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে সন্ধ্যায় তিন-মাসের আড্ডা বসে। সাধনবাবু তাতে নিয়মিত যোগদান করেন। সেদিন যেতে নবেন্দুবাবু তাঁকে একটা দলা পাকানো কাগজ দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন তো মশাই, এ থেকে কিছু সন্দেহ হয় কিনা। এটা জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে।'

আসলে কাগজটা নবেন্দুবাবুরই মেয়ে মিনির অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা। সাধনবাবু কাগজটাকে খুলে সেটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'এটা তো সংখ্যা দিয়ে লেখা কোনো সাংকেতিক ভাষা বলে মনে হচ্ছে।'

নবেন্দুবাবু কিছু না বলে চুপটি করে চেয়ে রইলেন সাধনবাবুর দিকে।

'কিন্তু এটার তো মানে করা দরকার,' বললেন সাধনবাবু। 'ধরুন এটা যদি কোনো হুমকি হয়, তাহলে...'

সংকেতের পাঠোদ্ধার হয়নি অবশ্য। কিন্তু সেটা বড় কথা নয় ; কথা হল, এই কাগজের দলা থেকে সাধনবাবুর সন্দেহ কোন কোন দিকে যেতে পারে সেইটে দেখা। সাধনবাবু বিশ্বাস করেন যে গোটা কলকাতা শহরটাই হল ঠক জুয়াচোর ফন্দিবাজ মিথ্যেবাদীর ডিপো। কারুর উপর ভরসা নেই, কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। এই অবস্থায় একমাত্র সন্দেহই মানুষকে সামলে চলতে সাহায্য করতে পারে।
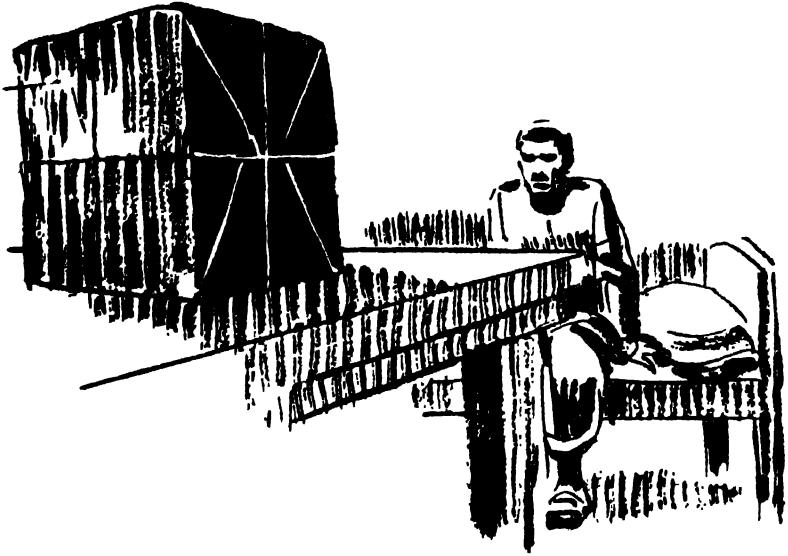
এই সাধনবাবুই একদিন আপিস থেকে এসে ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের উপর একটা বশ বড় চার-চৌকো কাগজের মোড়ক দেখতে পেলেন। তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হল সেটা ভুল করে তাঁর ঘরে চলে এসেছে। এহেন মোড়ক তাঁকে কে পাঠাবে ? তিনি তো এমন কোনো পার্সেল প্রত্যাশা করেননি !

কাছে গিয়ে যখন দেখলেন যে মোড়কের উপর তাঁর নাম নেই, তখন সন্দেহটা আরো পাকা হল।

'এটা কে এনে রাখল রে ?' চাকর পচাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন সাধনবাবু।

'আজ্ঞে একজন লোক ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে গেছে দুপুরে এসে। আপনার নাম করে বলেছে আপনারই জিনিস।'

ধনঞ্জয় একতলার ষোড়শীবাবুর চাকর।

'কী আছে এতে, কে পাঠিয়েছে, সেসব কিছু বলেছে ?'

'আজ্ঞে তা তো বলেনি।'

'বোঝো !'

সাধনবাবু কাঁধের চাদরটা আলনায় রেখে খাটে বসলেন। রীতিমতো বড় মোড়ক। প্রায় একটা পাঁচ নম্বর ফুটবল ঢুকে যায় ভিতরে। অথচ কে পাঠিয়েছে জানার কোনো উপায় নেই।

সাধনবাবু খাট থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে মোড়কটা হাতে তুললেন। বেশ

ভারী। কমপক্ষে পাঁচ কিলো।

সাধনবাবু মনে করতে চেষ্টা করলেন শেষ কবে তিনি এই জাতীয় মোড়ক পেয়েছেন। হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে খড়দায় তাঁর এক মাসীমা থাকতেন, তিনি পাঠিয়েছিলেন আমসত্ত্ব। তার মাস ছয়েকের মধ্যেই সেই মাসীমার মৃত্যু হয়। আজ সাধনবাবুর নিকট আত্মীয় বলতে আর কেউই অবশিষ্ট নেই। পার্সেল কেন, চিঠিও তিনি মাসে দু-একটার বেশি পান না। এই মোড়কের সঙ্গে একটা চিঠি থাকা অস্বাভাবিক হত না, কিন্তু তাও নেই।

কিম্বা হয়তো ছিল। সাধনবাবুর সন্দেহ হল ধনঞ্জয়ের অসাবধানতা হেতু সেটি খোয়া গেছে।

একবার ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

তাকে ডেকে পাঠানো অনুচিত হবে মনে করে সাধনবাবু নিজেই নিচে গেলেন। ধনঞ্জয় উঠোনে বসে হামানদিস্তায় কী যেন ছেঁচছিল, সাধনবাবুর ডাকে উঠে এল।

'ইয়ে, আজ তোমার হাতে কেউ একটা পার্সেল দিয়ে গেস্‌ল আমার নাম করে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সঙ্গে চিঠি ছিল ?'

'কই না তো।'

'কোত্থেকে আসছে সেটা বলেছিল ?'

'মদন না কী জানি একটা নাম বললেন।'

'মদন ?'

'তাই তো বললেন।'

মদন নামে কাউকে চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না সাধনবাবু। কী বলতে কী বলছে লোকটা কে জানে। ধনঞ্জয় যে একটি গবেট সে সন্দেহ অনেকদিনই করেছেন সাধনবাবু।

'চিঠিপত্তর কাগজটাগজ কিছু ছিল না সঙ্গে ?'

'একটা কাগজ ছিল, তাতে বাবু সই করে দিলেন।'

'কে, ষোড়শীবাবু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কিন্তু ষোড়শীবাবুকে জিজ্ঞেস করেও কোনো ফল হল না। একটা চিরকুটে তিনি সাধনবাবুর হয়ে সই করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা কোথা থেকে এসেছিল খেয়াল করেননি।

সাধনবাবু আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন। কার্তিক মাসের সন্ধ্যা, শীতটা

এর মধ্যে বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। সামনে কালীপুজো, তার তোড়জোড় যে চলছে সেটা মাঝে মাঝে বোমা-পটকার—

'দুম্ !'

পাড়াতেই একটা বোমা ফেটেছে। আর সেই মুহূর্তে খাটে বসা সাধনবাবুর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল।

টাইম-বোমা !

ওই মোড়কের মধ্যে টাইম-বোমা নেই তো, যেটা নির্দিষ্ট সময়ে ফেটে তাঁর ইহজগতের লীলা সাঙ্গ করে দেবে ?

এই টাইম-বোমার কথা ইদানীং খুব শোনা যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সন্ত্রাসবাদীদের এটা একটা প্রধান অস্ত্র।

কিন্তু তাঁকে বোমা পাঠাবে কে, কেন ?

প্রশ্নটা মনে আসতেই সাধনবাবু উপলব্ধি করলেন যে ব্যবসায়ী হওয়ার ফলে তাঁর শত্রুর অভাব নেই। কনট্র্যাক্ট পাবার জন্য তোষামোদ ধরাধরি তাঁকেও করতে হয়, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদেরও করতে হয়। যদি তিনি পেয়ে যান সে কনট্র্যাক্ট, তাহলে অন্যেরা হয়ে যায় তাঁর শত্রু। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

'পচা !'

ডাকটা দিয়েই বুঝতে পারলেন যে তাঁর গলা দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাও পচা হাজির।

'বাবু, ডাকলেন ?'

'হ্যাঁ—'

কিন্তু কাজটা কি ভালো হবে ? সাধনবাবু ভেবেছিলেন পচাকে বলবেন পার্সেলে কান লগিয়ে দেখতে টিক্‌টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা। টাইম-বোমার সঙ্গে কলকব্জা লাগানো থাকে, সেটা টিক্‌টিক্ শব্দে চলে। সেই টিক্‌টিক্-ই একটা পূর্বনির্ধারিত বিশেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পরিণত হয়।

পচা যখন কান লাগাবে, তখনই যদি বোমাটা—

সাধনবাবু আর ভাবতে পারলেন না। এদিকে পচা বাবুর আদেশের জন্য দাঁড়িয়ে আছে ; সাধনবাবুকে বলতেই হল যে তিনি ভুল করে ডেকেছিলেন, তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই।

এই রাতটা সাধনবাবু ভুলবেন না কোনোদিন। অসুখবিসুখে রাত্রে ঘুম হয় না এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু চরম আতঙ্কে এই শীতকালে ঘর্মাক্ত অবস্থায় সারারাত ঠায় বিছানায় বসে কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত যখন বোমা ফাটল না, তখন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে সাধনবাবু স্থির করলেন যে আজই সন্ধ্যায় মোড়কটা খুলে দেখতে হবে তার মধ্যে কী আছে। তাঁর নিজেরও মনে হয়েছে যে তাঁর সন্দেহটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলা এমন একটা ঘটনা ঘটল যে সাধনবাবুর আর মোড়ক খোলা হল না।

অনেক লোক আছে যারা খবরের কাগজের আদ্যোপান্ত না পড়ে পারে না। সাধনবাবু এই দলে পড়েন না। প্রথম এবং মাঝের পাতার খবরগুলোর শিরোনামায় চোখ বুলিয়েই তাঁর কাগজ পড়া হয়ে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই উত্তর কলকাতায় খুনের খবরটা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আপিস থেকে ফিরে একতলায় নবেন্দু চাটুজ্যের ঘরে একটা বড় রকম দাপাদাপি চলছে শুনে কারণ জিজ্ঞেস করে তিনি ঘটনাটা জানতে পারলেন।

পটুয়াটোলা লেনে খুন, হত ব্যক্তির নাম শিবদাস মৌলিক। কথাটা শুনেই সাধনবাবুর একটা সুপ্ত স্মৃতি খোঁচা খেয়ে জেগে উঠল।

এক মৌলিককে তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। তার প্রথম নাম শিবদাস কি ? হতেও পারে। সাধনবাবু তখন থাকতেন ওই পটুয়াটোলা লেনেই। মৌলিক ছিল তাঁর প্রতিবেশী। তিন-তাসের আড্ডা বসতো মৌলিকের ঘরে

রোজ সন্ধ্যায়। মৌলিককে কেন জানি মৌলিক বলেই ডাকত সবাই। আরো দুজন ছিলেন আড্ডায়। সুখেন দত্ত আর মধুসূদন মাইতি। এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির মতো সাংঘাতিক চরিত্র সাধনবাবু আর দেখেননি। তাসের খেলায় সে যে জুয়াচুরির রাজা সে সন্দেহ সাধনবাবুর গোড়া থেকেই হয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে একদিন সন্দেহটা প্রকাশ করতে হল। এতে মধু মাইতির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভয়াবহ। তার পকেটে সব সময়ই যে একটি চাকু অবস্থান করে সেটা সেদিনই জানতে পেরেছিলেন সাধনবাবু। তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন মৌলিক আর সুখেন দত্তর জন্য। ব্যবসায় উন্নতির পর সাধনবাবু পটুয়াটোলা লেনের খোলার ঘর ছেড়ে চলে আসেন মির্জাপুর স্ট্রীটের এই ফ্ল্যাটে। আর সেই থেকেই মৌলিক এন্ড কোম্পানির সঙ্গে তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাসের নেশাটা তিনি ছাড়তে পারেননি, আর সেই সঙ্গে তাঁর সন্দেহ বাতিকটাও। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে পরিবর্তন হয়েছিল বিস্তর। পোশাকে পারিপাট্য, বিড়ি ছেড়ে উইল্‌স সিগারেট ধরা, নীলামের দোকান থেকে মাঝে মাঝে শখের জিনিস কিনে এনে ঘর সাজানো—পেন্টিং, ফুলদানি, বাহারের অ্যাশট্রে—এসবই গত পাঁচ-সাত বছরের ঘটনা।

এই খুনের ঘটনার শিবদাস মৌলিক যদি সেই মৌলিক হয়, তাহলে খুনী যে মধু মাইতি সে বিষয়ে সাধনবাবুর কোনো সন্দেহ নেই।

'খুনটা কী ভাবে হল ?' সাধনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'নৃশংস,' বললেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'লাশ সনাক্ত করার কোনো উপায় ছিল না। পকেটে একটা ডায়রি থেকে নাম জেনেছে।'

'কেন, কেন ? সনাক্ত করার উপায় ছিল না কেন ?'

'ধড় আছে, মুড়ো নেই। সনাক্ত করবে কী করে ?'

'মুড়ো নেই মানে ?'

'মুণ্ডু ঘ্যাচাং !' জোড়া হাত মাথার উপর তুলে আবার ঝটিতি নামিয়ে এনে খাঁড়ার কোপের অভিনয় করে বুঝিয়ে দিলেন নবেন্দু চাটুজ্যে। 'খুনি' যে কোথায় সরিয়ে রেখেছে মুণ্ডু সেটা এখনো জানা যায়নি।'

'খুনী কে সেটা জানা গেছে ?'

'তিন-তাসের বৈঠক বসত এই মৌলিকের ঘরে। তাদেরই একজন বলে সন্দেহ করছে পুলিশ।'

সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে সাধনবাবু অনুভব করলেন যে তাঁর মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সেদিনের ঘটনা চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছেন তিনি—যেদিন তিনি মধু মাইতিকে জোচ্চুরির অপবাদ দিয়েছিলেন। চাকুর আক্রমণ থেকে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার বেশ কিছুক্ষণ

পর অবধি মধু মাইতির দৃষ্টি তাঁর উপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল সেটা মনে আছে। আর মনে আছে মধুর একটি উক্তি—'আমায় চেন না তুমি, সাধন মজুমদার!—আজ পার পেলে, কিন্তু এর বদলা আমি নোব, সে আজই হোক, আর দশ বছর পরেই হোক।'

রক্ত-জল-করা শাসানি। সাধনবাবু ভেবেছিলেন পটুয়াটোলা লেন থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন, কিন্তু—

কিন্তু ওই মোড়ক যদি মধু মাইতি দিয়ে গিয়ে থাকে? মদন!—ধনঞ্জয় বলেছিল মদন। ধনঞ্জয় যে কানে খাটো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মধু আর মদনে খুব বেশি পার্থক্য আছে কি? মোটেই না। মধু অথবা মধুর লোকই রেখে গেছে ওই পার্সেল, আর সেটা যাতে সত্যিই তাঁর হাতে পৌঁছায় তাই চিরকুটে সই করিয়ে নিয়েছে।

ওই মোড়কের ভিতরে রয়েছে শিবদাস মৌলিকের মাথা!

এই সন্দেহ সিঁড়ির মাথা থেকে তাঁর ঘরের দরজার দূরত্বটুকু পেরোবার মধ্যে দৃঢ় ভাবে সাধনবাবুর মনে গেঁথে গেল। দরজা থেকেই দেখা যায় টেবিলের উপর ফুলদানিটার পাশে রাখা মোড়কটাকে। মোড়কের ওজন এবং আয়তন দুইই এখন স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে তার ভিতরে কী আছে।

বাবু দোড়গোড়ায় এসে থেমে গেছেন দেখে পচা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল; সাধনবাবু প্রচণ্ড মনের জোর প্রয়োগ করে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে চাকরকে চা আনতে বললেন।

'আর, ইয়ে, আজ কেউ এসেছিল? আমার খোঁজ করতে?'

'কই না তো।'

'হুঁ।'

সাধনবাবু অবশ্য সন্দেহ করেছিলেন পুলিশ হয়তো এরই মধ্যে হানা দিয়ে গেছে। তাঁর ঘরে খুন হওয়া ব্যক্তির মুণ্ডু পেলে তাঁর যে কী দশা হবে সেটা ভাবতে তাঁর আরেক দফা ঘাম ছুটে গেল।

গরম চা পেটে পড়তে সামান্য বল যেন ফিরে এল মনে। যাক্—অন্তত টাইম-বোমা তো নয়।

কিন্তু এও ঠিক যে এই মুণ্ডুসমেত মোড়কটিকে সামনে রেখে যদি তাঁকে সারা রাত জেগে বসে থাকতে হয় তাহলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

ঘুমের বড়িতে ঘুম হল ঠিকই, কিন্তু দুঃস্বপ্ন থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। একবার দেখলেন মুণ্ডুহীন মৌলিকের সঙ্গে বসে তিন-তাস খেলছেন তিনি, আরেকবার দেখলেন মৌলিকের ধড়বিহীন মুণ্ডু তাঁকে এসে বলছে, 'দাদা,—ওই বাক্সে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠছে। দয়া করে মুক্তি দিন আমায়।'

•

বড়ি খাওয়া সত্ত্বেও চিরকালের অভ্যাস মতো সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল সাধনবাবুর। হয়তো ব্রাহ্ম মুহূর্তের গুণেই সংকট মোচনের একটা উপায় সাধনবাবুর মনে উদিত হল।

মুণ্ডু যখন তাঁর কাছে পাচার করা হয়েছে, তখন সে-মুণ্ডু অন্যত্র চালান দিতে বাধাটা কোথায় ? তাঁর ঘর থেকে জিনিসটাকে বিদায় করতে পারলেই তো নিশ্চিন্তি।

ভোর থাকতেই অন্য কাজ সারার আগে বাজারের থলিতে মোড়কটা ভরে নিয়ে সাধনবাবু বেরিয়ে পড়লেন। প্যাকিংটা ভালোই হয়েছে বলতে হবে, কারণ ভিতরের রক্ত চুঁইয়ে থাকলেও তার বিন্দুমাত্র বাক্স ভেদ করে বাইরের কাগজে ছোপ ফেলেনি।

বাসে উঠে কালীঘাট পৌঁছাতে লাগল পঁচিশ মিনিট। তারপর পায়ে হেঁটে আদিগঙ্গায় পৌঁছে একটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে হাতের মোড়কটাকে সবেগে ছুঁড়ে ফেললেন নদীর মাঝখানে।

ঝপাৎ—ডুবুস্ !

মোড়ক নিশ্চিহ্ন, সাধনবাবু নিশ্চিন্ত।

বাড়ি ফিরতে লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট। সদর দরজা দিয়ে যখন ঢুকছেন তিনি তখন ষোড়শীবাবুর দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজছে।

আর সেই ঘড়ির শব্দ শুনেই সাধনবাবু মুহূর্তে চোখে অন্ধকার দেখলেন।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তাঁর। কদিন থেকেই বার বার সন্দেহ হয়েছে তিনি যেন কী একটা ভুলে যাচ্ছেন। পঞ্চাশের পর এ জিনিসটা হয়। একথা নীলমণিবাবুকে বলতে তিনি নিয়মিত ব্রাহ্মীশাক খেতে বলেছিলেন।

আজ আধ ঘন্টা আগেই বেরিয়ে পড়তে হল সাধনবাবুকে, কারণ যাবার পথে একটা কাজ সেরে যেতে হবে।

রাসেল স্ট্রীটে নীলামের দোকান মর্ডান এক্সচেঞ্জে ঢুকতেই একগাল হেসে এগিয়ে এলেন মালিক তুলসীবাবু।

'টেবিল ক্লকটা চলছে তো ?'

'ওটা পাঠিয়েছিলেন আপনি ?'

'বা রে, আমি তো বলেইছিলাম পাঠিয়ে দেব। সেটা পৌঁছায়নি আপনার হাতে ?'

'হ্যাঁ, মানে, ইয়ে—'

'আপনি পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে গেলেন, এত পছন্দ আপনার, আপনি

পুরোনো খদ্দের—কথা দিয়ে কথা রাখব না ?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই—'

'দেখবেন ফার্স্ট ক্লাস টাইম রাখবে ও ঘড়ি। নামকরা ফরাসী কোম্পানি তো ! জিনিসটা জলের দরে পেয়ে গেছেন। ভেরি লাকি !'

তুলসীবাবু অন্য খদ্দেরের দিকে এগিয়ে যেতে সাধনবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন। জলের দরের ঘড়ি জলেই গেল !

ভালো বদলা নিয়েছে মধু মাইতি তাতে সন্দেহ নেই। আর 'মডার্ন'কেই যে 'মদন' শুনেছে ধনঞ্জয় তাতেও কোনো সন্দেহ আছে কি ?

অঙ্ক স্যার, গোলাপীবাবু আর টিপু

টিপু ভূগোলের বইটা বন্ধ করে ঘড়ির দিকে দেখল। সাতচল্লিশ মিনিট পড়া হয়ে গেছে একটানা। এখন তিনটে বেজে তেরো মিনিট। এবার যদি ও একটু ঘুরে আসে তাহলে ক্ষতি কী? ঠিক এমনি সময় তো সেদিন লোকটা এসেছিল। সে তো বলেছিল টিপুর দুঃখের কারণ হলে তবে আবার আসবে। তাহলে? কারণ তো হয়েছে। বেশ ভালো রকমই হয়েছে। যাবে নাকি একবার বাইরে?

নাঃ। মা বারান্দায় বেরিয়েছেন কিসের জন্য জানি। হুস করে একটা কাক তাড়ালেন এক্ষুনি। তারপর ক্যাঁচ শব্দটায় মনে হল বেতের চেয়ারটায় বসলেন। বোধহয় রোদ পোয়াচ্ছেন। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

লোকটার কথা মনে পড়ছে টিপুর। এমন লোক টিপু কোনোদিন দেখেনি। ভীষণ বেঁটে, গোঁফদাড়ি নেই, কিন্তু বাচ্চা নয়। বাচ্চাদের এমন গম্ভীর গলা হয় না। তাহলে লোকটা বুড়ো কি? সেটাও টিপু বুঝতে পারেনি। চামড়া কুঁচকোয়নি কোথাও। গায়ের রং চন্দনের সঙ্গে গোলাপী মেশালে যেমন হয় তেমনি। টিপু মনে মনে ওকে গোলাপীবাবু বলেই ডাকে। লোকটার আসল নাম টিপু জানে না। জানতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা বলল, 'কী হবে জেনে? আমার নাম উচ্চারণ করতে তোমার জিভ জড়িয়ে যাবে।'

টিপু বেশ রেগে গিয়েছিল। 'কেন, জড়িয়ে যাবে কেন? আমি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলতে পারি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলতে পারি, এমন-কি ফ্লক্সিনসিনিহিলিপিলিফিকেশন বলতে পারি, আর তোমার নাম বলতে পারব না?' তাতে লোকটা বলল, 'একটা জিভে আমার নাম উচ্চারণ হবে না।'

'তোমার বুঝি একটার বেশি জিভ আছে?' জিজ্ঞেস করেছিল টিপু।

'বাংলা বলতে একটার বেশি দরকার হয় না।'

বাড়ির পিছনে যে নেড়া শিরীষ গাছটা আছে, তারই নীচে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। এদিকটা বড় একটা কেউ আসে না। শিরীষ গাছটার পিছনে খোলা মাঠ, তারও পিছনে ধান ক্ষেত, আর তারও অনেক, অনেক পিছনে পাহাড়ের সারি। কদিন আগেই টিপু এদিকটায় এসে একটা ঝোপের ধারে একটা বেজিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল। আজ হাতে কিছু পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে এসেছিল ঝোপটার ধারে ছড়িয়ে দেবার জন্য, যদি তার লোভে বেজিটা আবার দেখা দেয়। এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল গাছতলায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। চোখাচুখি হতেই লোকটা ফিক্ করে হেসে বলল, 'হ্যালো।'

সাহেব নাকি ? সাহেব হলে কথা বলে বেশিদূর এগোনো যাবে না, তাই টিপু কিছুক্ষণ কিছু না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার লোকটাই ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার কোনো দুঃখ আছে ?'

'দুঃখ ?'

'দুঃখ।'

টিপু তো অবাক। এমন প্রশ্ন তাকে কেউ কোনোদিন করেনি। সে বলল, 'কই, না তো। দুঃখ তো নেই।'

'ঠিক বলছ ?'

'বা রে, ঠিক বলব না কেন ?'

'তোমার তো দুঃখ থাকার কথা। হিসেব করে তো তাই বেরোল।'

'কী রকম দুঃখ ? ভেবেছিলাম বেজিটাকে দেখতে পাব, কিন্তু পাচ্ছি না। সেরকম দুঃখ ?'

'উহুঁ উহুঁ। যে-দুঃখে কানের পিছনটা নীল হয়ে যায়, হাতের তেলো শুকিয়ে যায়, সেরকম দুঃখ।'

'মানে ভীষণ দুঃখ ?'

'হ্যাঁ।'

'না, সেরকম দুঃখ নেই।'

লোকটা এবার নিজে দুঃখ দুঃখ ভাব করে মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, তাহলে এখনো মুক্তি নেই।'

'মুক্তি ?'

'মুক্তি। ফ্রীডম।'

'ফ্রীডম মানে মুক্তি সেটা আমি জানি,' বলল টিপু। 'আমার দুঃখ হলে বুঝি তোমার মুক্তি হবে ?'

লোকটা টিপুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, 'তোমার বয়স সাড়ে দশ ?'

'হ্যাঁ,' বলল টিপু।
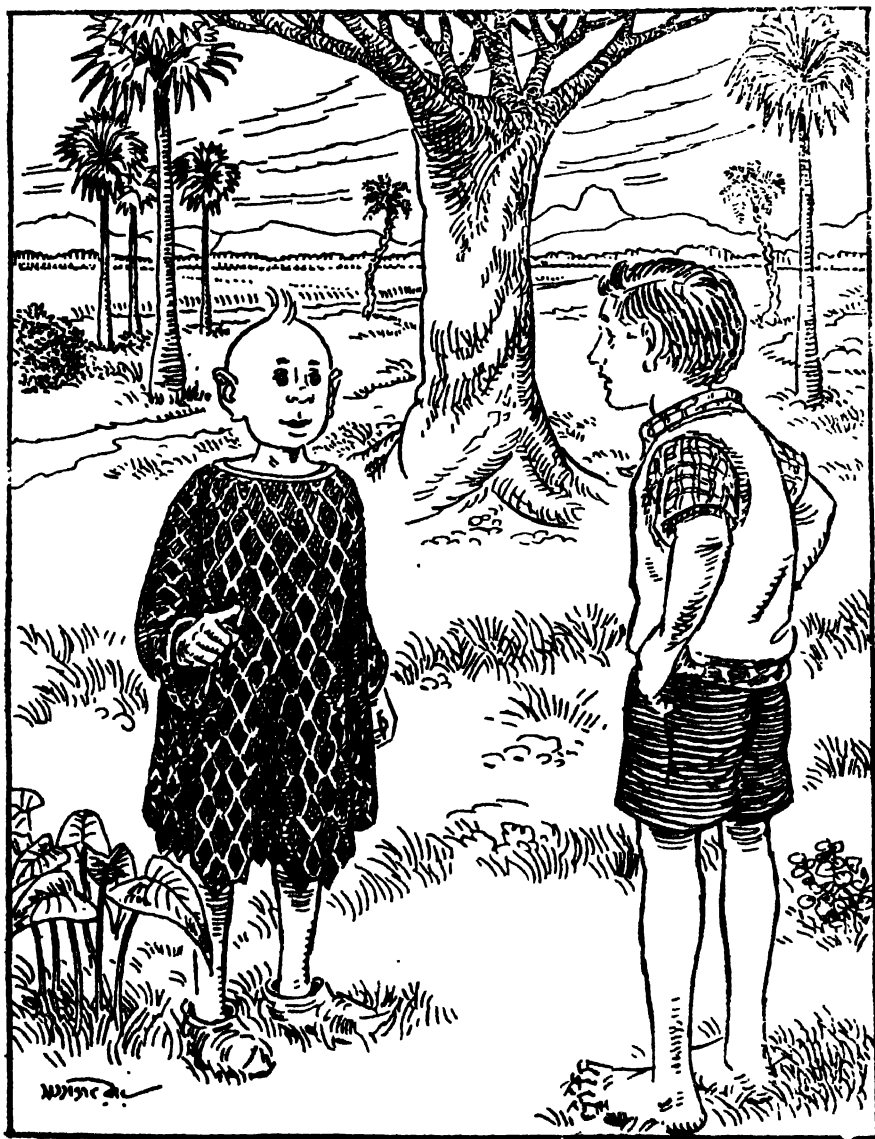
'আর নাম শ্রীমান তর্পণ চৌধুরী ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কোনো ভুল নেই।'

লোকটা যে ওর বিষয়ে এত খবর পেলো কোত্থেকে সেটা টিপু বুঝতে পারল না। টিপু বলল, 'শুধু আমার দুঃখ হলেই তোমার মুক্তি ? আর কারুর দুঃখে নয় ?'

'দুঃখে মুক্তি নয়, দুঃখ দূর করলে তবে মুক্তি।'

'কিন্তু দুঃখ তো অনেকের আছে। আমাদের বাড়িতে নিকুঞ্জ ভিখিরি এসে একতারা বাজিয়ে গান গায়। সে বলে তার তিন কুলে কেউ নেই। তার তো খুব দুঃখ।'

'তাতে হবে না,' লোকটা মাথা নেড়ে বলল। 'তর্পণ চৌধুরী, বয়স সাড়ে দশ—এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ আছে ?'

'বোধ হয় না।'

'তবে তোমাকেই চাই।'

এবার টিপু একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারল না।

'তুমি কিসের থেকে মুক্তির কথা বলছ ? তুমি তো দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছ।'

'এটা আমার দেশ নয়। এখানে তো আমায় নির্বাসিন দেওয়া হয়েছে।'

'কেন ?'

'অত জানার কী দরকার তোমার ?'

'বা রে, একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হল, আর তার বিষয় জানতে ইচ্ছা করবে না ? তুমি কোথায় থাক, কী কর, কী নাম তোমার, আর কে কে চেনে তোমাকে—সব জানতে ইচ্ছা করছে আমার।'

'অত জানলে জিঞ্জিরিয়া হবে।'

লোকটা আসলে জিঞ্জিরিয়া বলেনি ; বলেছিল একটা ভীষণ কঠিন কথা যেটা টিপু চেষ্টা করলেও উচ্চারণ করতে পারবে না। তবে খুব সহজ করে বললে সেটা জিঞ্জিরিয়াই হয়। না জানি কী ব্যারামের কথা বলছে, তাই টিপু আর ঘাঁটাল না। কার কথা মনে হচ্ছে লোকটাকে দেখে ? রামখেল তিলক সিং ? নাকি ঘ্যাঁঘাসুরের সেই একহাত লম্বা লোকটা, যার সঙ্গে মানিকের দেখা হয়েছিল ? নাকি স্নো হোয়াইটের সেই সাতটা বামনের একটা বামন ? টিপু রূপকথার পোকা। তার দাদু প্রতিবারই পুজোয় কলকাতা থেকে আসার সময় তার জন্য তিন-চারখানা করে রূপকথার বই এনে দেন। 'টিপুর মনটা সে সব পড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ছত্রিশ পাহাড় পেরিয়ে

কোথায় যেন উড়ে চলে যায়। সে নিজেই হয়ে যায় রাজপুত্তুর—তার মাথায় মুক্তো বসানো পাগড়ি আর কোমরে হীরে বসানো তলোয়ার। কোনোদিন চলেছে গজমোতির হার আনতে, কোনোদিন ড্র্যাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

'গুড বাই।'

সে কী, লোকটা যে চলল!

'কোথায় থাক তুমি, বললে না?'

লোকটা তার প্রশ্নে কান না দিয়ে শুধু বলল, 'তোমার দুঃখ হলে তখন আবার দেখা হবে।'

'কিন্তু তোমায় খবর দেব কী করে?'

ততক্ষণে লোকটা এক লাফে একটা দেড় মানুষ উঁচু কুল গাছ টপ্‌কে হাইজাম্পে ওয়ার্লড রেকর্ড করে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এটা প্রায় দেড়মাস আগের ঘটনা। তারপর থেকে লোকটা আর আসেনি। কিন্তু এখন তো আসা দরকার, কারণ টিপুর সত্যিই দুঃখের কারণ হয়েছে। আর সেই কারণ হল তাদের ইস্কুলের নতুন অঙ্কের মাস্টার নরহরিবাবু।

নতুন মাস্টারমশাইকে টিপুর এমনিতেই ভালো লাগেনি। প্রথমদিন ক্লাসে ঢুকে কিছু বলার আগে প্রায় দুমিনিট খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সারা ক্লাসের ছাত্রদের উপর যেভাবে চোখ বোলালেন তাতে মনে হয় যেন আগে সকলকে ভস্ম করে তারপর পড়াতে শুরু করবেন। তাল গাছের হুসুর মুসুরের মতো এমন ঝাঁটা গোঁফ যে সত্যি-মানুষের হয় সেটা টিপু জানতই না। তার ওপর ওরকম মুখে-হাঁড়িধরা গলার আওয়াজ। ক্লাসের কেউই তো কালা নয়, তাহলে অত হুমকিয়ে কথা বলার দরকারটা কী?

আসল গোলমালটা হল দুদিন পরে, বিষ্যুদবারে। দিনটা ছিল মেঘলা, তার উপর পৌষ মাসের শীত। টিফিনের সময় টিপু ক্লাস থেকে না বেরিয়ে নিজের ডেস্কে বসে পড়ছিল ডালিমকুমারের গল্প। কে জানত ঠিক সেই সময়ই অঙ্কের স্যার ক্লাসের পাশ দিয়ে যাবেন, আর তাকে দেখতে পেয়েই ক্লাসে ঢুকে আসবেন?

'ওটা কী বই, তর্পণ?'

স্যারের স্মরণশক্তি যে সাংঘাতিক সেটা বলতেই হবে, কারণ দুদিনেই সব ছাত্রদের নাম মুখস্ত হয়ে গেছে।

টিপুর বুকটা দুরদুর করলেও, টিফিনে গল্পের বই পড়াটা দোষের নয় মনে করে সে বলল, 'ঠাকুরমার ঝুলি, স্যার।'

'কই দেখি।'

টিপু বইটা দিয়ে দিল স্যারের হাতে। স্যার মিনিটখানেক ধরে সেটা

উলটেপালটে দেখে বললেন, 'হাঁউ মাউ কাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ, হীরের গাছে মোতির পাখি, শামুকের পেটে রাজপুত্তুর—এসব কী পড়া হচ্ছে শুনি ? যত আজগুবি ধাপ্পাবাজি ! এসব পড়লে অঙ্ক মাথায় ঢুকবে কেমন করে, অ্যাঁ ?'

'এ তো গল্প, স্যার,' টিপু কোনোরকমে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে বলল।

'গল্প ? গল্পর তো একটা মাথামুণ্ডু থাকবে, নাকি যেমন তেমন একটা লিখলেই হল ?'

টিপু অত সহজে হার মানতে চাইছিল না। বলল, 'রামায়ণেও তো আছে হনুমান জাম্বুবান, আর মহাভারতে বক রাক্ষস আর হিড়িম্বা রাক্ষসী আর আরো কত কী।'

'জ্যাঠামো কোরো না,' দাঁত খিঁচিয়ে বললেন নরহরি স্যার। 'ওসব হল মুনি-ঋষিদের লেখা, দুহাজার বছর আগে। সে তো গণেশ ঠাকুরেরও—মানুষের গায়ে হাতির মাথা, আর মা দুর্গার দশটা হাত। ও জিনিস আর তোমার এ মনগড়া গাঁজাখুরি গল্প এক জিনিস নয়। তোমরা এখন পড়বে মনীষীদের জীবনী, ভালো ভালো ভ্রমণ কাহিনী, আবিষ্কারের কথা, মানুষ কী করে ছোট থেকে বড় হয়েছে সেই সব কথা। তোমাদের বয়সে বাস্তব কথার দাম হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তোমরা হলে বিংশ শতাব্দীর ছেলে। আদ্যিকালের পল্লীগ্রামে যে জিনিস চলত সে জিনিস আজ শহরে চলবে কী করে ? এসব পড়তে হলে পাততাড়ি নিয়ে পাঠশালায় গিয়ে বসতে হবে, আর দুলে দুলে কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া মুখস্ত করতে হবে। সে সব পারবে তুমি ?'

টিপু চুপ করে রইল। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা শুনতে হবে সেটা ভাবতে পারেনি।

'ক্লাসে আর কে কে এসব বই পড়ে ?' অঙ্ক স্যার জিজ্ঞেস করলেন।

সত্যি বলতে কি, আর কেউই প্রায় পড়ে না। শীতল একবার টিপুর কাছ থেকে হিন্দুস্থানী উপকথা ধার নিয়ে গিয়েছিল, পরদিনই ফেরত দিয়ে বলল, 'ধুস্, এর চেয়ে অরণ্যদেব ঢের ভালো।'

'আর কেউ পড়ে না স্যার,' বলল টিপু।

'হুঁ। ...তোমার বাবার নাম কী ?'

'তারানাথ চৌধুরী।'

'কোথায় থাক তোমরা ?'

'স্টেশন রোড। পাঁচ নম্বর।'

'হুঁ।'

বইটা ঠক্ করে ডেস্কের উপর ফেলে দিয়ে অঙ্ক স্যার চলে গেলেন।

ইস্কুলের পর টিপু সোজা বাড়ি ফিরল না। ইস্কুলের পুব দিকে ঘোষেদের আম

বাগানটা ছাড়িয়ে বিষ্ণুরাম দাসের বাড়ির বাইরে বাঁধা সাদা ঘোড়াটার দিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল জামরুল গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুরামবাবুর বিড়ির কারখানা আছে। ঘোড়ায় চড়ে কারখানায় যান। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু এখনো মজবুত শরীর।

টিপু প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দেখে, কিন্তু আজ আর কিছু ভালো লাগছিল না। তার মন বলছে অঙ্ক স্যার তার গল্পের বই পড়া বন্ধ করার মতলব করছেন। গল্পের বই না পড়ে সে থাকবে কী করে ? সারা বছরের একটা দিনও তার গল্পের বই পড়া বন্ধ থাকে না, আর সবচেয়ে ভালো লাগে ওইসব বইগুলো, যেগুলোকে অঙ্ক স্যার বললেন আজগুবি আর গাঁজাখুরি। কই, ও তো এসব বই পড়েও অঙ্কেতে কোনোদিন খারাপ করেনি। গত পরীক্ষায় পঞ্চাশে চুয়াল্লিশ পেয়েছিল। আর আগের অঙ্কের স্যার ভূদেববাবুর কাছে তো অঙ্কের জন্য কোনোদিন ধমক খেতে হয়নি !

শীতকালের দিন ছোট বলে এমনিতেই টিপু এবার বাড়ি ফিরবে ভাবছিল, এমন সময় একটা ব্যাপার দেখে ঝট্ করে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিতে হল।

অঙ্ক স্যার নরহরিবাবু বই ছাতা বগলে এদিকেই আসছেন।

তাহলে কি ওঁর বাড়ি এই দিকেই ? বিষ্ণুরামবাবুর বাড়ির পরে আরো গোটা পাঁচেক বাড়ি আছে অবিশ্যি এ রাস্তায়। তারপরেই হামলাটুনির মাঠ। ওই মাঠের পুব দিকে এককালে রেশমের কুঠি ছিল। হ্যামিলটন সাহেব ছিলেন তার ম্যানেজার। ভয়ংকর কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। বত্রিশ বছর ম্যানেজারি করে কুঠির পাশেই তাঁর বাংলোতে মারা যান। তাঁর নামেই ওই মাঠের নাম হয়ে গেছে হামলাটুনির মাঠ।

আলো পড়ে আসা পৌষ মাসের বিকেলে জামরুল গাছের আড়াল থেকে ও দেখছে নরহরি স্যারকে। ভারী অবাক লাগছে তাঁর হাবভাব দেখে। স্যার এখন বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ঠোঁট ছুঁচোল করে চুক্ চুক্ শব্দ করে ঘোড়ার কাঁধে হাত বুলোচ্ছেন।

এমন সময় খুট্ করে বাড়ির সদর দরজা খোলার শব্দ হল, আর বিষ্ণুরামবাবু নিজেই চুরুট হাতে করে বেরিয়ে এলেন।

'নমস্কার।'

ঘোড়ার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে অঙ্ক স্যার বিষ্ণুরামবাবুর দিকে ফিরলেন। বিষ্ণুরামবাবুও নমস্কার করে বললেন, 'এক হাত হবে নাকি ?'

'সেই জন্যেই তো আসা,' বললেন অঙ্ক স্যার। তার মানে অঙ্ক স্যার দাবা খেলেন। বিষ্ণুরামবাবু যে খেলেন সেটা টিপু জানে। অঙ্ক স্যার এবার বললেন, 'দিব্যি ঘোড়াটি আপনার। পেলেন কোত্থেকে ?'
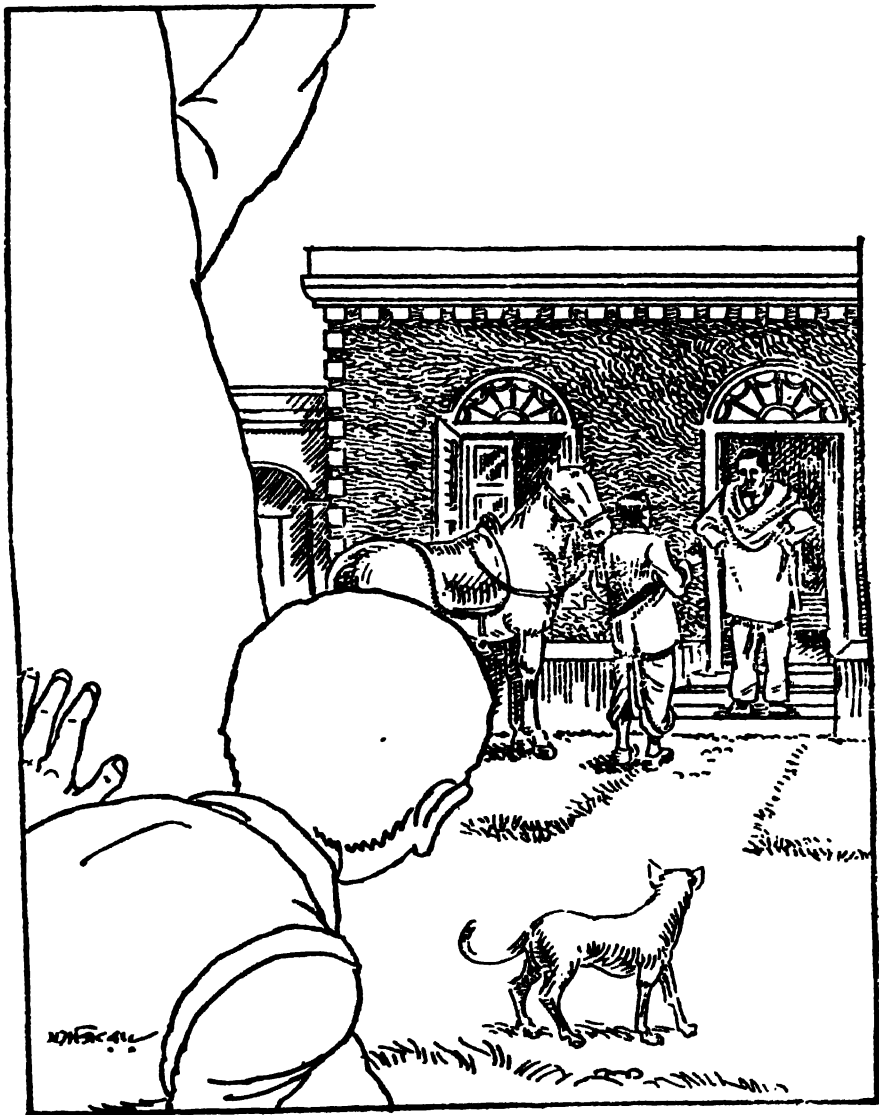
'কলকাতা। শোভাবাজারের দ্বারিক মিত্তিরের ছিল ঘোড়াটা। ওনার কাছ থেকেই কেনা। রেসের মাঠে ছুটেছে এককালে। নাম ছিল পেগ্যাসাস।'

পেগ্যাসাস? নামটা যেন চেনা চেনা মনে হল টিপুর, কিন্তু কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না।

'পেগ্যাসাস,' বললেন অঙ্ক স্যার। 'কিম্ভূত নাম তো মশাই।'

'ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ওই রকমই নাম হয়। হ্যাপি বার্থডে, শোভান আল্লা, ফরগেট-মি-নট...'

'আপনি চড়েন এ ঘোড়া?'

'চড়ি বৈকি। তালেবর ঘোড়া। একটি দিনের জন্যেও বিগড়োয়নি।'

অঙ্ক স্যার চেয়ে আছেন ঘোড়াটার দিকে। বললেন, 'আমি এককালে খুব চড়েছি ঘোড়া।'

'বটে?'

'তখন আমরা শেরপুরে। বাবা ছিলেন ডাক্তার। ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে যেতেন। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। সুযোগ পেলেই চড়তুম। ওঃ, সে কি আজকের কথা!'

'চড়ে দেখবেন এটা?'

'চড়ব?'

'চড়ুন না।'

টিপু অবাক হয়ে দেখল অঙ্ক স্যার হাত থেকে বই ছাতা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে ঘোড়ার দড়িটা খুলে এক ঝটকায় সেটার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঘোড়ার পাশে দুবার চাপ দিতেই সেটা খট্ খট্ করে চলতে আরম্ভ করল।

'দেখবেন, বেশিদূর যাবেন না,' বললেন বিষ্ণুরামবাবু।

'আপনি ঘুঁটি সাজান গিয়ে,' বললেন অঙ্ক স্যার, 'আমি খানিকদূর গিয়েই ঘুরে আসছি।'

টিপু আর থামল না। আজ একটা দিন গেল বটে!

কিন্তু ঘটনার শেষ এখানেই নয়।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। টিপু পরের দিনের পড়া শেষ করে সবে ভাবছে এবার গল্পের বইটা খুলবে কিনা, এমন সময় বাবা ডাক দিলেন নীচ থেকে।

টিপু নীচে বৈঠকখানায় গিয়ে দেখে নরহরি স্যার বসে আছেন বাবার সঙ্গে। টিপুর রক্ত হিম হয়ে গেল। বাবা বললেন, 'তোমার দাদুর দেওয়া যে বইগুলো রয়েছে সেগুলো ইনি একবার চাইছেন। যাও তো নিয়ে এসো গিয়ে।'

টিপু নিয়ে এল। সাতাশখানা বই। তিন খেপে আনতে হল।

অঙ্ক স্যার ঝাড়া দশ মিনিট ধরে বইগুলো দেখলেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন আর হুঁঃ করে একটা শব্দ করেন। তারপর বইগুলো রেখে দিয়ে বললেন—

'দেখুন মিস্টার চৌধুরী, আমি যেটা বলছি সেটা আমার অনেক দিনের চিন্তা-গবেষণার ফল। ফেয়ারি টেইল বলুন আর রূপকথাই বলুন আর উপকথাই বলুন, এর ফল হচ্ছে একই—ছেলেমেয়েদের মনে কুসংস্কারের বীজ বপন করা। শিশুমনকে যা বোঝাবেন তাই তারা বুঝবে। সেখানে আমাদের বড়দের দায়িত্বটা কতখানি সেটা একবার ভেবে দেখুন! আমরা কি তাদের বোঝাব, বোয়াল মাছের পেটে থাকে মানুষের প্রাণ? যেখানে আসল কথাটা হচ্ছে যে প্রাণ থাকে মানুষের হৃৎপিণ্ডে—তার বাইরে কোথাও থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়।'

বাবা পুরোপুরি কথাটা মানছেন কিনা সেটা টিপু বুঝতে না পারলেও, এটা সে জানে যে ইস্কুলের মাস্টারদের কথা যে মেনে চলতে হয়, এটা তিনি বিশ্বাস করেন। 'ছেলে বয়সটা মেনে চলারই বয়স, টিপু,' এ কথা বাবা অনেকবার বলেছেন। 'বিশেষ করে গুরুজনদের কথা মানতেই হবে। নিজের ইচ্ছে মতো সব কিছু করার বয়সও আছে একটা, কিন্তু সেটা পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর। তখন তোমাকে কেউ বলবে না এটা কর, ওটা কর। বা বললেও, সেখানে তোমার নিজের মতটা দেবার অধিকার আছে। কিন্তু সেটা এখন নয়।'

'আপনার বাড়িতে অন্য ধরনের শিশুপাঠ্য বই নেই?' জিজ্ঞেস করলেন নরহরি স্যার।

'আছে বৈকি,' বললেন বাবা। 'আমার বুক শেল্‌ফেই আছে। আমার ইস্কুলে প্রাইজ পাওয়া বই। টিপু, তুই দেখিস্‌নি?'

'সব পড়া হয়ে গেছে বাবা,' বলল টিপু।

'সবগুলো?'

'সবগুলো। বিদ্যাসাগরের জীবনী, সুরেশ বিশ্বাসের জীবনী, ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযান, মাঙ্গো পার্কের আফ্রিকা ভ্রমণ, ইস্পাতের কথা, আকাশযানের কথা...। প্রাইজ আর কটাই বা পেয়েছ বাবা?'

'তা বেশ তো,' বললেন বাবা। 'নতুন বই এনে দেওয়া যাবেখন।'

'আপনি এখানে তীর্থঙ্কর বুক স্টলে বললে ওরা কলকাতা থেকে আনিয়ে দেবে বই,' বললেন অঙ্ক স্যার, 'সেই সবই তুমি পড়বে এবার থেকে, তর্পণ। এগুলো বন্ধ।'

এগুলো বন্ধ। ওই দুটো কথায় যেন এক মুহূর্তে পৃথিবীটা টিপুর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। এগুলো বন্ধ!

আর বন্ধ যাতে হয় তার জন্য বাবাও অঙ্ক স্যারের থেকে নিয়ে বইগুলো তাঁর আলমারির তাকে ভরে ফেলে চাবি বন্ধ করে দিলেন।

মা অবিশ্যি ব্যাপারটা শুনে বেশ খানিকক্ষণ গজর গজর করেছিলেন। খাবার সময় একবার তো বলে ফেললেন, 'যে লোক এমন কথা বলতে পারে তাকে মাস্টার করে রাখা কেন বাপু ?'

বাবা পরপর তিনবার উহুঁ বলে মা-কে থামিয়ে দিলেন। —'তুমি বুঝছ না। উনি যা বলছেন টিপুর ভালোর জন্যই বলছেন।'

'ছাই বলছেন।' তারপর টিপুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুই ভাবিস্‌নে রে। আমি বলব তোকে গল্প। তোর দিদিমার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি ছেলেবেলায়। সব তো আর ভুলিনি।'

টিপু কিছু বলল না। মুশকিল হচ্ছে কি, মা-র কাছে টিপু এককালে অনেক গল্পই শুনেছে। তার বাইরে মা আর কিছু জানেন বলে মনে হয় না। আর জানলেও, বই পড়ার মজা মুখে শোনা গল্পে নেই। বইয়ে ডুবে যাওয়া একটা আলাদা ব্যাপার। সেখানে শুধু গল্প আর তুমি—মাঝখানে কেউ নেই। সেটা মা-কে বোঝাবে কী করে ?

আরো দুদিন গেল টিপুর বুঝতে যে এবার সত্যি সত্যিই সে দুঃখ পাচ্ছে। গোলাপীবাবু যে দুঃখের কথা বলেছিলেন, এটা সেই দুঃখ। এবার এক উনিই যদি কিছু করতে পারেন।

আজ রবিবার। বাবা ঘুমোচ্ছেন। মা বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকে সেলাই-এর কল চালাচ্ছেন। এখন বেজেছে সাড়ে তিনটে। এখন একবার পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়া যেতে পারে। লোকটা যে কেন বলে গেল না সে কোথায় থাকে ! সে না এলে টিপু সটান তার বাড়িতে চলে যেতে পারত।

টিপু পা টিপে টিপে একতলায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে, কিন্তু তাও বেশ শীত শীত ভাব। দূরে ধান ক্ষেতে সোনালী রং ধরে আছে পাহাড়ের লাইন অবধি। একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে একটানা, আর চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দটা নিশ্চয়ই ওই শিরীষ গাছের বাসিন্দা কোনো একটা কাঠবেড়ালী করছে।

'হ্যালো।'

আরে ! কী আশ্চর্য ! কখন যে লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে গাছতলায় সেটা টিপু দেখতেই পায়নি।

'তোমার কানের পিছনে নীল রঙ, হাতের তেলো খস্‌খসে, বুঝতেই পারছি তোমার দুঃখের কারণ ঘটেছে।'

'তা ঘটেছে বৈকি।'

লোকটা এগিয়ে আসছে টিপুর দিকে। আবার সেই পোশাক। আবার মাথার চুলগুলো ফৎফৎ করে ঝুঁটির মতো উড়ছে বাতাসে।

'কী ঘটেছে সেটা বলতে হবে তো, নইলে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'

টিপুর হাসি পেলেও, লোকটাকে শুধরোবার চেষ্টা না করে অঙ্ক স্যারের পুরো ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলে ফেলল। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেলেও মনের জোরে নিজেকে সামলে নিল টিপু।

'হুঁ' বলে লোকটা ষোলবার ধীরে ধীরে মাথা উপর-নীচ করল। টিপু ভেবেছিল আর থামবেই না ; আর সেই সঙ্গে এও মনে হয়েছিল যে লোকটা হয়তো কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। যদি না পায় তাহলে যে কী দশা হবে সেটা ভেবে টিপুর আবার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটা মাথা নাড়া থামিয়ে আবার 'হুঁ' বলাতে টিপুর ধড়ে প্রাণ এল।

'তুমি কিছু করতে পারবে কি ?' টিপু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

'ভেবে দেখতে হবে। পাকস্থলীটা খাটাতে হবে।'

'পাকস্থলী ? কেন, তোমরা মাথা খাটাও না বুঝি ?'

লোকটা কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোমার এই নরহরি স্যারকে কাল দেখলাম না মাঠে ঘোড়া চড়তে ?'

'কোন্ মাঠে ? হামলাটুনির মাঠে ?'

'যে মাঠে ভাঙা বাড়িটা আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি কি সেইখানেই থাক ?'

'ওই ভাঙা বাড়িটার পিছনেই আমার ট্রিডিঙ্গিপিডিটা রয়েছে।'

টিপু কথাটা ঠিক করে শোনেনি নিশ্চয়ই। তবে শুনলেও সেটা যে তার জিভ দিয়ে কিছুতেই বেরোত না সেটা সে জানে।

লোকটা এখনো আছে, আর আবার মাথাটা উপর-নীচ করতে আরম্ভ করেছে।

এবার একত্রিশবার নাড়াবার পর মাথা থামিয়ে লোকটা বলল, 'আজ ফুল্ মুন্। তুমি যদি ব্যাপারটা দেখতে চাও, তাহলে চাঁদ যখন মাঠের মাঝখানের খেজুর গাছটার ঠিক মাথায় আসবে তখন মাঠে এসে যেও। আড়ালে থেকো ; কেউ যেন দেখে না ফেলে। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।'

টিপুর হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিল।

'তুমি অঙ্ক স্যারকে মেরে-টেরে ফেলবে না তো ?'

এই প্রথম লোকটাকে হো হো করে হাসতে দেখল টিপু, আর সেই সঙ্গে দেখল লোকটার মুখের ভিতর একটার উপর আরেকটা জিভ। আর দেখল যে

লোকটার দাঁত বলে কিচ্ছু নেই।

'মেরে ফেলব ?'—লোকটা কোনোরকমে হাসি থামাল।—'উহুঁ। আমরা কাউকে মারি-টারি না। একজনকে চিমটি কাটার কথা ভেবেছিলাম বলেই তো আমার নির্বাসিন। প্রথম ছক কেটে বেরোল পৃথিবীর নাম, সেখানে হবে নির্বাসিন ; তারপর ছক কেটে বেরোল এই শহরের নাম ; তারপর তোমার নাম। তোমার দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েই আমার মুক্তি।'

'ঠিক আছে, তাহলে—'

লোকটা সেদিনের মতোই টিপুর কথা শেষ হবার আগেই কুল গাছের উপর দিয়ে হাই জাম্প করে হাওয়া।

টিপুর শরীরের ভিতর সেই যে মিহি কাঁপুনি শুরু হল সেটা রইল রাত অবধি। আশ্চর্য কপাল,—আজ মা বাবা দুজনেই রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে যাবেন সুশীলবাবুদের বাড়ি। সুশীলবাবুর নাতির মুখে ভাত। টিপুরও নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু সামনেই পরীক্ষা, তাই মা নিজেই বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই। বাড়িতে বসে পড়াশুনা কর।'

সাড়ে সাতটায় মা-বাবা বেরিয়ে গেলেন। টিপু পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে পুব দিকটা হলদে হতে শুরু করেছে দেখে বেরিয়ে পড়ল।

ইস্কুলের পিছনের শর্টকাটটা দিয়ে বিষ্ণুরামবাবুদের বাড়ি পৌঁছতে লাগল মিনিট দশেক। ঘোড়াটা নেই। টিপুর ধারণা ওটা বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলে থাকে। সামনের বৈঠকখানার জানালা দিয়ে আলো রাস্তায় এসে পড়েছে, ঘরের ভিতর চুরুটের ধোঁয়া।

'কিস্তি।'

অঙ্ক স্যারের গলা। দাবা খেলছেন বিষ্ণুরামবাবুর সঙ্গে। তাহলে কি আজ ঘোড়া চড়বেন না ? সেটা জানার কোনো উপায় নেই। লোকটা কিন্তু বলেছে হামলাটুনির মাঠে যেতে। টিপু যা থাকে কপালে করে সেই দিকেই রওনা দিল।

ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ। এখনো সোনালী, রূপোলী হবে আরো পরে। নেড়া খেজুর গাছটার মাথায় পৌঁছতে এখনো মিনিট দশেক দেরি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না যাকে বলে সেটা হতে আরো সময় লাগবে, তবে একটা ফিকে আলো চারদিক ছেয়ে আছে। তাতে গাছপালা ঝোপঝাড় সবই বোঝা যাচ্ছে। ওই যে দূরে ভাঙা কুঠিবাড়ি। ওর পিছনে কোথায় থাকে লোকটা ?

টিপু একটা ঝোপের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করার জন্য তৈরি হল। তার প্যান্টের পকেটে খবরের কাগজে মোড়া এক টুকরো পাটালি গুড়। টিপু তার
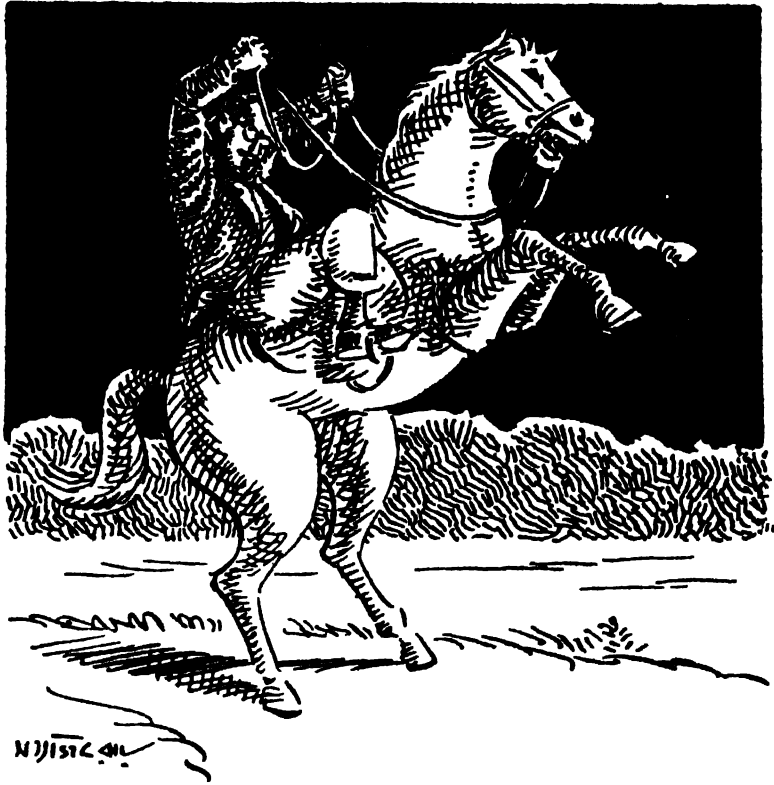
খানিকটা মুখে পুরে চিবোতে লাগল। শেয়াল ডাকছে দূরের বন থেকে। আকাশ দিয়ে যে কালো জিনিসটা উড়ে গেল সেটা নিশ্চয়ই পেঁচা। গরম কোটের উপব একটা খয়েরি চাদর জড়িয়ে নিয়েছে টিপু। তাতে গা ঢাকা দেওয়ারও সুবিধে হবে, শীতটাও বাগে আসবে।

আটটা বাজার যে শব্দটা এলো দূর থেকে সেটা নিশ্চয়ই বিষ্ণুরামবাবুদের ঘড়ির শব্দ।

আর তার পরেই টিপু শুনতে পেল—খট্‌মট্‌-খট্‌মট্‌-খট্‌মট-খট্‌মট্‌...

ঘোড়া আসছে।

টিপু ঝোপের পাশ দিয়ে মাথাটা বার করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মোড়ের দিকে।

হ্যাঁ, ঘোড়া তো বটেই, আর তার পিঠে নরহরি স্যার।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘটে গেল একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। একটা মশা কিছুক্ষণ থেকেই টিপুর কানের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, টিপু হাত চালিয়ে সেটাকে যথাসম্ভব দূরে রাখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা সুড়ুৎ করে ঢুকল গিয়ে তার নাকের ভিতর।

দু আঙুল দিয়ে নাক টিপে যে হাঁচি চাপা যায় সেটা টিপু আগে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু এখন নাক টিপলে মশাটা আর বেরোবে না মনে করে সে হাঁচিটা আসতে দিল, আর তার শব্দটা খোলা মাঠের শীতের রাতের থমথমে ভাবটাকে একেবারে খান্‌খান্‌ করে দিল।

ঘোড়া থেমে গেছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল টিপুর উপর।

'তর্পণ !'

টিপুর হাত পা অবশ হয়ে গেছে। সে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ছি ছি ছি ! এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটা ভেস্তে দেওয়াতে লোকটা না জানি কী মনে করছে !

ঘোড়াটা এগিয়ে আসছিল তারই দিকে, পিঠে অঙ্ক স্যার, কিন্তু এমন সময় স্যারকে প্রায় পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা সামনের পা দুটো তুলে একটা আকাশচেরা চিঁহিহি ডাক ছেড়ে এক লাফে রাস্তা থেকে মাঠে গিয়ে পড়ল।

আর তার পরেই টিপুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, দেখে যে ঘোড়া আর মাটিতে নেই।

ঘোড়ার দুদিকে দুটো ডানা। সেই ডানায় ঢেউ তুলে ঘোড়া আকাশে উড়তে লেগেছে, অঙ্ক স্যার উপুড় হয়ে ঘোড়ার পিঠ জাপটে ধরে আছেন, তাঁর জ্বলন্ত টর্চ হাত থেকে পড়ে গেছে রাস্তায়। চাঁদ এখন খেজুর গাছের মাথায়, জ্যোৎস্না এখন ফুটফুটে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে অঙ্ক স্যারকে পিঠে নিয়ে বিষ্ণুরাম দাসের ঘোড়া আকাশভরা তারার দিকে উড়তে উড়তে ক্রমেই ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে।

পেগ্যাসাস !

ধাঁ করে টিপুর মনে পড়ে গেল।

গ্রীসের উপকথা। রাক্ষসী মেডুসা—তার মাথায় চুলের বদলে হাজার বিষাক্ত সাপ, তাকে দেখলে মানুষ পাথর হয়ে যায়—তরোয়াল দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল বীর পারসিয়ুস, আর মেডুসার রক্ত থেকে জন্ম নিল পক্ষিরাজ পেগ্যাসাস।

'তুমি বাড়ি যাও, তর্পণ।'

পাশে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত লোকটা, চাঁদের আলো তার মাথার সোনালী ঝুঁটিতে। —'এভরিথিং ইজ অল রাইট।'

তিনদিন হাসপাতালে ছিলেন অঙ্ক স্যার। শরীরে কোনো জখম নেই, খালি মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না।

চারদিনের দিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অঙ্ক স্যার টিপুদের বাড়িতে এলেন। বাবার সঙ্গে কী কথা হল সেটা টিপু জানে না। অঙ্ক স্যার চলে যাবার পরেই বাবা টিপুকে ডাকলেন।

'ইয়ে, তোর বইগুলো নিয়ে যা আমার আলমারি থেকে। উনি বললেন ওসব গল্পে ওঁর আপত্তি নেই।'

সেই লোকটাকে আর দেখেনি টিপু। তার খোঁজে একদিন গিয়েছিল কুঠিবাড়ির পিছনটায়। পথে যেতে দেখেছে বিষ্ণুরামবাবুর ঘোড়া যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু কুঠিবাড়ির পিছনে কিচ্ছু নেই।

শুধু একটা গিরগিটি দেখতে পেয়েছিল টিপু, যেটার রং একদম গোলাপী।

গগন চৌধুরীর স্টুডিও

একটা ফ্ল্যাট দিনের বেলা দেখে পছন্দ হলেও, সেখানে গিয়ে থাকা না অবধি তার সুবিধে-অসুবিধেগুলো ঠিক বোঝা যায় না। সুধীন সরকার এইটেই উপলব্ধি করল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাটে বসবাস আরম্ভ করে। এই একটা ব্যাপাবেই ভাগ্যলক্ষ্মী একটু শুকনো হাসলেন ; না হলে তিনি যে সুধীনের প্রতি সবিশেষ প্রসন্না তার নজিবেব অভাব নেই।

যেমন তার পদোন্নতিব ব্যাপারটাই ধরা যাক। সে এখন আপিসের একটি ডিপার্টমেন্টের হেড। ঠিক এত তাড়াতাড়ি মাথায় পৌঁছানোর কথা নয় ; হাজার হোক তার বয়সটা তো বেশি নয়—এই আষাঢ়ে একত্রিশে পড়েছে সে। ডিপার্টমেন্টের কাঁধ অবধি এমনিতেই উঠেছিল সুধীন। মাথায় ছিল নগেন্দ্র কাপুর, যাঁর বয়স চল্লিশ, যিনি দীর্ঘাঙ্গী, সুপুরুষ, কর্মক্ষম ; যিনি ছাই রঙের সাফারি সুট পরে আপিসে ঢুকলে সকলেব দৃষ্টি চলে যায় তাঁর দিকে। সেই নগেন্দ্র কাপুর যে অকস্মাৎ টালিগঞ্জের গল্‌ফের মাঠে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যাবেন সে কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল ? এই মৃত্যুর পরেই সুধীন দেখল প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই সে কাপুরের জায়গা অধিকার করে বসেছে। এটা অবিশ্যি শুধু কপালজোরে নয় ; সুধীন এই পদের উপযুক্ত নয় এ অপবাদ তাকে কেউ দেবে না।

তারপর এই ফ্ল্যাট। সুধীনের বাপ মা তাকে সংসারী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, সময়টাও ভালো, কাজেই সুধীনকে বাধ্য হয়েই সে অবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে হয়েছে। আগে পার্ক সার্কাসে যে ফ্ল্যাটটা ছিল, তার পায়রার খোপের মতো দুখানা ঘরে সংসার করা চলে না। তাছাড়া কাছেই ছিল একটা বিয়ে-সাদিতে ভাড়া দেওয়ার বাড়ি। অষ্টপ্রহর গ্রামোফোন রেকর্ডে সানাইয়ের বিকৃত বাঁশফাটা সুরে সুধীনের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। দালালের কাছ

থেকে খবর পেয়ে সুধীন প্রথম যে ফ্ল্যাটটা দেখতে গেল সেটাই হল ভবানীপুরের এই ফ্ল্যাট। দোতলার ফ্ল্যাট, তিনখানা বেশ বড় বড় ঘর, দুটো বাথরুম, দক্ষিণে বারান্দা, মেঝের মোজেইক, জানালার গ্রিল, ফ্ল্যাটের প্ল্যান—সব কিছুতেই সুপরিকল্পনা ও সুরুচির ছাপ। ভাড়া আটশো। সর্বোপরি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে মোটামুটি সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে মনে হয়। সুধীনের আর দ্বিতীয় কোনো ফ্ল্যাট দেখতে হয়নি।

দু সপ্তাহ হল সে এসেছে এই ফ্ল্যাটে। প্রথম কদিন অত খেয়াল করেনি, তারপর একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখল তার চোখে বাইরে থেকে বিজলী আলো এসে পড়েছে। বেশ উজ্জ্বল আলো। এত রাত্রে আলো আসে কোত্থেকে ?

সুধীন বিছানা ছেড়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সারা পাড়া অন্ধকার, কেবল একটি আলো জ্বলছে রাস্তার উল্টো দিকের প্রাচীন অট্টালিকার তিনতলার একটি ঘরে। খোলা জানালার পর্দার উপর দিয়ে সটান এসে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকেছে সুধীনের ঘরে। শুধু ঘরে নয়, একেবারে সুধীনের বিছানায়। বালিশ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে শুলেও সে আলো পড়বে সুধীনের মুখে।

এ তো বড় জ্বালাতন ! ঘর অন্ধকার না হলে মানুষ ঘুমোয় কী করে ? অন্তত সুধীন সেটা পারে না। এটা কি রোজই হবে নাকি ?

আরো এক সপ্তাহ দেখার পর সুধীন বুঝল এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। বারোটার কিছু আগে থেকেই আলোটা জ্বলে, এবং জ্বলে থাকে ভোর অবধি। অথচ নিজের ঘরের দক্ষিণের জানালা বন্ধ করে শোয়ায় সুধীনের ঘোর আপত্তি। কার না হয় ? কলকাতায় ওই একটি জিনিসের অনেক দাম। দক্ষিণের জানালা। বিশেষ করে তার সামনে যদি অন্য কোনো বাড়ি না থাকে। সেটাও এ ফ্ল্যাটের একটা লোভনীয় দিক। জানালার সামনে রাস্তার ওপরে হল ওই পুরনো বনেদি বাড়িটার সংলগ্ন বাগান, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নতুন দালান ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। বাড়িটা কোনো এককালীন জমিদারের সেটা বোঝাই যায়। সংস্কার হয়নি বহুদিন, লোকজনও বিশেষ থাকে বলে মনে হয় না।

এক ওই তিনতলার ঘরে ছাড়া।

কোনো অজ্ঞাত কারণে ওই ঘরের বাসিন্দা সারারাত বাতি জ্বালিয়ে রাখেন।

একতলার ফ্ল্যাটে ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন সোমেশ্বর নাগ। সুধীনের মাস চারেক আগে ইনি এসেছেন এই ফ্ল্যাটে। বছর পঞ্চান্ন বয়স, বেঙ্গল ক্লাবের মেমবার, সন্ধ্যাটা তিনি ক্লাবেই কাটান। এক শনিবার বিকেলে বাড়ির গেটে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুধীন তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপের লোভ সামলাতে পারল

না।

'আমাদের উল্টোদিকের বাড়িটা কাদের বলুন তো ?'

'চৌধুরী। কেন, কী ব্যাপার ?'

'না, মানে, বাড়িতে তো বিশেষ কেউ থাকে-টাকে বলে মনে হয় না, অথচ তিনতলার একটা ঘরে সারারাত বাতি জ্বলে। সেটা লক্ষ করেছেন ?'

'না, তা তো করিনি।'

'আপনাদের ঘরে আসে না আলো ?'

'সেটা তো সম্ভব নয়। ওদের ছাতের পাঁচিলটা সামনে পড়ে তো। আমরা তো ঘরটাই দেখতে পাই না।'

'খুব বেঁচে গেছেন। আমার তো রাত্রে ঘুমই হয় না ওই আলোর জন্য।'

'ভেরি স্ট্রেঞ্জ। শুনেছি তো ওই এতবড় বাড়িতে একটি কি দুটি মাত্র প্রাণী থাকে। মালিক হলেন গগন চৌধুরী। তাঁকে বড় একটা দেখা-টেখা যায় না। আমি তো এসে অবধি দেখিনি। তবে আছেন বলে জানি। বয়স হয়েছে বোধহয়। শুনেছি এককালে ছবি-টবি আঁকতেন। আপনি এক কাজ করুন না। ভদ্রলোককে গিয়ে সোজাসুজি বলুন। অন্তত ওঁর নিজের ঘরের জানালাটা তো বন্ধ করে দিতে পারেন। এতটুকু কনসিডারেশন হবে না প্রতিবেশীর জন্য ?'

এ কাজটা অবিশ্যি করা যায়, যদিও সহজ নয়। অনুরোধ করলেও সেটা যে গ্রাহ্য হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। রাত্রে কী ঘটনা ঘটে ওই গগন চৌধুরীব ঘরে ?

সুধীন বুঝতে পারল, আলোর জন্য ব্যাঘাতের প্রশ্নটা বড় ঠিকই, কিন্তু ওই প্রাচীন অট্টালিকার ওই ঘরে কী ঘটছে সেটা জানার আগ্রহও কম নয়। তার বন্ধু মহিম রেসের মাঠে যাতায়াত করে ; তার একটি বড়ো বাইনোকুলার আছে। সেটা দিয়ে দেখলে কিছু জানা যাবে কি ? বাইনোকুলারের দরকার এই জন্যেই যে ঘরটা নেহাত কাছে নয়। চৌধুরীদের বাড়িটা ঠিক রাস্তার উপরে নয় ; পাঁচিল পেরিয়ে সামনে বেশ খানিকটা জায়গা আছে যেটা বাগানেরই অংশ। এই দূরত্বের পরেও আরও দূরত্ব আছে, কারণ তিনতলার ঘরটা ছাতের খানিকটা অংশ পেরিয়ে।

মহিমের বাইনোকুলারে জানালাটা চলে এল অনেকখানি কাছে, কিন্তু পর্দার উপর দিয়ে দেয়ালের খানিকটা অংশ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখা গেল না। দেয়ালে টাঙানো তেল রঙে আঁকা দুটি আবক্ষ প্রতিকৃতির খানিকটা করে অংশ দেখা যাচ্ছে সীলিং-এর ওই আলোতে। তাহলে কি শিল্পীর ঘর ? এটাই কি ছিল ভদ্রলোকের স্টুডিও ? কিন্তু সেখানে কি কোনো মানুষ নেই ?

হ্যাঁ, আছে। এইমাত্র জানালার পর্দায় ছায়া ফেলে একটা মূর্তি ডান থেকে বাঁ

দিকে চলে গেল। কিন্তু ছায়া থেকে মানুষ চেনা গেল না। পর্দায় আলোটা পড়াতে তার স্বচ্ছতাও অনেকটা কমে গেছে।

প্রায় পনের মিনিট দেখার পর সুধীনের ক্লান্তি এল। যেটুকু ঘুমের সম্ভাবনা তাও কি সে নষ্ট করবে এই ছেলেমানুষী করে ?

বাইনোকুলারটা টেবিলের উপর রেখে সুধীন শুয়ে পড়ল। সে মনে মনে স্থির করে নিয়েছে কী করা দরকার।

সোজা গিয়ে গগন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাঁকে বলবে তাঁর ঘরের উত্তরের দিকের জানালাটা বন্ধ রাখতে। এতে কাজ হলে হবে, না হলে সুধীনকে এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। গগন চৌধুরী লোকটা কিরকম সেটা জানা থাকলে ভালো হত—প্রতিবেশীর কাছ থেকে অভদ্র অপমানসূচক ব্যবহার হজম করা খুব কঠিন, তা তিনি যতই প্রবীণ হন না কেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া গতি নেই।

গেটটা খোলা, এবং দারোয়ান নেই দেখে সুধীনের একটু অবাক লাগল ; কিন্তু প্রথম বাধা এত সহজে অতিক্রম করতে পারায় সেই সঙ্গে একটু নিশ্চিন্তও লাগল। সে রাত্রেই যাওয়া স্থির করেছে, কারণ ভদ্রলোক দেখতে চাইলে তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারবে আলোটা কীভাবে তার ঘরে পড়ে।

ভবানীপুরের ভদ্রপাড়া শীতকালের রাত এগারোটার মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল ; চৌধুরীবাড়ির আগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের সব কিছুই জ্যোৎস্নার আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি ডাইনে ফেলে সুধীন এগিয়ে গেল নোনা ধরা গাড়িবারান্দার দিকে। এখনো তিনতলার ঘরে আলো জ্বলেনি। কপাল ভালো হলে গগন চৌধুরীকে হয়তো নিচেই পাওয়া যেতে পারে।

সদর দরজার কড়া নাড়তে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একটি ভৃত্যস্থানীয় প্রৌঢ় দরজা খুলে প্রশ্ন করল—'কাকে চাই ?'

'চৌধুরী মশাই—গগন চৌধুরী—তিনি কি শুয়ে পড়েছেন ?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় কি ? আমার নাম সুধীন সরকার। আমি থাকি ওই সামনের বাড়িতে। একটা বিশেষ কাজে এসেছি।'

চাকর ভিতরে গিয়ে আবার মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এল।

'আপনি আসুন।'

সব ব্যাপারটাই যে সহজে হয়ে যাচ্ছে—এ তো ভারী আশ্চর্য !

ভিতরে ঢুকে ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকল সুধীন।

'বসুন।'

জানালা দিয়ে এক ফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সোফার উপর, তাই সুধীন সেটা দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বসল। চাকর বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল না কেন ? এখন তো পাড়ায় লোডশেডিং নেই।

এবারে ঘরের চারদিকে চোখ ঘোরাতে সুধীনের হৃৎস্পন্দন হঠাৎ দেখতে দেখতে দ্বিগুণ হয়ে গেল।

সে কি ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে এসে পড়ল নাকি ? তাকে ঘিরে কারা চেয়ে রয়েছে তার দিকে ?

ঘরের প্রায়ান্ধকারে দৃষ্টি আরেকটু অভ্যস্ত হতে সুধীন বুঝতে পারল যারা চেয়ে রয়েছে তারা মানুষ নয়, মুখোশ। প্রত্যেকটি মুখোশের চোখের চাহনি যেন তারই দিকে ঘোরানো। এসব মুখোশ যে এ দেশের নয় সেটাও বুঝেছে সুধীন। দেখে মনে হয় অধিকাংশই আফ্রিকার, কিছু দক্ষিণ আমেরিকার হতে পারে। সুধীন এককালে ভালো ছবি আঁকত, বাপের আপত্তি না থাকলে হয়তো সেটাকেই সে পেশা করত। হাতের নানারকম কাজ সম্বন্ধে তাব এখনো যথেষ্ট কৌতূহল আছে।

সুধীন মনে মনে নিজের সাহসের তারিফ না করে পারল না। অন্ধকার ঘরে মুখোশ পরিবৃত এই ভৌতিক পরিবেশে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যেত।

ঘরে যে কখন লোক প্রবেশ করেছে তা সুধীন টের পায়নি। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন শুনে চমকে পাশ ফিরে সোফায় বসা মানুষটাকে দেখতে পেল।

'এত রাত্রে ?'

সুধীন হাত দুটোকে প্রায় যন্ত্রের মতো সামনে তুলে নমস্কার করে কথা বলতে গিয়েও পারল না।

ইনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান তাতে কোনো সন্দেহ নেই—পরনে দোরোখা শালই তার পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু গায়ের রঙে এমন পাংশুটে রক্তহীন ভাব, আর চোখের চাহনিতে এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা সুধীন কখনো দেখেনি। এমন ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনে কারুরই মুখ দিয়ে চট করে কথা বেরোবে না।

ভদ্রলোক নিষ্পলক দৃষ্টিতে সুধীনের দিকে চেয়ে আছেন। প্রায় এক মিনিট লাগল সুধীনের নিজেকে সামলে নিতে। তারপর সে মুখ খুলল।

'আমি একটা, মানে, অভিযোগ জানাতে এসেছি—কিছু মনে করবেন না। আপনিই গগন চৌধুরী তো ?'

ভদ্রলোক একবার শুধু মাথাটা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি। প্রশস্ত ললাটের তিনদিক ঘিরে সিংহের কেশরের মতো আধপাকা চুল থেকে মনে হয় বয়স পঁয়ষট্টির কম না।

সুধীন বলে চলল, 'আমার নাম সুধীন্দ্রনাথ সরকার। আমি সামনের বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি। আসলে হয়েছে কি, আপনার তিনতলার ঘরের বাতিটা সারা রাত জ্বলে বলে বড্ড অসুবিধা হয়। আলোটা সোজা আমার মুখের উপর এসে পড়ে। যদি আপনার জানালাটা বন্ধ করে রাখতে পারতেন !—নইলে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। সারাদিন আপিস করে রাত্তিরে ঘুমোতে না পারলে...'

ভদ্রলোক এখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছেন সুধীনের দিকে। এই ঘরের কি কোনো আলোই জ্বলে না নাকি ?

অগত্যা সুধীনই আবার মুখ খুলল। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কাব কবা দরকার।

'আমি যদি জানালা বন্ধ করি তাহলেও আলো আসবে না ঠিকই, কিন্তু দক্ষিণের জানালা তো, তাই...'

'আপনার জানালা বন্ধ করতে হবে না।'

'আজ্ঞে ?'

'আমিই করব।'

হঠাৎ যেন একটা বিরাট ভার নেমে গেল সুধীনের বুক থেকে।

'ওঃ, তাহলে তো কথাই নেই। অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি উঠছেন ?'

সুধীন ওঠার উদ্যোগ করছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রশ্নে একটু অবাক হয়েই আবার বসে পড়ল—'রাত হল তো। আর আপনিও নিশ্চয়ই শুতে যাবেন।'

'আমি রাত্রে ঘুমোই না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি সুধীনের দিক থেকে এক চুল নড়েনি।

'লেখাপড়া করেন বুঝি ?' সুধীন ধরা গলায় প্রশ্ন করল। এই পবিবেশে গগন চৌধুরীর সান্নিধ্য যে খুব স্বস্তিকর নয় সেটা স্বীকার করতেই হবে।

'না।'

'তবে ?'

'ছবি আঁকি।'

সুধীনের মনে পড়ে গেল বাইনোকুলার দিয়ে ঘরের দেয়ালে পেন্টিং দেখে মনে হয়েছিল সেটা চিত্রকরের স্টুডিও হতে পাবে। নাগ মশাইও বলেছিলেন ইনি এককালে ছবি আঁকতেন।

'তার মানে ওই ঘরটা আপনার স্টুডিও ?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'কিন্তু সে কথা বোধহয় পাড়ার বিশেষ কেউ জানে না ?'

গগন চৌধুরী একটা শুকনো হাসি হাসলেন।

'আপনার সময় আছে ?'

'সময়, মানে...'

'তাহলে কতগুলো কথা বলি। অনেক দিনের জমে থাকা কথা। কাউকে বলার সুযোগ হয়নি কখনো।'

সুধীন অনুভব করল ভদ্রলোকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা তার নেই।

'বলুন।'

'পাড়ার লোকে জানে না কারণ জানার আগ্রহ নেই। একটা লোক সারাটা জীবন শিল্পচর্চা করে গেল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কারুর কোনো কৌতূহল নেই। এককালে যখন এগজিবিশন করেছি, তখন কেউ কেউ এসে দেখেছে, অল্প বিস্তব সুখ্যাতিও করেছে। কিন্তু যখন হাওয়া বদলাতে শুরু করল, মানুষেব যে ছবি রক্তমাংসের মানুষ বলে চেনা যায় তার কদর আর যখন রইল না, তখন থেকে আমি গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে। নতুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলতে আমি শিখিনি। মনে মনে দা ভিঞ্চিকে গুরু বলে মেনেছিলাম ; এখনও তিনিই আমার গুরু।'

'কিন্তু...আপনি কিসের ছবি আঁকেন ?'

'মানুষের।'

'মানুষের ?'

'পোর্ট্রেট।'

'মন থেকে ?'

'না। সেটা আমি পারি না, শিখিনি। আমার সামনে কেউ এসে না বসলে আমি ছবি আঁকতে পারি না।'

'এই মাঝরাত্তিরে— ?'

'আসে। মডেল আসে। সিটিং দেয়। রোজই আসে।'

সুধীন কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে বসে রইল। এ কেমনতরো কথাবার্তা বলছেন ভদ্রলোক ? এ যে পাগলের প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে।

'বিশ্বাস হচ্ছে না !' গগন চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে এই প্রথম একটা পরিষ্কার হাসিব আভাস দেখা গেল। সুধীন কী বলবে বুঝতে পারল না।

'আসুন আমার সঙ্গে।'

সুধীন এ আদেশও অমান্য করতে পাবল না। ভদ্রলোকেব চোখে এবং কথায় একটা সম্মোহনী শক্তি আছে সেটা মানতেই হবে। তার নিজেরও যে কৌতূহল হচ্ছে না তা নয়। কেমন ছবি আঁকেন ভদ্রলোক ? কারা আসে সিটিং দিতে মাঝরাত্তিরে ? কীভাবে তাদের জোগাড় করা হয় ?

'এক আমার স্টুডিওতে ছাড়া বাড়ির আর কোথাও ইলেকট্রিসিটি নেই,' কেরোসিন ল্যাম্পের আবছা হলদে আলোয় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে

উঠতে বললেন ভদ্রলোক। —'বাকি সব কানেকশন কেটে দিয়েছি।'

আশ্চর্য এই যে, ল্যাণ্ডিং-এ, সিঁড়ির দেয়ালে, বৈঠকখানায়—কোথাও একটিও পেন্টিং নেই। সবই কি তাহলে স্টুডিওতে জড়ো করে রেখেছেন ভদ্রলোক ?

তিনতলায় উঠে বাঁয়ে ঘুরেই সামনে একটা দরজা। সেই ঘরে সুধীনকে নিয়ে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ করে দিয়ে বাঁয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে ঘরটা ভরে গেল।

এটাই যে স্টুডিও সেটা আর বলে দিতে হয় না। আঁকার সব সরঞ্জামই রয়েছে এখানে। ঘরের এক পাশে আলোর ঠিক নিচে ইজেলে একটা সাদা ক্যানভাস খাটানো রয়েছে। তাতে নতুন ছবি শুরু হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

সরঞ্জামের বাইরে যেটা আছে সেটা হল দেয়ালে টাঙানো এবং মেঝেতে ডাঁই করে রাখা পোর্ট্রেট। কমপক্ষে একশো তো হবেই। মেঝেরগুলো এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে না ধরলে বোঝা যাবে না। যেগুলো চোখের সামনে জলজ্যান্ত সে হল দেয়ালে টাঙানো পোর্ট্রেটগুলো। অধিকাংশই পুরুষের ছবি। সুধীন তার তৈরি চোখে বুঝে নিল সাবেকী ঢং-এ আঁকা পেন্টিংগুলোতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় আছে। এখানেও সুধীনের মনে হল যে সে যেন অনেক জ্যান্ত মানুষের ভিড়ে এসে পড়েছে—এবং সবাই চেয়ে আছে তারই দিকে—কমপক্ষে পঞ্চাশ জোড়া চোখে।

কিন্তু এরা সব কারা ? দু একটা মুখ চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু—

'কেমন লাগছে ?' প্রশ্ন করলেন গগন চৌধুরী।

'উঁচু দরের কাজ,' স্বীকার করতে বাধ্য হল সুধীন।

'অথচ অয়েল পেন্টিং-এ পোর্ট্রেট আঁকার রেওয়াজই লোপ পেয়ে গেছে। সেখানে আমাদের মতো শিল্পীদের কী দশা হয় ভেবে দেখেছেন ?'

'কিন্তু এ ঘরে এসে তো মনে হচ্ছে না যে আপনার কাজের অভাব আছে।'

'কী বলছেন ! সে তো এখন ! এককালে পনের বছর ধরে সমানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছি—একটি লোকও সাড়া দেয়নি। শেষটায় বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিই।'

'তারপর ? আবার আঁকা শুরু হল কী করে ?'

'অবস্থার পরিবর্তনের ফলে।'

সুধীন আর কিছু বলল না, কারণ তার সমস্ত মন এখন ছবির দিকে। ইতিমধ্যে সে তিনজনকে চিনতে পেরেছে। একজন মাস চারেক হল মারা গেছেন। বিখ্যাত গায়ক অনন্তলাল নিয়োগী। সুধীন আসরে বসে তাঁর গান শুনেছে বছর আষ্টেক আগে।

দ্বিতীয়জন হলেন অসীমানন্দ স্বামী—এককালে স্বদেশী করে পরে সন্ন্যাসী

হয়ে যান। ইনিও মারা গেছেন বছরখানেক হল। কাগজে ছবি বেরিয়েছিল, সুধীনের মনে আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি হলেন এয়ার ইণ্ডিয়ার বাঙালী পাইলট ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী। লণ্ডন যাবার পথে বোইং দুর্ঘটনায় আড়াইশো যাত্রীসমেত এঁরও মৃত্যু হয় বছর তিনেক আগে। সুধীন যে শুধু ছবি থেকেই চিনল এঁকে তা নয়; একবার আপিসের কাজে রোম যাবার পথে প্লেনের ককপিটে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

সুধীন একটা প্রশ্ন না করে পারল না।

'এঁরা কি শুধুই পোর্ট্রেট করানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন? সে ছবি নিজেরা নেননি কখনো?'

গগন চৌধুরীকে এই প্রথম গলা ছেড়ে হাসতে শুনল সুধীন।

'না, মিস্টার সরকার, পোর্ট্রেটে এঁদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য আঁকা।'

'আপনি কি বলতে চান রোজই কেউ না কেউ এসে আপনাকে সিটিং দেন?'

'সেটা আর একটুক্ষণ থাকলেই দেখতে পাবেন। আজও লোক আসবে।'

সুধীনের মাথা ক্রমেই গুলিয়ে যাচ্ছে।

'কিন্তু এঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা কীভাবে— ?'

'দাঁড়ান, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার সিসটেমটা একটু আলাদা।'

তাক থেকে একটা বেশ বড় খাতা নামিয়ে সুধীনের দিকে নিয়ে এলেন গগন চৌধুরী।

'এটা খুলে দেখুন এতে কী আছে।'

আলোর তলায় নিয়ে গিয়ে খাতাটা খুলল সুধীন।

খাতার পাতার পর পাতায় আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কাটা মৃত্যুসংবাদ। অনেকগুলো খবরের সঙ্গে ছবিও রয়েছে। সুধীন দেখল যে কিছু কিছু কাটিং-এর পাশে পেনসিল দিয়ে ঢিঁকে দেওয়া রয়েছে।

'পেনসিলের দাগ হলে বুঝতে হবে তাদের ছবি আঁকা হয়ে গেছে,' বললেন গগন চৌধুরী।

'কিন্তু যোগাযোগটা করেন কী করে সেটা তো—'

গগন চৌধুরী সুধীনের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে আবার সেটা তাকে রেখে দিলেন। তারপর ঘুরে এগিয়ে এসে বললেন, 'ওটা সকলে পারে না, আমি পারি। এটা চিঠি বা টেলিফোনের কম্ম নয়। এঁরা যেখানে আছেন সেখানে তো আর টেলিফোন নেই বা ডাক বিলির ব্যবস্থাও নেই। এঁদের জন্য অন্য উপায়ের প্রয়োজন হয়।'

সুধীনের হাত পা ঠাণ্ডা, গলা শুকিয়ে কাঠ। তাও একটা প্রশ্ন না করলেই নয়।

'আপনি কি বলতে চান এই সব লোকের পোর্ট্রেট করা হয়েছে এঁদের মৃত্যুর পর?'

'মৃত্যুর আগে এঁদের খবর পাবো কি করে, সুধীনবাবু। আমি আর কলকাতার কটা লোককে চিনি? মৃত্যু না হলে তো তাঁরা আর তাঁদের গণ্ডীর বাইরে বেরোতে পারেন না! একমাত্র মৃত ব্যক্তিই তো সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাঁদের সময়েরও অভাব নেই, ধৈর্যেরও অভাব নেই। ছবি যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণ ঠায়ে বসে থাকবেন ওই চেয়ারে।'

ঢং-ঢং-ঢং—

রাত্রের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা ঘড়ি বেজে উঠল। সিঁড়ির পাশে যে ঘড়িটা দেখেছিল সুধীন সেটাই বোধহয়।

'বারোটা,' বললেন গগন চৌধুরী। 'এইবার আসবেন।'

'কে ?'—সুধীনের গলার স্বর অস্বাভাবিক রকম চাপা ও রুক্ষ। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

'আজকে যিনি বসবেন তিনি। ওই তাঁর পায়ের শব্দ।'

সুধীন শ্রবণশক্তিটা এখনও হারায়নি, তাই সে স্পষ্ট পেল বাইরে নিচ থেকে জুতোর শব্দ।

'এসে দেখুন।'—গগন চৌধুরী এগিয়ে গেছেন পাশের একটা জানালার দিকে। 'আমার কথা বিশ্বাস না হয় এসে দেখুন।'

এও কি সেই সম্মোহনী শক্তি ? যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে সুধীন গগন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর তার অজান্তেই একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে—

'এঁকে যে চিনি !'

সেই দৃপ্ত মিলিটারি ভঙ্গি, সেই দীর্ঘ গড়ন, সেই ছাই রঙের সাফারি সুট।

ইনিই ছিলেন সুধীনের বস্—নগেন্দ্র কাপুর।

সুধীনের মাথা ঘুরছে। টাল সামলানোর জন্য সে ইজেলটাকে জাপটে ধরে ফেলল।

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ উপরে উঠে আসছে। কাঠের সিঁড়িতে জুতোর ক্রমবর্ধমান শব্দে সমস্ত বাড়ি গমগম করছে।

এবার আওয়াজ থামল।

নৈঃশব্দের মধ্যে গগন চৌধুরী মুখ খুললেন আবার।

'যোগস্থাপনের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না, সুধীনবাবু ? ভেরি সিম্পল—এই ভাবে হাতছানি দিলেই চলে আসে !'

সুধীন বিস্ফারিত চোখে দেখল দোরোখা শালের ভিতর থেকে গগন চৌধুরীর ডান হাতটা বেরিয়ে সামনে প্রসারিত। সে হাতে মাংস, চামড়া কিছুই নেই—খালি হাড় !

'যে হাতে ডাকা, সে হাতেই আঁকা !'

সংজ্ঞা হারাবার আগের মুহূর্তে সুধীন শুনল স্টুডিওর বন্ধ দরজার বাইরে থেকে টোকা পড়ছে—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

খট্ খট্ খট্—খট্ খট্ খট্—

'দাদাবাবু ! দাদাবাবু !'

এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দিনের আলোয় সুধীনকে আবার তখনই চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে নিতে হল। বাপ্‌রে—কী ভয়ংকর স্বপ্ন !

'দরজা খুলুন ! দাদাবাবু !'

চাকর অধীরের গলা।

'দাঁড়া, এক মিনিট।'

সুধীন বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল। অধীরের মুখে গভীর উদ্বেগ।

'আপনি এত বেলা অবধি—'

'জানি। ঘুমটা একটু বেশি হয়ে গেছে।'

'এত হৈ হল্লা বাড়ির সামনে, কিছুই টের পেলেন না ?'

'হৈ হল্লা ?'

'চৌধুরীবাড়ির বড়বাবু যে মারা গেলেন কাল রাত্তিরে। গগনবাবু। চৌরাশি বছর বয়স হয়েছেল। ভুগছিলেন তো অনেকদিন। ঘরে বাতি জ্বালা থাকত রাত্তিরে দেখেননি ?'

'তুই জানতিস ওঁর অসুখ ?'

'জানব না ? ওনার চাকর ভগীরথ—তার সঙ্গে তো দেখা হয় রোজ বাজারে।'

'বোঝো !'

অনুকূল

'এর একটা নাম আছে তো ?' নিকুঞ্জবাবু জিজ্ঞেস করলেন।
'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে বই কি।'

'কী বলে ডাকব ?'

'অনুকূল।'

চৌরঙ্গিতে রোবট সাপ্লাই এজেন্সির দোকানটা খুলেছে মাস ছয়েক হল। নিকুঞ্জবাবুর অনেক দিনের শখ একটা যান্ত্রিক চাকর রাখেন। ইদানীং ব্যবসায় বেশ ভালো আয় হয়েছে, তাই শখটা মিটিয়ে নেবার জন্য এসেছেন।

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে চাইলেন। এটা হচ্ছে যাকে বলে অ্যান্ড্রয়েড, অর্থাৎ যদিও যান্ত্রিক, তাও চেহারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের চেহারার কোনো তফাত নেই। দিব্যি সুশ্রী দেখতে, বয়স মনে হয় বাইশ-তেইশের বেশি নয়।

'কী ধরনের কাজ করবে এই রোবট ?' জিজ্ঞেস করলেন নিকুঞ্জবাবু। ডেস্কের উল্টো দিকের ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'সাধারণ চাকর যা পারে, ও তার সবই পারবে। কেবল রান্নাটা জানে না। তা ছাড়া, ঘর ঝাড়পোঁছ করা, বিছানা পাতা, কাপড় কাচা, চা দেওয়া, দরজা জানালা খোলা বন্ধ করা—সবই পারবে। তবে হ্যাঁ—ও যা কাজ করবে সবই বাড়িতে। ওকে দিয়ে বাজার করানো চলবে না, বা পান-সিগারেট আনাতে পারবেন না। আর ইয়ে—ওকে কিন্তু তুমি বলে সম্বোধন করবেন। তুইটা ও পছন্দ করে না।'

'এমনি মেজাজ-টেজাজ ভালো তো ?'

'খুব ভালো। সে-দিক দিয়ে ট্রাবল আসবে যদি আপনি কোনো কারণে ওর গায়ে হাত তোলেন। আমাদের রোবটরা ওটা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না।'

'সেটার অবিশ্যি কোনো সম্ভাবনা নেই কিন্তু ধরুন, যদি কেউ ওকে একটা

চড় মারল, তাহলে কী হবে ?'

'তাহলে ও তার প্রতিশোধ নেবে।'

'কী ভাবে ?'

'ওর ডান হাতের তর্জনীর সাহায্যে ও হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শক দিতে পারে।'

'তাতে মৃত্যু হতে পারে ?'

'তা পারে বই কি। আর আইন এ-ব্যাপারে কিছু করতে পারে না, কারণ রক্ত-মাংসের মানুষকে যে শাস্তি দেওয়া চলে, যান্ত্রিক মানুষকে তা চলে না। তবে এটা বলতে পারি যে, এখনো পর্যন্ত এরকম কোনো কেস হয়নি।'

'রাত্তিরে কি ও ঘুমোয় ?'

'না। রোবটরা ঘুমোয় না।'

'তাহলে এতটা সময় কী করে ?'

'চুপ করে বসে থাকে। রোবটের ধৈর্যের অভাব নেই।'

'ওর কি মন বলে কোনো বস্তু আছে ?'

'ওরা এমন অনেক কিছু বুঝতে পারে, যা সাধারণ মানুষ পারে না। এ গুণটা সব রোবটের যে সমান পরিমাণে থাকে তা নয় ; এটা খানিকটা লাকের ব্যাপার। এ গুণটা সময়ে প্রকাশ পায়।'

নিকুঞ্জবাবু রোবটটার দিকে ফিরে বললেন, 'অনুকূল, আমার বাড়িতে কাজ করতে তোমার আপত্তি নেই তো ?'

'কেন থাকবে ?' ষোলো আনা মানুষের মতো গলায় বলল অনুকূল। তার পরনে একটা নীল ডোরা কাটা শার্ট আর কালো হাফপ্যান্ট, বাঁ পাশে টেরি আর পাট করে আঁচড়ানো চুল, গায়ের রং বেশ ফরসা, দাঁতগুলো ঝকঝকে আর ঠোঁটের কোণে সব সময়ই যেন একটা হালকা হাসি লেগে আছে। চেহারা দেখে মনে বেশ ভরসা আসে।

'তাহলে চলো।'

নিকুঞ্জবাবুর মারুতি ভ্যান দোকানের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, অনুকূলের জন্য চেকটা দিয়ে রসিদ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, ভৃত্যের হাঁটাচলা দেখেও সে যে যান্ত্রিক মানুষ, সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

নিকুঞ্জবাবু বাড়ি করেছেন সল্ট লেকে। বিয়ে করেননি, তবে বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আছে, তারা সন্ধ্যাবেলা আসে তাস খেলতে। তাদের আগে থেকেই বলা ছিল যে, বাড়িতে একটি যান্ত্রিক চাকর আসছে। কেনার আগে অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবু খোঁজ নিয়ে নিয়েছিলেন। এই ক'মাসে কলকাতার বেশ কিছু উপরের

মহলের বাড়িতে রোবট-ভৃত্য বহাল হয়েছে। মানসুখানি, গিরিজা বোস, পঙ্কজ দস্তুরায়, মিঃ ছাবরিয়া—সকলেই বললেন তাঁরা খুব স্যাটিসফাইড, এবং তাঁদের চাকর কোনো ট্রাবল দিচ্ছে না। 'মুখ খুলতে না খুলতেই ফরমাশ পালন করে আমার জীবনলাল', বললেন মানসুখানি। 'আমার তো মনে হয় ও শুধু যন্ত্র নয়, ওর মাথার মধ্যে মগজ আছে আর বুকের মধ্যে কলিজা আছে।'

সাতদিনের মধ্যে নিকুঞ্জবাবুরও সেই একই ধারণা হল। আশ্চর্য পরিপাটি কাজ করে অনুকূল। শুধু তা-ই নয়, কাজের পারম্পর্যটাও সে বোঝে। বাবু স্নানের জল চাইলে সেটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সাবান তোয়ালে যথাস্থানে রেখে বাবু কী কাপড় পরবেন, কী জুতো পরবেন স্নান করে এসে, সেটাও পরিপাটি করে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে রেখে দেয়। আর সব ব্যাপারেই সে এত ভব্য যে তাকে তুমি ছেড়ে তুই বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নিকুঞ্জবাবুর বন্ধুদের অনুকূলকে মেনে নিতে একটু সময় লেগেছিল—বিশেষত বিনয় পাকড়াশি নিজের বাড়ির চাকরদের তুই বলে এমন অভ্যস্ত যে, অনুকূলকেও একদিন তুই বলে ফেলেছিলেন। তাতে অনুকূল গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমাকে তুই বললে কিন্তু তোকেও আমি তুই বলব।'

এরপর থেকে বিনয়বাবু আর কোনোদিন এ-ভুলটা করেননি।

নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে অনুকূলের একটা বেশ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল। অনুকূল বেশির ভাগ কাজই হুকুম দেবার আগেই করে ফেলে। এটা অবিশ্যি নিকুঞ্জবাবুর বেশ আশ্চর্য বলে মনে হয়, কিন্তু রোবট সাপ্লাই এজেন্সির মিঃ ভৌমিক বলেছিলেন যে, তাঁদের কোনো-কোনো রোবটের মস্তিষ্ক বলে একটা পদার্থ আছে, চিন্তাশক্তি আছে। অনুকূল নিশ্চয়ই সেই শ্রেণীর রোবটের মধ্যেই পড়ে গেছে। ঘুমোনোর ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিকুঞ্জবাবু ভৌমিকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। যে এতটাই মানুষের মতো, সে সারারাত জেগে বসে থাকবে, এও কি সম্ভব ? ব্যাপারটা যাচাই করতে তিনি একদিন মাঝরাত্তিরে চুপিসাড়ে অনুকূলের ঘরে ডাক দিতেই অনুকূল বলে উঠল, 'বাবু, আপনার কি কোনো দরকার আছে ?' নিকুঞ্জবাবু অপ্রস্তুত হয়ে 'না' বলে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

অনুকূলের সঙ্গে কাজের কথা ছাড়াও অন্য কথা বলে দেখেছেন নিকুঞ্জবাবু। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়েছেন অনুকূলের জ্ঞানের পরিধিটা কত বিস্তীর্ণ। খেলাধূলা বায়স্কোপ থিয়েটার নাটক নভেল, সব কিছু নিয়েই কথা বলতে পারে অনুকূল। আর সত্যি বলতে কি, অনুকূল এসব বিষয় যত জানে, নিকুঞ্জবাবু তার অর্ধেকও জানেন না। বাহাদুরি বলতে হবে এই রোবট প্রস্তুতকারকদের। কত কী জ্ঞান পুরতে হয়েছে ওই যন্ত্রের মধ্যে !

কিন্তু সুসময়েরও শেষ আছে।

অনুকূল আসার এক বছরের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু তাঁর ব্যবসায়ে কতকগুলো বেচাল চেলে তাঁর আর্থিক অবস্থার বেশ কিছুটা অবনতি করে ফেললেন। অনুকূলের জন্য মাসে তাঁর ভাড়া লাগে দু' হাজার টাকা। সে-টাকা এখনো তিনি নিয়মিত দিয়ে আসছেন, কিন্তু কতদিন পারবেন সেটাই হল প্রশ্ন। এবার একটু বেশি হিসেব করে চলতে হবে নিকুঞ্জবাবুকে। রোবট এজেন্সির নিয়ম হচ্ছে যে, এক মাসের ভাড়া বাকি পড়লেই তাঁরা রোবটকে ফেরত নিয়ে নেবে।

কিন্তু হিসেবে গণ্ডগোল করে দিল একটা ব্যাপার।

ঠিক এই সময় নিকুঞ্জবাবুর সেজোকাকা এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'চন্দননগরে একা-একা আর ভালো লাগছে না, তাই ভাবলুম তোর সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে যাই।'

নিকুঞ্জবাবুর এই সেজোকাকা—নাম নিবারণ বাঁড়ুজ্যে—মাঝে-মাঝে ভাইপোর কাছে এসে ক'টা দিন থেকে যান। নিকুঞ্জবাবুর বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, তিন কাকার মধ্যে একমাত্র ইনিই অবশিষ্ট। খিটখিটে মেজাজের মানুষ, শোনা যায় ওকালতি করে অনেক পয়সা করেছেন, তবে বাইরের হালচালে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। আসলে ভদ্রলোক বেজায় কঞ্জুষ।

'কাকা, এসেই যখন পড়েছেন যখন থাকবেন বই কি', বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'কিন্তু একটা ব্যাপার গোড়াতেই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। আমার একটি যান্ত্রিক চাকর হয়েছে। আজকাল কলকাতায় কয়েকটা রোবট কোম্পানি হয়েছে জানেন তো?'

'তা তো জানি', বললেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। কিন্তু চাকরের জাতটা কী শুনি। আমার আবার ওদিকে একটু কড়াকড়ি জানই তো। এ কি রান্নাও করে নাকি?'

'না না না', আশ্বাস দিলেন নিকুঞ্জবাবু। 'রান্নার জন্য আমার সেই পুরানো বৈকুণ্ঠই আছে। কাজেই আপনার কোনো ভাবনা নেই। আর ইয়ে, এই চাকরের নাম অনুকূল, আর একে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে হয়। 'তুই'টা ও পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করে না?'

'না।'

'ওর পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলতে হবে বুঝি আমাকে?'

'শুধু আপনাকে না, সকলকেই। তবে ওর কাজে কোনো ত্রুটি পাবেন না।'

'তা তুই এই ফ্যাসাদের মধ্যে আবার যেতে গেলি কেন?'

'বললাম তো—ও কাজ খুব ভাল করে।'

'তাহলে একবার ডাক তোর চাকরকে ; আলাপটা অন্তত সেরে নিই।'

নিকুঞ্জবাবু ডাক দিতেই অনুকূল এসে দাঁড়াল। 'ইনি আমার সেজোকাকা', বললেন নিকুঞ্জবাবু, 'এখন আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকবেন।'

'যে আজ্ঞে।'

'ও বাবা, এ তো দেখি পরিষ্কার বাংলা বলে,' বললেন নিবারণ বাঁড়ুজ্যে। 'তা বাপু দাও তো দেখি আমার জন্য একটু গরম জল করে। চান করব। বাদলা করে হঠাৎ কেমন জানি একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, তবে আমার আবার দু'বেলা স্নান না করলে চলে না—সারা বছর।'

'যে আজ্ঞে।'

অনুকূল ঘর থেকে চলে গেল আজ্ঞাপালন করতে।

নিবারণবাবু এলেন বটে, কিন্তু নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনো উন্নতি হল না। মাঝখান থেকে সান্ধ্য আড্ডাটি ভেঙে গেল। একে তো খুড়োর সামনে জুয়াখেলা চলে না, তার উপর নিকুঞ্জবাবুর সে সংস্থানও নেই।

এদিকে কাকা কতদিন থাকবেন তা জানা নেই। তিনি মর্জিমাফিক আসেন, মর্জিমাফিক চলে যান। এবার তাঁর হাবভাবে মনে হয় না তিনি সহজে এখান থেকে নড়ছেন। তার একটা কারণ এই যে, অনুকূল সম্বন্ধে তাঁর একটা অদ্ভুত মনোভাব গড়ে উঠেছে। তিনি এই যান্ত্রিক ভৃত্যটি সম্পর্কে যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুভব করছেন। চাকর যে ভালো কাজ করে, সেটা তিনি কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারেন না, কিন্তু চাকরের প্রতি ব্যবহারে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করাটাও তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। একদিন ভাইপোকে বলেই ফেললেন, 'নিকুঞ্জ, তোর এই চাকরকে নিয়ে কিন্তু মাঝে-মাঝে আমার খুব মুশকিল হচ্ছে।'

'কেন কাকা ?' নিকুঞ্জবাবু ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'সেদিন সকালে গীতার একটা শ্লোক আওড়াচ্ছিলাম, ও ব্যাটা আমার ভুল ধরে দিলে। ভুল যদি হয়েই থাকে, সেটা সংশোধন করা কি চাকরের কাজ ? ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি ? ইচ্ছা করছিল ওর গালে একটা থাপ্পড় মেরে দিই, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম।'

'ওই থাপ্পড়টা কখনো মারবেন না কাকা—ওতে ফল খুব গুরুতর হতে পারে। ওর ওপর হাত তোলা একেবারে বারণ। আপনি তার চেয়ে বরং ও কাছাকাছি থাকলে গীতা-টিতা আওড়াবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় একেবারে চুপ থাকলে।'

নিবারণবাবু গজগজ করতে লাগলেন।

এদিকে নিকুঞ্জবাবুর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। অনুকূলের জন্য মাসে দু'

হাজার করে দিতে এখন ওঁর বেশ কষ্টই হচ্ছে। একদিন অনুকূলকে ডেকে কথাটা বলেই ফেললেন।

'অনুকূল, আমার ব্যবসায় বড় মন্দা চলেছে।'

'সে আমি জানি।'

'তা তো জানো, কিন্তু তোমাকে আমি আর কদ্দিন রাখতে পারব জানি না। অথচ তোমার উপর আমার একটা মায়া পড়ে গেছে।'

'আমাকে একটু ভাবতে দিন এই নিয়ে।'

'কী নিয়ে ?'

'আপনার অবস্থার যদি কিছু উন্নতি করা যায়।'

'সে কি তুমি ভেবে কিছু করতে পারবে ? ব্যবসাটা তো আর তোমার লাইনের ব্যাপার নয়।'

'তবু দেখি না ভেবে কিছু করা যায় কি না।'

'তা দেখ। কিন্তু সেরকম বুঝলে তোমাকে আবার ফেরত দিয়ে আসতে হবে। এই কথাটা তোমাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখলাম।'

'যে আজ্ঞে।'

দু' মাস কেটে গেল। আজ আষাঢ় মাসের রবিবার। নিকুঞ্জবাবু বুঝতে পারছেন, টেনেটুনে আর দুটো মাস তিনি অনুকূলের ভাড়া দিতে পারবেন। তারপর তাঁকে মানুষ চাকরের খোঁজ করতে হবে। সত্যি বলতে কি, খোঁজ তিনি এখনই আরম্ভ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভালো লাগছে না। তার উপর আবার সকাল থেকে বৃষ্টি, তাই মেজাজ আরো খারাপ।

খবরের কাগজটা পাশে রেখে অনুকূলকে ডাকতে যাবেন এক পেয়ালা চায়ের জন্য, এমন সময় অনুকূল নিজেই এসে হাজির।

'কী অনুকূল, কী ব্যাপার ?'

'আজ্ঞে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।'

'কী হল ?'

'নিবারণবাবু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা বর্ষার গান করছিলেন, এমন সময় কথার ভুল করে ফেলেন। আমি ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলাম, বাধ্য হয়ে ওঁকে সংশোধন করতে হয়। তাতে উনি আমার উপর খেপে গিয়ে আমাকে একটা চড় মারেন। ফলে আমাকে প্রতিশোধ নিতে হয়।'

'প্রতিশোধ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা হাই-ভোল্টেজ শক্ ওঁকে দিতে হয় ওঁর নাভিতে।'

'তার মানে— ?'

'উনি আর বেঁচে নেই। অবিশ্যি যেই সময় আমি শক্‌টা দিই, সেই সময়

কাছেই একটা জোরে বাজ পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম।'

'কাজেই মৃত্যুর আসল কারণটা কী, সেটা আপনার বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু—'

'আপনি চিন্তা করবেন না। এতে আপনার মঙ্গলই হবে।'

আর হলও তাই। এই ঘটনার দু'দিন পরেই উকিল ভাস্কর বোস নিকুঞ্জবাবুকে ফোন করে জানালেন যে, নিবারণবাবু তাঁর সম্পত্তি উইল করে রেখে গিয়েছেন তাঁর ভাইপোর নামে। সম্পত্তির পরিমাণ হল সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা।

গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্ট্রেট

সুখময় সেনের বয়স পঁয়ত্রিশ। এই বয়সেই সে চিত্রকর হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। পোর্ট্রেটেই তার দক্ষতা বেশি। সমঝদারেরা বলে সুখময় সেনের আঁকা কোনো মানুষের প্রতিকৃতি দেখলে সেই মানুষের জ্যান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বহু প্রদর্শনীতে তার আঁকা পোর্ট্রেট দেখানো হয়েছে, শিল্প সমালোচকেরা তার প্রশংসা করেছে।

কিন্তু শিল্পীরা সবসময় এক পথে চলতে ভালোবাসে না। সুখময়ও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি তার মনে হয়েছে—পোর্ট্রেট তো অনেক হল, এবার একটু অন্য ধরনের কিছু আঁকলে কেমন হয়। এই অন্য ধরনটা সুখময়ের ক্ষেত্রে হল ল্যান্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার উদ্দেশ্যেই সুখময় হাজির হয়েছে শিলং শহরে।

সুখময় এখনো বিয়ে করেনি, তার বাপ মা দুজনেই জীবিত। দুটি বোন আছে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সুখময় শিলং-এ একাই এসেছে, কারণ শিল্পীর একাকিত্বের প্রয়োজনীয়তা সে প্রবলভাবে অনুভব করে। যখন সে ছবি আঁকে তার পাশে কেউ উপস্থিত থাকলে সেটা সে মোটেই পছন্দ করে না। অবিশ্যি পোর্ট্রেট আঁকা হলে যার ছবি আঁকা হচ্ছে তাকে থাকতেই হয়, কিন্তু আর কেউ নয়। সব শিল্পীর মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়, কিন্তু সুখময়ের মধ্যে এর মাত্রাটা একটু বেশি।

তাই শিলং-এ এসে সেখানকার বিখ্যাত লেকের ছবি সে যখন আঁকছিল ঘাসের উপর ইজেল রেখে, তখন একটি দ্বিতীয় প্রাণীর আবির্ভাবে সে মোটেই সন্তুষ্ট হল না।

'বাঃ, আপনার আঁকার হাত তো খাশা মশাই!' হল আগন্তুকের প্রথম মন্তব্য।

এর কোনো উত্তর হয় না, তাই সুখময় স্মিতহাস্য করে তার তুলি চালিয়ে চলল।

'আমি চিত্রকরদের খুব উঁচুতে স্থান দিই', বললেন আগন্তুক। 'একজিবিশনে যাই সুযোগ পেলেই। আপনার কি কখনো কোনো প্রদর্শনী হয়েছে?'

এটা একটা প্রশ্ন, কাজেই এর উত্তর দিতে হয়। সুখময় সংক্ষিপ্ততম উত্তরটি বেছে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

সুখময় নাম বলল।

আগন্তুকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'বলেন কি মশাই! আপনার নাম তো আমার বিলক্ষণ জানা। আমি যতদূর জানি আপনি তো ল্যান্ডস্কেপ আঁকেন না। আপনার ছবির প্রদর্শনীতে আমি গিয়েছি। সেগুলো সবই পোর্ট্রেট। আপনি হঠাৎ সাবজেক্ট চেঞ্জ করলেন কেন?'

'স্বাদ বদলের জন্য।' বলল সুখময়। এ ভদ্রলোক তার পাশ সহজে ছাড়বেন বলে মনে হয় না। সুখময় অভদ্রতা এড়ানোর জন্য বাধ্য হয়েই প্রশ্নটা করল।

'আপনি কি শিলং-এই থাকেন?'

'আজ্ঞে না। আমার এক শালা থাকে লাবানে, আমি তার বাড়িতে দিন দশেকের জন্য এসে উঠেছি। আমার নাম গণেশ মুৎসুদ্দি। কলকাতায় থাকি; একটা ইনশিওরেন্স কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

সুখময় যে এতক্ষণ এই ভদ্রলোককে বরদাস্ত করেছে তার একটা কারণ হল এই যে ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, কণ্ঠস্বরও ভালো, নাক চোখা, চাহনি বুদ্ধিদীপ্ত। এই রকম চেহারা দেখলে আপনা থেকেই সুখময়ের পোর্ট্রেট করার ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

'তা আপনি কি মানুষের ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন?' গণেশ মুৎসুদ্দি প্রশ্ন করলেন।

'পোর্ট্রেট তো অনেক হল,' বলল সুখময়, 'তাই এবার ল্যান্ডস্কেপের দিকে ঝুঁকেছি।'

'আপনি আমার একটা ছবি এঁকে দেবেন?'

সুখময় রীতিমতো বিস্মিত। এ ধরনের প্রস্তাব ভদ্রলোকের কাছ থেকে সে আশা করেনি। গণেশ মুৎসুদ্দি ঘাসের উপর বসে পড়ে বললেন, 'আমি একটা অভিনব অফার দিচ্ছি আপনাকে। আপনি পোর্ট্রেট আঁকবেন, তবে সাধারণ পোর্ট্রেট নয়।'

'কী রকম?'

সুখময়ের মনে এখন বিরক্তির জায়গায় কৌতূহল দেখা দিয়েছে। তাব

হাতের তুলি হাতেই রয়ে গেছে ; সে তুলি আর কাজ করছে না।

গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'আমার প্রস্তাবটা শুনুন, তারপর আপনার যা বলার বলুন। আমার মনে হয় এটা আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন না।'

সুখময় এখনও কোনো আন্দাজ করতে পারছেন না ভদ্রলোক কী বলতে চান। ভদ্রলোকও একটু সময় নিয়ে তাঁর প্রস্তাবটা দিলেন।

'ব্যাপারটা হল এই—আপনি আমার একটা ছবি আঁকুন, কিন্তু সেটা হবে এখনকার চেহারা নয়। আজ থেকে ঠিক পঁচিশ বছর পরে আমার যে চেহারা হবে সেইটে আপনার অনুমান করে আঁকতে হবে। আজ হল ১৫ই অক্টোবর ১৯৭০। আপনার ছবিটা আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে আপনার কাছ থেকে কিনে নেব। তারপর আজ থেকে পঁচিশ বছর পরে—অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর ১৯৯৫—আমি আবার ছবিটি নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আমার কথার নড়চড় হবে না। যদি দেখা যায় যে আপনার অনুমান ঠিক হয়েছে এবং ছবির সঙ্গে আমার তখনকার চেহারা মিলে গেছে, তাহলে আমি আপনাকে আরো কিছু টাকা পুরস্কার দেব। রাজি ?'

প্রস্তাব যে অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। এমন প্রস্তাব কোনো ব্যক্তি কোনো শিল্পীকে করেছে বলে সুখময়ের জানা নেই। সুখময় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিতে পারল না। এটা একটা চ্যালেঞ্জই বটে। একজন লোকের আজকের চেহারা পঁচিশ বছরে কী রূপ নেবে সেটা অনুমান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ; কিন্তু তাও সুখময় একটা আকর্ষণ অনুভব করল। সে বলল, 'ছবি না হয় আমি আঁকলাম, কিন্তু পঁচিশ বছর পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হবে কী করে ?'

'আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'আপনার এখনকার ঠিকানা আপনি আমাকে দিন, আমিও আমার ঠিকানা দিচ্ছি। যার ঠিকানা বদল হবে সে অন্যকে জানাবে। এই ব্যাপারে যেন অন্যথা না হয়, নইলে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ভাবে ঠিক পঁচিশ বছর পর আপনার পোর্ট্রেটটি সঙ্গে নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব। যদি চেহারা মেলে তাহলে আপনি আরো পাঁচ হাজার পাবেন ! না হলে অবশ্য টাকার আর কোনো প্রশ্ন উঠছে না ; কিন্তু এটাও বুঝুন যে আপনার কোনো লোকসান হচ্ছে না, কারণ আপনার পারিশ্রমিক আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি।'

সুখময় একটু ভেবে বলল, 'আমি রাজি আছি। শিলং-এই কাজটা হবে তো ?'

'তা তো হতেই পারে। আমি এখানে আরো দশদিন আছি, তার মধ্যে আপনার পোর্ট্রেট হয়ে যাবে না ?'

'পোর্ট্রেট করতে দিন পাঁচেকের বেশি লাগবে না। আমি আরো সাতদিন

আছি। কালই শুরু করা যাবে তো!'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু এমন উদ্ভট প্ল্যান আপনার মাথায় এল কী করে?'

'আমি মানুষটাই একটু রগুড়ে আর খামখেয়ালি। আমাকে যারা চেনে তারা আমার এদিকটা জানে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি তাই আপনার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে।'

'আপনার বয়স এখন কত?'

'সাঁইত্রিশ। পঁচিশ বছর পরে আমার বয়স হবে বাষট্টি। আপনি তো বোধহয় আমার চেয়ে ছোট?'

'আমার বয়স পঁয়ত্রিশ,' বলল সুখময়। 'আশা করি আমরা দুজনই আরো পঁচিশ বছর জীবিত থাকব।'

'সেটা কি জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে?'

'আমার মন তাই বলছে। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

'তাহলে কাল থেকেই কাজ শুরু।'

'হ্যাঁ। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি আপনার বাড়িতে আসতে পারি।'

'আঁকার সরঞ্জাম—রং, তুলি, ক্যানভাস, ইজেল—সেখানে পাওয়া যাবে! আমি থাকি লাইমখ্‌রা—বাংলো বাড়ি, নাম "কিসমৎ"। এখানে সকলেই ওটাকে স্মিথ সাহেবের বাংলো বলে।'

গণেশ মুৎসুদ্দির আজ থেকে পঁচিশ বছর পরের পোর্ট্রেট আঁকতে সুখময় সেনের লাগল পাঁচ দিন। ছবিটা এঁকে সুখময় বুঝেছে যে এমন চিত্তাকর্ষক কাজ সে কোনোদিন করেনি। অন্য পোর্ট্রেট আঁকতে শুধু পর্যবেক্ষণেরই প্রয়োজন হয়, এ ক্ষেত্রে একটা দূরদৃষ্টি সুখময়ের সব সময়ই প্রয়োগ করতে হচ্ছিল যেটা এর আগে কখনই প্রয়োজন হয়নি। গণেশ মুৎসুদ্দির মাথা ভর্তি চুল, কিন্তু সুখময় লক্ষ করেছে যে সে চুলের জাত পাতলা। তাই পঁচিশ বছর পরে তার মাথায় একটা বিস্তীর্ণ টাক দিয়েছে সুখময়। তাছাড়া সুখময়ের মন বলেছে এ ব্যক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোটা হবে না, রোগাই থাকবে। তাই ছবিতে মুখের ভাবটা শীর্ণ করেছে। গাল বসা, চোখের কোণে বলিরেখা, কানের পাশে চুলে পাক, থুৎনির নীচে ঈষৎ লোল চর্ম—এই সবই সুখময় এঁকেছে। তাছাড়া ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দিয়েছে। কারণ তার মন বলেছে গণেশ মুৎসুদ্দির জীবনটা মোটামুটি সুখের হবে।

ছবি দেখে গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, "বাঃ, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুটা আমার বাবার এখনকার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আর মনে হয় আমাকে মেক-আপ দিলেও এই চেহারা দাঁড় করানো যায়। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আবার পঁচিশ বছর পরে দেখা হবে, আপাতত আপনার পারিশ্রমিকটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

শিলং লেকের ছবি শেষ করার জন্য সুখময়কে আরো কদিন থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এ কদিনে আর গণেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে দেখা হয়নি। লোকটা যে ভারী অদ্ভুত এ চিন্তা সুখময়ের মনে অনেকবার উদয় হয়েছে। পঁচিশ বছর পরে কি সে সত্যিই আবার আসবে ? সেটা বলার কোনো উপায় নেই। এই পঁচিশ বছরে কত কী ঘটতে পারে এটা ভেবে সুখময়ের মাথা ভোঁ ভোঁ করে উঠল।

সুখময় সেন পোর্ট্রেট এঁকে যেমন নাম করেছিল, ল্যান্ডস্কেপ এঁকে তেমন করেনি। সমালোচকের মন্তব্য তাকে পীড়া দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার কিছুটা সে না মেনেও পারেনি। দৈনিক বার্তা কাগজের চিত্রসমালোচক অম্বুজ সান্যাল সুখময় সেন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনায় অনুযোগ করলেন যে প্রাচীন পথ ধরে চলাই হচ্ছে সুখময়ের উদ্দেশ্য। অথচ তার তুলির জোর আছে। রঙের উপর দখল আছে, টেকনিকে সে দক্ষ ; তাহলে সে পুরনো পথ ছেড়ে আজকের রীতি অবলম্বন করবে না কেন ? আর্ট তো চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না ; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রীতিনীতি পরিবর্তন হয়। সুখময়কে মডার্ন হতেই হবে। নইলে তার কাজে অবসাদের ছায়া আসতে বাধ্য।

১৯৭৫-এর মে মাসের প্রদর্শনীতে সুখময়ের নতুন ঢং-এর কাজের নমুনা দেখা গেল। দু'একজন সমালোচক প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু ছবি বিক্রী হল না। অথচ সুখময় পেশাদারী চিত্রকর, ছবি এঁকেই তাকে পেট চালাতে হয়।

এদিকে গোলমাল যা হবার তা হয়ে গেছে। মডার্ন আর্ট করতে গিয়েই সুখময়ের কাল হল। জীবনে সে প্রথম টের পেল অর্থাভাব কাকে বলে। নবীন নস্কর লেনে তার ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘরে সে বাস করে। তার সঙ্গে এতদিন ছিলেন তার মা ও বাবা। ১৯৮০-র ডিসেম্বরে সুখময়ের বাপের মৃত্যু হল। মার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সুখময় বিয়ে করেনি। ভাগ্যিস !—কারণ ১৯৭০-এর সুখময় আর ১৯৮০-র সুখময়ে অনেক পার্থক্য। শিল্পী হিসাবে তার যে আত্মপ্রত্যয় ছিল সেটা সে হারিয়েছে। মডার্ন আর্ট সে এখনও করছে এবং স্বল্পমূল্যে কয়েকটা বিক্রীও হয়, কিন্তু তাতে সংসার চলে না।

১৯৮৫-তে সুখময়কে মাঝে মাঝে ফিল্মের বিজ্ঞাপন আঁকতে শুরু করতে হল। তেলরঙে আঁকা বিরাট বিজ্ঞাপন রাস্তায় টাঙানো হবে ; কে সে ছবি এঁকেছে তা কেউ জানতে চাইবে না। অত্যন্ত হীন জীবিকা, কিন্তু এছাড়া গতি নেই। ফ্ল্যাটের তিনটে ঘরের একটা ভাড়া হয়ে গেল। তাতে এক জ্যোতিষী এসে উঠলেন, নাম ভবেশ ভট্টাচার্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল সুখময়ের।

সুখময়ের ভবিষ্যৎ গণনা করে কিন্তু জ্যোতিষী মশাই কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না।

১৯৮৬-র কোনো একটা সময়ে জীবন সংগ্রামের চাপে পড়ে সুখময়ের স্মৃতি থেকে শিলং-এর ঘটনাটা বেমালুম লোপ পেয়ে গেল। এই স্মৃতি লোপ পাওয়ার ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত ; কখন যে সেটা ঘটে তা কেউ বলতে পারে না।

১৯৮৬-তে সুখময়ের মা মারা গেলেন। এখন সুখময় একেবারে একা। তার সুদিনে তার যে কিছু বন্ধু জুটেছিল—প্রণব, সাত্যকি, অরুণ—এরা সকলেই সুখময়ের দুর্দিনে সরে পড়েছে। সুখময়ের বয়স এখন বাহান্ন। এই বয়সেই রাত্তিরের টিমটিমে আলোতে সাইনবোর্ড এঁকে এঁকে তার চোখে ছানির উপক্রম দেখা দিয়েছে। অথচ বাড়িওয়ালার তাগাদা এড়াতে তাকে ক্রমাগত কাজ করে যেতেই হচ্ছে। বাড়িওয়ালা আগে যিনি ছিলেন তিনি মোটামুটি ভদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি মরে গিয়ে তাঁর বড় ছেলে এখন তাঁর স্থান অধিকার করেছেন। ইনি পয়লা নম্বর চামার ; এঁর মুখে কিছু আটকায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে গালিগালাজও সুখময়ের গা সওয়া হয়ে গেছে !

সময় কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। দেখতে দেখতে ১৯৯৫ সাল এসে পড়ল। সুখময়ের এখন আর একটি কাঁচা চুলও অবশিষ্ট নেই।

অক্টোবরের পনেরই—সেদিন বিজয়া দশমী—সুখময়ের ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। সুখময় দরজা খুলে দেখল—একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মাথায় ঢেউ খেলানো পাকা চুল আর নাকের নিচে একটি জাঁদরেল গোঁফ। ভদ্রলোকের হাতে একটি বেশ বড় চতুষ্কোণ খবরের কাগজের মোড়ক, দেখলে মনে হয় হয়তো ছবি আছে। সুখময় ভদ্রলোককে দেখে সন্তুষ্ট হল না। এখন তার অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলার মেজাজ নেই। বাড়ি ভাড়া সাত মাসের বাকি পড়েছে, বাড়িওয়ালা শাসিয়ে গেছেন এবারে মিটিয়ে না দিলে তিনি জোর করে তাকে ঘর ছাড়া করবেন। গুণ্ডার সাহায্যে সবই সম্ভব।

আগন্তুকের মুখে কিন্তু হাসি। ঘরের ভিতরে ঢুকে বললেন, ' ভুলে গেছেন বুঝি ?'

সুখময় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজ কী তারিখ ?'

'পনেরই অক্টোবর।'

'কী সন ?'

'১৯৯৫।'

'তাও কিছু মনে পড়ছে না ? শিলং-এর সেই ঘটনা বেমালুম ভুলে গেলেন ?'

প্রশ্নটা করতেই—আর হয়তো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর শুনেই—সুখময়ের মনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক ঝলকে তার সব কথা মনে পড়ে গেল—কেবল ভদ্রলোকের নামটা ছাড়া।

'মনে পড়েছে', বলে উঠল সুখময়। 'আপনার একটা পোর্ট্রেট করেছিলাম আমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু আমি তো হেরে গেলাম। আপনার মাথা ভর্তি চুল, আপনার গোঁফ, আপনার ঝুলপি এসব তো কিছুই আমি আঁকিনি।'

'আমার চেহারা দেখে কারুর কথা মনে পড়ছে ?

এটা সত্যি কথা বটে। ভদ্রলোককে দেখেই সুখময়ের কেমন যেন চেনা লেগেছিল।

'আপনি বাংলা ফিল্ম দেখেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'তা দেখি না, তবে বাংলা ছবির বিজ্ঞাপন আঁকি।'

'মণীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটা চেনা লাগছে কি ?'

ঠিক কথা। এই মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় নামকরা চলচ্চিত্র অভিনেতা। বয়স হয়েছে, নায়কের অভিনয় করেন না, তবে জাঁদরেল চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। সুখময় বলল, 'এবার চিনেছি। আপনি ক্যারেকটার রোল করেন। খুব জনপ্রিয় অভিনেতা। আমি ফিল্মের বিজ্ঞাপনে আপনার ছবি এঁকেছি।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সেটা হল আমার আজকের পরিচয়। মণীশ গঙ্গোপাধ্যায় আমার আসল নাম নয়। আমার আসল নামে আপনি আমাকে চিনতেন পঁচিশ বছর আগে। সে নাম হল গণেশ মুৎসুদ্দি।'

'ঠিক কথা,' বলল সুখময়। 'আমি আপনার একটি পোর্ট্রেট করি—পঁচিশ বছর পরে আপনার যে চেহারা হবে সেটা অনুমান করে। সে ছবির কথা আমার এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। কিন্তু সে চেহারার সঙ্গে আপনার আজকের চেহারার কোনো মিল নেই। কাজেই আমি কৃতকার্য হইনি। হলে আপনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু সে টাকাও আমি দাবি করতে পারি না। কাজেই—'

'দাঁড়ান, আপনাকে সে ছবিটা দেখাই', বলে ভদ্রলোক মোড়ক খুলে ছবিটা টেবিলের উপর দাঁড় করালেন। তারপর বললেন, 'ভুলবেন না আমি অভিনেতা। এবার দেখুন আমার দিকে।'

সুখময় ভদ্রলোকের দিকে চাইল। ভদ্রলোক এক টানে তার গোঁফ আর মাথার চুল খুলে ফেললেন। সুখময় অবাক হয়ে দেখল তার সামনে হুবহু তার পোর্ট্রেটের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গণেশ মুৎসুদ্দি।

'এটাই আমার আসল চেহারা,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি। 'এই চেহারা আপনি অদ্ভুত ক্ষমতাবলে পঁচিশ বছর আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আমি তখন ছিলাম ইনশিওরেন্স কোম্পানির চাকুরে। কিন্তু অভিনয়ের শখ আমার তরুণ বয়স থেকেই। একবার এক বন্ধু পরিচালকের অনুরোধে পড়ে একটা বাংলা ছবিতে অভিনয় করি। প্রচুর সুনাম হয়। সেই থেকেই আমি অভিনেতা। নামটা বদলে নিই প্রথমেই। অর্থাৎ সবটাই আমার মুখোশ। টাক পড়ে যাচ্ছিল দেখে ফিল্মে পরচুলা ব্যবহার করতে শুরু করি। একটা গোঁফও নিই সেই সঙ্গে। আমার এই চেহারাটাই দর্শক পছন্দ করে। কিন্তু আমার আসল চেহারা হল এই ছবির চেহারা। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম চেহারা মিললে পুরস্কার দেব। এই নিন সেই পুরস্কার।'

সুখময় দেখল যে তার হাতে চলে এসেছে একটি কুড়ি হাজার টাকার চেক। এবার গণেশ মুৎসুদ্দি বললেন, 'শুনুন, আমি অভিনয় করি বলে যে আর্টের প্রদর্শনীতে যাই না তা নয়। আপনার এ মতিভ্রম হল কেন? আপনার পোর্ট্রেটে এত সুন্দর হাত—আপনি সেই ছেড়ে অন্য লাইনে গেলেন কেন?'

সুখময় আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

'আমি আপনাকে বলছি,' বললেন গণেশ মুৎসুদ্দি, 'আপনি সমালোচকের কথা ভুলে যান। আপনি আবার পোর্ট্রেট আঁকতে শুরু করুন। আমার ধারণা আপনার হাত এখনো নষ্ট হয়নি।'

গণেশ মুৎসুদ্দি ছবিটা আবার মোড়কে পুরে নিয়ে বললেন, 'আমি তাহলে আসি। আমার অ্যাডভাইসটা অগ্রাহ্য করবেন না।'

সুখময় করেনি অগ্রাহ্য, এবং তাতে আশ্চর্য ফল পেয়েছিল। ১৯৯৫-এর ডিসেম্বরে তাব আঁকা পোর্ট্রেটের প্রদর্শনীতে নতুন করে তার দক্ষতার সুখ্যাতি হল। আর সেই সঙ্গে ছবি বিক্রীও হল ভালো।

শেঠ গঙ্গারামের ধনদৌলত

'আমার এখন যে চেহারা দেখছিস', বললেন তারিণীখুড়ো, 'তা থেকে আমার ইয়াং বয়সের চেহারা তোরা কল্পনাই করতে পারবি না।'

'কীরকম চেহারা ছিল আপনার, খুড়ো ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা, 'ধর্মেন্দরের মতো ?'

'য্যা য্যাঃ !' বললেন খুড়ো, 'ওরকম নাসপাতিমার্কা চেহারা নয়। টক্‌টকে রং, ব্যায়াম করা পাকানো শরীর, জামা খুললে প্রত্যেকটি মাস্‌ল আঙুল দিয়ে দেখানো যায়—অ্যানাটমির চার্টের দরকার হয় না।—আর ফিল্ম স্টারের কথা কী বলছিস ? কত অফার পেয়েছে জানিস খুড়ো হিরো হবার জন্যে ?'

'ইস্—আর আপনি নিলেন না ?' বলল ন্যাপলা। 'অবিশ্যি তখন তো বোধহয় সাইলেন্ট ছবি, তাই না ?'

'কে বললে সাইলেন্ট ? আমি বলছি স্বাধীনতার কয়েক বছর আগের কথা। সাইলেন্ট ছবি তো ফুরিয়ে গেছে ত্রিশ সনের কিছু পরেই।'

'আপনি রিফিউজ করলেন ?'

'আলবৎ ! একবার একটা ছবিতে করতে হয়েছিল, তবে সেটা অন্য গল্প, আরেকদিন বলব। আসলে ফিল্মের হিরো হবার শখ আমার ছিল না। আমি চেয়েছিলাম আমার গোটা জীবনটাই হবে একটা সিনেমার গপ্‌পো। একটা খাঁটি নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চার। অথবা বলতে পারিস একটা সিরিজ অফ অ্যাডভেঞ্চার্স। রং মেখে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াব, ডিরেক্টরমশাই ডুগডুগি বাজাবেন, আর আমি নাচব—এ-শর্মা সে-শর্মা নয়।'

'আজ কোন্ অ্যাডভেঞ্চারের বিষয় বলবেন, মিস্টার শর্মা ?' জিজ্ঞেস করল ন্যাপলা। খুড়োকে এ ধরনের কথা বলার সাহস একমাত্র ন্যাপলারই আছে, তবে সেটা খুড়ো বিশেষ মাইন্ড করেন বলে মনে হয় না। বাইরে একটা খিটখিটে ভাব

দেখালেও আসলে ওঁর মনটা নরম একটা জানতাম। বেনেটোলা থেকে বালিগঞ্জে আসেন যে শুধু আমাদের গল্প শোনাবার জন্যই এটা তো মিথ্যে নয়।

দুধ-চিনি ছাড়া চায়ে পর পর দুটো চুমুক দিয়ে খুড়ো বললেন, 'নাইনটিন ফর্টি-ফোরে আজমীর। তখন আমার বয়স আটাশ।'

আমরা পাঁচজন—আমি, ভুলু, চটপটি, সুনন্দ আর ন্যাপলা—গল্পের জন্য রেডি হয়ে বসলাম। চা শেষ করে একটা একসপোর্ট কোয়ালিটি বিড়ি ধরিয়ে খুড়ো আরম্ভ করলেন।

আগ্রায় একটা ব্যাঙ্কের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল ধরণীকাকার কথা। আমার বাবার মাস্‌তুতো ভাই। তিনি জয়পুরে হোমিওপ্যাথি করে বেশ পসার জমিয়ে বসেছেন। রাজস্থানটা দেখা হয়নি, অথচ ছেলেবেলা থেকেই ও-দেশটার উপর একটা আকর্ষণ রয়েছে। মনে হয় ভারতবর্ষে ওটাই হল সত্যিকারের রোম্যান্স ও অ্যাডভেঞ্চারের ঘাঁটি। চলে গেলুম কাকার কাছে।

আমি বেকার জেনে কাকার ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'তোর মতো একজন জোয়ান ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আজমীর যাবি?' বললুম, 'কী আছে সেখানে?' কাকা বললেন, 'শেঠ গঙ্গারাম আমার পেশেন্ট। পেটের আলসারে ভুগত, আমার ওষুধে চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। তার একজন ইংরিজি জানা সেক্রেটারি দরকার। তোর তো ইংরিজিতে অনার্স ছিল। যদি চাস তো তোকে রেকমেন্ড করে দিতে পারি।'

কখন কী কাজে দরকার পড়ে, তাই টাইপিংটা আগেই শেখা ছিল। কাজেই সেক্রেটারির চাকরির পক্ষে আমি অনুপযুক্ত নই। তবু লোকটার সম্বন্ধে একটু ডিটেল জানা দরকার বলে প্রশ্ন করলুম, 'কী করেন গঙ্গারাম?' গঙ্গারাম বললেই উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে ঘায়েল হয়ে থামল শেষে—মনে পড়ে যায়।

কাকা বললেন, 'গঙ্গারাম মস্ত ধনী। হীরে জহরতের কারবার। বিদেশে করেসপন্ডেন্স চালাতে হয়। যে সেক্রেটারি ছিল সে নাকি বিয়ে করার নাম করে সেই যে গেছে আর আসেনি।'

'বস্‌ হিসেবে গঙ্গারাম কি—?'

'কোনো গোলমাল নেই। তবে ওর একটা ছেলে আছে বছর বারো বয়স, সে নাকি একটি মূর্তিমান বিচ্ছু। সে যদি কিছু করে থাকে।'

আমি বললাম, 'কুছ পরোয়া নেহী। যে ছেলের এখনো গোঁফ গজাবার বয়স হয়নি তাকে আবার ভয় কিসের? ও আমি সামলে নেব।'

'তাহলে আর কী, লেগে পড়। আমি গঙ্গারামকে লিখে দিচ্ছি। আমার

রিকোয়েস্ট ও ঠেলতে পারবে না।'

কাকার এক চিঠিতেই গঙ্গারাম রাজি। লিখলেন, 'সেন্ড ইওর নেফিউ ইমিডিয়েটলি।' একবার অম্বর প্যালেসটায় ঢুঁ মেরে জয়পুর থেকে চলে গেলাম মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান আজমীরে। আকবর একটা প্রাসাদ বানিয়েছিলেন এই শহরে। আজমীর থেকে সাত মাইল পশ্চিমে হিন্দুদের তীর্থস্থান পুষ্কর। সব মিলিয়ে যাকে বলে ঐতিহ্যে মহীয়ান।

প্রথম রাতটায় থাকলাম সার্কিট হাউসে। কাকাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আনাসাগর নামে বিরাট লেকের ধারে এমন সার্কিট হাউস ভারতবর্ষে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে যে দৃশ্য দেখলুম তা জীবনে ভুলব না। হাজার হাঁস চলে বেড়াচ্ছে লেকে, পশ্চিমে তারাগড় পাহাড়, তার পিছনে টেকনিকালার ছবির মতো সানসেট হচ্ছে।

শেঠ গঙ্গারামের গদি এবং বাসস্থান শহরের মধ্যিখানে হলেও, বাড়ির ভেতরে একবার ঢুকে পড়লে সেটা আর বোঝার জো থাকে না। সাতাশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। আর সেটাকে ঘিরে দুর্গের মতো পাঁচিল। আড়াই শো বছরের সোনাদানার ব্যবসা। ঘরে কত যে মহামূল্য রত্ন আর গয়নাগাটি আছে তার হিসেব নেই। সেই জন্যেই এই পাঁচিলের ব্যবস্থা—যদিও তাতেও যে ষোল আনা সেফ্‌টি হয় না সেটা পরে বুঝেছিলাম, তবে সে কথা যথাস্থানে প্রকাশ্য।

গঙ্গারামের সঙ্গে সকালে গদিতে দেখা করলুম। ভদ্রলোকের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, ঘি খাওয়া নধর পরিপুষ্ট চেহারা, একবার বসে পড়লে উঠতে গেলে পাশের লোককে হাত ধরে হেল্‌প করতে হয়। আমায় দেখে প্রশ্ন হল, 'আর ইউ এ বেঙ্গলী ?'

এ প্রশ্নের অবশ্যি একটা কারণ আছে। সেটা এখানে বলি।

আগ্রায় থাকতে একদিন ব্যাঙ্কে এক খদ্দের আসে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনিতেই ভালো, তার উপর এক জোড়া তাগড়াই গোঁফ তাতে এমন এক পার্সোন্যালিটি এনে দিয়েছে যে দেখেই ডিসাইড করলুম ও জিনিস আমারও চাই।

আড়াই মাস লেগেছিল গোঁফের ওই শেপ নিতে। মাঝখানটা ভরাট আর পুরু, আর দুটো পাশ যেন দুটো হাতির শুঁড় সেলাম ঠুকছে। কলকাতার বাঙালীদের মধ্যে থেকে গোঁফ জিনিসটা তখন প্রায় উঠে গেছে, কিন্তু পশ্চিমে অনেকেই ওটার খুব তোয়াজ করে। আর রাজস্থানে তো কথাই নেই।

শেঠজীকে বললুম যে আমি বঙ্গসন্তানই বটে—গোঁফটা নেহাৎ শখের ব্যাপার।

ইংরিজিটা তো মোটামুটি বলতেই পারতুম, দু-বছর আগ্রায় থেকে হিন্দীটাও

সড়গড় হয়ে গেস্‌ল। তার উপর আদব কায়দাগুলো রপ্ত, স্বাস্থ্য ভালো, সব মিলিয়ে গঙ্গারাম খুশিই হলেন। বললেন, 'আমার বাড়িতেই তুমি থাকবে। সকালে বিকেলে আমার কাজ করবে, দুপুরটা আমি ঘুমোই, আর সন্ধেটা তুমি আমার ছেলের টিউশনি করবে। ছেলে চালাক, তবে পড়াশুনোয় মন নেই, ভারী দুরন্ত, সঙ্গদোষে নষ্ট না হয় সেটা তোমাকে দেখতে হবে। উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি তোমাকে দেব। তবে একটা কথা—আমরা নিরামিষ খাই। মাছ, মাংস খেতে চাইলে তোমাকে বাইরে গিয়ে খেতে হবে। অবিশ্যি শাক-সবজি ফলমূল দুধ-মিষ্টিতে যদি তোমার অরুচি না হয় তাহলে বাইরে যাবার কোনো দরকার হবে বলে মনে করি না।'

নিরামিষ শুনে গোড়ায় মনটা দমে গেস্‌ল, কিন্তু শেঠজীর বাড়ির নিরামিষ রান্না এমনই সুস্বাদু, আর বাড়ির গরুর খাঁটি দুধের মালাই-বালাইয়ের এমনই কোয়ালিটি যে মাছ-মাংসের অভাব মিটিয়ে দিয়েছিল।

গঙ্গারামের সবসুদ্ধ সাত ছেলে। তার মধ্যে দুটি অল্প বয়সেই মারা গেছে, দুটি আর্মিতে, দুটি বাপের ব্যবসায় যোগ দিয়েছে আর ছোটটি হলেন শ্রীমান মহাবীর বিচ্ছু। আমার সঙ্গে কথা বলে গঙ্গারাম ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে পর 'ইনি তোমার নতুন মাস্টার' বলে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'যাও, এঁকে এঁর ঘর দেখিয়ে দিয়ে এস।'

এমন অস্থির চোখের দৃষ্টি আমি কোনো ছেলের মধ্যে দেখিনি, আর সেই সঙ্গে এমন তীক্ষ্ণ ঝিলিক। সে যে বিচ্ছু তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিও যে বেশ ধারালো সেটা বোঝা যায়।

গদি থেকে বাড়ির ভিতর ঢুকে একটা প্রকাণ্ড উঠোন পেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে আরেকটা উঠোনে পৌঁছলাম। তারই পাশে বারান্দার ধারে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে হাজির করল মহাবীর। বোঝাই যাচ্ছে এটা শিস-মহল জাতীয় একটা কিছু ছিল, কারণ ঘরের সারা দেয়াল আয়নার টুকরো দিয়ে মোড়া।

আমাকে পৌঁছে দিয়েই মহাবীর যে কেন চম্পট দিল সেটা মিনিটখানেকের মধ্যেই বুঝতে পারলুম।

ঘরের মেঝেতে দুটি এবং খাটের ওপর একটি জ্যান্ত বিছে অবস্থান করছে। মেঝের দুটি তেঁতুলে, আর খাটের ওপরেরটি একেবারে খোদ কাঁকড়া বিছে। শেষেরটি আপাতত খাটের মধ্যিখান থেকে বালিশ লক্ষ করে এগুচ্ছে। আমি জানি মেঝের দুটি চেহারাতেই যা ভয়ের উদ্রেক করে, কামড়ে বিষ নেই। তবে বিছানার উপরে যেটি, তার ল্যাজের ডগায় বাঁকানো হুলটির ছোবল একেবারে মারাত্মক।

'বিচ্ছু' বিশেষণের তাৎপর্য যে এই ভাবে প্রথম দিনেই বোঝা যাবে সেটা ভাবিনি।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে 'মহাবীর' বলে একটা হাঁক দিলুম। তাতে উত্তর না পেলেও, ডাকের ফলে উল্টোদিকের বারান্দায় স্বয়ং শ্রীমানের আবির্ভাব হল। হেলতে দুলতে সে এসে দাঁড়াল একটা থামের পাশে। আমি তাকে ডাকলুম।

'ইধার আও।'

বিচ্ছু এগিয়ে উঠোনের মাঝবরাবর এসে আবার থামলো।

'হাত দিয়ে বিচ্ছু তুলতে পার?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

শ্রীমান নিরুত্তর।

'এস। দেখে যাও কী করে তোলে।'

এবার শ্রীমানের কৌতূহল হল। এখানে বলে রাখি আমি নিজেও কোনোদিন হাত দিয়ে কাঁকড়াবিছে তুলিনি। তবে সেটা যে সম্ভব তা জানি, কারণ ছেলেবেলায় গণশা বলে আমাদের একটা চাকর ছিল তাকে এ জিনিস করতে দেখেছি। খপ্ করে ঠিক হুলের তলাটা ধরে তুলে ফেললে হুল ফোটাবার আর মওকা পায় না বিছে।

মহাবীর আমার ঘরের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়াল।

আমি দম টেনে এক বুক সাহস নিয়ে দুগ্গা বলে এক ছোবলে খাটের উপর থেকে বিছেটাকে ল্যাজ ধরে তুললুম। তারপর সেটা দু আঙুলে ঝুলিয়ে মহাবীরের মুখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে বললুম, 'বিছেগুলোকে বাইরে ফেলে আসার জন্য একটা পাত্র নিয়ে এস। আর দেখছই তো—আমার যখন ভয় নেই, তখন আমাকে ভয় দেখিয়ে কোনো মজা নেই।'

মহাবীর এক মিনিটের মধ্যেই একটা কাঁচের বৈয়াম নিয়ে এল। তার ভেতরের দেয়ালে লাড্ডুর গুঁড়ো লেগে রয়েছে। তারই মধ্যে প্রথমে কাঁকড়া বিছেটাকে, তারপরে তেঁতুল বিছে দুটো ফেলে বললুম, 'এগুলোকে বাড়ির পাঁচিলের বাইরে ফেলে এস।'

মহাবীর গেল, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে রিপোর্ট করে গেল যে সে আমার আজ্ঞা পালন করেছে।

তারপর থেকে মনে হত যে প্রাইভেট টিউটরের প্রতি তার যে স্বাভাবিক বিরাগ সেটা মহাবীর কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। কতটা কাটিয়েছে সেটা জানা মুশকিল, কারণ এমনিতে সে অত্যন্ত চাপা। পেটে বোমা মারলেও মনের আসল ভাব সে প্রকাশ করবে না। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত চৌকস, কাজেই লেখাপড়ায় যাতে তার মন বসে সে চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, তাতে সফল হই বা না হই। দুষ্টুমি বন্ধ করার চেষ্টা আমি করিনি, কারণ আমি জানি সেটা মাঠে মারা

যাবে। ত্যাঁদড়ামোর দৌড় যে কতখানি সেটা এক দিনের ঘটনা বললেই বুঝতে পারবে।

গঙ্গারামের বাড়িতে চারটে ঘোড়া, ছটা উট। একদিন সকালে মনিবের চিঠি টাইপ করছি গদিতে বসে, এমন সময় হঠাৎ সমস্বরে অনেকগুলো উটের আর্তনাদ শুনে আঁৎকে উঠলুম। উটের ডাকের মতো অমন বীভৎস ঘড়ঘড়ে ডাক আর কোনো জানোয়ারের নেই।

কৌতূহল হওয়াতে বাইরে বেরিয়ে দেখি—জোড়া জোড়া উট বোধহয় পরস্পরের দিকে পিঠ করে বসেছিল, কোন্ এক ফাঁকে গিয়ে শ্রীমান এর-ওর ল্যাজে গাঁটছড়ার মতো করে বেঁধে দিয়ে এসেছে। বসা উট দাঁড়িয়ে উঠতে ল্যাজে টান পড়ার ফলেই এই বিকট চিৎকার।

গঙ্গারাম এ ব্যাপারে ভয়ংকর আপসেট হয়ে পড়াতে তাকে বুঝিয়ে বললুম যে এ ধরনের দুষ্টুমির বয়সটা মানুষের খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না ; তোমার ছেলের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে ; সে পড়াশুনোয় ভালো হবে এ গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি, তুমি চিন্তা করো না। এত বলার পর বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মহাবীরকে পড়ানোর টাইম ছিল সন্ধ্যা সাতটা থেকে নটা। একতলার পিছন দিকে আমার ঘরের উল্টোদিকে একটা ঘরে বসে পড়াশুনা হত। আমি গিয়ে বসলেই বেয়ারা এক গেলাস সরবত দিয়ে যেত। সেটা যে কিসের সরবত তা কোনো দিন ঠাহর করতে পারিনি, তবে বলতে পারি এমন সুস্বাদু সুগন্ধী সরবত আর কোনোদিন খাইনি। সরবত শেষ হতে না হতেই ছাত্র এসে পড়তো।

একদিন দেখি ছেলে আর আসে না। আমি ঘড়ি দেখছি থেকে থেকে ; বিশ মিনিট হয়ে গেল, পঁচিশ মিনিট, এক ঘণ্টা, তবু সে আসে না। দেরির কী কারণ হতে পারে বুঝতে পারছি না, এমন সময় হঠাৎ শ্রীমান এসে হাজির।

'কী ব্যাপার বল তো ?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে। 'এত দেরি কেন ?'

'তোমায় একটা জিনিস দেখাব তাই', বলল শ্রীমান। 'বাবার নেশা পুরোপুরি না হলে ট্যাঁক থেকে চাবি বার করতে পারছিলাম না।'

সর্বনাশ ! বাবার ট্যাঁক থেকে চাবি ? শেঠজী যে গাঁজা জাতীয় একটা কিছু সেবন করেন সন্ধ্যাবেলা সেটা জানতাম।

'কিসের চাবি ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সিন্দুকের', বলল শ্রীমান বিচ্ছু।

তারপর পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে ঠক করে টেবিলের উপর রাখল। ল্যাম্পের আলোয় সেটার চোখ ধাঁধানো ঝলসানি আমায় থমকে দিল।

জিনিসটা একটা সোনার লকেট। সাইজে ক্যারামের স্ট্রাইকারের মতো। মাঝখানে একটা আধুলি-প্রমাণ সবুজ মণি, নির্ঘাৎ মরকত বা পান্না,—তাকে ঘিরে

আছে হীরের বলয়, আর তাকে আবার ঘিরে আছে সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্যের মধ্যে বসানো চুনি আর পান্না।

'জাহাঙ্গীর বাদশার জিনিস ছিল এটা', চাপা গলায় বলল মহাবীর। 'বিশ লাখ টাকা দাম। বাবা কাউকে দেখান না, কাউকে বিক্রী করবেন না।'

'আর তুমি এটা সিন্দুক থেকে বার করে নিয়ে এলে ?'

'বাঃ, এটা তোমাকে দেখাব না ? তোমার দেখা হলে আবার রেখে দিয়ে আসব।'

আমি অবাক হয়ে একবার লকেটের দিকে, একবার মহাবীরের দিকে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল শ্রীমান।

'টোটা সিং-এর নাম শুনেছ ?'

'কে টোটা সিং ?'

'আসল নাম কেউ জানে না। ডাকু টোটা সিং। পুলিশ ধরে জেলে পুরেছিল, ও জানলার গরাদ হাত দিয়ে বেঁকিয়ে পালিয়ে যায়।'

এবার মনে পড়ল। কোনো একটা কাগজে পড়েছিলাম বটে। রাজপুত ডাকাত, রাজপুত্রেরই মতো চেহারা। ফরসা রং, কিন্তু ডাকাতি করে মিশকালো ভীলদের সঙ্গে। ভারী রহস্যময় চরিত্র। পুলিশ জেরা করেও কিছু জানতে পারেনি। দুর্ধর্ষ সাহসী, আর বন্দুকের অব্যর্থ নিশানা। গায়েও নাকি প্রচণ্ড শক্তি।

'হঠাৎ টোটা সিং-এর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?'

'আমাদের বাড়িতে ডাকাত এলে মজা হবে।'

আমি তো থ ! বললাম, 'এসব কী বলছ তুমি ?'

'গোলাগুলি চলবে, আর মজা হবে না ?'

'এসব কথা বোল না, মহাবীর। যদি লোক খুন হয় সেটা কি খুব ভালো হবে ?'

মহাবীর আর কিছু বলল না। তার উৎসাহের সঙ্গে আমার উৎসাহ মেলাতে পারলাম না বলে বোধহয় সে কিছুটা হতাশ হল। তাকে লকেটটা দিয়ে বললাম, 'যাও, এটা রেখে এস বাবার সিন্দুকে।'

মহাবীর বাধ্য ছেলের মতো লকেটটা নিয়ে বেরিয়ে আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। সেদিন আর তেমন জমিয়ে পড়াশুনা হল না।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে লকেটটার কথা আর সেই সঙ্গে কী বিপুল ধনদৌলতের মধ্যে রয়েছি আমি সেই কথাটা ভাবছিলাম। আমার ঘরের উপরেই শেঠ গঙ্গারামের ঘর। শেঠজীর ইনসমনিয়া, রাত আড়াইটা তিনটার আগে ঘুম আসে না। নেশার ফলে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একটা তন্দ্রার ভাব আসে। তারপর

দশটা থেকে একেবারে সজাগ। এই ব্যারাম হোমিওপ্যাথিতে সারেনি। তাই শেঠজী অ্যালোপ্যাথির ঘুমের বড়ি খান। কিন্তু যতক্ষণ না ঘুমের আমেজ আসে ততক্ষণ ঘরে পায়চারি করেন। তাঁর পদধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি আমার মাথার উপরে।

ক্রমে সেই পায়ের শব্দও থেমে গেল, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঢংঢং করে গদির ঘরের জাপানী দেয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল, আর তারই কিছুক্ষণ পরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

একে টেলিপ্যাথি বলব না কী বলব জানি না ; আজই সন্ধ্যায় ডাকাতের কথা হল, আর আজই ডাকত পড়ল শেঠ গঙ্গারামের বাড়ি !

প্রথমে সন্দেহ হল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে। তারপর ঘোড়ার চিঁহিহি আর উটের পরিত্রাহি আর্তনাদ। তারপর হৈ হল্লা আর পর পর তিনটে বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে আমি খাটের উপর সটান উঠে বসলাম। ঘর থেকে বারান্দায় বেরোব কিনা ভাবছি, এমন সময় বেশ কিছু লোকের এক সঙ্গে দ্রুত পায়ের শব্দে সমস্ত বাড়িটা গমগম করে উঠল। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ওদিকের বারান্দায় প্যাসেজের ভিতর দিয়ে বাইরের উঠোনের যে অংশটা দেখা যায়, তাতে আলোকরশ্মির ছটফটানি দেখে বুঝলাম কে বা কারা যেন টর্চ ফেলছে।

মাথায় রোখ চেপে গেল। শেঠজীই আমাকে একটা রিভলবার দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে প্যাসেজের দিকে এগিয়ে গেলুম। বাড়িতে ডাকাত যদি পড়েই থাকে তো এভাবে কেঁচো হয়ে ঘরে বসে থাকলে বাঙালীর মুখে যে কালি পড়বে !

কিন্তু প্যাসেজ দিয়ে বেরনোমাত্র একটা বন্দুকের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম আমার কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে পিছনের একটা কাঁচের জানালাকে চৌচির করে দিল। আমি বেগতিক দেখে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। গোলাগুলি চললে এটাই যে প্রশস্ত পন্থা এটা আমার জানা ছিল। তাও উপুড় অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে রিভলভারের ঘোড়া টিপে একজন বন্দুকধারীর দিকে গুলি চালিয়ে দিলুম। লোকটা আর্তনাদ করে কোমরে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আজ অমাবস্যা, কিন্তু উঠোনের উপরে ছাত নেই বলে তারার আলোতে তবু কিছুটা দেখা যাচ্ছিল।

এই ভাবে কুরুক্ষেত্র চলল মিনিট কুড়ি। শেঠজীর বাড়ি পাহারা দেবার জন্য সশস্ত্র দারোয়ান ছিল গোটা আষ্টেক। কাজেই যুদ্ধ যে শুধু এক তরফাই ঘটেছে তা নয়।

ক্রমে হল্লা, আর্তনাদ, গুলির শব্দ, পায়ের শব্দ ইত্যাদি সব কিছু থামার পর আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম। তখন এদিকে ওদিকে বাতি জ্বলতে শুরু

করেছে। ওপর থেকে মেয়েদের ঘোর বিলাপ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যতদূর মনে হয়, রেড সাক্সেসফুল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই মহাবীর দৌড়ে নেমে এল দোতলা থেকে। সে আমার ঘরেই যাচ্ছিল, মাঝপথে আমাকে দেখে থেমে গিয়ে পাকা খবর দিয়ে দিল।

টোটা সিং ডাকাতের দল বিস্তর ধনরত্ন লুট করে নিয়ে চলে গেছে, ইনক্লুডিং শেঠজীর সিন্দুক খুলে জাহাঙ্গীর লকেট। শেঠজী নিজে নাকি বিপদ বুঝে গিন্নী ও মহাবীরকে নিয়ে ছাতে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁর দুই ছেলে প্রতাপ ও রঘুবীর বন্দুক নিয়ে ডাকাতদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল—দুজনেই জখম। এ ছাড়া দুটি প্রহরী মরেছে, আরেকটির পায়ে গুলি লেগেছে।

কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়।

পুলিশে ডায়রি ইত্যাদি যা করবার সে তো হলই। এখানে বলে রাখি যে শেষ পর্যন্ত ইনস্পেক্টর যশোবন্ত সিং এবং তাঁর দলের লোকেরা জাহাঙ্গীর লকেট সমেত চোরাই মালের অধিকাংশই উদ্ধার করেছিলেন, ডাকাতদলের সাতজন ধরা পড়েছিল, তবে টোটা সিং উধাও। কিন্তু এ সবের আগে আমাকে জড়িয়ে যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

ডাকাতির দুদিন পরের সন্ধ্যেবেলা।

ছাত্র পড়ানোর ঘরে গেছি যথারীতি সাতটার সময়, সরবতও খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলাম মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। ছাত্র তখনো আসেনি, এদিকে ক্রমেই বুঝতে পারছি যে চোখের সামনের জিনিসগুলো দেখতে যেন রীতিমতো কষ্ট করে দৃষ্টি ফোকাস করতে হচ্ছে।

কী যে হল কিছুই বুঝতে পারছি না, শুধু এটুকু বুঝছি যে এ অবস্থায় পড়ানো অসম্ভব।

এমন সময় শ্রীমান মহাবীর সিং-এর প্রবেশ। তার হাতে একটা হলদে কাগজ—হ্যান্ডবিলের মতো।

অবাক হয়ে দেখলাম তাতে আমারই ছবি।

'টোটা সিং', বলল মহাবীর, তার চোখ জ্বল জ্বল করছে।

টোটা সিং ? কী বলছে ছেলেটা পাগলের মতো। স্পষ্ট দেখছি যে আমার ছবি—সেই গোঁফ, সেই ঝুলপি, সেই নাক, সেই চোখ !

'টোটা সিং', আবার বলল মহাবীর। 'ঠিক তোমার মতো দেখতে। রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে ছবি আটকে দিয়েছে আজই দুপুরে। ধরে দিতে পারলে দু হাজার টাকা পুরস্কার।'

আমি সেই অবস্থাতেই কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে চোখের একেবারে

সামনে এনে নীচের লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলুম। বড় করে লেখা টোটা সিং-এর নামটা পড়তে কোনো অসুবিধা হল না। আর সেই সঙ্গে ছবির মাথার উপরে লেখা 'রিওয়ার্ড রুপীজ ২০০০।'

'পুলিশ তোমায় ধরতে আসবে,' বলল মহাবীর সিং। 'কিষণলাল বলল ও পুলিশে বলে দেবে তুমি এখানে থাক। ও দেখেছে দেয়ালের ছবি।'

কিষণলাল শেঠজীর দোকানের একজন কর্মচারী। লোকটা খুব সুবিধের নয় সেটা আমারও কয়েকবার মনে হয়েছে।

'তোমার জেল হবে,' বলে চলেছে মহাবীর সিং। আমার জেল হলে সে যেন রেহাই পায় এমনই তার ভাব। এই অদ্ভুত প্রায়-বেহুঁশ অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম যে এ ছেলেকে আমি বশ করতে পারিনি। সে আমার প্রতি যেমনি বিরূপ ছিল তেমনিই রয়ে গেছে।

আমি আর চোখ খুলে রাখতে পারছিলাম না। জিভও জড়িয়ে আসছিল। তার মধ্যেই বুঝতে পারছি যে একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়ে গেছি। চেহারায় যখন এতই মিল তখন গঙ্গারামও আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। শেষটায় হাতে হাতকড়া !

ঘর থেকে বেরিয়ে টলতে টলতে উঠোন পেরিয়ে কোনো মতে আমার শিস-মহলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, আর শোয়ামাত্র অঘোরে ঘুম !

পরদিন ঘুম ভাঙল পুরুষ মানুষের গলার শব্দে। ভারী গলায় কে যেন ইংরিজী-হিন্দী মিশিয়ে কথা বলছেন আমার ঘরের কাছেই।

'আমাদের ডেফিনিট ইনফরমেশন্ আছে এ বাড়িতে সে লোককে দেখা গেছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই। ছাব্বিশটা ঘর এই হাভেলিতে। লুকোবার জায়গার কি অভাব আছে ?'

আমি প্রমাদ গুনলাম। কথার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে আমারই ঘরের দিকে।

এবার গঙ্গারামের কাতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'এ বাড়িতে টোটা সিং লুকিয়ে থাকবে আমার অজান্তে ? এটা কী করে সম্ভব হয় ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ?'

দরজার বাইরে লোক। আমি বিছানায় কনুইয়ে ভর করে আধশোয়া। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, বুকের ভিতর ধড়ফড়ানি। এখনো মাথা ভার ; কাল যে কী হল এখনো বুঝতে পারছি না।

চৌকাঠ পেরিয়ে এক পা ঢুকে এলেন উর্দি পরা দারোগা। আমার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি দিয়ে 'সরি' বলে বেরিয়ে গেলেন। পায়ের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর বারান্দার

ডান দিক দিয়ে মিলিয়ে এল।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তাহলে কি কালকের ছবিটাও মহাবীরের আরেকটা বিচ্ছুমি ? শুধু আমার মনে একটা প্যানিক সৃষ্টি করার জন্য ?

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

দেয়ালের দিকে চোখ গেল।

দেয়ালে সর্বাঙ্গে আয়নার টুকরো। তাতে আমার মুখের ছায়া পড়েছে। একটা নয়, অগুন্তি।

কিন্তু এ মুখ যে বদলে গেছে !

আপনা থেকেই আমার হাতটা মুখের উপর চলে এল।

কোথায় আমার টৌটা-মার্কা তাগড়াই গোঁফ ? আমি যে ক্লীন-শেভ্‌ন !

আর আমার মাথার চুলের এ কী দশা ? এ যে প্রায় কদম ছাঁট !

দোর গোড়ায় এখন দাঁড়িয়ে মহাবীর সিং—তার চোখে মুখে শয়তানী হাসি।

'কাল সরবতে কী ছিল ?' সে জিজ্ঞেস করল।

'কী ছিল ?'

'বাবার চারটে ঘুমের বড়ি। তুমি ঘুমোলে পর দাদার ক্ষুর দিয়ে আমি তোমার গোঁফ কামিয়ে দিই, আর কাঁচি দিয়ে চুল ছেঁটে দিই। না হলে তোমায় ধরে নিয়ে যেত। এখন ওরা বুদ্ধু বনে যাবে।'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মহাবীরের দিকে। এমন ফন্দির কি তারিফ না করে পারা যায় ? আর সে যে সত্যি আমার বন্ধু, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ কি আর আছে ?

'সাবাস, মহাবীর', আমি এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললাম, 'জিতে রহো।'

উ প ন্যা স

ফটিকচাঁদ

ও যে কখন চোখ খুলেছে ও জানে না। চোখে কিছু দেখার আগে ও বুঝেছে ওর শীত করছে, ওর গা ভিজে, ওর পিঠের তলায় ঘাস, ওর মাথার নিচে একটা শক্ত জিনিস। আর তার পরেই বুঝেছে ওর গায়ে অনেক জায়গায় ব্যথা। ওর ডান হাতটাকে তুলে আস্তে আস্তে ভাঁজ করে মাথার পিছনে নিতেই হাতে ঠাণ্ডা পাথর ঠেকল। বড় পাথর, হাত দিয়ে সরাতে পারবে না। তার চেয়ে মাথাটা সরাই না কেন ? ও তাই করল, আর তাতে ও আর একটু চিত হয়ে গেল।

এবার ও বুঝল ও দেখতে পাচ্ছে। এতক্ষণ পায়নি তার কারণ এখন রাত, আর ও শুয়ে আছে আকাশের নিচে, আর আকাশে মেঘ ছিল। এখন মেঘ সরে যাচ্ছে আর জ্বলজ্বলে তারাগুলো বেরিয়ে আসছে।

ও বুঝতে চেষ্টা করল ওর কী হয়েছে। এখন ও উঠবে না। আগে বুঝে নেবে ওর কী হয়েছে ;—ও কেন ঘাসের উপর শুয়ে আছে, কেন ওর গায়ে ব্যথা, কেন ওর মাথাটা দপদপ করছে।

ওটা কিসের শব্দ হচ্ছে একটানা ?

একটু ভাবতেই ওর মনে পড়ল। ওটাকে বলে ঝিঁঝি পোকা। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকে কি ? না, ডাকে না। ঝিঁঝি পাখি নয়, ঝিঁঝি পোকা। এটা ও জানে। কী করে জানল ? কে বলেছে ওকে ? ওর মনে নেই।

ও ঘাড়টা একটু কাত করল। মাথাটা ঝনঝন করে উঠল। তা করুক। ও বেশি না নড়ে এদিক-ওদিক দেখে নেবে। ও এখন এ-সময়ে এখানে কেন, সেটা জানতে হবে।

ওটা কী ? তারাগুলো আকাশ থেকে নেমে এল নাকি ?

না। মনে পড়েছে। ওগুলো জোনাকি। জোনাকি অন্ধকারে দপদপ করে

জ্বলে আর ঘুরে ঘুরে ওড়ে। জোনাকির আলো ঠাণ্ডা আলো। হাতে নিলে গরম লাগে না। কে বলেছে ওকে ? মনে নেই।

জোনাকি মানে ওখানে গাছ। গাছের আশেপাশেই জোনাকি ঘোরে। আর ঝোপেঝাড়ে ঘোরে জোনাকি। ওখানে অনেক জোনাকি। ওই যে কাছে, আবার একটু দূরে, আবার অনেক দূরে। তার মানে অনেক গাছ। অনেক গাছ একসঙ্গে থাকলে কী বলে ? মনে পড়ছে না।

ও এবার অন্যদিকে মাথা ঘোরাল। আবার মাথাটা টনটন করে উঠল।

ওদিকেও অনেক গাছে অনেক জোনাকি। গাছের মাথা আকাশে মিশে গেছে, দুটোই এত কালো। আকাশে তারা এক জায়গায় থেমে জ্বলজ্বল করছে, গাছে জোনাকি ঘুরে ঘুরে জ্বলজ্বল করছে।

ওদিকের গাছগুলো দূরে, কারণ মাঝখানে রাস্তা। রাস্তায় ওটা কী ? আগে দেখেনি, এখন দেখছে, ক্রমে দেখছে।

একটা গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে। না, দাঁড়িয়ে না ; এক পাশে কাত হয়ে আছে। গাড়ির পিছনটা এখন ওর দিকে।

ওটা কার গাড়ি ? ও ছিল কি ওটার মধ্যে ? কোথাও যাচ্ছিল কি ? ও জানে না। ওর মনে নেই।

গাড়িটাকে দেখে কেন জানি ভয় করল ওর। শুধু ও আর গাড়ি—আর কেউ নেই। কোনো মানুষ নেই ; শুধু ও নিজে মানুষ। আর গাড়িটা কাত হয়ে ওর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ও জানে উঠলে ব্যথা লাগবে। তাও ও উঠল। উঠেই আবার পড়ে গেল। তারপর আবার উঠে এগিয়ে গেল গাছের দিকে, গাড়ির উলটো দিকে।

এটা জঙ্গল। একে বলে জঙ্গল। মনে পড়েছে। এখনো রাত। এখনো অন্ধকার। তাও বোঝা যায় জঙ্গল। একটু একটু দেখতে পাচ্ছে ও। তারার আলোয় তাহলে দেখা যায়। চাঁদের আলোয় আরো বেশি। সূর্যের আলোয় সব কিছু।

ও তিনটে গাছ পেরিয়ে চারের পাশে এসে থেমে গেল। ওর সামনে শুধু গাছ নয়, আরো কিছু আছে। একটু দূরে। ও গাছের গুঁড়ির পিছনে নিজেকে আড়াল করে মাথাটা বার করে ভালো করে দেখল।

একপাল জন্তু। তারা একসঙ্গে হাঁটছে, তাই খসখস শব্দ হচ্ছে। ঝিঁঝির শব্দ কমে এসেছে, তাই পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওই যে মাথায় শিং—একটার, দুটোর...আরেকটার। ওগুলোকে হরিণ বলে। ওর মনে আছে। একটা হরিণ হঠাৎ থেমে মাথা তুলে দাঁড়াল। অন্যগুলোও দাঁড়াল। কী যেন শুনছে।

এবার ও-ও শুনল। একটা গাড়ির আওয়াজ। দূর থেকে এগিয়ে আসছে

গাড়িটা।

হরিণগুলো পালাল। লাফ দিয়ে দৌড় দিয়ে পালাল। এই ছিল, এই নেই। সবগুলো একসঙ্গে।

গাড়িটা এগিয়ে আসছে। এবার ও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। পিছনের আকাশ আর তেমন কালো নেই। গাছের মাথা আকাশ থেকে আলগা হয়ে গেছে। তারাগুলো ফিকে হয়ে গেছে।

ও আবার উলটো দিকে ঘুরল। এবার বোধহয় গাড়িটাকে দেখা যাবে। ও এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে, কিন্তু জোরে হাঁটতে পারল না। ওর পায়ে বেশ ব্যথা। খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

গাড়িটা এসে চলে গেল। একে বলে লরি। সবুজ রঙের লরি, তাতে বোঝাই করা মাল। কাত-হওয়া গাড়িটার পাশে এসে লরিটা একটু আস্তে চলল, কিন্তু থামল না।

পা টেনে টেনে ও আবার রাস্তায় পৌঁছল। এখন আলো বেড়েছে, তাই পরিষ্কার দেখল গাড়িটাকে। গাড়ির সামনেটা দুমড়ে তুবড়ে কুঁচকে আছে।

ঢাকনাটা আধখোলা হয়ে বেঁকে ভেঙে হাঁ হয়ে আছে। সামনের দরজাটা খোলা। একটা মানুষের মাথার চুল। মানুষটা চিত হয়ে আছে। তার মাথাটা খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। মাথার নিচে রাস্তাটা ভিজে।

গাড়ির পিছনেও একটা লোক। তার শুধু হাঁটুটা দেখা যাচ্ছে জানালা দিয়ে। তার প্যান্টের রঙ কালো। গাড়িটার রঙ হালকা নীল। গাড়ির আশেপাশে রাস্তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঁচ। টুকরো টুকরো কাঁচে টুকরো টুকরো আকাশ। আকাশে এখন আলো।

ঝিঁঝি ডাকছে না। একটা পাখি ডাকল। তিনবার ডাকল। সরু শিসের মতো ডাক।

ও আবার গাড়িটাকে দেখে ভয় পেল। রাস্তায় কাঁচ আর লাল দেখে ভয় পেল। লাল আর কোথাও নেই। হ্যাঁ, আছে। ওর জামায় আছে, হাতে আছে, মোজায় আছে। ও আর থাকবে না এখানে। ওই যে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। দূরে বোধহয় বন শেষ হয়েছে, কারণ ওদিকটা অনেক খোলা।

ও এগিয়ে চলল যেদিকে বনের শেষ হয়েছে সেই দিকে। ও পারবে যেতে। ও এটা বুঝেছে যে ও খুব বেশি জখম হয়নি। জখম হয়েছে ওই দুটো লোক। কিংবা মরে গেছে। ওর নিজের মাথার ব্যথাটা যদি কমে যায়, আর কনুইয়ের কাটাটা যদি শুকিয়ে সেরে যায়, আর পা যদি খুঁড়িয়ে চলতে না হয়, তাহলে কেউ ওকে কেমন আছ জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারবে—ভালোই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ওর যে কেন কিছু মনে পড়ছে না সেটা ও বুঝতেই পারছে না। আজ এই কিছুক্ষণ আগে আকাশে তারা দেখার আগের কোনো কথাই ওর মনে নেই। এমন-কি ওর নিজের নামটাও না। ও শুধু জানে ওখানে একটা ভাঙা গাড়ি, তাতে দুটো লোক পড়ে আছে আর নড়ছে না। ও জানে এটা রাস্তা, ওটা ঘাস, ওগুলো গাছ, মাথার উপর আকাশ, আকাশের একটা দিক এখন লাল, তার মানে সূর্য উঠবে, তাহলে এটা সকাল।

ও হাঁটছে। পাখির ডাকে কান পাতা যায় না। এবার গাছগুলো চেনা যাচ্ছে। ওটা বট, ওটা আম, ওটা শিমুল, ওটা—ওটা কী ? পেয়ারা না ? ওই তো পেয়ারা হয়ে আছে।

পেয়ারা চিনেই ওর খিদে পেল। ও গাছটার দিকে এগিয়ে গেল রাস্তা থেকে নেমে। ভাগ্যিস পেয়ারা, ভাগ্যিস আম না। আম গাছে আম আছে, কিন্তু ও জানে ওর গায়ে ব্যথা, ও গাছে চড়তে পারবে না। পেয়ারাটা হাতের কাছে। পর পর দুটো খেল ও।

বনের শেষে রাস্তা আরেকটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। কোন্ দিকে যাবে

ও ? ও জানে না। শেষে না ভেবে ডাইনে ঘুরে কিছুদূর গিয়ে আর না পেরে ও একটা নাম-না-জানা গাছের নিচে বসে পড়ল। গাছের গুঁড়িতে সাদা-কালো ডোরা কাটা। শুধু এ গাছটায় নয়, রাস্তার দু'দিকে যত দূরে যত গাছ দেখা যায় সবটাতে ডোরা কাটা। কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে সাদা-কালো রঙ তা অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না।

আর ভাবতে চায় না ও। মাথাটা আবার দপদপ করছে। আর সেই সঙ্গে বুঝতে পারল, ওর নাকটা কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এটা জোরে শ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখটা জলে ভরে গেল। আর তার পরেই ওর চোখের সামনে থেকে গাছ রাস্তা সাদা-কালো হলদে-সবুজ সব মিশে মুছে হারিয়ে ফুরিয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ওর সামনে একটা মানুষের মাথা নড়ছে। দাড়িওয়ালা পাগড়িওয়ালা মানুষের মাথা। না, মানুষটা নড়ছে না, আসলে ও নিজেই নড়ছে। মানুষটা ওর গা ধরে নাড়া দিচ্ছে।

'দুধ পী লো বেটা—গরম দুধ।'

লোকটার হাতে একটা কাঁচের গেলাসে দুধ থেকে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

এবার ও বুঝল। একটা লরির পিছনে ও শুয়ে আছে। লরিতে মাল, মালের এক পাশে, যেদিকটা খুলে যায় লরির, সেইদিকে একটুখানি জায়গাতে ও একটা চাদরের উপর শুয়ে আছে। ওর গায়েও একটা চাদর, আর মাথার নিচে পুঁটলি-করা কিছু কাপড়।

লোকটার কাছ থেকে গেলাসটা নিয়ে ও উঠে বসল। লরির এক পাশে রাস্তা, অন্যদিকে একটা খাবারের দোকান। দোকানের সামনে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা, তাতে তিনজন লোক বসে চা খাচ্ছে। আরো দোকান রয়েছে রাস্তার দু'ধারে। একটায় বোধহয় গাড়ি মেরামত হয় ; সেখান থেকে ঠুকঠাক আওয়াজ আসছে। দোকানটার সামনে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে একজন শার্ট আর প্যান্ট পরা লোক রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছছে।

পাগড়ি-পরা লোকটা দোকানের দিকে চলে গিয়েছিল, আবার ওর দিকে এগিয়ে এল। ওর পিছন পিছন বেঞ্চির লোকগুলোও এগিয়ে এল।

'কেয়া নাম হ্যায় তুম্‌হারা ?' পাগড়িওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল। ওর হাতে এখনো দুধের গেলাস, অর্ধেক খাওয়া হয়েছে। খুব ভালো দুধ, খুব ভালো

লাগছে খেতে।

ও বলল, 'জানি না।'

'কেয়া জানি না ? তুম বাংগালী আছে ?'

ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। নিশ্চয়ই বাঙালী। এতক্ষণ অবধি ও যা ভেবেছে সবই তো বাংলাতে।

'তোমার ঘর কুথায় ? চোট লাগা ক্যায়সে ? সাথে আউর আদমি ছিল ? তারা কুথায় গেল ?'

'জানি না, আমার মনে নেই।'

'কী ব্যাপার ? ছেলেটি কে ?'

সেই কালো গাড়ির লোকটা এগিয়ে এসেছে লরিব দিকে। মাথায় বেশি চুল নেই, কিন্তু বয়স বেশি না। লোকটা চোখ কুঁচকে একদৃষ্টে দেখছে ওর দিকে। পাগড়িওয়ালা হিন্দিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। খুব সহজ। রাস্তার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লরিতে তুলে নিয়ে আসে। পরিচয় পেয়ে যদি দেখে কলকাতার ছেলে, তাহলে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেবে।

বাঙালী ভদ্রলোক এবার আরো কাছে এলেন।

'তোমার নাম কী ?'

নামটা ভুলে গিয়ে ওর খুব মুশকিল হয়েছে। ওকে আবার জানি না বলতে হল, আর পাগড়িওয়ালা হো-হো করে হেসে উঠল। '—জানি না, জানি না ছোড়কে আউর কুছ বোলতা হি নেহি।'

'জানি না মানে কী ? ভুলে গেছ ?'

'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক কনুইয়ের জখমটা দেখলেন।

'আর কোথায় লেগেছে ?'

ও হাঁটুর ছড়াটা দেখিয়ে দিল।

'মাথায় লেগেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'দেখি, মাথা হেঁট করো।'

ও হেঁট করলে পর ভদ্রলোক ফোলা জায়গাটা ভালো করে দেখলেন। হাত দিতে ব্যথা লাগায় ও শিউরে উঠেছিল।

'একটু কেটেওছে বোধহয়। চুলের মধ্যে রক্ত জমে আছে মনে হচ্ছে।...তুমি নামতে পারবে ? দেখ তো—এস।'

ও হাতের গেলাস পাগড়িওয়ালাকে দিয়ে পা ঝুলিয়ে হাত বাড়াতেই ভদ্রলোক ওকে খুব সাবধানে ব্যথা না লাগিয়ে নামিয়ে নিলেন। তারপর পাগড়িওয়ালার

সঙ্গে ভদ্রলোক কথা বলে নিলেন। খড়গ্‌পুর আর ত্রিশ মাইল দূর। ওখানে ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওকে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক ওকে সঙ্গে করে সোজা চলে যাবেন কলকাতা।

'সিধা থানা মে লে যাইয়ে', পাগড়িওয়ালা বলল। 'কুছ গড়বড় হুয়া মালুম হোতা।'

থানা যে কী জিনিস সেটা বুঝতে ওর কিছুটা সময় লাগল। তারপর পুলিশ কথাটা কানে আসতে ওর বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল। পুলিশ চোর ধরে। শাস্তি দেয়। ও চুরি করেছে বলে তো ও জানে না!

ভদ্রলোক নিজেই গাড়ি চালান। সামনে ওকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন। গাড়ি ছাড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই দোকান ঘরবাড়ি শেষ হয়ে গিয়ে খোলা মাঠ পড়ল। ও বুঝতে পারছিল যে ভদ্রলোক মাঝে মাঝে আড়চোখে ওর দিকে দেখছেন। কিছুক্ষণ পরেই উনি আবার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন।

'তুমি কলকাতায় থাক?'

ও তাতেও বলল, 'জানি না।'

'তোমার বাপ মা ভাই বোন কারুর কথা মনে পড়ছে না?'

'না।'

তারপর ও নিজে থেকেই রাত্তিরের ঘটনাটা বলল। ভাঙা গাড়ির কথাটা বলল। দুটো লোকের কথা বলল।

'গাড়ির নম্বরটা দেখেছিলে?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'লোকগুলো কী রকম দেখতে মনে আছে?'

ও যা মনে আছে বলল। বাকি রাস্তা ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে রইলেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

এখন দুটো বেজেছে সেটা ও ভদ্রলোকের হাতঘড়িটা দেখে জেনে নিয়েছে। একবার ভেবেছিল ও বলবে যে ওর খিদে পেয়েছে, শুধু দুটো পেয়ারা আর এক গেলাস দুধে পেট ভরেনি; কিন্তু সেটা আর বলার দরকার হল না। যেখানে রাস্তার ধারে খড়গ্‌পুর ১২ কিলোমিটার লেখা পাথরটা রয়েছে, তার পাশেই একটা গাছের তলায় ভদ্রলোক গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা সাদা কাগজের বাক্স খুলে তার থেকে লুচি আর আলুর তরকারি বার করে ওকে দিলেন, আর নিজেও নিলেন। চ্যাপটা সাদা গোল জিনিসটার নাম যে লুচি সেটা ওর কিছুতেই মনে পড়ছিল না, শেষে আকাশে অনেকগুলো পাখিকে একসঙ্গে উড়তে দেখে চিল মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লুচি মনে এসে গেল।

পাথরের ফলকের নম্বর বারো থেকে কমতে কমতে দুই হবার পরেই খড়গ্‌পুর

শহর দেখা গেল। ভদ্রলোক বললেন, 'খড়গ্‌পুর এসেছ কখনো ?'

ওর খড়গ্‌পুর নামটাই মনে নেই, এসেছে কিনা জানবে কী করে ? দেখে মনে হল ও কোনোদিন এখানে আসেনি। ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে একটা বড় ইস্কুল আছে, তাকে বলে আই আই টি।'

আই আই টি কথাটা ওর মাথার মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে শহরের শব্দ বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল।

একটা চৌমাথায় একটা পুলিশ দেখেই ওর বুকটা আবার কেঁপে উঠল, আর ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, 'আমার পুলিশ ভালো লাগে না।'

ভদ্রলোক রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললেন, 'পুলিশে খবর দিতেই হবে। ও নিয়ে তুমি কথা বোলো না। তুমি ভদ্রঘরের ছেলে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়। তোমার বাপ-মা আছেন নিশ্চয়ই। তুমি তাঁদের ভুলে গেলেও তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে ভোলেননি। তুমি কে সেটা জানতে হলে পুলিশের কাছে যেতেই হবে, আর তারাই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে। পুলিশ তো খারাপ নয়। পুলিশ অনেক ভালো কাজ করে।'

শংকর ফার্মেসির ডাক্তার ওর ছড়ে-যাওয়া জায়গাগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন, মাথায় বরফ লাগিয়ে দিলেন, কনুইয়ের উপর ওষুধ দিয়ে তুলো লাগিয়ে তার উপর একটা আঠাওয়ালা তাপ্পি মেরে দিলেন। এবার যিনি ওকে এনেছিলেন তিনি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের এখানে থানাটা কোথায় ?'

ডাক্তার কিছু বলার আগেই ও বলল, 'আমি একটু বাথরুম যাব।'

'এস আমার সঙ্গে', বলে ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

ডাক্তারখানার পিছন দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা বারান্দা। সেই বারান্দার শেষ মাথায় একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু।

ও দরজা খুলে ঘরে ঢুকেই ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিল। তারপর সত্যি করেই বাথরুমের কাজ সেরে আরেকটা বন্ধ দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

এটা একটা গলি। ডাইনে গেলেই বড় রাস্তা। তার মানে ধরা পড়ার ভয়। ও বাঁয়ে ঘুরল। কোথায় যাচ্ছে জানে না, তবে পুলিশের কাছে নয় এটা ভেবেই ফুর্তি। ওর কনুইয়ের ব্যাণ্ডেজ, ময়লা কাপড়, রক্তের দাগ, খুঁড়িয়ে হাঁটা—এই সবের জন্যেই বোধহয় রাস্তার কিছু লোক ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না ওকে।

ও এগিয়ে চলল। ট্রেনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে।

গলিটা শেষ হতেই একটা বেশ বড় রাস্তা পড়ল। এ রাস্তায় অনেক লোক,

সবাই ব্যস্ত, কেউ ওর দিকে চাইছে না। বাঁদিকে লোহার রেলিং-এর ওপারে রেলের লাইন। অনেকগুলো পাশাপাশি লাইন ; তার মধ্যে একটাতে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনের ভোঁ শোনা যাচ্ছে খুব জোরে আর কাছে। সামনে লাইনের পাশে একটা লোহার ডাণ্ডার মাথায় অনেকগুলো আড়াআড়ি ছোট ডাণ্ডা, তাদের গায়ে লাল-সবুজ গোল গোল আলো। কী যেন বলে ওগুলোকে ? ওর মনে পড়ল না।

ওই যে সামনে স্টেশন। বেশ বড় স্টেশন। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে প্ল্যাটফর্মে লোকের ভিড়।

ও খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। ভোঁ বেজে উঠল ইঞ্জিনের দিক থেকে। ওর মনটা ছটফটিয়ে বলে উঠল—তোমাকে উঠতে হবে এই গাড়িতে। এই সুযোগ। এই বেলা উঠে পড়ো !

ওর সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে লোক ছুটোছুটি করছে। পিছন থেকে একটা পুঁটলির ধাক্কায় ও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কোনো রকমে সামলে এগিয়ে গিয়েই দেখল ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গাড়িগুলো সরে সরে যাচ্ছে ওর সামনে দিয়ে। ও আরো এগোল। সব দরজা বন্ধ। খোলা দরজা না পেলে ও উঠবে কী করে ?

ওই একটা দরজা খোলা। ও কি পারবে উঠতে ? পারবে না। ওর হাতে জোর নেই। পায়ে জোর নেই। তবু মন বলছে এই সুযোগ, এগিয়ে যাও।

ও এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে দিল। ওই যে দরজা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হবে। তারপর হাতল ধরে লাফ। পা হড়কালেই ফসকে গিয়ে একেবারে—

ওর পা আর মাটিতে নেই। পা ফসকায়নি। একটা হাত কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ওর কোমর জাপটে ধরে হুশ করে ওকে কামরায় তুলে নিল। আর তার পরেই শুনল ও ধমক—

'ইয়ার্কি হচ্ছে ? মারব নাকি ল্যাঙা ঠ্যাঙে ঠ্যাঙার বাড়ি ?'

॥ ৩ ॥

ও এখন বেঞ্চিতে বসে হাঁপাচ্ছে। এত জোরে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে যে কথা বলতে চাইলেও পারবে না। ও লোকটার দিকে চেয়ে আছে। ধমক দিলে কী হবে—মুখ দেখে মনে হয় না খুব বেশি রাগ করেছে। কিংবা হয়তো প্রথমে রেগেছিল, এখন ওকে ভালো করে দেখে রাগটা কমে গেছে। এখন ওর চোখে চালাক হাসি, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতগুলোতে রোদ পড়ে হাসি আরো খোলতাই

হয়েছে। দেখে মনে হয় লোকটার মাথায় হাজার বুদ্ধি কিলবিল করে, আর সেগুলো খাটিয়ে সারাটা জীবন সে চালিয়ে দিতে পারে।

কামরায় আরো লোক রয়েছে, কিন্তু ওদের বেঞ্চিতে কেবল ওরা দু'জন। সামনের বেঞ্চিতে তিনজন বুড়ো পাশাপাশি বসে আছে। একজন বসে বসেই ঘুমোচ্ছে, একজন এইমাত্র এক চিমটে কালো গুঁড়ো নিয়ে নাকের ফুটোর সামনে ধরে হাতটাকে ঝাঁকি দিয়ে নিশ্বাস টেনে নিল। আরেকজন খবরের কাগজ পড়ছে। ট্রেনের দুলুনি যত বাড়ছে তাকে তত বেশি শক্ত করে কাগজটাকে ধরে চোখের কাছে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

'এবার বলো তো চাঁদ, মতলবখানা কী?'

লোকটার গলা গম্ভীর কিন্তু হাসিটা এখনো যায়নি। সে এমনভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে যেন চাহনির জোরেই ওর মনের সব কথা জেনে যাবে।

ও চুপ করে রইল। মতলব তো পুলিশের কাছ থেকে পালানো ; কিন্তু সেটা ও বলতে পারল না।

'পুলিশ?'—ওর মনের কথা জেনে তাক্ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'চালের ব্যাপার?'—লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল। এই নিয়ে পর পর তিনটে প্রশ্ন করল যার একটারও উত্তর ও দেয়নি।

'উঁহু। তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে। চালের থলি কাঁধে নিয়ে ছুটবে এমন তাগদ নেই তোমার।'

ও এখনো চুপ করে আছে। লোকটাও ওর দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে।

'পেটে বোমা মারতে হবে নাকি?'—এবার বলল লোকটা। তারপর কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, 'আমাকে বলতে কী? আমি কাউকে বলব না। আমিও ঘর-পালানো ছেলে, তোমার মতন।'

ও জানত যে এবার লোকটা ওর নাম জিজ্ঞেস করবে, তাই ও উলটে ওকেই ওর নাম জিজ্ঞেস করে ফেলল। লোকটা বলল, 'আমার নামটা পরে হবে, আগে তোমারটা শুনি।'

বার বার জানি না বলতে ওর মোটেই ভালো লাগছিল না। খড়গ্‌পুর ডাক্তারখানার উলটো দিকে একটা দোকানের দরজার উপরে ও একটুক্ষণ আগেই একটা নাম দেখেছে। সাদা টিনের বোর্ডে কালো দিয়ে লেখা—'মহামায়া স্টোরস', আর তার নিচে 'প্রোঃ ফটিকচন্দ্র পাল'। ও তাই ফস্ করে বলে দিল—'ফটিক'।

'ডাকনাম না ভালো নাম?'

'ভালো নাম।'

'পদবী কী ?'

'পদবী ?'

পদবী কথাটার মানের জন্য ওর কিছুক্ষণ মাথার মধ্যে হাতড়াতে হল।

'পদবী বোঝ না ?'—লোকটা বলল। 'তুমি কি সাহেব ইস্কুলে পড় নাকি ? সারনেম। সারনেম বোঝ ?'

সারনেম ও আরোই বোঝে না।

'নামের শেষে যেটা থাকে', লোকটা ধমক দিয়ে বলল। 'যেমন রবির শেষে ঠাকুর।...তুমি সত্যিই বোকা, না বোকা সেজে রয়েচ সেটা আমাকে জানতে হবে।'

নামের শেষে বলাতেই ও বুঝে ফেলেছে। বলল, 'পাল। পদবী পাল। আর মাঝখানে চন্দ্র। ফটিকচন্দ্র পাল।'

লোকটা একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যে লোকটা ঝড়াকসে নিজের একটা নাম বানিয়ে বলতে পারে সেও আর্টিস্ট। এসো, হারুনের সঙ্গে হাত মেলাও ফটিকচাঁদ পাল। হারুন, মাঝখানে অল, শেষে রসিদ। বোগ্দাদের খলিফ, জগলরের বাদশা।'

ও হাতটা বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু লোকটা ওর বানানো নাম বিশ্বাস করল না বলে ওর একটু রাগ হল।

'তুমি যে-বাড়ির ছেলে', লোকটা সটান ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেসব বাড়ি থেকে ফটিক নামটা উঠে গেছে সিরাজদ্দৌলার আমল থেকে।—দেখি তোমার হাতের তেলো।'

ও কিছু বলার আগেই লোকটা ওর ডান হাতটা খপ্ করে তেলোটা দেখে নিয়ে বলল, 'হুঁ..বাসের রড ধরে ঝুলতে হয়নি কস্মিনকালেও।...শার্টের দাম কম-সে-কম ফর্টিফাইভ চিপ্স...টেরিকটের প্যান্ট..নো মাদুলি...লাস্ট টিকেটা উঠেছিল কি ? হুঁ...সেলুনে ছাঁটা চুল, খুব বেশিদিন না..পার্কস্ট্রীটের সেলুন কি ? তাই তো মনে হচ্ছে ?...'

লোকটা আবার চেয়ে আছে ওর দিকে ; হয়তো চাইছে ও কিছু বলুক। ও বাধ্য হয়েই বলল, 'আমার কিচ্ছু মনে নেই।'

লোকটার চোখ দুটো হঠাৎ খুদে খুদে আব জ্বলজ্বলে হয়ে গেল।

'বোগ্দাদের খলিফের সঙ্গে ফচকেমো করতে এসো না চাঁদ। ওসব কারচুপি খাটবে না আমার কাছে। তুমি অনেক ভাজা মাছ উলটে খেয়েচো। সাহেবী ইস্কুলের তালিম তোমার, হুঁ-হুঁ ! ব্যাড কোম্পানি হয়ে এখন বাপের খপ্পর থেকে ছট্‌কে বেরিয়ে এসেচ। আমি কি আর বুঝি না ? কনুইয়ে চোট লাগল কী করে ? মাথা ফুলেচে কেন ? ল্যাংচাচ্চ কেন ? যা বলবার সাফ বলে ফেল তো

চাঁদ ! নইলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দোব জকপুরে গাড়ি থামলেই। ...বল, বলে ফেল।'

ও বলল। সব বলল। ওর মনে হল একে বলা যায়। এ লোকটা ক্ষতি করবে না ওর, ওকে পুলিশে দেবে না। আকাশে তারা দেখা থেকে আরম্ভ করে বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব বলল।

লোকটা শুনে-টুনে কিছুক্ষণ চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরের চলন্ত মাঠঘাটের দিকে চেয়ে ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার তো তাহলে একটা ডেরা লাগবে কলকাতায়। আমি যেখানে থাকি সেখানে তো তোমার থাকা পোষাবে না।'

'তুমি কলকাতায় থাক ?'

'আগে থেকেচি। এখন আবার থাকব। ডেরা একটা আছে আমার এনটালিতে। মাঝে-মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরতে বেরোই বাক্স নিয়ে। রথের মেলা, চড়কের মেলা, শিবরাত্তিরের মেলা। বিয়েশাদিতেও বায়না জুটে যায় টাইম টু টাইম। এখন আসচি কোয়েম্বাটোর থেকে। কোযেম্বাটোর জান ? মাদ্রাজে। তিন হপ্তা স্রেফ ইডলি-দোসা। এক সার্কাস কোম্পানির সঙ্গে কথা বলে এসেচি। ভেঙ্কটেশ ট্রাপীজ দেখায় গ্রেট ডায়মন্ডে, আমার সঙ্গে দোস্তি হয়েচে। বলেচে চান্স হলেই জানাবে। আপাতত কলকাতা। শহীদ মিনারের নিচে ঘাসের উপর একফালি জায়গা, ব্যস্।'

'তুমি ঘাসের উপর থাকবে ?' ও জিজ্ঞেস করল। ও নিজে অনেকক্ষণ ঘাসের উপর শুয়ে ছিল সেটা ওর মনে আছে।

লোকটা বলল, 'থাকব না, খেল দেখাব। ওই যে বেঞ্চির নিচে বাক্সটা দেখছ, ওর মধ্যে আমার খেলার জিনিস আছে। জাগ্‌লিং-এর খেলা। একটি জিনিসও আমার নিজের কেনা নয়। সব ওস্তাদের দেওয়া।'—ওস্তাদ কথাটা বলেই লোকটা তিনবার কপালে হাত ঠেকাল। —'তিয়াত্তর বছর বয়স অবধি খেল দেখিয়েছিল। তখনও চিরুনি দিয়ে দু' ভাগ করে আঁচড়ানো দাড়ির অর্ধেক কাঁচা। নমাজ পড়ার মতো করে বসে লাট্টু ছুঁড়েচে আকাশে, তারপর তেলোটা চিত করে হাতটা বাড়িয়েছে ধরবে বলে—হঠাৎ দেখি ওস্তাদ হাত টেনে নিয়ে দু' হাত দিয়ে বুক চেপে দুমড়ে গেল। লাট্টু আকাশ থেকে নেমে এসে ওস্তাদের পিঠের দুই পাখনার মধ্যিখানে শিরদাঁড়ার উপর পড়ে ঘুরতে লাগল—পাবলিক ক্ল্যাপ দিচ্ছে, ভাবছে বুঝি নতুন খেলা—কিন্তু ওস্তাদ আর সোজা হলেন না।'

লোকটা কিছুক্ষণ চুপ করে জানালার বাইরে চেয়ে থেকে বোধ হয় ওস্তাদের কথাই ভাবল। তারপর বলল, 'উপেনদাকে বলে দেখব, যদি তোমার একটা হিল্লে করে দিতে পারেন। অবিশ্যি পুলিশ লাগবে তোমার পেছনে সেটা বলে

দিলাম।'

ওর মুখ আবার শুকিয়ে গেল। লোকটা বলল, 'নিয়মমতো তোমাকে আমার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।'

'না-না !'—ও এবার বেশ জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

'ভয় নেই', লোকটা একটু হেসে বলল, 'আর্টিস্টের নিয়মগুলো একটু আলাদা। নিয়ম যদি মানতাম গোড়া থেকেই, তাহলে তোমার সঙ্গে আজ এইভাবে থার্ড কেলাসে বসে কথা বলতে হত না। নিয়ম মানলে এই আপিস ভাঙার টাইমে অরুণ মুস্তাফি হয়তো ফিয়াট গাড়ি হাঁকিয়ে বি বি ডি বাগ থেকে বালিগঞ্জে ফিরত।'

একটা লোকের নাম ওর মাথায় ঘুরছিল। ও জিজ্ঞেস করল, 'উপেনদা কে ?'

লোকটা বলল, 'উপেনদা হল উপেন গুঁই। বেনটিং ইস্ট্রীটে চায়ের দোকান আছে।'

'হিল্লে কাকে বলে ?'

'হিল্লে মানে গতি। যাকে বলে ব্যবস্থা। —তুমি নিঘঘাৎ সাহেব ইস্কুলে পড়েছ।'

॥ ৪ ॥

দারোগা দীনেশ চন্দ আরেকবার রুমালটা বার করে কপালের ঘামটা মুছে একটা কেঠো হাসি হেসে বললেন, 'আপনি অতটা ইয়ে হবেন না স্যার। আমরা তো অনুসন্ধান চালিয়েই যাচ্ছি। আমরা—'

'মুণ্ডু !'—হেঁকে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। 'আমার ছেলে কী অবস্থায় আছে সেটাই বলতে পারছেন না আপনারা !'

'মানে, ব্যাপারটা—'

'আপনি থামুন। আমাকে বলতে দিন। আমি আপনাদের কথাই বলছি। —চারজন লোক, এ গ্যাঙ অফ ফোর, বাবলুকে কিডন্যাপ করেছিল। তারা একটা নীল রঙের চোরাই অ্যামবাসাডরে করে ওকে নিয়ে ঘাটশিলা ছাড়িয়ে সিংভূমের দিকে যাচ্ছিল।'

'ইয়েস স্যার।'

'ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার করার দরকার নেই, আমাকে শেষ করতে দিন।...পথে একটা লরি ওদের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালায়। মাঝরাত্তিরে। লরিটাকে পরে আপনারা ধরেছেন।'

'ইয়েস—' দারোগা সাহেব স্যারের আগে ব্রেক কষে নিজেকে কোনোমতে সামলে নিলেন।

'অ্যাকসিডেন্টে দু'জন লোক মারা যায়। সেই চারজনের মধ্যে দু'জন।'

'বঙ্কু ঘোষ আর নারায়ণ কর্মকার।'

'কিন্তু দলের পাণ্ডা বেঁচে আছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী নাম তার?'

'তার আসল নামটা ঠিক জানা নেই।'

'চমৎকার। —কী নামে জানেন তাকে?'

'স্যামসন।'

'আর অন্যটি?'

'রঘুনাথ।'

'এও ছদ্মনাম?'

'হতে পারে।'

'যাক্‌গে।...স্যামসন আর রঘুনাথ বলছেন বেঁচে আছে—অ্যাকসিডেন্টের পরে তারা পালায়। আর আপনারা বলছেন, বাবলু গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়ে। —'

'আজ্ঞে, দশ-বারো বছরের ছেলের সাইজের একটা জুতোর সোলের খানিকটা পাওয়া গেছে গাড়ি থেকে সাত হাত দূরে। রাস্তার পাশটা খানিকটা ঢালু হয়ে জঙ্গলের দিকে নেমে গেছে, সেই স্লোপের নিচের দিকে। তাছাড়া রক্তের দাগও পাওয়া গেছে তার আশেপাশে। আর একটি নতুন ক্যাডবেরি চকোলেটের প্যাকেট।'

'কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।'

'না স্যার।'

'জঙ্গলের ভিতর সার্চ করা হয়েছে? নাকি বাঘের ভয়ে সেটা বাদ গেছে?'

দারোগাবাবু হালকাভাবে হাসতে গিয়ে না পেরে কেশে বললেন, 'ও জঙ্গলে বাঘ নেই স্যার। জঙ্গলে তো সার্চ করেইছি, এমন-কি কাছাকাছির গ্রাম ক'টাও বাদ দিইনি।'

'তাহলে আপনারা কী রিপোর্ট করতে এসেছেন আমার কাছে? সমস্ত ব্যাপারটা তো জলের মতো পরিষ্কার। স্যামসন আর রঘুনাথ বাবলুকে নিয়েই পালিয়েছে।'

দারোগা হাত তুলে মিস্টার সান্যালের কথা বন্ধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে করে হাতটা নামিয়ে বললেন, 'একটা আশার আলো দেখা গেছে,

সেইটেই আপনাকে—'

'ওসব আলো-টালো থিয়েটারি বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলুন।'

দারোগাবাবু আরেকবার কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, 'অমরনাথ ব্যানার্জি বলে এক ভদ্রলোক—জুট কর্পোরেশনে কাজ করেন—ঘাটশিলা থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মোটরে করে ওই অ্যাকসিডেন্টের পরের দিন। উনি ঘাটশিলায় বাড়ি করেছেন, বৌ আর ছেলেকে—'

'ফ্যাকড়া বাদ দিন।'

'হ্যাঁ স্যার, সরি স্যার।—খড়গ্পুর থেকে ত্রিশ মাইল আগে একটা লরিতে একটি ছেলেকে দেখেন। তার হাতে পায়ে ইনজুরি ছিল। লরির ড্রাইভার বলে ছেলেটিকে নাকি রাস্তায় অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে পায়, অ্যাকসিডেন্টের জায়গা থেকে মাইলখানেক উত্তরে, মেন রোডে। ভদ্রলোক ছেলেটিকে নিয়ে খড়গ্পুরে একটা ডাক্তারখানায় যান। সেখানে ফার্স্ট এড দেবার পর ছেলেটি বাথরুমে যাবার নাম করে পালায়। ভদ্রলোক পুলিশে রিপোর্ট করেন।'

দারোগাবাবু থামলেন। মিস্টার সান্যাল এতক্ষণ তাঁর কাঁচের ছাউনি দেওয়া প্রকাণ্ড টেবিলটার উপর দৃষ্টি রেখে ভুরু কুঁচকে কথাগুলো শুনছিলেন, এবার দারোগাবাবুর দিকে চোখ তুলে বললেন, 'এত কথা বললেন, আর ছেলেটিকে তার নামটা বলেছে কিনা বললেন না?'

'ওইখানে একটা মুশকিল হয়েছে স্যার। ছেলেটির বোধহয় লস্ অফ মেমরি হয়েছে।'

'লস্ অফ মেমরি?'—অবিশ্বাসে মিস্টার সান্যালের নাক চোখ ভুরু সব একসঙ্গে কুঁচকে গেল।

'সে নিজের নাম, আপনার নাম, কোথায় থাকে, কিচ্ছু নাকি বলতে পারেনি।'

'ননসেন্স!'

'অথচ চেহারার বর্ণনায় দস্তুরমতো মিল আছে।'

'কী-রকম? রঙ ফরসা, দোহারা চেহারা, চুল কোঁকড়া—এই তো?'

'আজ্ঞে নীল প্যান্ট আর সাদা শার্টের কথাও বলেছে।'

'আর কোমরে জন্মদাগ বলেছে? থুতনির নিচে তিলের কথা বলেছে?'

'না স্যার।'

মিস্টার সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর হাতঘড়িটার দিকে দেখে বললেন, 'আজকে আমাকে কোর্টে যেতেই হবে। এ তিনদিন পারিনি দুশ্চিন্তায়। আমার তিন ছেলেকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। একটি আবার খড়গ্পুরে আছে—আই আই টি-তে। ফোন করেছিল—আজই আসবে। অন্য দুটি বম্বে আর ব্যাঙ্গালোরে। আসবে নিশ্চয়ই, হয়তো দু-একদিন দেরি হবে।

চিন্তা সবচেয়ে বেশি মাকে নিয়ে। বাবলুর মা নয়, আমার মা। বাবলুর মা বেঁচে থাকলে এ শক্ সইতে পারত না। আমি রাস্তা ঠিক করে ফেলেছি। ওই লোক দুটো যদি বাবলুকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে টাকা ডিমান্ড করবেই। যদি করে তো আমি সে টাকা দেব, দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেব। তারপর তারা ধরা পড়ল কি না-পড়ল, সেটা আপনাদের লুক-আউট, আই ডোন্ট কেয়ার।'

কথাটা বলে কলকাতার জাঁদরেল ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁর তিনদিক-বইয়ে-ঠাসা আপিস-ঘরের শ্বেতপাথরের মেঝেতে জুতোর আওয়াজ তুলে দারোগা দীনেশ চন্দের কপালে নতুন করে ঘাম ছুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৫ ॥

উত্তর কলকাতার একটা অখ্যাত চুল-ছাঁটাইয়ের দোকানে (প্রোঃ নরহরি দত্তরায়) দুটি লোক ঢুকে দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসে বিশ মিনিটের মধ্যে নিজেদের চেহারা সম্পূর্ণ পালটে নিল। যে বেশি জোয়ান আর বেশি লম্বা, যার কাঁধ দুটো ধরে পরেশ নাপিত চমকে উঠেছিল, তার ছিল চাপদাড়ি আর গোঁফ আর মাথায় কাঁধ অবধি চুল। তার দাড়িগোঁফ বেমালুম সাফ হয়ে গেল, তার মাথার চুল হয়ে গেল দশ বছর আগে বেশির ভাগ লোক যে-রকম চুল রাখত সেইরকম। অন্য লোকটির ঝুলপি বাদ হয়ে গেল, সিঁথি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফের জায়গায় রয়ে গেল শুধু একটা সরু গোঁফ। পরেশ আর পশুপতি তাদের পাওনার উপরি পেল ষণ্ডা লোকটার কাছ থেকে এমন একটা মুখ-বন্ধ-করা চাহনি যেটা তারা কোনোদিন অমান্য করতে পারবে না।

চুল ছাঁটার বিশ মিনিট পরে লোক দুটি শোভাবাজারের একটা গলিতে একটা ঘুণধরা একতলা বাড়ির কড়া নাড়ল। দরজা খুললেন একজন বেঁটে শুকনো বুড়ো ভদ্রলোক। ষণ্ডা লোকটি তাঁর বুকের উপর পাঁচটা আঙুলের ডগার চাপ দিয়ে তাঁকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে নিজেও ঢুকে গেল, আর সেইসঙ্গে অন্য লোকটাও ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সময়টা সন্ধ্যা, ঘরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা বিশ পাওয়ারের বাল্ব।

'চিনতে পারছ দাদু ?'—বলল ষণ্ডা লোকটা বুড়োর উপর ঝুঁকে পড়ে।

বুড়োর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মাথার কাঁপুনির চোটে ইস্পাতের ফ্রেমের আদ্যিকালের চশমাটা নাকের উপর নেমে আসছে।

'কই-কে-কই না তো...'

ষণ্ডা লোকটা একটা বিশ্রী হাসি হেসে বলল, 'দাড়ি কামিয়েছি যে !—এই

দ্যাখো—'

লোকটা বুড়োর মাথাটা টেনে এনে চশমাসুদ্ধু নাকটা নিজের গালে ঘষে দিল।

'গন্ধ পাচ্ছ না দাদু ? শেভিং সোপের খুশ্‌বু ? আমার নাম যে স্যামসন। এবার মনে পড়ছে ?'

বৃদ্ধ এবার কাঁপতে কাঁপতে তক্তপোশে বসে পড়লেন, কারণ লোকটা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

'তোমার হুঁকো খাবার সময় ডিসটার্ব দিলুম—ভেরি সরি দাদু !'

স্যামসন দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো হুঁকোটাকে তুলে নিয়ে কলকেটা মাথা থেকে খুলে নিল। তক্তপোশের উপর একটা ডেস্ক, তার উপর একটা খোলা পাঁজি। পাঁজির পাতার উপর চাপা দেওয়া একটা ছ'কোনা পাথরের পেপারওয়েট। স্যামসন পেপারওয়েটটা সরিয়ে কলকেটা পাঁজির উপর ধরে উপুড় করতেই টিকেগুলো পাঁজির পাতার উপব পড়ল। তারপর কলকেটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার টেনে নিয়ে তক্তপোশেব সামনে বুড়োর মুখোমুখি বসে বলল, 'এবার বল তো দিকি দাদু—গাঁট যদি কাটার ইচ্ছে থাকে তো সোজাসুজি কাটতেই হয় ; গনৎকারীর ভড়ং ধরেচ কেন ?'

বুড়ো কোন্‌দিকে চাইবেন বুঝতে পারছেন না। পাঁজির পাতা থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকে ঘরটার কড়িবরগার দিকে, পাতায় কালশিটে পড়ে গর্ত হয়ে যাচ্ছে, তামাকের গন্ধের সঙ্গে পোড়া কাগজের গন্ধ মিশে যাচ্ছে।

স্যামসন তার ঝাঁঝালো ফিসফিসে গলায় বলে চলল, 'সেদিন যে এলুম—এসে বললুম একটা বড় কাজে হাত দিতে যাচ্ছি, একটা ভালো দিন দেখে দাও। তুমি বই দেখে হিসেব করে বললে আষাঢ়ের সাতুই। লোকে বলে বাড়ির আলসেতে কাগ এসে বসলে ভৈরব ভট্‌চায তার ভাগ্য গুনে দিতে পারে। আমরাও বিশ্বাস করে এলুম, তুমি বলে-টলে গাঁট থেকে দশটি টাকা বার করে নিয়ে তোমার ওই কাঠের বাক্সের মধ্যে গুঁজে রেখে দিলে। তারপর কী হয়েচে জান ?'

গনৎকার মশাই পাঁজি থেকে চোখ সরাতে পারছেন না বলেই বোধহয় রঘুনাথ লোকটি তাঁর থুতনি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে স্যামসনের দিকে করে দিল। আর সেইসঙ্গে দুটো চোখের পাতাও আঙুল দিয়ে টেনে খুলে রাখল, যাতে ভট্‌চায মশাই স্যামসনের মুখ থেকে চোখ সরাতে না পারেন। চোখেব ব্যাপারটা করার আগে অবিশ্যি রঘুনাথ ভট্‌চাযের চশমাটা খুলে তক্তপোশের উপর ফেলে দিয়েছিল।

'বলছি শোন', বলল স্যামসন, 'যে গাড়িতে করে মাল নিয়ে যাচ্ছিলাম, এক শালা লরি তাতে মারে ধাক্কা। গাড়ি খোলামকুচি। লরি ভাগলওয়া। দো পার্টনার খতম। স্পট ডেড। আমার লোহার শরীর, তাই জানে বেঁচে গেছি। তাও মালাইচাকি ডিসলোকেট হতে হতে হয়নি। আর এই যে—এ আমার পার্টনার—এর তিনি জায়গা জখম, ডান পাশে ফিরে ঘুমুতে পাচ্চে না। ওদিকে যার জন্যে এত মেহনত—সে মালটিও খতম।...এসব তুমি গুনে পাওনি কেন?'

'আমরা তো বাবা ভগবান—'

'চ্যাওপ্ !'

রঘুনার বুড়োর মাথাটা ছেড়ে তাকে খানিকটা রেহাই দিল, কারণ বাকি খেলাটা স্যামসন একাই খেলবে।

'এবার বার করো তো দেখি দাদু দশ ইনটু দশ।'

'আ-আমি—'

'চ্যাওপ্ !'

স্যামসনের চাপা চিৎকারের সঙ্গে তার হাতে একটা ছুরি এসে গেল, আব তাব ভাঁজ-করা অদৃশ্য ফলাটা হাতলে একটা বোতাম টেপার ফলে সড়াৎ শব্দে খুলে গেল।

ছুরিসমেত হাতটা গনৎকারের দিকে এগিযে এল।

'দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি।'

ভৈরব জ্যোতিষীর থরথরে হাত প্রথমে তাঁর ট্যাঁক, তারপর তাঁর তেলচিটে-পড়া কাঠের ক্যাশবাক্সটার দিকে এগিয়ে গেল।

॥ ৬ ॥

এই পাঁচ দিনে ফটিক তার কাজ বেশ কিছুটা শিখে নিয়েছে। উপেনবাবু লোক ভালো হওয়াতে অবিশ্যি খুব সুবিধে হয়েছে। তিনি ফটিককে বাবো টাকা মাইনে, থাকার জায়গা, আর খেতে দেবেন। এস মাসের মাইনে আগাম দিয়েছেন। উপেনবাবু যে লোক ভালো, সেটা ফটিক সত্যি কবে বুঝেছে গতকাল। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে উপেনবাবুর জন্য পান আনতে গিয়ে বিশু বলে আরেকটা পানের দোকানের ছেলের সঙ্গে ফটিকের আলাপ হয়। বিশুও সবে মাসখানেক হল কাজে ঢুকেছে। ঢোকার দু'দিনের মধ্যে সে একটা চায়ের কাপ ভাঙে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার একগোছা চুল মালিক বেণীবাবুর হাতে উঠে আসে, আর তার পরেই এক রাবুণে গাঁট্টার চোটে মাথায় আলু বেরিয়ে যায়।

উপেনবাবু মারেন না। তিনি ধমক দেন, আর ধমকটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে, আর ক্রমে সেটা বদলে গিয়ে একঘেয়ে উপদেশ হয়ে যায়। এই উপদেশটা খেপে খেপে দিনের শেষ অবধি চলতে থাকে। দ্বিতীয় দিনে ফটিক যখন কাঁচের গেলাসটা ভাঙল, তখন উপেনবাবু প্রথমে মেঝেতে ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ফটিক যখন টুকরোগুলো গামছায় তুলছে, তখন তিনি মুখ খুললেন।—

'কাঁচের জিনিসটা যে ভাঙলে, কিনতে পয়সা লাগে না? পয়সাটা দিচ্ছে কে? তুমি না আমি? এসব কথাগুলো কাজের সময় খেয়াল রেখো। কাজে ফুর্তি চাই ঠিকই, তার মানে এই নয় যে, হাতে গেলাস নিয়ে লাফাতে হবে। দোকানের জিনিসপত্তর হাতে নিয়ে ভোজবাজি করার জিনিস নয়।'

উপদেশের কথাগুলো যে উপেনবাবু ঠিক শোনাবার জন্য বলেন তা নয়। দোকানের গোলমালের মধ্যেই ফটিক লক্ষ করেছিল ওঁর ভুরু কুঁচকানো আর ঠোঁট দুটো নড়ছে। খদ্দেরের অর্ডার নিয়ে ওদিকে যেতে ওঁর দু-একটা কথা ফটিকের কানে এসে গেছিল। উপদেশ দেবার সময় উপেনবাবু কাজ থামান না, এটা ফটিক লক্ষ করেছে।

দোকানে নতুন মুখ যে রোজ দেখা যায় তা নয়। বেশির ভাগই যারা আসে তারা রোজই আসে, আর তাদের খাবার সময়টা বাঁধা। শুধু সময় না, অর্ডারটাও বাঁধা। কেউ শুধু চা, কেউ চা-টোস্ট, কেউ চা-ডিম-টোস্ট—এইরকম আর কি। ডিম মানে হয় ডিম পোচ, না-হয় ডিমের মামলেট। কে কী অর্ডার দেয়, সেটা ফটিক এর মধ্যেই বুঝে ফেলতে শুরু করেছে। আজ সকালে সেই রোগা লিকলিকে লোকটা—যে ভীষণ দুঃখ-দুঃখ মুখ করে থাকে—সে এসে তিন নম্বর টেবিলে বসতেই ফটিক তার কাছে গিয়ে বলল, 'চা আর মাখন-ছাড়া টোস্ট?' লোকটা সেইরকমই দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল, 'চিনে ফেলেছিস এর মধ্যেই?'

লোক চিনে রাখার মধ্যে ফটিক একটা বেশ মজা পেয়ে গেছে। তবে একটু সাবধানে চলতে হবে, কারণ আজই দুপুরে ও একটা ভুল করে বসেছিল। একজন হলদে শার্টপরা মোটা লোককে দেখে চেনা মনে করে যেই বলেছে, 'চা আর ডবল ডিমের মামলেট?'—অমনি লোকটা হাতের খবরের কাগজ সরিয়ে ফটিকের দিকে ভুরু তুলে বলল, 'তোর মর্জিমাফিক খেতে হবে নাকি?'

যেটা ফটিকের সবচেয়ে ভালো লাগছে সেটা হল যে, কাপ-ডিস নিয়ে চলাফেরাটা ওর ক্রমে সহজ হয়ে আসছে। হারুনদা বলেছিল, 'দেখবি এসব আস্তে আস্তে কেমন সড়গড় হয়ে আসবে। তখন দেখবি কাজটা একেবারে নাচের ছকে বাঁধা হয়ে গেছে। আসলে এটাও একটা আর্ট। সেই আর্টটা যদ্দিন রপ্ত না হচ্ছে, তদ্দিন মাঝে মাঝে দু-একটা করে জিনিসপত্তর ভাঙবেই।'

হারুনদা রোজই বিকেলে একবার আসে। উপেনবাবুকে অবিশ্যি আসল ব্যাপার কিছু বলেনি। ফটিক হয়ে গেছে হারুনের দূর সম্পর্কের ভাই, মেদিনীপুরে থাকে, বাপ-মা কেউ নেই, এক খিটখিটে খুড়ো আছে যে গাঁজা খায় আর ফটিককে ধরে বেধড়ক মারে।—'দেখছেন উপেনদা—লোকটা স্রেফ খামচে দিয়ে কনুইয়ের ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছে। মাথায় ফোলাটা দেখছেন ?—চ্যালাকাঠের বাড়ি।' উপেনবাবুও এক কথায় রাজী। যে ছেলেটি আছে তাকে নাকি আর রাখা যাচ্ছে না। সে নাকি পর পর তিনদিন ফাঁকি দিয়ে হিন্দি ফিলিম দেখতে গিয়ে রাত করে ফিরে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে দোষ ঢাকতে গিয়েছিল।

ফটিকের চেহারার বদল হয়েছে। তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কাটিয়ে ছোট করে দিয়েছে হারুনদা। তাতে অবিশ্যি ফটিক কোনো আপত্তি করেনি। চুল ছাঁটার পরে হারুনদা যখন ওকে এক জোড়া নতুন হাফপ্যান্ট, দুটো শার্ট, দুটো হাতকাটা গেঞ্জি আর এক জোড়া চটি কিনে দিয়ে বলল, 'কাজের সময় গেঞ্জি পরবি, তবে পরার আগে একটু চায়ের জলে চুবিয়ে শুকিয়ে নিবি'—তখন ফটিকের হঠাৎ কেন জানি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। বোধহয় কাজ কথাটা শুনে নিজেকে বড় মনে হওয়ার জন্যেই। কাজটা তার অভ্যেস হয়ে যাবে এটা ফটিক জানে। সকাল সাড়ে-আটটা থেকে রাত আটটা অবধি হপ্তায় পাঁচ দিন। শনিবার চারটে অবধি, আর রবিবার ছুটি। দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে উপেনবাবুর ছোট কাঠের ঘর, আর সেই ঘরের দরজার বাইরে টিনের ছাউনির তলায় ফটিকের নিজের শোবার জায়গা। প্রথম রাত মশার কামড়ে ঘুম হয়নি, তাই চাদরটা পা থেকে মাথা অবধি জড়িয়ে নিয়েছিল, কিন্তু নিশ্বাসের কষ্ট হওয়াতে বেশিক্ষণ সেভাবে থাকতে পারেনি। পরদিন উপেনবাবুকে বলাতে উনি একটা মশারি এনে দিলেন। তারপর থেকে ঘুম ভালোই হচ্ছে। কনুইয়ের ঘা-টা শুকিয়ে এসেছে, মাথার ব্যথাটা মাঝে মাঝে চলে যায় আবার মাঝে মাঝে ফিরে আসে। যেটা একেবারেই ফিরে আসে না সেটা হল, সেদিন সেই আকাশে তারা দেখার আগের ঘটনাগুলো। ও বুঝেছে ও নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। হারুনদাও বলেছে যে, যে-জিনিসটা নেই, যেটা শুন্যি, সেটা নিয়ে ভাবা যায় না। 'মনে পড়লে আপনিই পড়বে রে ফটিক !'

আসল মজা হয়েছিল গতকাল। গতকাল ছিল রবিবার। হারুনদা বলে দিয়েছিল, তাই ফটিক দোকানেই ছিল। হারুনদা এল দুটোর সময়, সঙ্গে কাঁধে ঝোলানো একটা থলি। অনেক রঙচঙে কাপড়ের টুকরো পাশাপাশি সেলাই করে তৈরি হয়েছে থলিটা। ফটিক হারুনের সঙ্গে উপেনবাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল শহীদ মিনার।

এ-রকম যে একটা জায়গা থাকতে পারে, সেটা ফটিক ভাবতেই পারেনি। মিনারের একটা দিকে মানুষ ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এত মানুষ এক জায়গায় এক সঙ্গে কী করতে পারে, সেটা ফটিকের মাথায় ঢুকল না। হারুন বলল, 'মিনারের চুড়োয় যদি উঠতে পারতিস তাহলে দেখতিস, এই ভিড়টার মধ্যে একটা নকশা আছে। দেখতিস ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা গোল চক্করের মতো ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকটার প্রত্যেকটাতে একটা কিছু ঘটছে, আর সেইটে দেখবার জন্য গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়েছে।'

'রোজ এত লোকের ভিড় হয় এখানে?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'ওনলি সানডে', বলল হারুন, 'চ তোকে দেখাচ্চি। দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবি।'

ফটিক দেখল বটে, কিন্তু বুঝল বললে একটু বেশি বলা হবে। এত বিরাট ব্যাপার সহজে বোঝা যায় না। এত রকম কাজ, এত রকম খেলা, এত রকম ভাষা, এত রকম রঙ আর এত রকম শব্দ এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে যে, ফটিকের চোখ-কান-মাথা সব এক সঙ্গে ধাঁধিয়ে গেল। শুধু যে খেলা হচ্ছে তা তো নয়। একটা দিকে কেবল জিনিস ফেরি হচ্ছে—দাঁতের মাজন, দাদের মলম, বাতের ওষুধ, চোখের ওষুধ, নাম-না-জানা শুকিয়ে যাওয়া শেকড় বাকল, আর আরো কত কী। এক জায়গায় একটা টিয়া পাখি এক গোছা কাগজের মধ্যে থেকে একটা করে কাগজ ঠোঁট দিয়ে টেনে বার করে লোকের ভাগ্য বলে দিচ্ছে। একজন লোক কথার তুবড়ি ছেড়ে একরকম আশ্চর্য সাবানের তারিফ করছে—লোকটার মাথায় পাগড়ি, গায়ে খাকী প্যাণ্ট আর দু-হাতে গোলাপী সাবানের ফেনা। একদিকে একটা লোক গলায় একটা ইয়া মোটা লোহার শিকল ঝুলিয়ে হাত-পা নেড়ে কী জানি বলছে, আর তার চারদিকের লোক হাঁ করে তার কথা শুনছে। তার কাছেই একটা সিমেন্ট-বাঁধানো জায়গার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটা ভীষণ ময়লা কাপড়পরা কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া-চুলো পাগলাগোছের লোক লাল, কালো আর সাদা খড়ি দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর দেবদেবীর ছবি আঁকছে। লোক চারপাশ থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পয়সা ফেলছে, সেগুলো ঠং ঠং করে হনুমানের ল্যাজে, রামচন্দ্রের মুকুটে, রাবণের মাথার উপর পড়ছে, কিন্তু লোকটা সেগুলোর দিকে দেখছেই না।

তবে এটা ফটিক দেখল যে, যেসব জিনিস হচ্ছে তার মধ্যে খেলাটাই সবচেয়ে বেশি। কেবল একটা জিনিসকে ফটিক খেলা বলবে না কী বলবে ভেবেই পেল না—ফটিকের চেয়েও কয়েক বছরের ছোট একটি ছেলে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর মাথার চারপাশে মাটি চাপা দিয়ে বাতাস ঢোকার ফাঁকটাও বন্ধ করে দিয়েছে আরেকটি

বাচ্চা ছেলে। এইভাবে ছেলেটা চিত হয়ে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। ফটিক কিছুক্ষণ দেখে ঢোক গিলে বলল, 'ও হারুনদা, ও যে মরে যাবে!'

'এখানে কেউ মরতে আসে না রে ফটকে', বলল হারুন,—'এখানে আসে বাঁচতে। ও-ও বেঁচে যাবে। ও যা করছে সেটা স্রেফ অভ্যাসের ব্যাপার। অভ্যাসে কী যে হয় সেটা খলিফ হারুনের খেলা দেখলে বুঝবি।'

হারুন ওকে নিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যেখানে ও আগে খেলা দেখাত সেই জায়গায়। সেখানে এখন একটা মেয়ে খেলা দেখাচ্ছে। দড়ির উপর ব্যালান্সের খেলা। মাটি থেকে প্রায় সাত-আট হাত উঁচুতে টান করে বাঁধা দড়ির উপর দিয়ে দিব্যি এ-মাথা থেকে ও-মাথা চলে যাচ্ছে মেয়েটা। 'মাদ্রাজের মেয়ে', বলল হারুনদা।

আরেকটা জায়গায় একটা শূন্যে ঝোলানো লোহার রিং-এর গায়ে আট-দশটা জায়গায় আগুন জ্বলছে দেখে ফটিক হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওর ভিতর দিয়ে একটা লোক লাফাবে বুঝি?'

হারুন হাঁটা থামিয়ে ওর দিকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোর মনে পড়ে গেছে? তুই আগে দেখেছিস এ জিনিস?'

ফটিক 'হ্যাঁ' বলতে গিয়েও পারল না। একটা আলো-বাজানা-ভিড় মেশানো ছবি এক মুহূর্তের জন্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু সামনে যা দেখতে পাচ্ছে তাই।

হারুন আবার এগিয়ে গেল, ফটিক তার পিছনে।

যে জায়গাটায় হারুন খেলা দেখাবে সেখানে এখন কেউ নেই। ডান দিকে একটা ভিড়ের পিছন থেকে ডুগডুগির শব্দ আসছে, ফটিক মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে ভাল্লুকের কালো লোম দেখতে পেয়েছে। ডুগডুগি আর ঢোলক এখানে সব খেলাতেই বাজায়, কিন্তু হারুন থলি থেকে যেটা বার করল সেটা দুটোর একটাও নয়। সেটা একটা বাঁশি; যেটার পিছন দিকটা সরু আর সামনের দিকটা চওড়া আর ফুলকাটা। সাতবার পর পর ফুঁ দিল বাঁশিটায় হারুনদা। ফটিক জানে যে, সব শব্দ ছাপিয়ে বাঁশির শব্দ শোনা গেছে ময়দানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা।

এবার বাঁশিটা ওয়েস্টকোটের পকেটে রেখে হারুন একটা চিৎকার দিয়ে চমকে দিল ফটিককে।

'ছু-উ-উ-উ-উ!
ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-উ-উ-উ!'

এই এক ডাক আর বাঁশির আওয়াজেই এখান থেকে ওখান থেকে ছেলের দল

ছুটে আসতে আরম্ভ করেছে হারুনের দিকে। তারা এসে দাঁড়াতেই হারুন একটা কান-ফাটানো তালি দিয়ে তিনবার পাক খেয়ে একটা ডিগবাজি আর একটা পেল্লায় লাফ দিয়ে তার আশ্চর্য লোক-ডাকার মন্ত্রটা শুরু করে দিল—

'ছু-ছু-ছু-ছু-ছু-ঊ-ঊ-ঊ !
ছু মন্তর যন্তর ফন্তর
হর্ বিমারি দূর করন্তর
সাত সমন্দর বারা বন্দর
চালিস চুহা ছে ছুছুন্দর
ছু-ঊ-ঊ-ঊ !'

ছু বলেই বাঁশিতে আরেকটা লম্বা ফুঁ দিয়ে আরেকটা তালি আর আরেকটা ডিগবাজির পর আবার ধরল হারুনদা—

'কাম্ ! কাম্ ! কাম্ ! কাম !
'কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্ !
কাম্ সী কাম্ সী চমকদারি
হর্ কিস্‌ম্ কি জাদুকারি
কলকত্তে কি খেল-খিলাড়ী
লম্বি দাড়ি লং সুপারি
কাম্-ম-ম্-ম্-ম্-ম্ !

কাম্ কামান্ডর ওয়ান্ডর ওয়ান্ডর
জাগ্‌লর জোকার জাম্পিং ওয়ান্ডর
ওয়ান্ডর খালিফ হারুন ওয়ান্ডর
ভেল্‌কী ভেলকাম্ কাম্ কমাকম
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্ !

কামবয় গুডবয় ব্যাডবয় ফ্যাটবয়
হ্যাটবয় কোটবয় দিস-বয় দ্যাট-বয়
কালিং অলবয়, অলবয় কালিং
কালিং কালিং কালিং কালিং
কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্-ম্ !'

বাপ্‌রে, ভাবল ফটিক, কী গলার জোর, কী লোকডাকার কায়দা ! এরই মধ্যে বেশ লোক জমে গেছে হারুনদাকে ঘিরে। হারুন তার থলি থেকে একটা

চকরাবকরা আসন বার করে ঘাসের উপর বিছাল। তারপর তার উপর বসে থলিতে যা কিছু খেলার সরঞ্জাম ছিল, সব একে একে বার করে নিজের দু-পাশে সাজিয়ে রাখল।

ফটিক দেখল, চারটে নকশা-করা ঝকঝকে পিতলের বল, দুটো প্রকাণ্ড লাট্টু, তার জন্য মানানসই লেত্তি, তিন-চারটে লাল নীল পালক লাগানো বাঁশের কঞ্চি, পাঁচ রকম নকশা-করা টুপি—যার একটা হারুনদা মাথায় পরে নিল। ফটিক এতক্ষণ হারুনকে জিনিস সাজিয়ে রাখতে সাহায্য করছিল, এবার হারুন বলল, 'তুই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়া, এক-একটা খেলা যেই শেষ হবে অমনি তালি দিবি।'

প্রথম দুটো খেলার পর ফটিকই তালি শুরু করল, তারপর অন্যরা দিল। তিন নম্বর খেলা থেকে ফটিককে আর ধরিয়ে দেবার দরকার হয়নি। সত্যি বলতে কি, সে হারুনের কাণ্ডকারখানা দেখে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তালি দেবার কথা আর মনেই ছিল না। শুধু হাতেরই যে কায়দা তা তো নয়। হারুনের কোমর থেকে উপরের সমস্ত শরীরটাই যেন জাদু। নমাজ-পড়ার মতো করে গোড়ালির উপর বসে অত বড় লাট্টুটায় দড়ি পেঁচিয়ে সেটাকে সামনের দিকে ছুঁড়ে লেত্তি ফুরোবার ঠিক আগে পিছন দিকে একটা হ্যাঁচকা টান দিলে সেটা যে কী করে শূন্য দিয়ে ঘুরে এসে আবার হারুনদারই হাতের তেলোয় পড়ছিল—বার বার ঠিক একইভাবেই একই জায়গায় পড়ছিল—সেটা ফটিকের মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না। আর সেখানেই তো শেষ না। লাট্টুটা হাতের তেলো থেকে ওই পালক-লাগানো কাঠির মাথায় বসিয়ে দিল হারুনদা আর ওই বোমা লাট্টুটা ঘুরতে লাগল ওই পেনসিলের মতো সরু কাঠিটার মাথায়। ফটিক ভাবল এটাই বুঝি খেলার শেষ, এখানেই বুঝি হাততালি দিতে হবে, কিন্তু ওমা—হারুনদা মাথা চিত করে ঘুরন্ত লাট্টু সমেত কাঠিটা বসিয়ে দিয়েছে ওর থুতনির ঠিক মাঝখানে! তারপর হাত সরিয়ে নিতে লাট্টুর সঙ্গে সঙ্গে কাঠিটাও ঘুরতে লাগল থুতনির উপর দাঁড়িয়ে—আর সেই সঙ্গে তার গায়ে লাগানো রঙীন পালকগুলো। তারও পরে ফটিক অবাক হয়ে দেখল যে, কাঠিটা আবার মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ঘুরছে কিন্তু লাট্টুটা ঘুরে চলেছে একটানা।

পিতলের বলের খেলায় আরো বেশি হাততালি পেল হারুন। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার বলে চলে গেল জাগ্‌লিং দেখাতে দেখাতে। বিকেলের রোদে এমনিতেই বলগুলো ঝলমল করে উঠছে; সেগুলো থেকে আবার আলো ঠিকরে বেরিয়ে হারুনের মুখে পড়াতে মনে হচ্ছে যেন তার মুখ থেকেই বার বার আলো বেরুচ্ছে।

সূর্য ডুবে যাওয়া অবধি খেলা চলল। শেষের দিকে পাশের খেলা থেকে

অনেক লোক চলে এসেছিল হারুনের খেলা দেখতে। ফটিক অবাক হয়ে দেখছিল বাচ্চারা পর্যন্ত কীরকম পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে হারুনের চারপাশে। হারুন কিন্তু খেলার সময় সেগুলোর দিকে দেখছেই না। খেলার শেষে ফটিককে ডেকে বলল, 'ওগুলো তোল তো।'

হারুন যতক্ষণে তার ভোজবাজির সরঞ্জাম থলিতে তুলেছে, তার আগেই ফটিকের পয়সা তোলা হয়ে গেছে। গুনে হল আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সা। থলি কাঁধে ঝুলিয়ে হারুন বলল, 'চল্, আজ তোকে খাওয়াব—পাঞ্জাবী রুমালি রুটি আর তরখা। নিঘ্ঘাৎ এ জিনিস তুই কোনোদিন খাসনি। তারপর মিষ্টি কী খাওয়া যায় সেটা তখন ভেবে দেখা যাবে।'

॥ ৭ ॥

ফটিক তার শোবার জায়গার পাশের দেয়ালে একটা কাত্যায়নী স্টোর্সের ক্যালেন্ডার টাঙিয়ে দিয়েছে। তাতে পেনসিল দিয়ে প্রত্যেক দিনের শেষে সেই দিনের তারিখটার উপর একটা দাগ কেটে দেয়। এইভাবে দাগ গুনে সে হিসেব করে ক'দিন হল তার চাকরি। আট দিনের দিন, তার মানে বিষ্যুদবার, দুপুরে সাড়ে-বারোটার সময় উপেনবাবুর দোকানে একজন লোক এল, যে-রকম ষণ্ডা লোক ফটিক কোনোদিন দেখেনি। দোকানের আটটা বেঞ্চির মধ্যে যেটা দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে—মানে যেটা উপেনবাবুর বসার জায়গা থেকে সবচেয়ে দূরে—সেখানে বসেছে লোকটা। তার সঙ্গে অবিশ্যি আরেকজন লোক আছে ; তার চেহারা মোটেই চোখে পড়ার মতো নয়। ষণ্ডা লোকটা বেঞ্চিতে বসেই একটা 'অ্যাই' করে হাঁক দিয়েছে। ফটিক বুঝল যে তাকেই ডাকা হচ্ছে। থুতনিতে শ্বেতীওয়ালা ভদ্রলোক, যিনি রোজ এই সময় এসে এক কাপ চা সামনে নিয়ে আধ ঘন্টা ধরে খবরের কাগজ পড়েন, তিনি এইমাত্র উঠে গেছেন। ফটিক তাঁর পেয়ালা তুলে নিয়ে টেবিলটা ঝাড়ন দিয়ে মুছছিল, তার মধ্যে ষণ্ডা লোকটা আবার হাঁক দিয়ে উঠল।

'দুটো মামলেট আর দুটো চা এদিকে। জলদি।'

'দিচ্ছি বাবু।'

কথাটা বলতে ফটিকের গলাটা যে কেন একটু কেঁপে গেল, আর তার সঙ্গে হাতের কাপটাও, সেটা ও বুঝতে পারল না। অর্ডারটা কিচেনে কেষ্টদাকে চালান দিয়ে, হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে শ্বেতীওয়ালা লোকের পয়সাটা উপেনবাবুর কাছে দিয়ে ফটিক আরেকবার আড়চোখে ষণ্ডা লোকটার দিকে দেখে নিল। ওকে আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না ওর। তাহলে ওর গলা শুনে এমন হল

কেন ? লোক দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, রোগা লোকটা ষণ্ডাটাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে ।

ফটিক ওদের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল । তারপর হাতের ঝাড়নটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে গেল পান্নাবাবুর টেবিলের উপর রুটির গুঁড়ো পরিষ্কার করতে । অন্য যারা এ দোকানে আসে, পান্নাবাবু তাদের চেয়ে অনেক বেশি ভালো জামাকাপড় পরেন । উনি এলে উপেনবাবুও উঠে গিয়ে খাতির-টাতির করেন । আর কেউ যেটা করে না সেটা দু'দিন পান্নাবাবু করেছেন ; ফটিককে দশ পয়সা করে বকশিশ দিয়েছেন । তার মধ্যে একটা দশ আজকে এই পাঁচ মিনিট আগে পেয়েছে ফটিক । ও ঠিক করেছে, বকশিশের পয়সা জমিয়ে ও হারুনদার ধার শোধ করবে ।

অমলেট তৈরি হচ্ছে । সবাই বলে মামলেট, কেবল হারুনদা বলে অমলেট, আর সেটাই নাকি ঠিক । ফটিকও তাই মনে মনে অমলেট বলে । কেষ্টদা দু-কাপ চা এগিয়ে দিল, ফটিকও স্টাইলের মাথায় কাপ দুটো হাতে নিয়ে একটুও চা পিরিচে না-ফেলে সে দুটোকে এক নম্বর টেবিলের উপর ষণ্ডা আর রোগাটার সামনে রেখে দিল । একটা জিনিস ও দু'দিন থেকে করতে আরম্ভ করেছে । যেটা দিচ্ছে সেটাও বলে দেয় আর যেটা বাকি সেটাও বলে—তারপরে একটা 'কামিং' জুড়ে দেয় । আজ যেমন বলল, 'মামলেট কামিং ।'

কথাটা বলে ষণ্ডাটার দিকে চাইতেই ফটিক দেখল লোকটার মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে, আর সেই হাঁ-এর ভিতর সিগারেটের না-ছাড়া ধোঁয়াটা পাক খেয়ে আপনা থেকেই ফিতের মতো বেরিয়ে আসছে ।

ধোঁয়াটা দেখবার জন্যই ফটিক বোধহয় পাঁচ সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়েছিল, এবার উলটো ঘুরতেই লোকটা কথা বলল ।

'অ্যাই—'

ফটিক থামল ।

'তুই কদ্দিন কাজ করছিস ?'

পুলিশ !

হতেই হবে পুলিশ । না হলে ও-রকম জিজ্ঞেস করছে কেন ? ফটিক ঠিক করে নিল বানিয়ে বলবে, কিন্তু আস্তে বলবে, যাতে উপেনবাবু শুনতে না পান । আড়চোখে একবার উপেনবাবুর দিকে চাইতেই দেখল তিনি নেই । যাক্, বাঁচা গেল ।

'অনেকদিন বাবু ।'

'তোর নাম কী ?'

'ফটিক ।'

ফটিক তো ওর নিজের বানানো নাম, তাই সেটা বললে কোনো ক্ষতি নেই।

'চুল ছেঁটেছিস কবে ?'

'অনেকদিন বাবু।'

'কাছে আয়।'

ওদিক থেকে কেষ্টদা জানান দিচ্ছে মামলেট রেডি।

'আপনার মামলেট আনি বাবু।'

ফটিক কেষ্টদার কাছ থেকে প্লেট এনে লোক দুটোর সামনে রাখল। তারপর দু-নম্বর থেকে নুন-মরিচ এনে তার পাশে রাখল। ষণ্ডা আর অন্য লোকটা এখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, ওর দিকে দেখছে না। ফটিক চার নম্বরের দিকে

চলে গেল। খদ্দের এসেছে।

লোক দুটো খাওয়া শেষ করে যখন ফটিককে পয়সা দেবে তখন ষণ্ডা লোকটা বলল, 'তোর হাতে চোট লাগল কী করে?'

'দেয়ালে ঘষটা লেগেছিল।'

'দিনে ক'টা মিথ্যে বলা হয় চাঁদু?'

লোকটাকে না চিনলেও, ওর কথাগুলো শুনতে ফটিকের ভালো লাগছিল না। ও ঠিক করল হারুনদা এলে ওকে বলবে।

'জবাব দিচ্ছ না যে?'

লোকটা এখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে। ঠিক এই সময় উপেনবাবু রাস্তার দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলেন। ফটিককে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হওয়াতে বললেন, 'কী হয়েছে?'

ফটিক বলল, 'বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন—'

'কী?'

'আমি কদ্দিন এখানে কাজ করছি তাই।'

উপেনবাবু ষণ্ডার দিকে চেয়ে বেশ নরম ভাবেই বললেন, 'কেন মশাই, কী দরকার আপনাদের?'

ষণ্ডা কিছু না বলে পয়সাটা টেবিলের উপর রেখে উঠে পড়ল আর সেই সঙ্গে অন্য লোকটাও। কাজের চাপে বিকেল হতে-না-হতে ফটিক লোক দুটোর কথা প্রায় ভুলেই গেল।

॥ ৮ ॥

বিকেল চারটে নাগাদ হারুন উপেনবাবুর দোকানে এল। সে ক'দিন থেকেই বলে রেখেছে সে কোথায় থাকে সেটা ফটিককে দেখিয়ে দেবে। উপেনবাবুকে বলাতে উনি রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, বাকি ঘন্টা তিনেকের কাজ কেষ্টর ছেলে সতু চালিয়ে নিতে পারবে। সতু মাসে তিনবার করে জ্বরে পড়ে; না হলে কাজ যে একেবারে জানে না তা নয়।

হারুন দোকান থেকে বেরিয়ে ফটিককে বলল, 'আজ এমন একটা আর্ট দেখাব তোকে যে তুই ব্যোম্‌কে যাবি।' কথাটা শুনে ফটিকের মন এমন নেচে উঠল যে, উলটো দিকের ফুটপাথের পানের দোকানের সামনে সকালের সেই দুটো লোককে ও দেখতেই পেল না।

হারুনদা ঝুলে ঝুলে বাসে চড়ে না, কারণ তাতে তার হাতের ক্ষতি হতে পারে। 'হাত না চললে পেট চলবে না রে ফটকে, তাই পদব্রজই বেস্ট।'

অনেক অলিগলি ছোটবড় মাঝারি রাস্তা পেরিয়ে হারুন আর ফটিক শেষটা ব্রিজের উপর পৌঁছাল, যেটার তলা দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন যায়। ব্রিজ থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গিয়ে একটা বস্তিতে পড়েছে। এই বস্তিতেই থাকে হারুনদা। ফটিক ব্রিজের উপর থেকেই দেখল, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বস্তিটা। দূরে এখানে-ওখানে কারখানার চিমনি দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছের উপর মাথা তুলে। বস্তিটাকে দেখে ফটিকের মনে হল, সেটা যেন একটা ধোঁয়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে রয়েছে। হারুনদা বলল, সেটা উনুনের ধোঁয়া ; সন্ধ্যের মুখে

ঘরে ঘরে উনুন জ্বলেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হারুন বলল, 'এখানে হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান সবরকম লোক থাকে, জানিস। আর তাদের মধ্যে এমন এক-একটা আর্টিস্ট আছে না—দেখলে তাক লেগে যায়। জামাল বলে একটা কাঠের মিস্তিরি আমার ঘরে এসে গান শুনিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আমি আমার চৌকিতে ঠেকা দিই। কোথায় আছি ভুলে যাই, এমনি তার আর্টের ভেল্‌কি।'

দু'দিকে খোলার ছাতওয়ালা বাড়ির মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে হারুনের বাড়ির দিকে। হারুন আর ফটিক পাশাপাশি হাঁটছে, আর এদিক-সেদিক থেকে আট-দশ-বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা হারুনকে দেখে লাফাচ্ছে, তালি দিচ্ছে, আর তার নাম ধরে ডেকে উঠছে। হারুন সব্বাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সঙ্গে নিয়ে নিল; বলল, 'আজ নতুন খেলা!'—'হো!—নতুন খেলা!'— বলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। হারুনদার যে এত বন্ধু আছে সেটা ফটিক জানতই না।

হারুনের ছোট্ট একটা ঘর, তাতে আলো বেশি আসে না, তাই বোধহয় হারুনদা এত রকম রঙচঙে জিনিস ঘরে সাজিয়ে টাঙিয়ে বিছিয়ে রেখেছে। কাপড়, কাগজ, পুতুল, ছবি, নকশা, ঘুড়ি সবকিছুই আছে। কিন্তু তাও দেখলে দোকান বলে মনে হয় না। যেখানে যেটা রাখলে মানায়, সেইটুকুই—তার বেশিও নয়, কমও নয়। ফটিক মনে মনে ভাবল, এটাও নিশ্চয়ই একটা দারুণ আর্ট। এছাড়া অবিশ্যি কাজের জিনিসও যতটুকু দরকার ততটুকু আছে। আর আছে হারুনের সেই বাক্স আর সেই থলি।

এত সব জিনিসের মধ্যে একটা জিনিস এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল, এবার বাতিটা জ্বালতেই সেটার দিকে চোখ গেল ফটিকের।

'ওটা কার ছবি হারুনদা?'

বাতিটার ঠিক নিচেই বেশ বড় ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছোট্ট ছবি। গোঁফে চাড়া দেওয়া ঢেউ-খেলানো চুলওয়ালা একজন লোক সোজা ফটিকের দিকে চেয়ে আছে। তার তলায় খুব ধরে ধরে পরিষ্কার করে কালো কালিতে লেখা—এন্‌রিকো রাস্‌টেলি।

হারুন একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ও আমার আরেক গুরু। চোখে দেখিনি কখনো। ইতালিয়ান সাহেব। আমি যে খেলা দেখাই ও-ও সেই খেলা দেখাত। জাগ্‌লিং। প্রায় একশো বছর আগে। একটা ম্যাগাজিন থেকে ছবিটা কেটে রেখেছিলুম। আমাকে তো চারটে বল নিয়ে খেলতে দেখলি—ও খেলত একসঙ্গে দশটা বল নিয়ে। ভাবতে পারিস? পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—একেবারে দশটা! লোকে দেখে একেবারে পাগলা হয়ে যেত।'

হারুনদা জাগ্‌লিং নিয়ে পড়াশুনা করেছে শুনে ফটিক অবাক হয়ে গেল। ও কি তাহলে ইংরিজি পড়তে পারে? 'ক্লাস এইট অবধি পড়েছিলুম ইস্কুলে', বলল হারুন। 'চন্দননগরে বাড়ি ছিল আমাদের। বাপের ছিল কাপড়ের দোকান। মাহেশের রথের মেলায় ভালো ভোজবাজি হচ্ছে শুনে চলে গেলুম দেখতে। দু'দিনের জন্য হাওয়া। ফাস্ কেলাস জাগ্‌লিং, জানিস। কিন্তু ফিরে আসতে বাপ দেখিয়ে দিলেন আরেকরকম জাগ্‌লিং। কাপড় কাটার ঢাউস কাঁচি হয় দেখেচিস? এই দ্যাখ তার রেজাল্ট।'

হারুন শার্ট তুলে পিঠে একটা গর্ত দেখিয়ে দিল।

'তিন হপ্তা লেগেছিল ঘা শুকুতে। তারপর একদিন মওকা বুঝে পকেটে এগারোটি টাকা আর কাঁধে পুঁটলি নিয়ে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লুম কাউকে কিচ্ছু না বলে। তিনবার ট্রেন বদল করে বিনি-টিকিটে ঝ্যাকড় ঝ্যাকড় করে তিন দিন তিন রাত্তির স্রেফ চা-বিস্কুট খেয়ে শেষটায় একদিন কামরার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি তাজমহল দেখা যাচ্ছে। নেমে পড়লুম। শহরে ঘুরতে ঘুরতে কেল্লায় গিয়ে হাজির হলুম। পেছনে মাঠ, তার পেছনে যমুনা, আর তারও পেছনে দূরে আবার দেখলুম তাজমহল। তারপরেই আমার চোখ গেল উলটো দিকে। কেল্লার গায়ে উপর দিকে বারান্দা, তার নিচে বাইবে ঘাসের উপর খেলা হচ্ছে। এক পাশে সাপ খেলছে, এক পাশে ভাল্লুক নাচছে, আর মধ্যিখানে, আসাদুল্লা দু-হাতে বল নাচাচ্ছে—তার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা!...ভক্তি কি সাধে হয় রে ফটকে? গায়ের লোম খাড়া হয়ে চোখে জল এসে গেস্‌ল। মানুষের এত খ্যামতা হয়?'

'কারা দেখছিল সেই খেলা?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

'সাহেব, মেমসাহেব,' বলল হারুন। 'ওই উঁচুতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, আর নিচের দিকে দশ টাকা পাঁচ টাকার করকরে নোট পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—কেউ সাপের দিকে, কেউ ভাল্লুকের দিকে, কেউ বল খেলার দিকে। বেশির ভাগ বলের দিকেই ছুঁড়ছে। এক ব্যাটা সাহেবের মাথা মোটা, সে ব্যাটা না-পাকিয়েই ছুঁড়েছে একটা দশ টাকার নোট বলের দিকে, আর দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে সেটাকে ফেলেছে একেবারে ফণা-তোলা গোখরোর ঝাঁপির মধ্যে। ওস্তাদ তখন চোখের বাঁধন খুলে ফেলেছে। সাহেব উপর থেকে চেঁচাচ্ছে, আমি বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঝাঁপির ভেতর ঘপাৎ করে হাত ঢুকিযে নোট বার করে এনে ওস্তাদের হাতে গুঁজে দিলাম। ওস্তাদ 'সাবাস বেটা—জিতে রহো' বলে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আমি হিন্দি-ফিন্দি জানি না—পকেট থেকে দুটো কাঠের বল বার করে এই তিন দিনে শেখা লোফার খেলা দেখিয়ে দিলাম। ব্যস—সেই দিন থেকে ওর দেহ রাখার দিনটা অবধি

আমি ওর ছায়ায়। তবু অ্যাদ্দিনেও লোকের সামনে সাহস করে চোখ বেঁধে খেলা দেখাতে পারিনি। আজ সেইটেই একবার চেষ্টা কবে দেখব।'

বস্তির ছেলেমেয়ের দল হারুনের দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। হারুন থলি নিয়ে বেরোল, ফটিক তার পিছনে। বাঁ দিকে ঘুরল হারুন। আট-দশটা ঘর পেরিয়ে একটা খোলা জায়গা, তার পিছনে একটা ডোবা আর তারও পিছনে একটা কারখানার পাঁচিল। হারুন ডান দিকে খোলা জায়গাটার মধ্যে যেখানটা জংলাটা কম, সেখানে বসে পড়ল আসন বিছিয়ে। ছেলেমেয়েদেব দল তার সামনে আর দু'পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারুন থলি থেকে বার করল একটা হলদের উপর কালো বুটি দেওয়া সিল্কের রুমাল। সেটা পাশেই দাঁড়ানো ফটিকের হাতে দিয়ে বলল,'বাঁধ্ তো দেখি বেশ করে।'

ফটিক রুমালটা দিয়ে হারুনের চোখ বেঁধে পিছিয়ে ভিড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় হারুন তার গুরুকে তিনবার সেলাম জানিয়ে প্রথমে দুটো আর তারপর তিনটে পিতলের বল নিয়ে এমন আশ্চর্য খেলা দেখাল যে, ফটিকের মনে হল, তার মন থেকে যদি আবার সব মুছে গিয়ে শুধু আজকের খেলাটাই থেকে যায়, তাহলে তাই নিয়েই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বলেই শেষ না। বল রেখে এবার বাঁধন না খুলেই হারুন থলি থেকে বার করল তিনটে ছুরি, যার আয়নার মতো ঝকঝকে ফলাগুলোতে বাড়ি-ঘর-গাছ-আকাশ সব-কিছু দেখা যাচ্ছে। ওই ফলাগুলো এবার নাচতে শুরু করল হারুনের হাতে। হারুনের সামনের আকাশ বাতাস চিরে ফালাফালা হয়ে গেল, কিন্তু একটিবারও ছুরিগুলো পরস্পরের গায়ে ঠেকল না, একটিবারও হারুনের হাতে একটি আঁচড়ও লাগল না।

বস্তির আকাশ যখন হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ছে, তখন ফটিক এগিয়ে গিয়ে হারুনের বাঁধন খুলতে গিয়ে পারল না, কারণ তার হাত কাঁপছে। হারুন বুঝতে পেরে হেসে নিজেই বাঁধন খুলে নিল। তারপর তার সরঞ্জাম থলিতে পুরে বাচ্চাদের দিকে ফিরে বলল, 'আজকের মতো খেল্ খতম। তোরা যে যার ঘরে ফিরে যা!'

ফটিকের কেন জানি মনে হচ্ছিল, এমন একটা খেলা দেখিয়ে হারুনের মুখে যতটা হাসি ফুর্তি থাকা উচিত ছিল, ততটা যেন নেই। হয়তো ওস্তাদের কথা মনে পড়ে তার মনটা ভারি হয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে তা নয়। ঘরে ফিরে এসে হারুন কারণটা বলল ফটিককে।

'দুটো লোক—বুঝলি ফটিক—বেপাড়ার লোক—দেখিনি কখনো—দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল তোর দিকে। বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াতেই চোখ গেছে আমার। লোক দুটোর ভাবগতিক ভালো লাগল না।'

কথাটা বলতেই ফটিকের ধক্ করে সেই দুটো লোকের কথা মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'একজন ষণ্ডা আর একজন রোগা কি ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। তুইও দেখলি ?'

'এখন দেখিনি, দুপুরে।'

ফটিক বলল দুপুরের ব্যাপারটা। শুনে হারুনের মুখটা থমথমে হয়ে গেল। 'কানে লোমটা একটু বেশি কি ?' হারুন জিজ্ঞেস করল। ফটিকের তক্ষুনি মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো ! সবচেয়ে আগে কানের দিকেই চোখ গিয়েছিল ফটিকের—এখন হারুনদা বলাতে মনে পড়েছে।

'শ্যামলাল', চোয়াল শক্ত করে বলল হারুন। 'ওপর দিকটা ষণ্ডা হলে কী হবে, পা দু'খানা ধনুকের মতো বাঁকা। দূর থেকে পা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। দাড়ি ছিল, কামিয়ে ফেলেছে। কানের দাড়িটা আর কামানোর কথা খেয়াল করেনি। বছর কয়েক আগে চিৎপুরের একটা চায়ের দোকানে যেতুম মাঝে মাঝে। সেখানে দেখিচি। চার বন্ধু ছিল। একের নম্বরের—'

হারুন হঠাৎ থেমে গিয়ে ভুরু কুঁচকে আবার বলল, 'দু'জন লোক মরে পড়েছিল গাড়িতে—তাই না ?'

ফটিক মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হারুনের মুখ কালো হয়ে গেল। বলল, 'যা আঁচ করেছিলাম তাই রে ফটিক। তোর বাপের অনেক পয়সা।'

বাবা-টাবার কথা বললে ফটিকের মনে কোনো ভাবই জাগে না, তাই ও চুপ করে রইল। হারুন তক্তপোশ ছেড়ে উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানালার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখে বলল, 'এখনো আছে। সিগারেট ধরাল।'

বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। ফটিকের মনে পড়ল ওকে বাড়ি ফিরতে হবে। সেই বেনটিং স্ট্রীটে। হারুনদা ওকে পৌঁছে দেবে বলেছে, কিন্তু লোক দুটোর যদি মতলব খারাপ হয়ে থাকে তাহলে ওদের দু'জনেরই মুশকিল হতে পারে।

হারুনদা আবার তক্তপোশে বসে পড়েছে। ওকে এত গম্ভীর কখনো দেখেনি ফটিক। 'আমার বাড়ি ফেরার কথা ভাবছ ?' ফটিক জিজ্ঞেস করল।

হারুন বলল, 'বাড়ি ফেরার অন্য রাস্তা আছে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে লখা মিস্তিরির ঘরের ভেতর দিয়ে ওদিকের গলিটা ধরব। শ্যামলাল টের পাবে না। যদ্দূর মনে হয়, তল্লাটটা ও ভালো চেনে না। তোকে ধাওয়া করে এসে পড়েচে। না, ওটা চিন্তা না। চিন্তা তোর হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে।' হারুন একটু

থামল। তারপর ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'তোর এখনো কিচ্ছু মনে পড়েনি ?'

ফটিক মাথা নাড়ল।—'কিচ্ছু না হারুনদা। মনে-পড়া কাকে বলে তাই জানি না।'

হারুন হাঁটুতে একটা চাঁটি মেরে উঠে পড়ল। তারপর ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে রেখে দরজায় একটা তালা এঁটে ফটিককে নিয়ে সামনের দরজার দিকে না গিয়ে উলটো দিকে ঘুরল।

॥ ৯ ॥

পরের রবিবারের সকাল।

ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যালের বাড়িতে আজ মিটিং বসেছে বৈঠকখানায়। প্রায় ষাট বছরের পুরনো অভিজাত বাড়ির প্রকাণ্ড ড্রইংরুম। ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালে যাঁর বাঁধানো ছবি রয়েছে, তাঁরই কীর্তি এই বাড়ি। ইনি শরদিন্দু সান্যালের পরলোকগত পিতৃদেব দ্বারকানাথ সান্যাল। ছেলে বাপেরই পেশা নিয়েছেন, তবে বাপের মতো এত অঢেল রোজগারের ভাগ্য তাঁর কখনো হয়নি। শোনা যায় দ্বারিক সান্যালের এক সময় আয় ছিল গড়ে দিনে হাজার টাকা।

আগের দিনের চেয়ে আজ যেন মিস্টার সান্যালের দাপটটা একটু কম। আসলে এতদিনেও গুণ্ডাদের কাছ থেকে কোনো হুমকি চিঠি না পেয়ে তিনি একটু ধাঁধায় পড়েছেন। সেই সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাটাও আরো বেড়ে গেছে। আজ শুধু মিস্টার সান্যাল ও দারোগা সাহেব নন—ঘরে আরো দু'জন লোক রয়েছেন, মিস্টার সান্যালের দুই ছেলে, মেজো আর সেজো। বড়টিও এসেছিল, তবে দু'দিনের বেশি থাকতে পারেনি, দিল্লীতে তার একটা জরুরী মিটিং আছে।

মেজো ছেলে সুধীন্দ্রই এখন কথা বলছে। বছর ছাব্বিশেক বয়স, রং ফরসা, আজকের ফ্যাশানের ঝুলপিটা বড়, আর চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। সুধীন্দ্র বলছে, 'মেমরি লসের অনেক ইয়ে তো বিলিতি ম্যাগাজিনে পড়া যায় বাবা। এটা তো হতেই পারে। তুমি যে কেন বিশ্বাস করছ না সেটা আমি বুঝতেই পারছি না। অ্যামনিসিয়ার কথা পড়নি ?'

সেজো ছেলে প্রীতীন কিছুই বলছে না। হারানো ভাইয়ের সঙ্গে নিজের বয়সের তফাতটা সবচেয়ে কম বলেই বোধহয় প্রীতীনের মনটা অন্যদের চেয়ে বেশি ভারি। ও বাবলুকে ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছে, মোনোপলি শিখিয়েছে, দরকার হলে অঙ্ক বুঝিয়ে দিয়েছে, এই সেদিনও সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেছে।

প্রীতীন খড়গপুর চলে যাবার পর থেকে অবিশ্যি দু-ভাইয়ের দেখা কমে গেছে। এখন যে প্রীতীন মাঝে মাঝে দু-হাতের তেলো দিয়ে কপালে আঘাত করছে তার কারণ ওর বিশ্বাস, ও কলকাতায় থাকলে বাবলুকে এইভাবে কিডন্যাপ করা সম্ভব হত না। ওব কেন যে এরকম ধারণা হল সেটা বলা মুশকিল, কারণ ও সেই সময় কলকাতায় থাকলেও ভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকত না। বাবলু ফিরছিল ইস্কুল থেকে। বাড়ি কাছে হাওয়ায় বৃষ্টি না থাকলে ও হেঁটেই ফেরে। সঙ্গে থাকে ওর বন্ধু পরাগ—যার বাড়ি ওর তিনটে বাড়ি পরেই। সেদিন ইস্কুল ছুটি ছিল, কিন্তু ইস্কুলেবই খেলার মাঠে শিশুমেলা হবে কয়েকদিনের মধ্যেই, তাই কিছু ছেলেকে বাছাই কবা হয়েছিল তার তোড়জোড়ে সাহায্য করার জন্য। বাবলু ছিল তাদের মধ্যে একজন। পরাগ ছিল না। তাই বাবলু সেদিন একাই বাড়ি ফিরছিল বিকেল সাড়ে-পাঁচটার সময়। সেই সময় তাকে ধরে নিয়ে যায় গুণ্ডাব দল একটা নীল রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে। ঘটনাটার একজন সাক্ষীও ছিল. পোদ্দারদের বাড়ির বুড়ো দারোয়ান মহাদেও পাঁড়ে।

'তাই যদি হয়,' মিস্টার সান্যাল একটু ভেবে বললেন, 'তাহলে তো সে ছেলে বাড়ি ফিরে এলে কাউকে চিনতেই পারবে না।'

'সেটারও ট্রিটমেণ্ট হয়,' সুধীন্দ্র বলল। 'লস্ট মেমরি ফিরিয়ে আনা যায়। তুমি এ বিষয়ে ডক্টর বোসকে কনসাল্ট করে দেখতে পার। আর এখানে যদি সে-রকম স্পেশালিস্ট না থাকে, বিদেশে নিশ্চয়ই আছে।'

'তাহলে—' মিস্টার সান্যাল সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তিনি তাঁর কথা শেষ করার আগেই দারোগা মিস্টার চন্দ বললেন, 'আমি যেটা বলছি সেটাই করুন স্যার। অ্যাদ্দিনেও যখন তারা কোনো উচ্চবাচ্য করল না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনার ছেলে অন্য কোথাও আছে। আর সে যদি সব-কিছু ভুলে গিয়েই থাকে, তাহলে তো সে আর নিজে থেকে বাড়ি ফিরবে না। তাই বলছি, আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। রিওয়ার্ড অফার করুন। তারপর দেখুন কী হয়। এতে তো আর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না আপনার।'

'ওই লোক দুটোর কোনো হদিশ পেলেন?' মিস্টার সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে হয় তারা কলকাতাতেই আছে,' বললেন দারোগাসাহেব, 'তবে খোঁজ যাকে বলে সেটা এখনো ঠিক...'

শরদিন্দু সান্যাল ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাতটা চালিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে তাই করা যাক্। বলু, তুই কালকেব দিনটা থেকে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাটা করে দে। পিটু ছেলেমানুষ, পারবে না।'

সুধীন্দ্র মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। প্রীতীন্দ্র অপমানবোধে একটু নড়েচড়ে

বসল।

'ক'টা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার কথা বলছেন আপনি?'

প্রশ্নটা দারোগাসাহেবকে করলেন মিস্টার সান্যাল। চন্দ বললেন, 'পাঁচটা তো বটেই—মিনিমাম। ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিনটে ভাষাতেই দেওয়া উচিত। আমি হলে উর্দু আর গুরুমুখীটাও বাদ দিতাম না। কোন্ দলে গিয়ে পড়েছে আপনার ছেলে সে তো জানার উপায় নেই।'

'ওর একটা ছবিও দিতে হবে তো?'

এবার প্রীতীন্দ্র কথা বলল।

'আমার কাছে ছবি আছে বাবলুর। লাস্ট ইয়ার দার্জিলিং-এ তোলা।'

'দেওয়াই যখন হচ্ছে', বললেন মিস্টার সান্যাল, 'তখন ভালো করে চোখে পড়ার মতো বিজ্ঞাপন হয় যেন। খরচটা কোনো কথা না।'

॥ ১০ ॥

আজ সকাল থেকেই ফটিকের মনটা চনমনে। আজ হারুনদা প্রথম ময়দানে চোখ বেঁধে জাগ্‌লিং দেখাবে। সেদিন থেকে হারুন রোজই নিয়মমতো উপেনবাবুর দোকানে এসেছে। আগে একবার করে আসত, এ ক'দিন দু-বেলা এসেছে। সেদিন ওর বাড়ি থেকে ফিরতে ফটিকদের কোনো অসুবিধা হয়নি। শ্যামলাল আর সেই লোকটা ওদের পিছু নেয়নি।

হারুন যে কলকাতার অলিগলি কী-রকম ভালোভাবে জানে সেটা ফটিক সেদিন বুঝতে পেরেছে। লোকগুলো পিছু নিলেও হারুনের চরকিবাজির চোটে হিমসিম খেয়ে যেত।

হারুন প্রতিবার এসেই ফটিককে জিজ্ঞেস করেছে সেই দুটো লোক আর এসেছিল কিনা। কিন্তু তারা আর আসেনি। দোকানের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে কিনা সেটা ফটিক জানে না, কারণ রোজই তাকে সকাল থেকে রাত অবধি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বাইরে গিয়ে দু-দণ্ড দাঁড়াবারও সময় পায়নি। এ ক'দিনে তার কাজ আরো অনেকটা সড়গড় হয়ে এসেছে। গোড়ায় রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে বুঝতে পারত হাত দুটোতে একটা অবশ ভাব, কিন্তু গত ক'দিন সেটাও হয়নি। এমন-কি বিষ্যুদবার থেকেই ও কাজের পর খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় বসে দুটো কাঠের বল নিয়ে লোফালুফি অভ্যাস করেছে। বল দুটো হারুনদাই এনে দিয়েছে, একটা হলদে একটা লাল। কী করে লুফতে হয় সেটাও হারুনদা শিখিয়ে দিয়ে বলেছে, 'তুই যে আর্টটা শিখছিস সেটা পাঁচ হাজার বছর আগেও মিশরদেশে ছিল। পাঁচ হাজার কী বলছি—সৃষ্টির আদি থেকে ছিল। লক্ষ লক্ষ

কোটি কোটি বছর আগে।' ফটিক অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাবল হারুনদা বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু হারুন বুঝিয়ে দিল।

'এই যে পৃথিবী—এটাও তো একটা বল। আরো যত গ্রহ আছে—মঙ্গল বুধ বিষ্যুদ শুক্কুর শনি—সব এক-একটা বল। আর সব ব্যাটা ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে। আবার চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। অথচ কেউ কারুর গায়ে গায়ে লাগছে না। ভাবতে পারিস ? এর চেয়ে বড় জাগ্‌লিং হয় ? রাত্তিরে আকাশের দিকে চাইলেই বুঝবি কী বলছি।...বল দুটো যখন হাতে নিবি, তখন এই কথাটা মনে রাখিস।'

কিন্তু লোক দুটো না এলেও ফটিক বুঝতে পারছে যে হারুনদার মনে একটা ভয় ঢুকে গেছে যেটা সহজে যাবার নয়। এক এক সময় মনে হয় শুধু ভয় না, আরো কিছু ; কিন্তু সেটা যে কী সেটা ফটিক বুঝতে পারে না। ও খালি লক্ষ করে যে হারুনদার চোখের জ্বলজ্বলে ভাবটা মাঝে মাঝে চলে গিয়ে চোখ দুটো কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

এসব কথা অবিশ্যি ময়দানে গিয়ে আর ফটিকের মনে হয়নি। হারুন গত রবিবারে যেখানে খেলা দেখিয়েছিল, সেখানে আজ আগে থেকেই ছেলের দল ভিড় করে রয়েছে। ফটিক তাদের কয়েকজনকে দেখেই চিনল। ওই যে সেই মুখে বসন্তের দাগওয়ালা কানা ছেলেটা ; ওই যে সেই বেঁটে বামুনটা যাকে দূর থেকে দেখলে বাচ্চা মনে হয়, আর কাছে এসেই গোঁফদাড়ি দেখে চমকে যেতে হয় ; আর ওই যে সেই লুঙ্গিপরা ঢ্যাঙা ছেলেটা যার দাঁত সবসময় বেরিয়ে থাকে। হারুনকে দেখেই ছেলের দল হাততালি দিয়ে হৈ-হৈ করে উঠল।

হারুন তার জায়গায় বসে একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিল। ফটিক জানে কেন। পশ্চিমের আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি এলে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। হে ভগবান—যেন বৃষ্টি না হয়, যেন হারুনদা আজ চোখ বেঁধে খেলা দেখিয়ে এদের চোখ টেরিয়ে দিতে পারে, যেন সে আজ আঠারো টাকা বত্রিশ পয়সার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করতে পারে। ইস্, কয়েকটা সাহেব-মেম ভিড়ের মধ্যে থাকলে বেশ হত ! এখানে কে ফেলবে দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোট !

দূর থেকে আসা একটা মেঘের ডাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হারুন তার খেলা শুরু করে দিল। আজ থুতনির উপর লাট্টুর খেলাটা শেষ করে হারুন ভিড়ের মধ্যে থেকে ইশারা করে ফটিককে কাছে ডাকল। লাট্টুটা তখনো হারুনের তেলোতে ঘুরছে। ফটিক আসতেই হারুন তাকে হাত পাততে বলে নিজের হাত থেকে লাট্টুটা ফটিকের হাতে চালান দিয়ে বলল, 'ধর এটা।'

তেলোতে সুড়সুড়ি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফটিকের সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে আজ হারুনদার অ্যাসিস্ট্যান্ট, হারুনদার শিষ্য !

হারুন এবার আরেকটা ঘুরন্ত লাট্টু ডান হাতে নিয়ে অন্যটা ফটিকের হাত থেকে নিজের বাঁ হাতে নিয়ে নিল। তারপর যতক্ষণ দুটো লাট্টুতে দম থাকে, ততক্ষণ চলল চোখ-ধাঁধানো ঘুরন্ত লাট্টুর জাগ্‌লিং।

তারপর এমনি বলের খেলা শেষ হলে ফটিকের আবার ডাক পড়ল। হারুনদা থলি থেকে বুটিদার সিল্কের রুমালটা বার করে ফটিকের হাতে দিল। ফটিক রুমাল দিয়ে হারুনের চোখ ঢাকতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা হৈ-হৈ রব উঠল। অন্ধকার হয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু ফটিক জানে তাতে কিছু এসে যাবে না ; হারুনদার চোখেও এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। এ খেল্ দেখাতে হারুনদার আলোর দরকার হয় না।

দু' বলের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফটিক বুঝেছে যে, আজকে আগের দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পড়বে। অনেক নতুন লোক এসে জমা হয়েছে এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

হারুন থলে হাতড়ে তিন নম্বর পিতলের বল বার করল। বেশ জোরে একটা মেঘের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ-বাঁধা হারুন ওস্তাদের উদ্দেশে সেলাম জানিয়ে বল আকাশে ছুঁড়ল। বল চার পাক ঘোরার পর পাঁচ পাকের বেলা ফটিকের চোখের সামনে যেটা ঘটল, তার চেয়ে যদি আকাশ ভেঙে ওর মাথায় পড়ত তাতে ওর কষ্ট অনেক কম হত।

ঠিক হারুনদার মাথার উপরে একটা বল আরেকটা বলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একটা সাতচড়া কান-ফাটানো শব্দ করে ছিটকে গিয়ে পড়ল দু'দিকে ঘাসের উপর।

আরো অবাক এই যে, যে লোকগুলো এতক্ষণ হারুনকে তারিফ করছিল, তালি দিচ্ছিল, সাবাস দিচ্ছিল, তারা হঠাৎ রাক্ষস হয়ে গিয়ে বিকট সুরে হেসে উঠে সেই একই হারুনকে দুয়ো দিতে লাগল।

তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিড় উধাও হয়ে গিয়ে জায়গাটা খালি হয়ে গেল। এদিকে হারুন নিজেই চোখের বাঁধন খুলে থলির মধ্যে তার খেলার সরঞ্জাম তুলে ফেলেছে। ফটিক পয়সাগুলো তুলতে যাচ্ছিল, হারুন তার দিকে একটা ধমক ছুঁড়ে সেটা বন্ধ করে দিল। তারপর ঘাসের উপর বসেই একটা বিড়ি ধরাল। ফটিক তার পাশে গিয়ে বসল। নিজে থেকে কিছু বলার সাহস নেই তার ; সে ইচ্ছেও নেই। চৌরঙ্গী থেকে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, যা এর আগের দিন, বা একটুক্ষণ আগে পর্যন্ত ফটিকের কানেই যায়নি। দুটো টান দিয়ে বিড়িটাকে ঘাসের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হারুন বলল, 'মনের সঙ্গে হাতের এমন যোগ না রে ফটিক—একটা গুম্‌সে গেলে অন্যটাও খেলতে চায় না।...যদ্দিন না তোর একটা হিল্লে হচ্ছে তদ্দিন ব্লাইন্ড জাগ্‌লিং এস্টপ্।'

কী বলছে এসব আবোলতাবোল হারুনদা ? বেশ তো আছে ফটিক। আবার কী হিস্ট্রির দরকার ? হারুন বলে চলল, 'সেদিন শ্যামলালকে দেখার পর থেকেই তোর ঘটনাটা একটা ছকে এসে গেছে। লোকগুলো তোকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তোকে কোনো একটা গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখে তোর বাবার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে তবে তোকে ছাড়ত। ওদের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যায় গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। শ্যামলাল আর আরেক ব্যাটা বেঁচে যায়, অন্য দুটো মরে। তোকে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতে দেখে শ্যামলালের হয়তো ধারণা হয়েছিল তুইও মরে গেছিস, তাই তোকে ফেলেই পালায়। তারপর সেদিন উপেনদার দোকানে গিয়ে দ্যাখে ফসকে-যাওয়া শিকার আবার হাতের কাছে এসে গেছে।

'সেদিন তোকে পৌঁছে বাড়ি ফিরে এসে দেখি দু' ব্যাটা তখনো ঘুরঘুর করছে। এগারোটা পর্যন্ত ছিল, তারপর চলে যায়। আমি পেছনে ধাওয়া করি, করে ওদের ডেরাটা জেনে নিই। পুলিশে বললে ওরা ধরা পড়ে যায়, কিন্তু ওদের ধরিয়ে দিলেই তো আর খেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। আমার উচিত তোকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।'

'না না, হারুনদা।'

'জানি। তোর মন আমি জানি। তাই তো কিছু করতে পারছি না। আর সত্যি বলতে কী, তোর পরিচয়টা জানা হয়ে গেলে অন্য কথা ছিল। এখন তোকে পুলিশে দেওয়া আর একটা রাস্তার কুকুরকে পুলিশে দেওয়া একই ব্যাপার।'

কথাটা শুনে ফটিকের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ও বলল 'রাস্তার কুকুর কাঠের বল নিয়ে জাগলিং করতে পারে ?'

'তুই অভ্যেস করছিস ?' হারুন জিজ্ঞেস করল, এই প্রথম ফটিকের দিকে সোজা তাকিয়ে, এই প্রথম একটু হেসে।

'করছি না ?'—ফটিকের অভিমান এখনো যায়নি।- 'সারাদিন কাজের পর রাত্তিরে ঘুমোনোর আগে এক ঘন্টা রোজ।' ফটিক পকেট থেকে বল দুটো বার করে হারুনকে দেখিয়ে দিল।

'গুড', বলল হারুন। 'দেখি, আর দুটো দিন দেখি। কেউ যদি তোর খোঁজখবর না করে তো তোকে সঙ্গে নিয়েই যাব।'

'কোথায় ?'—ফটিক অবাক। হারুনদা যে আবার কোথাও যাবার কথা ভাবছে সেটা ও এই প্রথম শুনল।

'এখনো ঠিক করিনি। কাল সেই ভেঙ্কটেশের একটা চিঠি পেয়েছি আসতে লিখেছে। এইভাবে মাটি থেকে পয়সা কুড়িয়ে নিতে আর ভালো

লাগছে না রে। অনেক দিন তো—'

'তোমার এই খুদে সাকরেদটি কে হে?'

কথাটা এমন আচমকা এল যে ফটিকের মনে হল তার কলজেটা এক লাফে গলার কাছে চলে এসেছে।

সেই দুটো লোক অন্ধকারে পিছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছে। ফটিকের ডান

কাঁধের পাশে এখন শ্যামলালের ধনুকের মতো বাঁকা প্যান্ট-পরা বাঁ পা।

এবার ফটিক দেখল তার কানের পাশ দিয়ে একটা ছুরির ফলা এগিয়ে গিয়ে তার আর হারুনের মাঝখানে এসে থেমে গেল।

হারুনদাও আড়চোখে দেখছে শ্যামলালের দিকে।

'রোঘো—চাকতিগুলো তুলে নে। নন্দর দোকানের দেনাটা শোধ হয়ে যাবে।'

অন্য লোকটা পয়সাগুলো তুলতে আরম্ভ করে দিল।

'কী হে, আমার কথার—'

শ্যামলালের কথা শেষ হল না। ফটিক দেখল চারটে পিতলের বল, চারটে ছোরা আর দুটো বোমা লাট্টু সমেত হারুণদার থলিটা মাটি থেকে হাউয়ের মতো শূন্যে উঠে গিয়ে শ্যামলালের থুতনিতে লেগে তাকে পাঁচ হাত পিছনে ছিটকে ফেলে দিল।

'ফট্‌কে।'

হারুনদার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ফটিক দেখল সে-ও থলিটার মতো শূন্যে উঠে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে হারুনের বগলদাবা হয়ে। এদিকে ধুলোর ঝড় উঠেছে শহীদ মিনারের চারদিকে, আর ময়দানের যত লোক সব ছুটে চলেছে চৌরঙ্গীর দিকে বৃষ্টির প্রথম ঝাপটা থেকে রেহাই পাবার জন্য।

'ছুটতে পারবি ?'

'পারব।'

ফটিক বুঝল তার পায়ের তলায় আবার মাটি, আর বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই তার পা-ও চলতে লাগল হারুনের সঙ্গে পা মিলিয়ে গাড়িগুলোর দিকে।

'ট্যাক্সি !'

একটা ব্রেক কষার শব্দ। ফটিকের সামনে একটা কালো গাড়ির দরজা খুলে গেল।

'সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ !'

সামনে অন্য গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস, স্কুটার। হারুন ফটিক দু'জনেই পাশ ফিরে দেখছে শ্যামলাল আর রঘুনাথ দৌড়ে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মধ্যে। এখনো দিনের আলো আছে, তবে রাস্তায় আর দোকানে বাতি জ্বলে গেছে।

ট্যাক্সি সামনে ফাঁক পেয়ে রওনা দিল। হারুন ড্রাইভারকে বলল, 'বাড়তি পয়সা দোব ভাই—একটু তেজ লাগান।'

বাঁয়ে ঘুরে চৌরঙ্গী ধরে ট্যাক্সি এগিয়ে চলল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। সামনে চৌমাথা। ধরমতলার মোড়। বাতি লাল ছিল; ফটিকদের ট্যাক্সি পৌঁছতে সবুজ হয়ে গেল। গাড়ি মোড় পেরিয়ে বিজলি-আপিস বাঁয়ে ফেলে

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর চওড়া রাস্তা ধরল। রবিবার, তাই ভিড় কম। ফটিক বুঝল তার কানের পাশ দিয়ে শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

'আরো জোরে ভাই—পেছনে গণ্ডগোল।'

হারুনের কথায় ফটিক মাথা ঘুরিয়ে পিছনের কাঁচ দিয়ে দেখল আরেকটা ট্যাক্সির জোড়া আলো ক্রমে বড় হয়ে তাদের দিকে ধাওয়া করে আসছে।

'হারুনদা—ওরা ধরে ফেলবে আমাদের!'

'না, ফেলবে না।' ফটিকের কান বাতাসে বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। জোড়া আলো আবার ছোট হচ্ছে। এবার ঝাপসা হয়ে গেল, কারণ কাঁচে বৃষ্টি পড়ছে। ফটিক সামনের দিকে ফিরল। সামনের কাঁচেও বৃষ্টি। সামনেও জোড়া জোড়া গোল আলো একটার পর একটা হুশ্ হুশ্ করে ট্যাক্সির পাশ দিয়ে বেরিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে।

এবার একটা জোড়া আলো যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। গাড়ি নয়, বাস। ধুমসো বাস। দৈত্যের মতো বাস। রাক্ষসের মতো বাস। ওই দুটো ওর চোখ। ক্রমে বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে। হতে হতে বাসটা হঠাৎ লরি হয়ে গেল। দু'পাশের বাড়িগুলো আর নেই...আলোগুলো আর নেই। তার বদলে অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার, জঙ্গল, জঙ্গল, জঙ্গল...

'কী হল ফট্‌কে ? এলিয়ে পড়লি কেন ? কী হল ?'

হারুনের প্রশ্নটা একরাশ ফিরে আসা শব্দের মধ্যে হারিয়ে গেল। প্রথমেই সেই গাড়িতে গাড়িতে লাগার কানফাটা শব্দ—যার পরেই ওর মনে হয়েছিল ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় উড়ছে। সেটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কানে তালা লেগে যাওয়ার ভাব হল, আর তারপরেই তার বারো বছর তিন মাসের জীবনে যা-কিছু ঘটেছিল সব যেন হুড়মুড় করে এসে তাকে ঘিরে ধরে বলল—আমরা এসেছি, যখন চাও, যাকে চাও বেছে নাও। তারাই বলল, তোমার ভাল নাম নিখিল, ডাকনাম বাবলু, তোমার বাবার নাম শরদিন্দু সান্যাল ; তোমার তিন দাদা, এক দিদি ; দিদির নাম ছায়া। দিদি বিয়ে করে চলে গেছে বরের সঙ্গে সুইটজারল্যান্ড। তারাই বলল তোমার ঠামা তোমাদের বাড়ির দোতলায় বারান্দার শেষের বাঁ দিকের ঘরটাতে—রাতদিন পুজোর ঘরে খুটুং খাটুং—নাকের উপর চশমা এঁটে ইয়া মোটা কাশীরামের ছেঁড়া পাতার উপর ঝুঁকে পড়ে সুর করে দুলে দুলে পড়া ঠামা...ছোড়দা বলল, 'এই দ্যাখ, ড্রাইভ মারার সময় রিস্ট কী ঘোরে,' আর অঙ্কের স্যার মিস্টার শুক্‌লা বলছে, 'স্টপ ইট মনমোহন!'—মনমোহনের গোল মুখ গোল মাথায় এত সরু বুদ্ধি—যতবার বিক্রমটা পেনসিল কেটে ডেস্কের উপর রাখছে, ও পিছন থেকে কাগজের নল পাকিয়ে ফুঁ দিয়ে সেটাকে গড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। সবচেয়ে হাসি পায়

মনে করলে, দিদির বিয়েতে গ্রামোফোনে বিসমিল্লার সানাই, আর পুরনো রেকর্ড ফাটা জায়গায় এসে প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও প্যাঁও একই জিনিস বারবার আর তাই শুনে সামিয়ানার তলায় যত লোক সব খাওয়াটাওয়া ফেলে হো হো হো হো— । আর হ্যাঁ, দার্জিলিং তো মনে পড়েই, আর তার আগের বছর পুরী, তার আগে মুসুরি, তার আগে আবার দার্জিলিং, আর তারও অনেক অনেক আগে ছোটবেলায় ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে পায়ের তলায় বালি সরে সরে যাচ্ছে আর সুড়সুড়ি লাগছে আর মনে হচ্ছে ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে সরসর সরসর করে সরে যাচ্ছে, আর মা যেই বললেন, পড়ে যাবে বাবলু সোনা, অমনি ধপাস্ ঝপাং !—মা'র কথা অবিশ্যি বেশি মনে নেই । এখন খালি একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি । এখন বাড়িতে লোক আর নেই । এত বড় বাড়ি আর তিনজন মাত্র লোক । ছোটকাকার তো মাথাই খারাপ । আগে ছিল বাড়িতেই, যখন মাথা ঠিক ছিল । এখন লুম্বিনীতে । ...

ও আবার শুনতে পেল ট্যাক্সির শব্দ । বাইরের রাস্তার আলো দেখতে পেল । হারুনদা—হ্যাঁ, ওই তো হারুনদা—ওর পাশের জানালার কাঁচটা তুলে দিল ।

'ভয় পেলি নাকি—অ্যাই ফট্‌কে,' হারুনদা বলছে । 'আর ভয় নেই । ওরা আর নেই পেছনে ।'

ও শুনতে পেল, পাশের বাড়ির রাইট সাহেবদের অ্যালসেশিয়ানটা ভারি গলায় ঘেউ-ঘেউ করছে । কুকুরের নাম ডিউক । ও ডিউককে ভয় পায় না । ওর ভীষণ সাহস । ও রাত্রে একা শোয় । একবার দার্জিলিং-এ ও বার্চ হিলের রাস্তা দিয়ে অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল । ও তখন একা । ওর মনে আছে ও ভয় পায়নি ।

'শরীর খারাপ লাগছে ? না মন খারাপ ?' হারুনদা জিজ্ঞেস করছে ।

ও মাথা নাড়ল ।

'তবে কী ?'

ও হারুনদার দিকে চাইল । বাইরে বৃষ্টি পড়ছে । ট্যাক্সি চলছে এখনো । কাঁচ তোলা, তাই আস্তে বললেও কথা শোনা যায় । ও আস্তেই বলল ।

'সব মনে পড়ে গেছে হারুনদা ।'

॥ ১১ ॥

ওরা দু'জন এখন চিৎপুরের একটা দোকানে বসে রুটি-মাংস খাচ্ছে । ও জানে এ-রকম জায়গায় এসে ও কোনোদিন খায়নি, হারুনদার সঙ্গে না এলে হয়তো

কোনোদিন আসত না। হারুনদা এতক্ষণ ওকে জিজ্ঞেস করে করে সব জেনে নিয়েছে। ইস্কুল থেকে ফেরার সময় লোকগুলো কী করে ওকে রাস্তা থেকে ছিনিয়ে তুলে নিল, তাও বলেছে।

'লাউডন স্ট্রীটে তোর বাড়িতে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবি ?' হারুন জিজ্ঞেস করল। 'ও তল্লাট আমার চেনা নেই।'

ও হেসে উঠল।—'আরেব্বাস, খুব সহজ।'

'হুঁ...'

হারুন একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আজ রাত করে যাবার দরকার নেই। আর তোর চেহারাটাকেও একটু ফিরিয়ে নিতে হবে। চুলটা আর একটু বড় হলে ভালো হতো, কিন্তু উপায় নেই। কাল পরিষ্কার প্যান্ট-শার্ট পরে রেডি থাকবি। আমি সক্কাল সক্কাল এসে পড়ব। উপেনদাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। আমি পরে ম্যানেজ করব।'

ও এখনো কিছুই ভালো করে ভাবতে পারছে না। বাড়ি তো যেতেই হবে। বাবা আছে, মামা আছে, হরিনাথ বুড়ো চাকর আছে। হরিনাথ ওর সব কাজ করে দেয়। ও চায় না, তা-ও করে দেয়। ওর রাগ হয়, কিন্তু হরিনাথ বুড়ো বলে কিছু বলে না। তারপর ইস্কুল আছে, রাম খেলাওন দারোয়ান, মিস্টার শুকুল হেডমাস্টার, পি-টি মাস্টার মিঃ দত্ত, ওর ক্লাসের বন্ধুরা—অঞ্জন, প্রীতম, রুসি, প্রদ্যোত, মনমোহন। একবার সেই চাঁদপাল ঘাট থেকে স্টীমার করে বোটানিক্স-এ পিকনিক...

ওর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল, আর তক্ষুনি সেটা হারুনদাকে না বলে পারল না।

'আমাদের বাড়ির একতলায় একটা ঘর আছে, কেউ থাকে না হারুনদা! খালি একটা পুরনো আলমারি আর একটু পুরনো ভাঙা টেবিল রয়েছে। ওগুলো সরিয়ে দিলেই তুমি থাকতে পারবে।'

হারুন একবার আড়চোখে ওর দিকে দেখে নিল। তারপর রুটির আধখানা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে বলল, 'আমার বস্তির ঘরের মতো করে সাজিয়ে নিতে দেবে তোর বাবা ?'

বাবার চেহারাটা মনে করে ও যে খুব ভরসা পেল তা নয় ; কিন্তু তাহলে কি হয় ? মানুষ তো বদলাতে পারে। তাই ও বলল, 'কেন দেবে না ? নিশ্চয়ই দেবে।'

'ভেরি গুড', বলল হারুন, 'তাহলে বলব তোর বাবা খাঁটি আর্টিস্ট। খলিফ হারুনের খেয়ালগুলো আর্টিস্ট ছাড়া কেউ বুঝবে না।'

॥ ১২ ॥

খবরের কাগজের সব-কিছুই যে সবাই পড়ে বা দেখে তা নয়। বিশেষ করে সাঁতরাগাছির কাছে একটা বিশ্রী রেল-দুর্ঘটনার খবর কাগজের সামনের পাতার অনেকখানি জুড়ে থাকায় অনেকেরই আর পিছনের পাতায় বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েনি। যাদের পড়েছে তারা সকলেই স্বীকার করল যে ব্যারিস্টার শরদিন্দু সান্যাল তাঁরা হারানো ছেলেকে ফিরে পাবার আশায় যে পুরস্কারটা ঘোষণা করেছেন, সেটা তাঁর মতো ধনী লোকের পক্ষে বেশ মানানসই হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা মুখের কথা নয়।

উপেনবাবু বিজ্ঞাপনটা দেখেননি। হারুন নিয়মিত কাগজ না পড়লেও একবার অন্তত উলটে-পালটে দেখে সকালে সিংহিমশাইয়ের চায়ের কেবিনে বসে। আজ সেটা হয়ে ওঠেনি, কারণ তার সে মেজাজ ছিল না। ভোর সাড়ে-পাঁচটায় উঠে কোনোমতে এক কাপ চা খেয়ে সে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেছে ফটিকের কাছে। এখন বোধহয় আর ফটিক বলাটা ঠিক নয়; কিন্তু হারুনের কাছে ওই নামটাই ওর নাম। নিখিল নয়, বাবলু নয়, এমন কি সান্যালও নয়। ওর নাম ফটিকচন্দ্র পাল।

উপেনবাবু অবিশ্যি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন হারুন ফটিককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। তাতে হারুন বলল, 'একটু সাহেবপাড়ায় যাচ্চি উপেনদা; ফিরে এসে সব বলব।' উপেনবাবু জানেন, হারুনের মাথায় মাঝে মাঝে ছিট দেখা দেয়। তবে লোকটা ভালো, তাই ওকে আর কিছু না বলে কেষ্টর ছেলে সতুর দিকে ফিরে বললেন, 'আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে হবে না। কাজ আছে, হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে।'

॥ ১৩ ॥

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর ক্লার্ক রজনীবাবুকে বললেন, 'আজকাল কাগজ আর ছাপা যা হয়েছে—এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ।...বাবলুর এমন সুন্দর ছবিটাকে এইভাবে ছেপেছে?'

'আপনি এইটে দেখেছেন স্যার?'—বলে রজীনবাবু একটা ইংরিজি কাগজ মিস্টার সান্যালের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'ওতে কিন্তু বাবলু বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।'

শরদিন্দু সান্যালের সামনে ডাঁই করা খবরের কাগজে। রজনীবাবুকে বলাই ছিল উনি যেন আসার সময় কিনে আনেন। এমনিতে রজনীবাবু সাড়ে-আটটায়

আসেন। আজ তাড়াতাড়ি আসার কারণ, সান্যাল সাহেবের বিশ্বাস, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেই যত সব আজেবাজে লোক টাকার লোভে যেখান-সেখান থেকে ছেলে ধরে এনে তাঁর সামনে হাজির করবে। তখন ব্যাপারটা যাতে বেসামাল না হয়ে পড়ে, তার জন্য সেজো ছেলে প্রীতীন আর বেয়ারা কিশোরীলাল ছাড়াও তিনি রজনীবাবু ও জুনিয়র ব্যারিস্টার তপন সরকারকে সকাল সকাল আসতে বলেছেন। সরকার এখনো আসেননি, আর প্রীতীনের এখনো ঘুম ভাঙেনি। সে রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করেছে। আজই দুপুরে সে খড়গ্‌পুর ফিরে যাবে।

বাইরে একটা ট্যাক্সি থামার আওয়াজ পেয়ে মিস্টার সান্যাল হাত থেকে কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই শুরু হল।' শুরুতেই যে শেষ সেটা শরদিন্দু সান্যাল ভাবতে পারেননি।

'বাবা !'

একী, এ যে বাবলুর গলা !

শরদিন্দু সান্যালের দৃষ্টি পর্দাওয়ালা বাইরের দরজাটার দিকে চলে গেল। তার ঠিক পরেই পর্দা ফাঁক করে বাবলু এসে ঢুকল ঘরে।

'কী ব্যাপার ? কোথায় ছিলি অ্যাদ্দিন ? কে আনল তোকে ? একী, তোর চুলের এ কী দশা ?'

প্রশ্নগুলো এক নিশ্বাসে করে গেলেন শরদিন্দু সান্যাল ; এবং করেই একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাঁর চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন—যেন উত্তরগুলো জানাটা বড় কথা নয়, ছেলে ফিরে এসেছে সেটাই বড়।

তারপরেই তাঁর চোখ গেল বাবলুর পাশে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে। 'আপনি ভেতরে আসুন,' বললেন মিস্টার সান্যাল। যেই হোক না কেন, ভিতরে ডাকতেই হবে ; একটা পুরস্কারের ব্যাপার আছে তো।

লোকটা দরজার দিকে এগিয়ে এল। মিস্টার সান্যাল রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'দারোয়ানকে বলে দিন বাচ্চা ছেলে সঙ্গে করে কেউ এলে যেন ঢুকতে না দেয়। বলুন যেন বলে দেয় যে ছেলে ফিরে এসেছে।'

রজনীবাবু হুকুম তামিল করতে চলে গেলেন। পর্দা ফাঁক হতেই মিস্টার সান্যাল দেখলেন যে, লোকটা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

একে ভদ্রলোক বলা যায় কি ? মিস্টার সান্যাল ভেবে স্থির করলেন—না, যায় না। শার্টটা সস্তা এবং ময়লা, পায়ের চটিটা ক্ষয়ে গেছে, সাদা সুতির প্যান্টটায় অজস্র ভাঁজ। আর ও-রকম চুল আর ঝুলপি—না, ওগুলোকে অভদ্র বলা মুশকিল, কারণ তার নিজের সেজো ছেলে প্রীতীন্দ্রর চুল আর ঝুলপিও তো কতকটা ওইরকমই।

'ভেতরে এস।'

হারুন চৌকাঠ পেরিয়ে এল।

'কী নাম তোমার ?'

'ও হারুনদা, বাবা। আর্টিস্ট। দারুণ খেলা দেখায়।'

শরদিন্দু সান্যাল তাঁর সদ্য-ফিরে-পাওয়া ছেলের দিকে একটু বিরক্তভাবেই চেয়ে বললেন, 'তুমি থামো বাবলু। ওকে বলতে দাও। তুমি বরং ওপরে যাও। ঠামাকে গিয়ে বলো, তুমি ফিরে এসেছ—বড় কষ্ট পেয়েছেন এ ক'টা দিন। আর ছোড়দাও আছে। ঘুমোচ্ছে। ওকে তুলে দাও গিয়ে।'

বাবলুর কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই। হারুনদাকে ফেলে সে যাবে কী করে ? ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে বাবার চোখের আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাবলু। ও হারুনদাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর পিছন দিকটা।

শরদিন্দু সান্যাল আবার লোকটার দিকে চাইলেন।

'শুনি তোমার ব্যাপার।'

'ও খড়গ্‌পুর থেকে আমার সঙ্গে এসেছে। চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করছিল। আমি টেনে তুলি। তারপর থেকে এখানেই ছিল।'

'এখানে মানে ?'

'কলকাতায় বেনটিং ইস্ট্রীটে। একটা চায়ের দোকানে।'

'চায়ের দোকানে ?' মিস্টার সান্যালের চোখ কপালে উঠে গেছে। 'কী করছিল চায়ের দাকানে ?'

'কাজ করছিল স্যার ?'

'কাজ ? কী কাজ ?' মিস্টার সান্যাল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করছেন না।

হারুন বলল। মিস্টার সান্যালের মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে, থাকলে বোধহয় বেশ কয়েক গাছা ছিঁড়ে ফেলতেন।

'হোয়াট ইজ অল্ দিস !' চেয়ার ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার সান্যাল—'এ কি মগের মুল্লুক নাকি ? ওকে দিয়ে চায়ের দোকানের বয়ের কাজ করিয়েছ ? তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই ? দেখে বুঝলে না, ও ভদ্রলোকের ছেলে ?'

বাবলু আর থাকতে পারল না। ও বারান্দা থেকে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'আমার খুব ভালো লাগছিল কাজ করতে বাবা !'

'চুপ করো !'—গর্জন করে উঠলেন মিস্টার সান্যাল। 'তোমাকে বললাম না ওপরে যেতে ?'

বাবলু আবার দরজার বাইরে চলে গেল। অ্যাদ্দিন পরে বাড়িতে ফিরে এসে যে এ-রকম একটা ব্যাপার হবে, সেটা ও ভাবতেই পারেনি।

হারুন এখনো শান্তভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, আর শান্তভাবেই সে বলল, 'আমি যদি জানতুম ও কোন্ বাড়ির তাহলে কি আর আমার কাছে রাখতুম স্যার। ও যে বলতে পারলে না। ওর কিছু মনে ছিল না।'

'আর আজ কাগজে বেরোনোমাত্র সব মনে পড় গেল?'

মিস্টার সান্যাল যে হারুনের কথা মোটেই বিশ্বাস করছেন না, সেটা তাঁর প্রশ্নের সুর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল। হারুন কথাটা শুনে একটু অবাক হল।

'কাগজের কথা কী বলছেন জানি না স্যার। ওর মনে পড়েছে কাল রাত্তিরে। কাল বাদলা ছিল তাই আর আনিনি। আজ নিয়ে এলুম, আপনার হাতে তুলে দিলুম—ব্যস্, আমার ডিউটি ফিনিশ। তবে, ইয়ে, ওর মাথার একটা জায়গায় দেখবেন একটু ফোলা আছে। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। যদি ডাক্তার-ফাক্তার দেখান, তাই জানিয়ে দিলুম।...চলি রে ফট্‌কে।'

হারুনদা চলে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাবলু ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ওকে বাবা ডাকলেন। 'বাবলু, একবার এদিকে এস।'

ও এল। টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। শরদিন্দু সান্যাল ছেলের মাথার দিকে হাত বাড়ালেন। 'কোথায় ফোলা রে?'

বাবলু দেখাল। সত্যিই ফোলাটা এখনো পুরোপুরি যায়নি। পাছে ব্যথা লাগে, তাই মিস্টার সান্যাল আর সেখানে হাত দিলেন না।

'খুব কষ্ট হয়েছে এ-ক'দিন?'

ও মাথা নাড়ল। না, হয়নি!

'ওপরে যাও। হরিনাথকে বলো, গরম জলে বেশ করে চান করিয়ে দেবে। আজ তোমার ছুটি। আজ ডাক্তারবাবু এসে তোমাকে দেখবেন। যদি বলেন যে ঠিক আছে, তাহলে কাল থেকে তুমি আবার ইস্কুলে যাবে। এবার থেকে রোজ গাড়িতে।...যাও।'

ও চলে গেল।

মিস্টার সান্যাল সামনে টেবিলের উপর থেকে খবরের কাগজের স্তূপটা হাতের একটা বিরক্ত ঝাঁটে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'চায়ের দোকান!—ফুঃ!'—তারপর রজনীবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'চায়ের দোকান! ভাবতে পার?'

রজনীবাবু কেবল একটা কথাই ভাবছিলেন—যদিও সেটা তাঁর মনিবকে বলা যায় না, কারণ কথাটা তাঁর সম্পর্কেই। তিনি ভাবছিলেন যে, যে-লোকটা বাবলুকে ফেরত দিয়ে গেল, তার খবরের কাগজ না-দেখার সুযোগটা নিয়ে মিস্টার সান্যাল তাকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে কাজটা বোধহয় ভালো করলেন না।

ঘন্টাখানেক পরে মিস্টার সান্যাল দারোগা মিস্টার চন্দর কাছ থেকে একটা ফোন পেলেন।

'আপনার বিজ্ঞাপনের কোনো ফল পেলেন?' জিজ্ঞেস করলেন দারোগাসাহেব।

উত্তরে মিস্টার সান্যাল যা বললেন তাতে তিনি খুশি তো হলেনই, সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলেন রীতিমতো। বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার স্যার!—একেকটা সময়

আসে যখন মনে হয়, এগোবার বুঝি আর রাস্তা নেই। আবার তারপরেই হঠাৎ দেখবেন, ম্যাজিকের মতো সব রাস্তা খুলে গেছে। আপনার ছেলেও ফিরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্যাঙের দুটি লোকও অ্যারেস্ট হয়ে গেল।'

'সে কী!' বললেন মিস্টার সান্যাল। 'কী করে হল?'

'একটা লোক ফোন করে তাদের ডেরার হদিস দিয়ে দেয়। আধ ঘন্টাও হয়নি, ওদের ঘুম থেকে তুলে ধরে আনা হয়েছে। থানায় এসে ঘুম ছুটে গেছে। পুরো ব্যাপারটা স্বীকার করেছে।'

এই টেলিফোনের দশ মিনিটের মধ্যে বাবলু-চুরির পুরো ব্যাপারটা শরদিন্দু সান্যালের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল।

বাবলুর ঠাকুরমা তাঁর নাতিকে ফিরে পেয়ে কিছুক্ষণ তাকে জড়িয়ে ধরে 'ধন আমার মানিক আমার' বলে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ওর ব্যথার জায়গাগুলোতে নতুন করে ব্যথা লাগিয়ে দিয়ে আবার চলে চলেন তাঁর পুজোর ঘরে। গোপালই তাঁর নাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। গোপালের উপর তাঁর ভক্তি তিনগুণ বেড়ে গেছে। বাবলু নতুন করে বুঝেছে যে ঠামার পুজোর ঘন্টা ওর নিজের ঘর থেকে শোনা গেলেও, আসলে ঠামা থাকেন অনেক দূরে।

ছোড়দা আড়াইটের সময় খড়গ্‌পুর চলে গেল। সে বলল, 'ভাবতে পারিস, তুই রয়েছিস খড়গ্‌পুরে, নিজের নাম বাপের নাম সব ভুলে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছিস, আর আমিও রয়েছি সেই একই শহরে মাইলখানেকের মধ্যে, অথচ কিছুই জানতে পারলাম না। স্কাউন্ড্রেল দুটোকে হাতের কাছে পেলে স্রেফ একটি করে কারাটে চপ—ব্যস্, ওদেরও বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া যেত।...যাক্, তোকে হোম টাস্ক দিচ্ছি—যা ঘটল তা বেশ গুছিয়ে লিখে ফ্যাল্ তো ইংরিজিতে। তুই তো "এসে"-টেসে বেশ ভালো লিখতিস। লিখে ফ্যাল্। নেক্সট টাইম এসে দেখব।'

এ বাড়িতে বাবলুর নতুন করে দেখার কিছুই নেই। সবই ওর জানা, ওর দেখা। প্রতিটি ঘর, প্রতিটি বারান্দা, প্রতিটি সিঁড়ির ধাপ। ওর নিজের ঘরে দেয়ালের উপর দিকে একটা জায়গায় ড্যাম্প লেগে নকশা ফুটে উঠেছিল যেটা দেখতে ঠিক যেন আফ্রিকার ম্যাপ। বাবলুর সেটা সম্বন্ধে একটা কৌতূহল ছিল। এবার ফিরে এসে ঘরে গিয়েই দাগটার দিকে চেয়ে দেখল সেটা বেড়ে ছড়িয়ে অনেকটা উত্তর আমেরিকার মতো হয়ে গেছে।

সাড়ে-তিনটের সময় গোলগাল নাদুস-নুদুস ডক্টর বোস এলেন। বাবলু দেখেছে, তার যখন একশো চার জ্বর হচ্ছে তখনো ডাক্তারবাবুর মুখে হাসি। ছোড়দা একবার বলেছিল, ওঁর মুখের মাস্‌লগুলোই নাকি ওইরকম, তাই হাসতে না চাইলেও মুখ হাসি-হাসি দেখায়। হরিনাথ ডাক্তারবাবুর ব্যাগ বয়ে নিয়ে

এল। সঙ্গে রজনীকাকুও ছিলেন, আর চৌকাঠের বাইরে পর্দা ফাঁক করে পুরু চশমার ভিতর দিয়ে দেখছিল ঠামা। বাবা তখনো কোর্ট থেকে ফেরেননি। ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'তোমার দাম কত জান তো বাবলুবাবু ? পাঁচটা তুমি হলেই একটা অ্যামবাসাডর হয়ে যায়—হ্যাঁ-হ্যাঁ !'

বাবলু তখন কথাটার মানে বুঝতে পারেনি। বুঝল, যখন ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ করে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে রজনীকাকুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাগ্যবান পুরুষটি কে মশাই ? পাঁচ হাজার ইজ নো জোক !' —আর রজনীকাকু গলা খাঁকরিয়ে 'ওটা, ইয়ে—লোকটির নামটা...মানে...' বলে থেমে গেলেন। ডাক্তার বোস আর ব্যাপারটা না ঘাঁটিয়ে 'ওয়েল বাবলুবাবু—একদিন এসে তোমার গপ্‌পো শোনা যাবে কেমন ?'—বলে চলে গেলেন, আর হরিনাথ আর রজনীকাকুও ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে গেল।

বাবলু বুঝতে পারল, বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। ও আজকাল মাঝে মাঝে খবরের কাগজ দেখে—খেলার খবব দেখে, কোথায় কী সিনেমা হচ্ছে দেখে। ও জানে কাগজে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশের খবর বেরোয়। তাতে যে হারিয়েছে তার ছবি থাকে, আর পুরস্কারের কথা থাকে। বাবাও কি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন নাকি ?

বাবলু নিচে গেল। বাবার আপিস ঘরে থাকে খবরের কাগজ। গিয়ে দেখল, দশটা খবরের কাগজে পাঁচরকম ভাষায় ওর সেই সিনচল লেকের ধারে ছোড়দার তোলা ছবিটা দিয়ে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। হারানো ছেলে নিখিল (ডাকনাম বাবলু) সান্যালের সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

হারুনদা কাগজ পড়েনি, তাই হারুনদা টাকা চায়নি। এই টাকা হারুনদার পাওনা। না চাইলেও পাওয়া উচিত ছিল। বাবার দেওয়া উচিত ছিল। বাবা দেননি।

বাবলুর মনটা এত ভারি হয়ে গেল যে, সে কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসে রইল। বাবা হারুনদাকে ফাঁকি দিয়েছেন। টাকাটা পেলে হারুনদা নতুন খেলার জন্য নতুন জিনিস কিনতে পারত, ছোট ঘর ছেড়ে আরেকটু বড় ঘরে গিয়ে থাকতে পারত। হয়তো অনেকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারত। দিব্যি খেয়ে-পরে হেসে-খেলে গান গেয়ে কাটাতে পারত।

হয়তো ও এতক্ষণে কাগজ পড়ে বিজ্ঞাপনটা দেখে ফেলেছে, আর কে জানে না জানি কী ভাবছে !

বাবলু বাগান থেকে বেরিয়ে এল। ওই যে বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। চারিদিকে ছড়ানো সোফা, টেবিল, বইয়ের আলমারি, মূর্তি, ছবি,

ফুলদানি। কোনোটাতেই এমন রং নেই যাতে মনটা খুশি হয়। সোফার ঢাকনাগুলো ময়লা হয়ে গেছে, নক্‌শাগুলো প্রায় বোঝাই যায় না। কেউ বদলায়নি, তাই এই দশা। দিদি থাকলে খেয়াল করে বদলে দিত। এখন কেউ করে না।

বাবলু বেশ কিছুক্ষণ একা একটা সোফায় পা তুলে বসে রইল। দেয়ালের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে চারটে বাজল। পাশের বাড়ি থেকে ডিউক কুকুরটা একবার ঘেউ করে উঠল। বোধহয় বারান্দা থেকে কোনো রাস্তার কুকুরকে দেখেছে। হারুনদা সেদিন ওকে বলেছিল রাস্তার কুকুর। বাবলুর মনে হল সেটা হলে তাও ভালো ছিল।

॥ ১৪ ॥

সাড়ে-চারটের সময় হরিনাথ চায়ের জন্য বাবলুর খোঁজ করে বুঝতে পারল, খোকাবাবু বাড়ি নেই। তাতে হরিনাথের খুব বেশি ভাবনা হল না, কারণ তিনটে বাড়ি পরেই বাবলুর বন্ধু থাকে। অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি থেকে খোকাবাবু নিশ্চয়ই তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে ; একটু পরেই ফিরে আসবে।

বাবলু তার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু হরিনাথ যার কথা ভাবছে সে-বন্ধু নয়। দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে বাগানের পিছনের পাঁচিল টপকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাবলু লাউডন স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট দিয়ে, লোয়ার সার্কুলার রোড পেরিয়ে শেষটায় সি আই টি রোডে পৌঁছে একে ওকে জিজ্ঞেস করে ঠিক হাজির হয়েছিল সেই ব্রিজটাতে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডান দিক বাঁ দিক হিসেব রেখে টিউব কলের ধারে মেয়েদের ভিড় পেরিয়ে একটু যেতেই, কয়েকটি ছেলে তাকে দেখে বলল, 'হারুনদা নেই, হারুনদা চলে গেছে।'

বাবলু চোখে অন্ধকার দেখল।

'কোথায় চলে গেছে ?' সে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল।

এবার একজন লুঙ্গিপরা বুড়ো একটা ঝুরঝুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'হারুনকে খুঁজচ খোকা ? সে আজ মাদ্রাজ যাবে বলে ট্রেন ধরতে গেছে। সার্কাস কোম্পানি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

হাওড়া যাবার জন্য দশ নম্বর বাস ধরতে হবে সেটা বস্তির কয়েকজন ছেলেই বাবলুকে বলে, ওকে ট্রেন লাইন পেরিয়ে একেবারে বাসস্টপে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। উপেনবাবুর দেওয়া আগাম টাকাটা বাবলু সবসময়ই তাঁর প্যান্টের পকেটে রাখত। তার থেকেই বাসভাড়া আর হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম টিকিট হয়ে গেল।

হারুনদার গাড়ি ছেড়ে দেয়নি তো ?

'মাদ্রাজের গাড়ি কোন প্ল্যাটফর্মে—মাদ্রাজের গাড়ি ?'

'সাত নম্বর, খোকা, ওই যে ওই দিকে। ওই দ্যাখ নম্বর।'

লম্বা ট্রেনটা দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে লম্বা পাড়ি দেবে বলে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাবলু এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে চলল। থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস,...ফার্স্ট ক্লাস .লোকজন মাল কুলি বাক্স-প্যাটবা হোল্ডল পুঁটলি সব ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে একটা জায়গায় এসে বাবলু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

একটা চায়ের দোকানেব পাশে লোকে ভিড় করেছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তিনটে চায়ের কাপ শূন্যে লাফ মারছে, আর লোকগুলো হো-হো করে উঠছে, হাততালি দিচ্ছে।

গাড়ি ছাড়তে কিছু দেরি, তাই হারুনদা খেলা দেখাচ্ছে।

বাবলু ভিড় ঠেলে হারুনদার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এ কী, তুই এখানে ?'

হাততালির জন্য হারুনদাকে বেশ চেঁচিয়ে বলতে হল কথাটা। তারপর কাপ তিনটে দোকানদারের হাতে তুলে দিয়ে হারুন আবাব বাবলুব দিকে ফিরল।

'আমার ওখানে গেসলি বুঝি ? ওরা বলে দিল "আমি নেই" ?'

ও কিছু বলছে না দেখে হারুনই বলে চলল, 'সেদিন তোকে মাদ্রাজের সেই ভেঙ্কটেশের চিঠিটার কথা বলছিলাম না ?—ভেবে দেখলাম, মওকাটা ছাড়া উচিত হবে না। ওখানে চোখ বেঁধে এক চাকার সাইকেল চালাতে চালাতে জাগ্‌লিং দেখাতে হবে। কম-সে-কম মাসখানেক প্র্যাকটিস লাগবে। তাই একটু আগে যাওয়া ভালো।'

ও টাকাটার কথা বলতে গিয়েও পারল না। হারুনদা একটা নতুন সুযোগ পেয়েছে—হয়তো অনেক বেশি রোজগার করবে। আর ওকে দেখেও মনে হচ্ছে ও ফুর্তিতে আছে। যদি টাকাটার কথা বললে ওর মন খারাপ হয়ে যায় !

ওর নিজের মন খারাপের কথাটাও বলতে হল না, কারণ হারুনদা বুঝে ফেলেছে।

'বাড়িতে ভাল্লাগছে না তো ?'

'না হারুনদা।'

'ফট্‌কেটা জ্বালাছে, তাই তো ? বলছে, উপেনদার দোকানে ইস্কুল করতে হত না, কতরকম লোক দেখা যেত—হারুনদা কতরকম খেলা দেখাত, কলকাতার রাস্তার দিয়ে কেমন হেঁটে বেড়াতাম দু'জনে—তাই তো ?'

সব ঠিক বলেছে হারুনদা। ও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। হারুন বলল,

'ফট্‌কেটাকে একটু ধমক না দিলে ও তোকে লেখাপড়া করতে দেবে না। সেটা কোনো কাজের কথা নয়। কত আপসোস হয় আমার জানিস—আরো পড়িনি বলে ?'

'তাও তো তুমি এত ভালো খেলা দেখাও। তুমি তো আর্টিস্ট।'

'আর্টিস্ট কি শুধু একরকম হয় ? তোদের বাড়ির মতো বাড়িতে থেকে কি আর্টিস্ট হওয়া যায় না ? লেখাপড়া করে আর্টিস্ট হয় না ? শুধু বলের খেলাতেই কি আর্টিস্ট ? বলের খেলা, রঙের খেলা, কথার খেলা, সুরের খেলা—কতরকম খেলা আর কতরকম আর্টিস্ট হয় জানিস ? যখন বড় হবি তখন জানতে পারবি, কোন্ খেলাটা কী স্টাইলে খেলতে হবে তোকে। তখন তুই—'

ও আর পারল না। গার্ড হুইসল দিয়ে দিয়েছে। ওকে বলতেই হবে কথাটা। ও হারুনদার কথার উপরেই চিৎকার করে বলল, 'বাবা তোমায় টাকা দেয়নি হারুনদা। পাঁচ হাজার টাকা ! তুমি না নিয়েই চলে যাবে ?'

হারুন ওর কামরার পা-দানিতে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে হেসে বলল, 'তোর ছবিটা ও-রকম হয়েছে কেন ? মনে হচ্ছে খোক্কসের ছা।'

হারুনদা জানে ! ও কাগজ দেখেছে !

ট্রেনের ভোঁ বেজে উঠল। ও হারুনদার কামরার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হারুন বলল, 'তোর বাবাকে বলিস, হারুনদা বলেছে ওঁর ছেলেকে ফেরত দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিতে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাইকে বিক্রি করে কেউ টাকা নেয় ?'

গাড়ি ছেড়ে দিল। ও কিছু ভাবতে পারছে না। ও শুনছে হারুনদা চেঁচিয়ে বলছে, 'গ্রেট ডায়মন্ড সার্কাস—এলে দেখতে যাস—এক চাকার সাইকেলে চোখ বেঁধে বলের খেলা !'

'এখানে আসবে হারুনদা ?'

ও ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। বেশিক্ষণ পারবে না।

'আসতেই হবে ! সার্কাসের কদর কলকাতায় সবচেয়ে বেশি। দেশের সব শহরের মধ্যে !'

হারুনদা হাত নাড়ছে।

হারুনদা দূরে চলে যাচ্ছে।

হারুনদা মিলিয়ে গেল।

ট্রেন চলে গেল।

ওই যে সবুজ গোল আলো। ওটাকে বলে সিগন্যাল। বাবলু এখন জানে। ওর মানে লাইন ক্লিয়ার।

হাতের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছে বাবলু বাড়ির দিকে পা বাড়াল। দুটো কাঠের

বল ওর পকেটে। আর, একটা মানুষ—যাকে ও খুব ভালো করে চেনে—যাকে দিয়ে ওর অনেক কাজ হবে—তাকে ও মনের এক কোনায় পুরে রেখে দেবে।

তার নাম শ্রীফটিকচন্দ্র পাল।

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি

একশৃঙ্গ অভিযান

১লা জুলাই

আশ্চর্য খবর। তিব্বত পর্যটক চার্লস উইলার্ডের একটা ডায়রি পাওয়া গেছে। মাত্র এক বছর আগে এই ইংরাজ পর্যটক তিব্বত থেকে ফেরার পথে সেখানকার কোনো অঞ্চলে খাম্‌পা শ্রেণীর এক দস্যুদলের হাতে পড়ে। দস্যুরা তার অধিকাংশ জিনিস লুট করে নিয়ে তাকে জখম করে রেখে চলে যায়। উইলার্ড কোনো রকমে প্রায় আধমরা অবস্থায় ভারতবর্ষের আলমোড়া শহরে এসে পৌঁছায়। সেইখানেই তার মৃত্যু হয়। এসব খবর আমি খবরের কাগজেই পড়েছিলাম। আজ লন্ডন থেকে আমার বন্ধু ভূতত্ত্ববিদ্ জেরেমি সন্ডার্সের একটা চিঠিতে জানলাম যে উইলার্ডের মৃত্যুর পর তার সামান্য জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ডায়রি পাওয়া যায়, এবং সেটা এখন সন্ডার্সের হাতে। তাতে নাকি এক আশ্চর্য ব্যাপারের উল্লেখ আছে। আমার তিব্বত সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতূহল, আর আমি তিব্বতী ভাষা জানি জেনে সন্ডার্স আমাকে চিঠিটা লিখেছে। সেটার একটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

> '...উইলার্ড আমার অনেক দিনের বন্ধু ছিল সেটা তুমি জান কিনা জানি না। তার বিধবা স্ত্রী এডউইনার সঙ্গে পরশু দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে বলল আলমোড়া থেকে তার মৃত স্বামীর যেসব জিনিস পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে একটা ডায়রি রয়েছে। সে ডায়রি আমি তার কাছ থেকে চেয়ে আনি। দুঃখের বিষয় ডায়রির অনেক লেখাই জল লেগে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই পড়া মুশকিল। কিন্তু তার শেষ পৃষ্ঠার কয়েকটা লাইন পড়তে কোনো অসুবিধা হয়নি। ১৯শে মার্চের একটা ঘটনা তাতে লেখা রয়েছে। শুধু দুটি লাইন—'আই স এ হার্ড অফ ইউনিকর্নস টু ডে। আই রাইট দিস্ ইন ফুল্

পোজেশন অফ মাই সেনসেস।' তার পরেই একটা প্রচণ্ড ঝড়ের ইঙ্গিত পেয়ে উইলার্ড ডায়রি লেখা বন্ধ করে। তার এই অদ্ভুত উক্তি সম্বন্ধে তোমার কী মত জানতে ইচ্ছে করে'—ইত্যাদি।

উইলার্ড একপাল ইউনিকর্ন দেখেছে বলে লিখেছে। আর তার পরেই বলছে সেটা সে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে দেখেছে। এটা বলার দরকার ছিল এই জন্যেই যে ইউনিকর্ন নামক প্রাণীটিকে আবহমানকাল থেকেই সারা বিশ্বের লোকে কাল্পনিক প্রাণী বলেই জানে। একশৃঙ্গ জানোয়ার। কপাল থেকে বেরোনো লম্বা প্যাঁচানো শিং-বিশিষ্ট ঘোড়া। ইউনিকর্নের চেহারা বিলাতি আঁকা ছবিতে যা দেখা যায় তা হল এই। যেমন চীনের ড্র্যাগন কাল্পনিক, তেমনি ইউনিকর্নও কাল্পনিক।

কিন্তু এই কাল্পনিক কথাটা লিখতে গিয়েও আমার মনে খট্‌কা লাগছে। আমার সামনে টেবিলের উপর একটা বই খোলা রয়েছে, সেটা মোহেঞ্জোদাড়ো সম্পর্কে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই মোহেঞ্জোদাড়োর মাটি খুঁড়ে আজ থেকে চার হাজার বছর আগেকার এক আশ্চর্য ভারতীয় সভ্যতার যে সব নমুনা পেয়েছিলেন তার মধ্যে ঘর বাড়ি রাস্তা ঘাট হাঁড়ি কলসী খেলনা ইত্যাদি ছাড়াও এক জাতের জিনিস ছিল, যেগুলো হচ্ছে মাটির আর হাতির দাঁতের তৈরি চারকোনা সীল। এই সব সীলে খোদাই করা হাতি বাঘ ষাঁড় গণ্ডার ইত্যাদি আমাদের চেনা জানোয়ার ছাড়াও একরকম জানোয়ার দেখা যায়, যার শরীরটা অনেকটা বলদের মতো, কিন্তু মাথায় রয়েছে একটিমাত্র পাকানো শিং। এটাকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কাল্পনিক জানোয়ার বলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু এতগুলো আসল জানোয়ারের পাশে হঠাৎ একটা আজগুবী জানোয়ার কেন খোদাই করা হবে সেটা আমি বুঝতে পারি না।

এ জানোয়ার যে কাল্পনিক নয় সেটা ভাবার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে দু হাজার বছর আগের রোম্যান পণ্ডিত প্লিনি তাঁর বিখ্যাত জীবতত্ত্বের বইয়েতে স্পষ্ট বলে গেছেন যে, ভারতবর্ষে একরকম গরু আর একরকম গাধা পাওয়া যায় যাদের মাথায় মাত্র একটা শিং। গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটলও ভারতবর্ষে ইউনিকর্ন আছে বলে লিখে গেছেন। এ থেকে কি এমন ভাবা অন্যায় হবে যে, এককালে এদেশে এক ধরনের একশৃঙ্গ জানোয়ার ছিল যেটা এখান থেকে লোপ পেলেও, হয়তো তিব্বতের কোনো অজ্ঞাত অঞ্চলে রয়ে গেছে, আর উইলার্ড ঘটনাচক্রে সেই অঞ্চলে গিয়ে পড়ে এই জানোয়ার দেখতে পেয়েছেন? এ কথা ঠিক যে গত দুশো বছরে অনেক বিদেশী পর্যটকই তিব্বত গিয়ে তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন, এবং কেউই ইউনিকর্নের কথা লেখেননি। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হল? তিব্বতে এখনো অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষের পা পড়েনি। সুতরাং সে দেশের কোথায় যে কী আছে তা কেউ সঠিক বলতে পারে?

সন্ডার্সকে আমার এই কথাগুলো লিখে জানাব। দেখি ও কী বলে।

১৫ই জুলাই

আমার চিঠির উত্তরে লেখা সন্ডার্সের চিঠিটা তুলে দিচ্ছি—

প্রিয় শঙ্কু,

তোমার চিঠি পেলাম। উইলার্ডের ডায়রির শেষ দিকের খানিকটা অংশ পড়তে পেরে আরো বিস্মিত হয়েছি। ১৬ই মার্চ সে লিখছে 'টুডে আই ফ্লু উইথ দ্য টু হান্ড্রেড ইয়ার ওল্ড লামা।' ফ্লু মানে কি এরোপ্লেনে ওড়া ? মনে তো হয় না। তিব্বতে রেলগাড়িই নেই, এরোপ্লেন যাবে কী করে। কিন্তু তাহলে কি সে কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই আকাশে ওড়ার কথা বলছে ? তাই বা বিশ্বাস করি কী করে ? এসব কথা পড়ে উইলার্ডের মাথা ঠিক ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। অথচ আলমোড়ার যে ডাক্তারটি তাকে শেষ অবস্থায় দেখেছিলেন (মেজর হর্টন) তাঁর মতে উইলার্ডের মাথায় গণ্ডগোল ছিল না। ১৩ই মার্চের ডায়রিতে থোকচুম-গোম্ফা নামে একটা মঠের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। উইলার্ডের মতে—'এ ওয়ান্ডারফুল মনাস্ট্রি। নো ইউরোপিয়ান হ্যাজ এভার বিন হিয়ার বিফোর।' তুমি কি এই মঠের নাম শুনেছ কখনো ?...যাই হোক্, আসল কথা হচ্ছে—উইলার্ডের এই ডায়রি পড়ে আমার মনে তিব্বত যাবার একটা প্রবল বাসনা জেগেছে। আমার জার্মান বন্ধু উইলহেল্ম ক্রোলও এ ব্যাপারে উৎসাহী। তাকে অবিশ্যি উড়ন্ত লামার বিবরণই বেশি আকর্ষণ করেছে। জাদুবিদ্যা, উইচক্রাফ্ট ইত্যাদি সম্পর্কে ক্রোলের মূল্যবান গবেষণা আছে, তুমি হয়তো জান। সে পাহাড়েও চড়তে পারে খুব ভালো। বলা বাহুল্য, আমরা যদি যাই তো তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে খুবই ভালো হবে। এ মাসেই রওনা হওয়া যেতে পারে। কী স্থির কর সেটা আমাকে জানিও। শুভেচ্ছা নিও। ইতি

জেরেমি সন্ডার্স

উড়ন্ত লামা ! তিব্বতী যোগী মিলারেপার আত্মজীবনী আমি পড়েছি। ইনি তান্ত্রিক জাদুবিদ্যা শিখে এবং যোগ সাধনা করে নানারকম আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা ছিল উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা। এই জাতীয় কোনো মহাযোগীর সাহায্যেই কি উইলার্ড আকাশে উড়েছিলেন ?

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমারও মনে প্রচণ্ড কৌতূহল উদ্রেক করেছে। তিব্বত যাইনি ; কেবল দেশটা নিয়ে ঘরে বসে পড়াশুনা করেছি, আর তিব্বতী ভাষাটা শিখেছি। ভাবছি সন্ডার্সের দলে আমিও যোগ দেব। এতে ওদের সুবিধাই হবে, কারণ আমার তৈরি এমন সব ওষুধপত্র আছে যার সাহায্যে পার্বত্য

অভিযানের শারীরিক গ্লানি অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায়।

২৭শে জুলাই

আজ আমার পড়শী ও বন্ধু অবিনাশবাবুকে তিব্বত অভিযানের কথা বলতে তিনি একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। দু-দুবার আমার সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে ওঁর এই প্রৌঢ় বয়সে ভ্রমণের নেশা চাগিয়ে উঠেছে। তিব্বত জায়গাটা খুব আরামের নয়, এবং অনেক অজানা দুর্গম জায়গায় আমাদের যেতে হবে শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'সে হোক্ গে। শিবের পাহাড় কৈলাসটা যদি একবার চাক্ষুষ দেখতে পারি তো আমার হিন্দু জন্ম সার্থক।' কৈলাস যে তিব্বতে সেটা জানলেও তার পাশের বিখ্যাত হ্রদটির কথা অবিনাশবাবু জানতেন না। বললেন, 'সে কী মশাই, মানস সরোবর তো কাশ্মীরে বলে জানতুম!'

একশৃঙ্গ আর উড়ন্ত লামার কথাটা আর অবিনাশবাবুকে বললাম না, কারণ ও দুটো নিয়ে এখনো আমার মনে খট্‌কা রয়ে গেল। খাম্‌পা দস্যুদের কথাটা বলাতে ভদ্রলোক বললেন, 'তাতে ভয়ের কী আছে মশাই? আপনার ওই হনলুলু পিস্তল দিয়ে ওদের সাবাড় করে দেবেন।' অ্যানাইহিলিন যে হনলুলু কী করে হল জানি না।

কাঠগোদাম থেকেই যাওয়া স্থির করেছি। আজ সন্ডার্সকে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিয়েছি যে আমি পয়লা কাঠগোদাম পৌঁছাব। জিনিসপত্র বেশি নেওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অবিনাশবাবুকেও সেটা বলে দিলাম। উনি আবার পাশবালিশ ছাড়া ঘুমোতে পারেন না, তাই ওঁর জন্যে ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায় এমন একটা লম্বাটে বালিশ তৈরি করে দেব বলেছি। শীতে পরার জন্য আমারই আবিষ্কৃত শ্যাঙ্কলন প্লাস্টিকের হাল্‌কা পোশাক নিচ্ছি, এয়ার-কন্ডিশনিং পিল নিচ্ছি, বেশি উঁচুতে উঠলে যাতে নিশ্বাসের কষ্ট না হয় তার জন্য আমার তৈরি অক্সিমোর পাউডার নিচ্ছি। এছাড়া অম্‌নিস্কোপ ক্যামেরাপিড ইত্যাদি তো নিচ্ছিই। সব মিলিয়ে পাঁচ সেরের বেশি ওজন হবার কথা নয়। পায়ে পরার জন্য পশমের বুট আলমোড়াতেই পাওয়া যাবে।

ক'দিন হল খুব গুমোট হয়েছে। এইবার ঘোর বর্ষা শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে। হিমালয়ের প্রাচীর পেরিয়ে একবার তিব্বতে পৌঁছাতে পারলে মনসুন আর আমাদের নাগাল পাবে না।

২রা আগস্ট। গারবেয়াং।

এর মধ্যে ডায়রি লেখার সময় পাইনি। আমরা কাঠগোদাম ছেড়ে

মোটরে করে আলমোড়া পর্যন্ত এসে, তারপর ঘোড়া করে উত্তরপূর্ব-গামী পাহাড়ে রাস্তা ধরে প্রায় দেড়শো মাইল অতিক্রম করে কাল সন্ধ্যায় গারবেয়াং এসে পৌঁছেছি।

গারবেয়াং দশ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত একটা ভুটিয়া গ্রাম। আমরা এখনো ভারতবর্ষের মধ্যেই রয়েছি। আমাদের পুবদিকে খাদের নীচ দিয়ে কালী নদী বয়ে চলেছে। নদীর ওপারে নেপাল রাজ্যের ঘন ঝাউবন দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আরো বিশ মাইল উত্তরে গিয়ে ১৬০০০ ফুট উঁচুতে একটা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে লিপুধুরা। লিপুধুরা পেরোলেই ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তিব্বতে প্রবেশ।

কৈলাস-মানস-সরোবর তিব্বতের সীমানা থেকে মাইল চল্লিশেক। দূরত্বের দিক দিয়ে বেশি নয় মোটেই, কিন্তু দুর্গম গিরিপথ, বেয়াড়া শীত, আর তার সঙ্গে আরো পাঁচরকম বিপদ-আপদের কথা কল্পনা করে ভারতবর্ষের শতকরা ৯৯·৯ ভাগ লোকই আর এদিকে আসার নাম করে না। অথচ এই পথটুকু আসতেই আমরা যা দৃশ্যের নমুনা পেয়েছি, এর পরে না জানি কী আছে সেটা ভাবতে এই বয়সেও আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।

এবার আমাদের দলটার কথা বলি। সন্ডার্স ও ক্রোল ছাড়া আরো একজন বিদেশী আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন। এর নাম সের্গেই মার্কোভিচ। জাতে রাশিয়ান, থাকেন পোল্যান্ডে। ইংরিজিটা ভালোই বলেন। আমাদের মধ্যে ইনিই অপেক্ষাকৃত কমবয়সী। দোহারা লম্বা চেহারা, ঘোলাটে চোখ, মাথায় একরাশ অবিন্যস্ত তামাটে চুল, ঘন ভুরু, আর ঠোঁটের দুপাশে ঝুলে থাকা লম্বা গোঁফ। এঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ আলমোড়াতেই। ইনিও নাকি তিব্বত যাচ্ছিলেন, তার একমাত্র কারণ ভ্রমণের নেশা, তাই আমরা যাচ্ছি শুনে আমাদের দলে ভিড়ে পড়লেন। এমনিতে হয়তো লোক খারাপ নন, কিন্তু ঠোঁট হাসলেও চোখ হাসে না দেখে মনে হয় তেমন অবস্থায় পড়লে খুন-খারাপিতেও পেছ-পা হবেন না। সেই কারণেই বোধহয় ক্রোলের একে পছন্দ না। ক্রোলের নিজের হাইট সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি না। টেকো মাথার দুপাশে সোনালী চুল কানের উপর এসে পড়েছে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। তবে আদৌ হিংস্র নয়। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে পাঁচবার ম্যাটারহর্নের চুড়োয় উঠেছে। লোকটা মাঝে মাঝে বেজায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, তিনবার নাম ধরে ডাকলে তবে জবাব দেয়। আর প্রায়ই দেখি ডান হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে কী যেন হিসেব করে। আমরা যেমন কড়ে আঙুল থেকে শুরু করে পাঁচ আঙুলের গাঁটে গাঁটে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুনতে পারি, ইউরোপের লোকেরা দেখেছি সেটা একেবারেই পারে না। এরা একটা আঙুলে এক গোনে। গাঁটের ব্যবহারটা বোধহয় ভারতীয়।

সন্ডার্স আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট। সুগঠিত সুপুরুষ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত হাল্‌কা নীল চোখ, প্রশস্ত ললাট। সে এই ক'দিনে তিব্বত সম্বন্ধে খান দশেক বই পড়ে অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। যোগবল বা ম্যাজিকে তার বিশ্বাস নেই। এসব বই পড়েও সে বিশ্বাস জাগেনি, এবং এই নিয়ে ক্রোলের সঙ্গে তার মাঝে মাঝে তর্কবিতর্কও হচ্ছে।

এই তিনজন ছাড়া অবিশ্যি রয়েছেন আমার প্রতিবেশী তীর্থযাত্রী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, যিনি আপাতত আমাদের থেকে বিশ হাত দূরে খাদের পাশে একটা পাথরের খণ্ডে বসে হাতে তামার পাত্রে তিব্বতী চা নিয়ে কাছেই খুঁটির সঙ্গে বাঁধা একটা ইয়াক বা চমরী গাইয়ের দিকে চেয়ে আছেন। আজ সকালেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'মশাই, সেই ছেলেবেলা থেকে পুজোর কাজে চামরের ব্যবহার দেখে আসছি, আর অ্যাদ্দিনে তার উৎপত্তিস্থল দেখলাম।' সাদা চমরীর ল্যাজ দিয়েই চামর তৈরি হয়। এখানে যে চমরীটা রয়েছে সেটা অবিশ্যি কালো।

আমরা বাকি চারজনে বসেছি একটা ভুটিয়ার দোকানের সামনে। সেই দোকান থেকেই কেনা তিব্বতী চা ও সাম্পায় আমরা ব্রেকফাস্ট সারছি। সাম্পা হল গমের ছাতুর ডেলা। জলে বা চায়ে ভিজিয়ে খেতে হয়। এই চা কিন্তু আমাদের ভারতীয় চা নয়। এ চা চীন দেশ থেকে আসে, এর নাম ব্রিক-টী। দুধ-চিনির বদলে নুন আর মাখন দিয়ে এই চা তৈরি হয়। একটা লম্বা বাঁশের চোঙার মধ্যে চা ঢেলে আরেকটা বাঁশের ডাণ্ডা দিয়ে মোক্ষম ঘাঁটান দিলে চায়ে-মাখনে একাকার হয়ে এই পানীয় প্রস্তুত হয়। তিব্বতীরা এই চা খায় দিনে ত্রিশ-চল্লিশ বার। চা আর সাম্পা ছাড়া আরো যেটা খায় সেটা হল ছাগল আর চমরীর মাংস। এসব হয়তো আমাদেরও খেতে হবে, যদিও চাল ডাল সবজি কফি টিনের খাবার ইত্যাদি আমরা সঙ্গে নিয়েছি। সে সব যতদিন চলে চলবে, তারপর সব কিছু ফুরোলে রয়েছে আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণানাশক বড়ি বটিকা ইন্ডিকা।

অবিনাশবাবু আমায় শাসিয়ে রেখেছেন—'আমাকে মশাই আপনার ওই সাহেব বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে বলবেন না। আপনি চৌষট্টিটা ভাষা জানতে পাবেন, আমার বাংলা বৈ আর সম্বল নেই। সকাল সন্ধ্যেয় গুড মর্নিং গুড ইভনিংটা বলতে পারি, এমন কি ওনাদের কেউ খাদে-টাদে পড়ে গেলে গুড বাইটাও মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে—তার বেশি আর কিছু পাবেন না। আপনি বরং বলে দেবেন যে আমি একজন মৌনী সাধু, তীর্থ করতে যাচ্ছি।' সত্যিই অবিনাশবাবু খুবই কম কথা বলছেন। আমি একা থাকলেও কথা বলেন ফিস্‌ফিস্ করে। একটা সুবিধে এই যে ভদ্রলোকের ঘোড়া চড়তে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এসব অঞ্চলে ঘোড়া ছাড়া গতি নেই। ছ'টা ঘোড়া, মাল

বইবার জন্য চারটে চমরী আর আটজন ভুটিয়া কুলি আমরা সঙ্গে নিচ্ছি।

উইলার্ডের ডায়রিটা নিজের চোখে দেখে আমার ইউনিকর্ন ও উড়ন্ত লামা সম্পর্কে কৌতূহল দশগুণ বেড়ে গেছে। এখানে একদল তিব্বতী পশমের ব্যাপারী এসেছে, তাদের একজনের সঙ্গে আলাপ করে একশৃঙ্গ জানোয়ারের কথা জিজ্ঞেস করাতে সে বোধহয় আমাকে পাগল ভেবে দাঁত বার করে হাসতে লাগল! উড়ন্ত লামার কথা জিজ্ঞেস করাতে সে বলল সব লামাই নাকি উড়তে পারে। আসলে এদের সঙ্গে কথা বলে কোনো ফল হবে না। উইলার্ডের সৌভাগ্য আমাদের হবে কিনা জানি না। একটা সুখবর আছে এই যে, উইলার্ডের ১১ই মার্চের ডায়রিতে একটা জায়গার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যেটার নাম দেওয়া নেই, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান দেওয়া আছে। সেটা হল ল্যাটিচিউড ৩৩·৩ নর্থ আর লঙ্গিচিউড ৮৪ ইস্ট। ম্যাপ খুলে দেখা যাচ্ছে সেটা কৈলাসের প্রায় একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে চাংথাং অঞ্চলে। এই চাংথাং ভয়ানক জায়গা। সেখানে গাছপালা বলতে কিছু নেই, আছে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত বালি আর পাথরে মেশানো রুক্ষ জমির মাঝে মাঝে একেকটা হ্রদ। মানুষ বলতে এক যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা ছাড়া কেউ থাকে না ওখানে। শীতও নাকি প্রচণ্ড। আর তার উপরে আছে বরফের ঝড়—যাকে বলে ব্লিজার্ড—যা নাকি সাতপুরু পশমের জামা ভেদ করে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

সবই সহ্য হবে যদি যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়। অবিনাশবাবু বলছেন, 'কোনো ভাবনা নেই। ভক্তির জোর, আর কৈলাসেশ্বরের কৃপায় আপনাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

৪ঠা আগস্ট। পুরাং উপত্যকা।

১২০০০ ফুট উঁচুতে একটা খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর ধারে আমরা ক্যাম্প ফেলেছি। হাপরের সাহায্যে ধুনি জ্বালিয়ে তার সামনে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে বসেছি। বিকেল হয়ে আসছে; চারদিকে ববফে ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা এই জায়গাটা থেকে রোদ সরে গিয়ে আবহাওয়া দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আশ্চর্য এই যে, এখানে সন্ধ্যা থেকে সকাল অবধি দুর্জয় শীত হলেও দুপুরের দিকে তাপমাত্রা চড়ে গিয়ে মাঝে মাঝে ৮০/৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উঠে যায়।

গারবেয়াং থেকে রওনা হবার আগে, চড়াই উঠতে হবে বলে নিশ্বাসের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য আমি সকলকে অক্সিমোর পাউডার অফার করি। সন্ডার্স ও অবিনাশবাবু আমার ওষুধ খেলেন। ক্রোল বলল সে জার্মানির পার্বত্য অঞ্চলে মাইনিঙ্গেন শহরে থাকে, ছেলেবেলা থেকে পাহাড়ে চড়েছে, তাই তার ওষুধের দরকার হবে না। মার্কোভিচকে জিজ্ঞেস করাতে সেও বলল ওষুধ খাবে না।

কেন খাবে না তার কোনো কারণ দিল না। বোধ হয় আমার তৈরি ওষুধে তার আস্থা নেই। সে যে অত্যন্ত মূর্খের মতো কাজ করেছে সেটা পরে নিজেও বুঝতে পেরেছিল। ঘোড়ায় চড়ে দিব্যি চলেছিলাম আমরা পাহাড়ে পথ ধরে। বেঁটে বেঁটে তিব্বতী ঘোড়ার পিঠে আমরা পাঁচজন, আর আমাদের পিছনে কুলি আর মালবাহী চমরীর দল। ষোল হাজার ফুটে গুরুপ-লা গিরিবর্ত্ম পেরোতেই হিমেল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ছাপিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আমাদের কানে এল। আমাদের মধ্যে কে যেন প্রচণ্ড জোরে হাসতে শুরু করেছে।

এদিক ওদিক চেয়ে একটু হিসেব করে শুনে বুঝতে পারলাম হাসিটা আসছে সবচেয়ে সামনের ঘোড়ার পিঠ থেকে। পিঠে রয়েছেন শ্রীমান সেরগেই মার্কোভিচ। তার হাসিটা এমনই বিকট ও অস্বাভাবিক যে আমাদের দলটা আপনা থেকেই থেমে গেল।

মার্কোভিচ থেমেছে। এবার সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। তারপর তার সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে অত্যন্ত বেপরোয়া ও বেসামাল ভাবে সে রাস্তার ডান দিকে এগোতে লাগল। ডাইনে খাদ, আর সে খাদ দিয়ে একবার গড়িয়ে পড়লে অন্তত দু হাজার ফুট নিচে গিয়ে সে গড়ানো থামবে এবং অবিনাশবাবুর 'গুড বাই' বলার সুযোগ এসে যাবে।

সন্ডার্স, ক্রোল ও আমি ঘোড়া থেকে নেমে ব্যস্ত ভাবে মার্কোভিচের দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চোখ ঘোলাটে ; তার হাসিও ঘোলাটে মনের হাসি। এবারে বুঝতে পারলাম তার কী হয়েছে। বারো হাজার ফুটের পর থেকেই আবহাওয়ায় অক্সিজেনের রীতিমতো অভাব হতে শুরু করে। কোনো কোনো লোকের বেলায় সেটা নিশ্বাসের কষ্ট ছাড়া আর কোনো গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে না। কিন্তু একেকজনের ক্ষেত্রে সেটা রীতিমতো মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়ে দেয়। তার ফলে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ ভুল বকে, আবার কেউ বা অজ্ঞান হয়ে যায়। মার্কোভিচকে হাসিতে পেয়েছে। আমাদের কুলিরা বোধহয় এ ধরনের ব্যারাম কখনো দেখেনি, কারণ তারা দেখছি মজা পেয়ে নিজেরাও হাসতে শুরু করে দিয়েছে। ন'টি পুরুষের অট্টহাসি এখন চারিদিকে পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ক্রোল হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'ওকে মারি একটা ঘুঁষি ?'

আমি তো অবাক। বললাম, 'কেন, ঘুঁষি মারবে কেন ? ওর তো অক্সিজেনের অভাবে ওই অবস্থা হয়েছে।'

'সেই জন্যেই তো বলছি। এই অবস্থায় ওকে তোমার ওষুধ খাওয়াতে পারবে না। বেহুঁশ হলে জোর করে গেলানো যেতে পারে।'

এর পরে আমি কিছু বলার আগেই ক্রোল মার্কোভিচের দিকে এগিয়ে গিয়ে
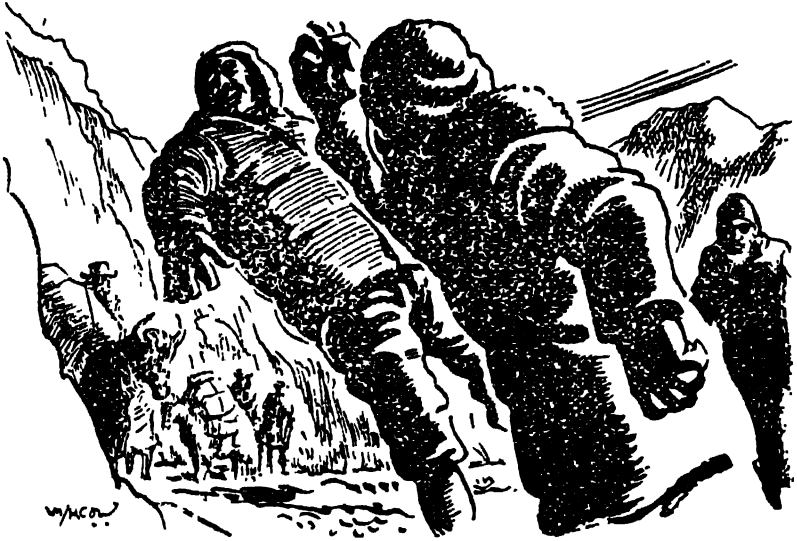
একটা প্রচণ্ড ঘুঁষিতে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। অজ্ঞান অবস্থায় তার মুখ হাঁ করে তার গলায় আমার পাউডার গুঁজে দিলাম। দশ মিনিট পরে জ্ঞান হয়ে ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক দেখে তার চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে সুবোধ বালকের মতো তার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। আমরা সকলে আবার রওনা দিলাম।

পুরাঙে এসে ক্যাম্প ফেলে আগুন জ্বেলে বসবার পর ক্রোল ও সন্ডার্সের সঙ্গে ইউনিকর্ন নিয়ে কথা হল। সন্ডার্স বলল, 'বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে হঠাৎ একটা নতুন জাতের জানোয়ার আবিষ্কার করাটা কী সাংঘাতিক ব্যাপার বল তো! আর, একটা আধটা নয়, একেবারে দলে দলে।'

ইউনিকর্ন থেকে আলোচনাটা আরো অন্য কাল্পনিক প্রাণীতে চলে গেল। সত্যি, পুরাকালে কতরকমই না উদ্ভট জীবজন্তু সৃষ্টি করেছে মানুষের কল্পনা। অবিশ্যি কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে এসব নিছক কল্পনা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যে সব প্রাণীদের দেখত, তার আবছা স্মৃতি নাকি অনেক যুগ পর্যন্ত মানুষের মনে থেকে যায়। সেই স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা জুড়ে মানুষই আবার এই সব উদ্ভট প্রাণীর সৃষ্টি করে। এই ভাবে প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাকটিল বা ঈপিয়র্নিস পাখির স্মৃতি থেকেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে গরুড় বা জটায়ু বা আরব্যোপন্যাসের সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পের অতিকায় রক পাখি—যার

ছানার খাদ্য ছিল একটা আস্ত হাতি। মিশর দেশের উপকথায় তি-বেন্নু পাখির কথা আছে, পরে ইউরোপে যার নাম হয়েছিল ফীনিক্স। এই ফীনিক্সের নাকি মৃত্যু নেই। একটা সময় আসে যখন সে নিজেই নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে, আর পরমুহূর্তেই তার ভস্ম থেকে নতুন ফীনিক্স জন্ম নেয়। আর আছে ড্র্যাগন—যার অস্তিত্ব পূর্ব-পশ্চিম দুদিকের লোকই বিশ্বাস করত। তফাৎ এই যে পশ্চিমের ড্র্যাগন ছিল অনিষ্টকারী দানব, আর চীন বা তিব্বতের ড্র্যাগন ছিল মঙ্গলময় দেবতা।

এই সব আলোচনা করতে করতে আমি মার্কোভিচের কথাটা তুললাম। আমার মতে তাকে আমাদেব অভিযানের আসল উদ্দেশ্যটা জানানো দরকার। চাংথাং অঞ্চলের ভয়াবহ চেহারাটাও তার কাছে পরিষ্কার করা দরকার। সেটা জেনেও যদি সে আমাদের সঙ্গে যেতে চায় তো চলুক, আর না হলে হয় সে নিজের রাস্তা ধরুক, না হয় দেশে ফিরে যাক।

ক্রোল বলল, 'ঠিক বলেছ। যে লোক আমাদের সঙ্গে ভালো ভাবে মিশতে পারে না, তাকে সঙ্গে নেওয়া কী দরকার। যা বলবার এখনি বলা হোক্।'

সন্ডার্স বলল সে মার্কোভিচকে পশ্চিমের তাঁবুতে যেতে দেখেছে। আমরা তিনজনে তাঁবুর ভেতর ঢুকলাম।

মার্কোভিচ একপাশে অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। আমরা ঢুকতে সে মুখ তুলে চাইল। সন্ডার্স ভনিতা না করে সরাসরি উইলার্ডের ডায়রি আর একশৃঙ্গের কথায় চলে গেল। তার কথার মাঝখানেই মার্কোভিচ বলে উঠল, 'ইউনিকর্ন ? ইউনিকর্ন তো আমি ঢের দেখেছি। আজকেও আসার সময় দেখলাম। তোমরা দেখনি বুঝি ?'

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। মার্কোভিচ যেমন বসে ছিল তেমনি বসে আছে। সে যে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে সেটা তার ভাব দেখে মোটেই মনে হয় না। তাহলে কি আমার ওষুধ পুরোপুরি কাজ দেয়নি ? তার মাথা কি এখনো পরিষ্কার হয়নি ?

ক্রোল গুনগুন করে একটা জার্মান সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাইরে চলে গেল। বুঝলাম সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা দুজনেও উঠে পড়লাম। বাইরে এলে পর ক্রোল তার পাইপ ধরিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল, 'এটাও কি তোমার অক্সিজেনের অভাব বলে মনে হয় ?' আমি আর সন্ডার্স দুজনেই চুপ। 'আমরা নিঃসন্দেহে একটা পাগলকে সঙ্গে নিয়ে চলেছি'—বলে ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে খোদাই করা তিব্বতী মহামন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'-এর ছবি তুলতে চলে গেল।

মার্কোভিচ কি সত্যিই পাগল, না সাজা-পাগল ? আমার মনটা খুঁৎ খুঁৎ

কবছে।

আমাদের মধ্যে অবিনাশবাবুই বোধহয় সবচেয়ে ভালো আছেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভদ্রলোককে দেখছি, ওঁর মধ্যে যে কোনো রসবোধ আছে তা আগে কল্পনাই করতে পারিনি। আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে উনি চিরকালই ঠাট্টা করে এসেছেন ; আমার যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোও ওঁর মনে কোনোদিন বিস্ময় বা শ্রদ্ধা জাগাতে পারেনি। কিন্তু ওই যে দুবার আমার সঙ্গে বাইরে গেলেন—একবার আফ্রিকায়, আরেকবার প্রশান্ত মহাসাগরের সেই আশ্চর্য দ্বীপে—তার পর থেকেই দেখেছি ওঁর চরিত্রে একটা বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। ভ্রমণে মনের প্রসার বাড়ে বলে ইংরাজিতে একটা কথা আছে, সেটা অবিনাশবাবুর ক্ষেত্রে চমৎকার ভাবে ফলেছে। আজ বারবার উনি আমার কানের কাছে এসে বিড়বিড় করে গেছেন—'কৈলাস ভূধর অতি মনোহর, কোটি শশী পরকাশ, গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর অপ্সরাগণের বাস।' কৈলাস সম্বন্ধে পৌরাণিক ধারণাটা অবিনাশবাবু এখনো বিশ্বাস করে বসে আছেন। আসল কৈলাসের সাক্ষাৎ পেয়ে ভদ্রলোককে কিঞ্চিৎ হতাশ হতে হবে। আপাতত উনি কুলিদের রান্নার আয়োজন দেখতে ব্যস্ত। বুনো ছাগলের মাংস রান্না করছে ওরা।

দূরে, বহুদূরে, আমরা যেই রাস্তা দিয়ে যাব সেই রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে একদল লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ দলটাকে কতগুলো চলমান কালো বিন্দু বলে মনে হচ্ছিল। এখন তাদের চেহারাটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এদের দেখতে পেয়ে আমাদের লোকগুলোর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করছি। কারা এরা ?

শীত বাড়ছে। আর বেশিক্ষণ বাইরে বসা চলবে না।

৪ঠা আগস্ট। সন্ধ্যা সাতটা।

একটা বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল এই কিছুক্ষণ আগে। দূর থেকে যে দলটাকে আসতে দেখেছিলাম সেটা ছিল একটা খাম্‌পা দস্যুদল। এই বিশেষ দলটিই যে উইলার্ডকে আক্রমণ করেছিল তারও প্রমাণ পেয়েছি।

বাইশটা ঘোড়ার পিঠে বাইশজন লোক, তাদের প্রত্যেকের মোটা পশমের জামার কোমরে গোঁজা তলোয়ার, কুক্‌রি, ভোজালি, আর পিঠের সঙ্গে বাঁধা আদ্যিকালের গাদা বন্দুক। এ ছাড়া দলে আছে পাঁচটা লোমশ তিব্বতী কুকুর।

দলটা যখন প্রায় একশো গজ দূরে, তখন আমাদের দুজন লোক—রাবসাং ও টুণ্ডুপ—হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কাছে এসে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে যা অস্ত্রশস্ত্র আছে তা তাঁবুর ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসুন।' আমি বললাম, 'কেন, ওদের দিয়ে দিতে হবে নাকি ?' 'না, না। বিলাতি বন্দুককে ওরা সমীহ করে চলে। না

হলে ওরা সব তছনছ করে লুট করে নিয়ে যাবে। ভারী বেপরোয়া দস্যু ওরা।'

আমাদের সঙ্গে তিনটে বন্দুক—একটা এনফিল্ড ও দুটো অস্ট্রিয়ান মান্‌লিখার। সন্ডার্স ও ক্রোল তাঁবু থেকে টোটা সমেত বন্দুক বার করে আনল। মার্কোভিচের বেরোবার নাম নেই, আমি প্রয়োজনে পকেট থেকে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল বার করব, তাই হাত খালি রাখতে হবে, অথচ দুজনের হাতে তিনটে বন্দুক বেমানান, তাই অবিনাশবাবুকে ডেকে তার হাতে একটা মান্‌লিখার তুলে দেওয়া হল! ভদ্রলোক একবার মাত্র হাঁ হাঁ করে থেমে গিয়ে কাঁপা হাতে বন্দুকটা নিয়ে দস্যুদলের উল্টো দিকে মুখ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

২

দস্যুদল এসে পড়ল। ধুম্‌সো লোমশ তিব্বতী কুকুরগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করছে। তাদেরও ভাবটা দস্যুদেরই মতো। আমাদের দলের লোকগুলোর অবস্থা কাহিল। যে যেখানে ছিল সব জবুথবু হয়ে বসে পড়েছে। এই সব দস্যু সাধারণত যাযাবরদের আস্তানায় গিয়ে পড়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে চলে যায়। উপযুক্ত অস্ত্র ছাড়া এদের বাধা দিতে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। অবিশ্যি এরা যদি তিব্বতী পুলিশের হাতে পড়ে তাহলে এদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। গর্দান আর ডান হাতটা কেটে নিয়ে সেগুলোকে সোজা রাজধানী লাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধু ধু প্রান্তরে বরফে ঢাকা গিরিবর্ত্মের আনাচে কানাচে এদের খুঁজে বার করা মোটেই সহজ নয়। এও শুনেছি যে এই সব দস্যুদের নিজেদেরও নাকি নরকভোগের ভয় আছে। তাই এরা লুটপাট বা খুনখারাপী করে নিজেরাই, হয় কৈলাস প্রদক্ষিণ করে, না হয় কোনো উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে নিজেদের পাপের ফিরিস্তি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে নেয়।

দস্যুদের সামনে যে রয়েছে তাকেই মনে হল পালের গোদা। নাক থ্যাবড়া, কানে মাক্‌ড়ি, মাথার রুক্ষ চুল টুপির পাশ দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে, বয়স বেশি না হলেও মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, কুৎকুতে চোখে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে আমাদের চারজনকে নিরীক্ষণ করছে। বাকি লোকগুলো যে যেখানে ছিল সেখানেই চুপ করে ঘোড়ার লাগাম ধরে অপেক্ষা করছে; বোঝা যাচ্ছে নেতার হুকুম না পেলে কিছু করবে না।

এবারে দস্যুনেতা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। তারপর ক্রোলের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা ঘড়ঘড় গলায় বলল—'পেলিং?' পেলিং মানে ইউরোপীয়। ক্রোলের হয়ে আমিই 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিয়ে দিলাম। দিয়েই

খট্‌কা লাগল। ইউরোপীয় দেখে চিনল কী করে এরা ?

লোকটা এবার ধীরে ধীরে সন্ডার্সের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার পায়ের কাছ থেকে একটা বেক্‌ড বীন্‌সের খালি টিন তুলে নিয়ে সেটাকে উল্টে পাল্টে দেখে তার গন্ধ শুঁকে আবার মাটিতে ফেলে ভারী ভারী বুটের গোড়ালির এক মোক্ষম চাপে সেটাকে থেঁৎলে মাটির সঙ্গে সমান করে দিল। সন্ডার্স হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দস্যু নেতার ঔদ্ধত্য হজম করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কোত্থেকে জানি মাঝে মাঝে একটা দাঁড়কাকের গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এছাড়া কেবল নদীর কুল কুল শব্দ। কুকুরগুলো আর ডাকছে না। এই থম্‌থমের মধ্যে আবার দস্যুনেতার ভারী বুটের শব্দ পাওয়া গেল। সে এবার অবিনাশবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোক যে কেন তাকে মাথা হেঁট করে নমস্কার করলেন তা বোঝা গেল না। দস্যুনেতার বোধহয় ব্যাপারটা ভারী কমিক বলে মনে হল, কারণ সে সশব্দে একটা বর্বর হাসি হেসে অবিনাশবাবুর হাতের বন্দুকের বাঁটে একটা খোঁচা মারল।

এবার ক্রোলের দিকে চোখ পড়াতে সভয়ে দেখলাম সে তার বন্দুকটা দস্যুনেতার দিকে উঠিয়েছে, প্রচণ্ড রাগে তার কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে। আমি চোখ দিয়ে ইসারা করে তাকে ধৈর্য হারাতে মানা করলাম। ইতিমধ্যে সন্ডার্স আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ফিস্ ফিস করে বলল, 'দে হ্যাভ অ্যান এনফিল্ড টু।'

কথাটা শুনে অন্য দস্যুগুলোর দিকে চেয়ে দেখি তাদের মধ্যে একজন হিংস্র চেহারার লোক ঘোড়ার পিঠে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। তার কাঁধে সত্যিই একটা এনফিল্ড রাইফ্‌ল। উইলার্ডের ডায়রি থেকে জেনেছি যে তার নিজের একটা এনফিল্ড ছিল। সেটা কিন্তু আলমোড়ায় ফেরেনি। এই বন্দুক, আর ইউরোপীয়দের দেখে চিনতে পারা—এই দুটো ব্যাপার থেকে বেশ বোঝা গেল যে এই দস্যুদলই উইলার্ডের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কিন্তু তাহলেও আমাদের হাত পা বাঁধা। এরা দলে ভারী। লড়াই লাগলে হয়তো আমাদের বন্দুক আর আমার পিস্তলের সাহায্যে এদের রীতিমতো শিক্ষা দেওয়া যেত, কিন্তু সে খবর যদি অন্য খাম্‌পাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে কি তারা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে ?

লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে কিনা ভাবছি, দস্যুনেতা অসীম সাহসের সঙ্গে আমাদের পূর্বদিকের ক্যাম্পটার দিকে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। অন্য ক্যাম্পটা থেকে হঠাৎ মার্কোভিচ টলতে টলতে বেরিয়ে এলো—তার ডান হাতটা সামনের দিকে তোলা, তার তর্জনী নির্দেশ করছে

দস্যুদের তিব্বতী কুকুরগুলোর দিকে।

পরমুহূর্তেই তার গলায় এক অদ্ভুত উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল—'ইউনিকর্ন! ইউনিকর্ন!'

আমরা ভালো করে ব্যাপারটা বোঝার আগেই মার্কোভিচ দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল একটা বিশাল লোমশ ম্যাস্টিফ কুকুরের দিকে। হয়তো তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে মনে করেই কুকুরটা হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে একটা বিশ্রী গর্জন করে মার্কোভিচের দিকে দিল একটা লাফ।

কিন্তু মার্কোভিচের নাগাল পাবার আগেই সে কুকুর ভেল্‌কিব মতো ভ্যানিশ করে গেল। এর কারণ আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল। আমার ডান হাতটা অনেকক্ষণ থেকেই পকেটে পিস্তলের উপর রাখা ছিল। মোক্ষম মুহূর্তে সে হাত পিস্তল সমেত বেরিয়ে এসে কুকুরের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিয়েছে।

কুকুর উধাও হবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কোভিচ মুহ্যমান অবস্থায় মাটিতে বসে পড়ল। ক্রোল আর সন্ডার্স মিলে তাকে কোলপাঁজা করে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেল।

আর এদিকে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আমার পিস্তলের মহিমা দেখে দস্যুদলের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তারা কেউ কেউ ঘোড়া থেকে নেমে

হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েছে, কেউ আবার ঘোড়ার পিঠ থেকেই বার বার গড় করার ভাব করে উপুড় হয়ে পড়ছে। দস্যুনেতাও বেগতিক দেখে ইতিমধ্যে তার ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়েছে। বাইশজন দস্যুর সম্মিলিত বেপরোয়া ভাব এক মুহূর্তে এভাবে উবে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

এবার আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। যে লোকটার কাছে এনফিল্ডটা ছিল তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হয় তোমার বন্দুক দাও, না হয় তোমাদের পুরো দলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।' সে কাঁপতে কাঁপতে তার কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে আমার হাতে তুলে দিল। এবার বললাম, 'এই বন্দুক যার, তার আর কী কী জিনিস তোমাদের কাছে আছে বার কর।'

এক মিনিটের মধ্যে এর ওর ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়ল দু টিন সসেজ, একটা গিলেট সেফটি রেজার, একটা আয়না, একটা বাইনোকুলার, একটা ছেঁড়া তিব্বতের ম্যাপ, একটা ওমেগা ঘড়ি, আর একটা চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ খুলে দেখি তাতে রয়েছে একটা বাইবেল, আর তিব্বত সম্বন্ধে মোরক্রফ্‌ট ও টিফেন্টালেরের লেখা দুটো বিখ্যাত বই। বই দুটোতে উইলার্ডের নাম লেখা রয়েছে তার নিজের হাতে।

জিনিসগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে সবে ভাবছি দস্যুনেতাকে কিছু সতর্কবাণী শুনিয়ে তাদের বিদায় নিতে বলব, কিন্তু তার আগেই তাদের পুরো দলটা চক্ষের নিমেষে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ঘোড়া ছুটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আবছা হয়ে আসা পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আপদ বিদায় করে অবিনাশবাবুকে মান্‌লিখারের ভারমুক্ত করে পশ্চিম দিকের তাঁবুতে গেলাম মার্কোভিচের অবস্থা দেখতে। সে মাটিতে কম্বলের উপর শুয়ে আছে চোখ বুজে। মুখের উপর টর্চ ফেলতে সে ধীরে ধীরে চোখ খুলল। এইবারে তার চোখের পাতা আর মণি দেখেই বুঝতে পারলাম যে সে নেশা করেছে। আর সে নেশা সাধারণ নেশা নয়; অত্যন্ত কড়া কোনো মাদক ব্যবহার করেছে সে। হয়তো এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস, আর তার প্রভাবেই সে যেখানে সেখানে ইউনিকর্ন দেখতে পাচ্ছে। কোকেন, হেরয়েন, মর্ফিয়া বা ওই জাতীয় কোনো মাদক খেলে বা ইঞ্জেকশন নিলে শুধু যে শরীরের ক্ষতি করে তা নয়, তা থেকে ব্রেনের বিকার ও তার ফলে চোখে ভুল দেখা কিছুই আশ্চর্য না।

মার্কোভিচের মতো নেশাখোরকে সঙ্গে নিলে আমাদের এই অভিযান ভণ্ডুল হয়ে যাবে। হয় তাকে তাড়াতে হবে, না হয় তার নেশাকে তাড়াতে হবে।

৫ই আগস্ট, সকাল ৭টা।

কাল রাত্রে তাকে ডাকা সত্ত্বেও মার্কোভিচ যখন খেতে এল না, তখন নেশার

ধারণাটা আমার মনে আরো বদ্ধমূল হল। আমি জানি এ জাতীয় ড্রাগ বা মাদক ব্যবহার করলে মানুষের ক্ষিদে তেষ্টা অনেক কমে যায়। কথাটা বলতে সন্ডার্স একেবারে ক্ষেপে উঠল। বলল, 'ওকে সরাসরি জেরা করতে হবে এক্ষুনি।' ক্রোল বলল, 'তুমি অত্যন্ত বেশি ভদ্র, তোমাকে দিয়ে জেরা হবে না। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

খাবার পরে ক্রোল সোজা তাঁবুর ভিতর গিয়ে আধঘুমন্ত মার্কোভিচকে বিছানা থেকে হিঁচড়ে টেনে তুলে সোজা তার মুখের উপর বলল, 'তোমার কাছে কী ড্রাগ আছে বার কর। আমরা জানি তুমি নেশা কর। এ নেশা তোমার ছাড়তে হবে, নয়তো তোমাকে আমরা বরফের মধ্যে পুঁতে দিয়ে চলে যাব ; কেউ টের পাবে না।'

মার্কোভিচ পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল কিনা জানি না, কিন্তু সে ক্রোলের ভাব দেখে যে ভয় পেয়েছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সে কোনোরকমে ক্রোলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ হাতড়ে তার থেকে একটা মাথার বুরুশ বার করে ক্রোলের হাতে দিল। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল এটা তার পাগলামিরই আরেকটা লক্ষণ ; কিন্তু ক্রোলের জার্মান বুদ্ধি এক নিমেষে বুঝে ফেলল যে মার্কোভিচ আসল জিনিসটাই বার করে দিয়েছে। বুরুশের কাঠের অংশটায় চাড় দিতে সেটা বাক্সের ডালার মতো খুলে গেল, আর তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল ঠিক ট্যালকাম পাউডারের মতো দেখতে মিহি সাদা কোকেনের গুঁড়ো। আধ মিনিটের মধ্যে সে গুঁড়ো তিব্বতের হিমেল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, আর বুরুশটা নিক্ষিপ্ত হল খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর জলে।

কিন্তু শুধু কোকেন দূর করলেই তো হবে না, মার্কোভিচের নেশাটাকেও দূর করা চাই। আজ সকালে তার হাবভাবে মনে হচ্ছে আমার আশ্চর্য ওষুধ মিরাকিউরলে কাজ দিয়েছে। সে ইতিমধ্যেই চার গেলাস মাখন চা, সেরখানেক ছাগলের মাংস আর বেশ কিছুটা সাম্পা খেয়ে ফেলেছে।

৭ই আগস্ট। সাংচান ছাড়িয়ে।

এখন দুপুর আড়াইটা। আমরা মানস সরোবরের পথে একটা গুম্ফা বা তিব্বতী মঠের বাইরে বসে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি। পথে আসতে আসতে আরো অনেক গুম্ফা দেখেছি। এগুলোর প্রত্যেকটাই একেকটা পাহাড়ের চুড়ো বেছে বেছে তার উপর তৈরি করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা থেকেই চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। লামাদের সৌন্দর্যবোধ আছে একথা স্বীকার করতেই হয়।

আমাদের সামনে উত্তর দিকে ২৫০০ ফুট উঁচু গুর্লা-মান্ধাতা পর্বত সদর্পে

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া চারিদিকে আরো অনেক বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুদূর গেলেই কৈলাস-মানস সরোবরের দর্শন মিলবে, অবিনাশবাবুর যাত্রা সার্থক হবে। আপাতত মান্ধাতা দেখেই তাঁর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের সীমা নেই। বার বার বলছেন, 'গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই। মহাভারতের যুগে চলে এসেছি। উঃ কী ভয়ানক ব্যাপার !'

বলা বাহুল্য, এখনো পর্যন্ত একশৃঙ্গের কোনো চিহ্ন নেই। জানোয়ারের মধ্যে বুনো ছাগল ভেড়া গাধা চমরী এসব তো হামেশাই দেখছি। মাঝে মধ্যে এক-আধটা খরগোশ ও মেঠো ইঁদুরও দেখা যায়। হরিণ আর ভাল্লুক আছে বলে জানি, কিন্তু দেখিনি। কাল রাত্রে ক্যাম্পের আশেপাশে নেকড়ে হানা দিচ্ছিল, তাঁবুর কাপড় ফাঁক করে টর্চ ফেলে তাদের জ্বলন্ত সবুজ চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম।

সন্ডার্সের মনে একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়েছে। ওর ধারণা হয়েছে উইলার্ডও মার্কোভিচের মতো নেশা করে আজগুবী দৃশ্য দেখেছে আর আজগুবী ঘটনার বর্ণনা করেছে। উড়ন্ত লামা, ইউনিকর্ন—এরা সবই তার ড্রাগ-জনিত দৃষ্টিভ্রম। সন্ডার্স ভুলে যাচ্ছে যে আমরা আলমোড়াতে মেজর হর্টনের সঙ্গে দেখা করেছি। উইলার্ড সম্বন্ধে তার রিপোর্ট দেখেছি। তাতে ড্রাগের কোনো ইঙ্গিত ছিল না।

আমরা যে গুম্ফার সামনে বসেছি তাতে একটি মাত্র লামা বাস করেন। আমরা এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এক অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছি। এমনিতে হয়তো যেতাম না, কিন্তু রাবসাং যখন বলল লামাটি পঞ্চাশ বছর কারুর সঙ্গে কথা বলেননি, তখন স্বভাবতই আমাদের একটা কৌতূহল হল। আমরা রাস্তা থেকে দুশো ফুট উপরে উঠে মৌনী লামাকে দর্শন করার জন্য গুম্ফায় প্রবেশ করলাম।

পাথরের তৈরি প্রাচীন গুম্ফার ভিতরে অন্ধকার দেওয়ালে শেওলা। আসল কক্ষের ভিতর পিছন দিকে একটা লম্বা তাকে সাত আটটা মাঝারি আকারের বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে, তার মধ্যে অন্তত তিনখানা যে খাঁটি সোনার তৈরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রদীপ জ্বলছে। এক পাশে একটা পাত্রে একতাল মাখন রাখা রয়েছে, ঘিয়ের বদলে এই মাখনই ব্যবহার হয় প্রদীপের জন্য। একদিকের দেয়ালের গায়ে তাকের উপর থরে থরে সাজানো রয়েছে লাল কাপড়ে মোড়া প্রাচীন তিব্বতী পুঁথি। অবিনাশবাবু একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে মশাই।' চেয়ে দেখি সেখানে একটা মড়ার খুলি রয়েছে। আমি বললাম, 'ওটা চা খাওয়ার পাত্র।' অবিনাশবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

মৌনী লামা ছিলেন পাশের একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে। ঘরের পুবের দেয়ালে একটা খুপরি জানালা, সেই জানালার পাশে বসে লামা জপযন্ত্র ঘোরাচ্ছেন। মাথা মুড়োন, শীর্ণ চেহারা, বসে থেকে থেকে হাত-পাগুলো অস্বাভাবিক রকম সরু হয়ে গেছে। আমরা তাঁকে একে একে অভিবাদন জানালাম, তিনি আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাল সুতো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর সামনে একটা নিচু কাঠের বেঞ্চিতে আমরা পাঁচজন বসলাম। লামা কথা বলবেন না, তাই তাঁকে এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর কথা না বলে দেওয়া যায়। আমি আর সময় নষ্ট না করে সোজা আসল প্রশ্নে চলে গেলাম।

'তিব্বতের কোথাও একশৃঙ্গ জানোয়ার আছে কি ?'

লামা কয়েক মুহূর্ত হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমাদের পাঁচ জোড়া চোখের উৎসুক দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ। এইবার তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, উপর থেকে নিচে। একবার, দুবার, তিনবার। অর্থাৎ—আছে। আমরা চাপা উৎকণ্ঠায় আড়চোখে একবার পরস্পরের দিকে চেয়ে নিলাম। কিন্তু লামা যে আবার মাথা নাড়ছেন! এবার পাশাপাশি। অর্থাৎ—নেই।

এটা কিরকম হল ? এর মানে কী হতে পাবে ? আগে ছিল, কিন্তু এখন নেই ? ক্রোল আমাকে ফিস্‌ফিসে গলায় বলল, 'কোথায় আছে জিজ্ঞেস করো।' মার্কোভিচও দেখছি অত্যন্ত মন দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। এই প্রথম সে সুস্থ অবস্থায় আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্যের কথা শুনল।

ক্রোলের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রশ্নটা করাতে লামা তার শীর্ণ বাঁ হাতটা তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমরা তো ওই দিকেই যাচ্ছি। কৈলাস ছাড়িয়ে চাংথাং অঞ্চলে! আমি এবার আরেকটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'আপনি যোগীপুরুষ। ভূত ভবিষ্যৎ আপনার জানা। আপনি বলুন তো আমরা এই আশ্চর্য জানোয়ার দেখতে পাব কিনা।'

লামা আবার মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। উপর থেকে নিচে। তিনবার।

ক্রোল রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এবার বেশ জোরেই বলল, 'আস্ক হিম অ্যাবাউট ফ্লাইং লামাজ।'

আমি লামার দিকে ফিরে বললাম, 'আমি আপনাদের মহাযোগী মিলারেপার আত্মজীবনী পড়েছি। তাতে আছে তিনি মন্ত্রবলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে যেতে পারতেন। এখনও এমন কোনো তিব্বতী যোগী আছেন কি যিনি এই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ?'

মৌনী লামার চাহনিতে যেন একটা কাঠিন্যের ভাব ফুটে উঠল। তিনি এবার
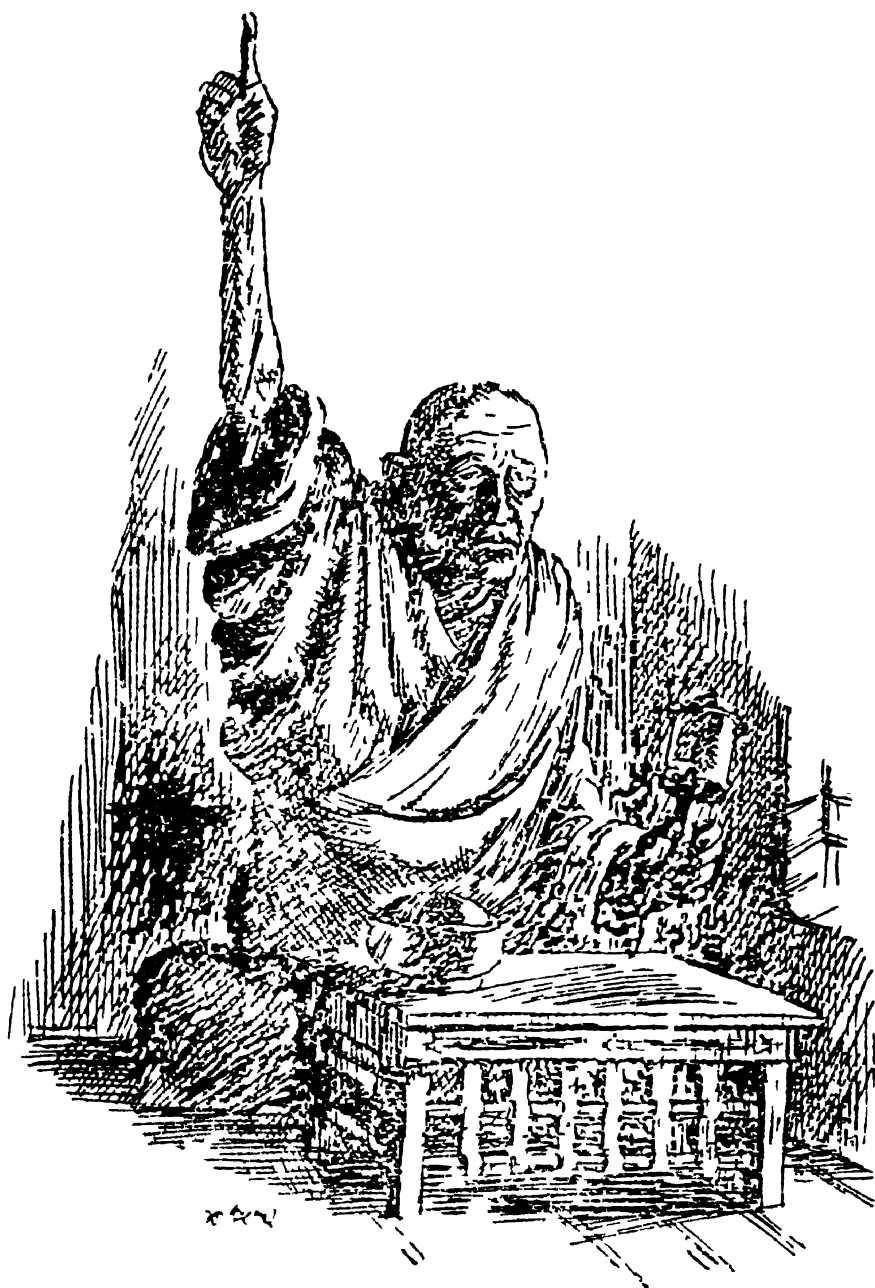
বেশ দৃঢ়ভাবেই মাথাটাকে নাড়লেন। পাশাপাশি। অর্থাৎ না, নেই। তারপর তিনি তাঁর ডানহাতের তর্জনীটা খাড়া করে সেই অবস্থায় পুরো হাতটাকে মাথার উপর তুলে কিছুক্ষণ ধরে ঘোরালেন। তারপর হাত নামিযে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের উঁচোন তর্জনীটাকে চাপ দিয়ে নামিয়ে দিলেন। মানেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হল না: মিলারেপা একজনই ছিলেন। তিনি মন্ত্রবলে উড়তে পারতেন। তিনি এখন আর নেই।

গুম্ফা থেকে বেরোনোর আগে আমরা কিছু চা আর সাম্পা মৌনী লামার জন্যে রেখে এলাম। এখানকার যাত্রী ও যাযাবরদের মধ্যে যাবা মৌনী লামাব কথা জানে তারা এই গুম্ফার পাশ দিয়ে গেলেই লামাব জন্যে কিছু না কিছু খাবাব জিনিস রেখে যায়।

বাইরে এসে সন্ডার্স আর ক্রোলের মধ্যে তর্ক লেগে গেল। সন্ডার্স লামার সংকেতে আমল দিতে রাজি নয়। বলল, 'একবাব হ্যাঁ, একবার না—এ আবাব কী ? আমার মতে হ্যাঁ-য়ে না-য়ে কাটাকাটি হয়ে কিছুই থাকে না। অর্থাৎ আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি।'

ক্রোল কিন্তু লামার সংকেতের সম্পূর্ণ অন্য মানে করেছে। সে বলল, 'আমার কাছে মানেটা খুব স্পষ্ট। হ্যাঁ মানে ইউনিকর্ন আছে, আব না মানে সেটা এমন জায়গায় আছে যেখানে আমাদের যেতে সে বারণ কবছে। কিন্তু বাবণ কবলেই তো আর আমরা বাবণ মানছি না।'

মার্কোভিচ এইবার প্রথম আমাদের কথায় যোগ দিল। সে বলল, 'ইউনিকর্ন যদি সত্যিই পাওযা যায়, তাহলে সেটাকে নিয়ে আমবা কী করব সেটা ভেবে দেখা হয়েছে কি ?'

লোকটা কী জানতে চাইছে সেটা পরিষ্কাব বোঝা গেল না। ক্রোল বলল, 'সেটা আমরা এখনো ভেবে দেখিনি। আপাতত জানোযাবটাকে খুঁজে বাব কবাই হচ্ছে প্রধান কাজ।'

'হুঁ' বলে মার্কোভিচ চুপ মেরে গেল। মনে হল তাব মাথায কী যেন একটা ফন্দি খেলছে। কোকেনমুক্ত হবার পব থেকেই দেখছি তাব উদ্যম অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে লামাদের সম্পর্কে তার একটা বিশেষ কৌতূহল লক্ষ করছি, যার জন্য কাল থেকে নিয়ে সাতবার সে দল ছেড়ে পাহাড়ে উঠে গুম্ফা দেখতে গেছে। কোকেনখোর কি শেষটায় ধর্মজ্ঞানী হয়ে দেশে ফিবরে ?

৩

৯ই আগস্ট, সকাল দশটা।

আমরা এইমাত্র চুসুং-লা গিরিবর্ত্ম পেবিয়ে রাবণ হ্রদ ও তার পিছনে কৈলাসের

তুষারাবৃত ডিম্বাকৃতি শিখরের সাক্ষাৎ পেলাম। এই রাবণ হ্রদের তিব্বতী নাম রাক্ষস-তাল, আর কৈলাসকে এরা বলে কাং-রিমপোচে। হ্রদটা তেমন পবিত্র কিছু নয়, কিন্তু কৈলাস দেখামাত্র আমাদের কুলিরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। অবিনাশবাবু প্রথমে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। শেষটায় খেয়াল হওয়া মাত্র এক সঙ্গে শিবের আট দশটা নাম উচ্চারণ করে হাঁটুগেড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠেকাতে লাগলেন। রাবণ হ্রদের পুব দিকে মানস সরোবর। কালই পৌঁছে যাব বলে মনে হয়।

১০ই আগস্ট, দুপুর আড়াইটা।

মানস সরোবরের উত্তর পশ্চিমে একটা জলকুণ্ডের ধারে বসে আমরা বিশ্রাম করছি। আমাদের বাঁ দিকের চড়াইটা পেরিয়ে খানিকটা পথ গেলেই হ্রদের দেখা পাব।

গত এক মাসে এই প্রথম আমরা সকলে স্নান করলাম। প্রচণ্ড গরম জল, তাতে সালফার বা গন্ধক রয়েছে। জলের উপর ধোঁয়া আর শেওলার আবরণ। আশ্চর্য তাজা বোধ করছি স্নানটা করে।

এখন ডায়রি লিখতাম না, কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেছে যেটা লিখে রাখা দরকার।

আমি আর অবিনাশবাবু কুণ্ডের পশ্চিম দিকটায় নেমেছিলাম, আর সাহেব তিনজন নেমেছিলেন দক্ষিণ দিকে। স্নান সেরে ভিজে কাপড় শুকোনোর অপেক্ষায় বসে আছি, এমন সময় ক্রোল আমার কাছে এসে গল্প করার ভান করে হাসি হাসি মুখে চাপা গলায় বলল, 'খুব জটিল ব্যাপার।' আমি বললাম, 'কেন. কী হয়েছে?'

'মার্কোভিচ।'

'লোকটা ভণ্ড, জোচ্চোর।'

'আবার কী করল?'

আমি জানি ক্রোল মার্কোভিচকে মোটেই পছন্দ করে না। বললাম, 'ব্যাপারটা খুলে বল।'

ক্রোল সেই রকম হাসি হাসি ভাব করেই বলতে লাগল, 'একটা পাথরের পিছনে আমাদের গরম জামাগুলো খুলে আমরা জলে নেমেছিলাম। আমি একটা ডুব দিয়েই উঠে পড়ি। মার্কোভিচের কোট আমার কোটের পাশেই রাখা ছিল। ভিতরের পকেটটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাতে কী আছে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। তিনটে চিঠি ছিল। ব্রিটিশ ডাকটিকিট। প্রত্যেকটিই জন মার্কহ্যাম নামক কোনো ভদ্রলোককে লেখা।'

'মার্কহ্যাম ?'

'মার্কহ্যাম—মার্কোভিচ। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ কি ?'

আমি বললাম, 'ঠিকানা কী ছিল ?'

'দিল্লীর ঠিকানা।'

জন মার্কহ্যাম...জন মার্কহ্যাম...নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছি আগে ? ঠিক কথা, বছর তিনেক আগের খবরের কাগজের একটা খবর। সোনা স্মাগল করার ব্যাপারে লোকটা ধরা পড়েছিল—জন মার্কহ্যাম। জেলও হয়েছিল। কী ভাবে যেন পালায়। একটা পুলিশকে গুলি করে মেরেছিল জন মার্কহ্যাম। লোকটা ইংরেজ। ভারতবর্ষে আছে বহুদিন। নৈনিতালে একটা হোটেল চালাত। পলাতক আসামী। এখন নাম ভাঁড়িয়ে পোল্যান্ডবাসী রাশিয়ান সেজে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। তিব্বত হবে তার গা ঢাকা দেবার জায়গা। কিংবা আরো অন্য কোনো কুকীর্তির মতলবে এসেছে এখানে। ভণ্ডই বটে। ডেঞ্জারাস লোক। ক্রোলের গোয়েন্দাগিরির প্রশংসা করতে হয়। প্রথমে ওর অন্যমনস্ক ভাব দেখে ও যে এতটা চতুর তা বুঝতে পারিনি। আমি ক্রোলকে মার্কহ্যামের ঘটনাটা বললাম।

ক্রোলের মুখে এখনো হাসি। সেটার প্রয়োজন এই কারণে যে মার্কোভিচ কুণ্ডের দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের দেখতে পাচ্ছে। তার বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা তাকে বুঝতে দেওয়া চলে না। ক্রোল খোশগল্পের মেজাজে একবার সশব্দে হেসে পরক্ষণেই গলা নামিয়ে বলল, 'আমার ইচ্ছা ওকে ফেলে রেখে যাওয়া। ওর তুষার-সমাধি হোক। ওটাই হবে ওর শাস্তি।'

প্রস্তাবটা আমার কাছে ভালো মনে হল না। বললাম, 'না। ও আমাদের সঙ্গে চলুক। ওকে কোনোরকমেই জানতে দেওয়া হবে না যে ওর আসল পরিচয় আমরা জেনে ফেলেছি। আমাদের লক্ষ হবে দেশে ফিরে গিয়ে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।'

শেষ পর্যন্ত ক্রোল আমার প্রস্তাবে রাজি হল। সন্ডার্সকে সুযোগ বুঝে সব বলতে হবে, আর সবাই মিলে মার্কোভিচের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

১০ই আগস্ট, বিকেল সাড়ে পাঁচটা। মানস সরোবরের উপকূলে।

মেঘদূতে কালিদাসের বর্ণনায় মানস সরোবরে রাজহাঁস আর পদ্মের কথা আছে। এসে অবধি রাজহাঁসের বদলে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস দেখেছি, আর পদ্ম থাকলেও এখনো চোখে পড়েনি। এছাড়া আজ পর্যন্ত মানস সরোবরের যত বর্ণনা শুনেছি বা পড়েছি, চোখের সামনে দেখে মনে হচ্ছে এ হ্রদ তার চেয়ে সহস্রগুণে বেশি সুন্দর। চারিদিকের বালি আর পাথরের রুক্ষতার মধ্যে এই

পঁয়তাল্লিশ মাইল ব্যাসযুক্ত জলখণ্ডের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ নীল রঙ মনে এমনই একটা ভাবের সঞ্চার করে যার কোনো বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্রদের উত্তরে বাইশ হাজার ফুট উঁচু কৈলাস, আর দক্ষিণে প্রায় যেন জল থেকে খাড়া হয়ে ওঠা গুর্লা-মান্ধাতা। চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে ছোট-বড় সব গুম্ফা চোখে পড়ছে, তাদের সোনায় মোড়া ছাতগুলোতে রোদ পড়ে ঝিক্‌মিক্ করছে।

আমরা ক্যাম্প ফেলেছি জল থেকে বিশ হাত দূরে। এখানে আরো অনেক তীর্থযাত্রী ও লামাদের দেখতে পাচ্ছি। তাদের কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে হ্রদ প্রদক্ষিণ করছে, কেউ হাতে প্রেয়ার হুইল বা জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করছে। হিন্দু বৌদ্ধ দুই ধর্মাবলম্বী লোকের কাছেই কৈলাস-মানস সরোবরের অসীম মাহাত্ম্য। ভূগোলের দিক দিয়ে এই জায়গার বিশেষত্ব হল এই যে, এক সঙ্গে চারটে বিখ্যাত নদীর উৎস রয়েছে এরই আশেপাশে। এই নদীগুলো হল ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু, সিন্ধু ও কর্ণালী।

অবিনাশবাবু এখানে এসেই বালির উপর শুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম তো করলেনই, তারপর আমাদের সঙ্গী সাহেবদেরও 'সেক্রেড, সেক্রেড—মোর সেক্রেড দ্যান কাউ' ইত্যাদি বলে গড করিয়ে ছাড়লেন। তারপরে যেটা করলেন সেটা অবিশ্যি বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। হ্রদের ধারে গিয়ে গায়ের ভারী পশমের কোটটা খুলে ফেলে দুহাত জোড় করে এক লাফে ঝপাং করে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেখি তাঁর দাঁত কপাটি লেগে গেছে। ক্রোল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ জলে নেমে ভদ্রলোককে টেনে তুলল। তারপর তাঁকে ব্র্যান্ডি খাইয়ে তাঁর শরীর গরম করল। আসলে মানস সরোবরের মতো এমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল ভারতবর্ষের কোনো নদী বা হ্রদে নেই। অবিনাশবাবু ভুলে গেছেন যে এখানকার উচ্চতা পনের হাজার ফুট।

ভদ্রলোক এখন দিব্যি চাঙ্গা। বলছেন, ওর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের গাঁটে নাকি ছাব্বিশ বছর ধরে একটা ব্যথা ছিল, সেটা এই এক ঝাঁপানিতেই বেমালুম সেরে গেছে। দুটো হর্লিকসের খালি বোতলে ভদ্রলোক হ্রদের পবিত্র জল নিয়ে নিয়েছেন, সেই জলের ছিটে দিয়ে আমাদের যাবতীয় বিপদ-আপদ দূর করার মতলব করেছেন।

এই অঞ্চলেই গিয়ানিমাতে একটা বড় হাট বসে। আমরা সেখান থেকে কিছু খাবার জিনিস, কিছু শুক্‌নো ফল, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পাথরের মতো শক্ত চমরীর দুধ, আর পশমের তৈরি কিছু কম্বল ও পোশাক কিনে নিয়েছি। ক্রোল দেখি একরাশ মানুষের হাড়গোড় কিনে এনেছে, তার মধ্যে একটা পায়ের হাড় বাঁশির মতো বাজানো যায়। এসব নাকি তার জাদুবিদ্যার গবেষণায় কাজে

লাগবে। মার্কোভিচ গিয়ানিমার বাজারে কিছুক্ষণের জন্য দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিট হল সে ফিরেছে। থলিতে করে কী এনেছে বোঝা গেল না। সন্ডার্সের নৈরাশ্য অনেকটা কমেছে। সে বুঝেছে যে একশৃঙ্গের দেখা না পেলেও, মানস সরোবরের এই পার্থিব সৌন্দর্য আর এই নির্মল আবহাওয়া—এও কিছু কম পাওয়া নয়।

কাল আমরা সরোবর ছেড়ে চাং-থাং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করব। আমাদের লক্ষ হবে ল্যাটিচিউট ৩৩·৩ নর্থ ও লঙ্গিচিউড ৮৪ ইস্ট।

অবিনাশবাবু তাঁর পকেট-গীতা খুলে কৈলাসের দিকে মুখ করে পিঠে রোদ নিয়ে বসে আছেন। এইবার বোঝা যাবে তাঁর ভক্তির দৌড় কতদূর।

১২ই আগস্ট। চাং থাং। ল্যা. ৩০ ন—লং ৮১ই।

সকাল সাড়ে আটটা। আমরা একটা ছোট লেকের ধারে ক্যাম্প ফেলেছি। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা। বারোটার সময় মাইনাস পনের ডিগ্রি শীতে ক্রোল আমার ক্যাম্পে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলল, সে মার্কোভিচের জিনিসপত্র ঘেঁটে অনেক কিছু পেয়েছে। আমি তো অবাক। বললাম, 'তার জিনিস ঘাঁটলে ? সে টের পেল না ?'

'পাবে কী করে ?—কাল সন্ধেবেলা যে ওর চায়ের সঙ্গে বারবিটুরেট মিশিয়ে দিয়েছিলাম। হাত-সাফাই কি আর অমনি অমনি শিখেছি ? ও এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

'কী জিনিস পেলে ?'

'চলো না দেখবে।'

গায়ে একটা মোটা কম্বল চাপিয়ে আমাদের ক্যাম্প ছেড়ে ওদেরটায় গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকতেই একটা তীব্র আধ-চেনা গন্ধ নাকে এল। বললাম, 'এ কিসের গন্ধ ?'

ক্রোল বলল, 'এই তো—এই টিনের মধ্যে কী জানি রয়েছে।' টিনের কৌটোটা হাতে নিয়ে ঢাকনা খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

'এ যে কস্তুরী !'—ধরা গলায় বললাম আমি।

কস্তুরীই বটে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিব্বতে কস্তুরী মৃগ বা muskdeer পাওয়া যায়! সারা পৃথিবী থেকেই প্রায় লোপ পেতে বসেছে এই জানোয়ার। একটা মাঝারি কুকুরের সাইজের হরিণ, তার পেটের ভিতর পাওয়া যায় কস্তুরী নামক এই আশ্চর্য জিনিস। এটার প্রয়োজন হয় গন্ধদ্রব্য বা পারফিউম তৈরির কাজে। এক তোলা কস্তুরীর দাম হল প্রায় ত্রিশ টাকা। আসবার পথে ভারতবর্ষ ও তিব্বতের সীমানায় আসকোট শহরে এক

ব্যবসাদারের কাছে জেনেছিলাম যে, তিনি একাই সরকারী লাইসেন্সে গত বছরে প্রায় চার লাখ টাকার কস্তুরী বিদেশে রপ্তানী করেছেন। আমি বললাম, 'এই কস্তুরী কি গিয়ানিমার হাটে কিনেছে নাকি মার্কোভিচ ?'

'কিনেছে ?'

প্রশ্নটা করল সন্ডার্স ; তার কথায় তিক্ত ব্যঙ্গের সুর। 'এই দেখ না—এগুলো কি সব ওর কেনা ?'

সন্ডার্স একটা ঝোলা ফাঁক করে একরাশ কালো চমরীর লোমের ভিতর থেকে পাঁচটা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বার করল। সেগুলোর সাইজ এক বিঘতের বেশি না, কিন্তু প্রত্যেকটি মূর্তি সোনার তৈরি। এছাড়া আরো মূল্যবান জিনিস ঝোলায় ছিল—একটা পাথর বসানো সোনার বজ্র, একটা সোনার পাত্র, খান ত্রিশেক আলগা পাথর ইত্যাদি।

'উই হ্যাভ এ রিয়েল রবার ইন আওয়ার মিডস্ট', বলল সন্ডার্স। 'শুধু খাম্‌পারাই দস্যু নয়, ইনিও একটি জলজ্যান্ত দস্যু। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এ কস্তুরী সে গিয়ানিমার বাজার থেকে চুরি করে এনেছে, যেমন এই মূর্তিগুলো চুরি করেছে গুম্ফা থেকে।'

এখন বুঝতে পারলাম মার্কোভিচ কেন আমাদের দল ছেড়ে বার বার গুম্ফা দেখতে চলে যায়। লোকটার বেপরোয়া সাহসের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়।

আজ মার্কোভিচের ভাব দেখে মনে হল যে কালকের ঘটনা কিছু টের পায়নি। তার জিনিসপত্র যেভাবে ছিল আবার ঠিক সেইভাবেই রেখে আমরা ঘুমোতে চলে যাই। যাবার আগে এটাও দেখেছিলাম যে, মার্কোভিচের সঙ্গে একটি অস্ত্রও আছে—একটা ৪৫ কোল্ট অটোম্যাটিক রিভলবার। এটার কথা মার্কোভিচ আমাদের বলেনি। সে রিভলবার অবিশ্যি তার আর কোনো কাজে লাগবে না, কারণ ক্রোল তার টোটাগুলি সযত্নে সরিয়ে ফেলেছে।

১৫ই আগস্ট। চাং থাং—ল্যা. ৩২·৫ ন, লং ৮২ই। বিকেল সাড়ে চারটা।

চাং থাং অঞ্চলের ভয়াবহ চেহারাটা ক্রমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এই জায়গার উচ্চতা সাড়ে ষোল হাজার ফুট। আমরা এখন একটা অসমতল জায়গায় এসে পড়েছি। মাঝে মাঝে ৪০০/৫০০ ফুট উঠতে হচ্ছে, তারপর একটা গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার নামতে হচ্ছে।

কাল সকাল থেকে একটি গাছ, একটি তৃণও চোখে পড়েনি। যেদিকে দেখছি খালি বালি পাথর আর বরফ। তিব্বতীরা কিন্তু এসব অঞ্চলেও পাথরের গায়ে তাদের মহামন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' খোদাই করে রেখেছে। গুম্ফার সংখ্যা

ক্রমে কমে আসছে, তবে মাঝে মাঝে এক-একটা স্তূপ বা চর্টেন দেখা যায়। বসতি একেবারেই নেই।

পরশু একটা যাযাবরদের আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম। প্রায় শ'পাঁচেক মহিলা পুরুষ তাদের কাচ্চা বাচ্চা ছাগল ভেড়া গাধা চমরী নিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পশমের তাঁবু খাটিয়ে বসতি গেড়েছে। লোকগুলো ভারী আমুদে, মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই, এই ভ্রাম্যমাণ শিকড়হীন অবস্থাতেও দিব্যি আছে বলে মনে হয়। এদের দু একজনকে একশৃঙ্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে কোনো ফল হল না।

আমরা আরো উত্তরের দিকে যাচ্ছি শুনে এরা বেশ জোর দিয়ে বারণ করল। বলল, উত্তরে ডুংলুং-ডো আছে। সেটা পেরিয়ে যাওয়া নাকি মানুষের অসাধ্য। ডুংলুং-ডো কী জিজ্ঞেস করাতে যা বর্ণনা দিল তাতে বুঝলাম সেটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তার পিছনে কী আছে কেউ জানে না। এই প্রাচীর এরা কেউই দেখেনি, কিন্তু বহুকাল থেকেই নাকি তিব্বতীরা এর কথা জানে। আদ্যিকালে কোনো কোনো লামা নাকি সেখানে গেছে, কিন্তু গত তিনশো বছরের মধ্যে কেউ যায়নি।

মৌনী লামার হেঁয়ালি কথাতেও যখন আমরা নিরুদ্যম হইনি, তখন যাযাবরদের বারণ আমরা মানব কেন? চার্লস উইলার্ডের ডায়রি রয়েছে
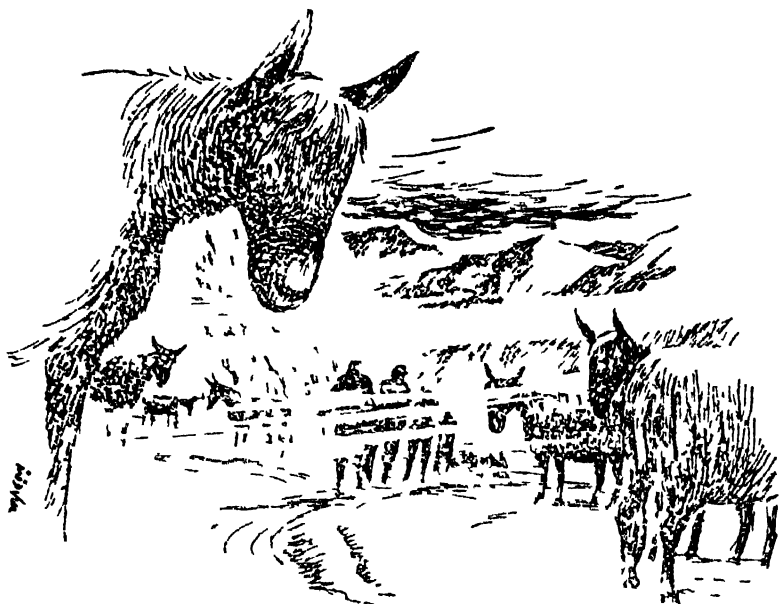
আমাদের কাছে। তার কথার উপর ভরসা রেখেই আমাদের চলতে হবে।

১৮ই আগস্ট। চাং থাং—ল্যা ৩২ ন, লং ৮২ ৮ ই।

একটা লেকের ধারে ক্যাম্পের ভিতর বসে ডায়রি লিখছি। আজ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একটা প্রায় সমতল উপত্যকা দিয়ে হেঁটে চলেছি, আকাশে ঘন কালো মেঘ, মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে, এমন সময় সণ্ডাস চেঁচিয়ে উঠল 'ওগুলো

সামনে বেশ কিছু দূরে যেখানে জমিটা খানিকটা উপর দিকে উঠছে, তার ঠিক সামনে কালো কালো অনেকগুলো কী যেন দাঁড়িয়ে আছে। জানোয়ারের পাল বলেই তো মনে হচ্ছে। বাবসাংকে জিজ্ঞেস করতে সে সঠিক কিছু বলতে পারল না। ক্রোল অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'তোমার অমনিস্কোপে চোখ লাগাও।'

অমনিস্কোপ দিয়ে দেখে মনে হল সেগুলো জানোয়ার, তবে কী জানোয়ার, কেন ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিছুই বোঝা গেল না। 'শিং আছে কি?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল। সে ছেলেমানুষের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে বলতে হল যে শিং আছে কি নেই তা বোঝা যাচ্ছে না।

কাছে গিয়ে ব্যাপার বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা বুনো গাধার পাল, সংখ্যায় প্রায় চল্লিশটা হবে, সব ক'টা মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে

আছে। রাবসাং এইবার ব্যাপারটা বুঝেছে। বলল, শীতকালে বরফের ঝড়ে সেগুলো মরেছে। তারপর গরম কালে বরফ গলে গিয়ে মৃতদেহগুলো সেই দাঁড়ানো অবস্থাতেই আবার বেরিয়ে পড়েছে।

আমাদের খাবারের স্টক কমে আসছে। যাযাবরদের কাছ থেকে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে কিছু চা আর মাখন কিনে নিয়েছিলাম, সেটা এখনো চলবে কিছুদিন। মাংসে আমাদের সকলেরই অরুচি ধরে গেছে। শাক সবজি গম ইত্যাদি ফুরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে আমার তৈরি ক্ষুধাতৃষ্ণানাশক বটিকা ইন্ডিকা খেতে হয়েছে সকলকেই। আর কিছুদিন পরে ওই বড়ি ছাড়া আর কিছুই খাবার থাকবে না। ক্রোল মেক্সিকো থেকে আরম্ভ করে বোর্নিও পর্যন্ত এগারটা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকম ম্যাজিক প্রয়োগ করে জানার চেষ্টা করছে আমাদের কপালে একশৃঙ্গ দেখার সৌভাগ্য হবে কিনা। পাঁচটা ম্যাজিক বলছে না, ছ'টা বলছে হ্যাঁ।

আমরা যেখানে ক্যাম্প ফেলেছি তার উত্তরে—অর্থাৎ আমরা যেদিকে যাব সেইদিকে প্রায় ৩০/৪০ মাইল দূরে একটা অংশ দেখে মনে হচ্ছে সেখানে জমিটা যেন একটা সিঁড়ির ধাপের মতো উপর দিকে গেছে। অমনিস্কোপ দিয়ে দেখে সেটাকে একটা টেবল মাউন্টেনের মতো মনে হচ্ছে। এটাই কি ডুংলুং ডো? উইলার্ড তার ডায়রিতে যে জায়গার অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছে আমরা তার খুবই কাছে এসে পড়েছি।

কিন্তু উইলার্ড যাকে 'এ ওয়াণ্ডারফুল মনাস্টি' বলেছে সেই থোকচুম গুম্ফা কোথায়? তার দুশো বছরের উড়ন্ত লামাটি বা কোথায়?

আর ইউনিকর্নই বা কোথায়?

৪

১৯শে আগস্ট।

এক আশ্চর্য গুম্ফায় এক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। এটাই যে উইলার্ডের থোকচুম গুম্ফা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ গুম্ফায় পৌঁছাবার তিন মিনিট আগেই রাস্তার পাশে একটা পাথরের গায়ে সেই বিখ্যাত তিব্বতী মহামন্ত্রের নিচে তিনটে ইংরাজি অক্ষর খোদাই করা দেখলাম। সি আর ডব্লু—অর্থাৎ চার্লস রক্সটন উইলার্ড। আগেই বলে রাখি আমাদের কুলির মধ্যে রাবসাং ও টুণ্ডুপ ছাড়া আর সকলেই পালিয়েছে। রাবসাং পালাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। সে যে শুধু বিশ্বাসী তা নয়, তার মধ্যে কুসংস্কারের লেশমাত্র নেই। তিব্বতীদের মধ্যে সে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অন্যেরা যাবার সময় আমাদের সব ক'টা

ঘোড়া এবং চারটে চমরী নিয়ে গেছে। বাকি আছে দুটো মাত্র চমরী। আমাদের তাঁবু এবং আরো কিছু ভারী জিনিস এই দুটোর পিঠে চলে যাবে। বাকি জিনিস আমাদের নিজেদের বইতে হবে। আর ঘোড়া যখন নেই, তখন বাকি পথটা হেঁটেই যেতে হবে। সেই খাড়া উঠে যাওয়া উপত্যকার অংশটা ক্রমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, আর সেই কারণেই আমাদের দলের সকলেরই বিশ্বাস ওটাই ডুংলুং-ডো, যদিও ডুংলুং-ডো যে কী তা এখনো কেউই জানি না। সন্ডার্সের মতে ওটা একটা কেল্লার প্রাচীর। আমার ধারণা ওটার পিছনে একটা হ্রদ আছে, যার কোনো উল্লেখ পৃথিবীর কোনো মানচিত্রে নেই।

যে গুম্ফাটার কথা লিখতে যাচ্ছি সেটার অস্তিত্ব প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায়নি। তার কারণ সেটা একটা বেশ উঁচু গ্র্যানিটের টিলার পিছনে লুকোনো ছিল। টিলাটা পেরোতেই গুম্ফাটা দেখা গেল, আর দেখামাত্র আমাদের সকলের মুখ দিয়েই নানারকম বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। সূর্য মেঘের আড়ালে থাকা সত্ত্বেও গুম্ফার জৌলুস দেখে মনে হয় তার আপাদমস্তক সোনা দিয়ে মোড়া। কাছে গিয়ে কেমন যেন ধারণা হল যে, গুম্ফায় লোকজন বেশি নেই। একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা সেটাকে ঘিরে রেখেছে। আমরা পাহাড়ে পথ দিয়ে উঠে গুম্ফার ভিতরে ঢুকলাম। চৌকাঠ পেরোতেই মাথার উপর প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের ঘণ্টা। ক্রোল তার দড়ি ধরে টান দিতেই গুরুগম্ভীর স্বরে সেটা বেজে উঠল, এবং প্রায় তিন মিনিট ধরে সেই ঘণ্টার বেশ গুম্ফার ভিতর ধ্বনিত হতে লাগল।

ভিতরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম যে, সেখানে অনেকদিন কোনো মানুষের পা পড়েনি। কেবল মানুষ ছাড়া একটা গুম্ফায় যা থাকে তার সবই এখানে রয়েছে। সন্ডার্স দু-একবার 'হ্যালো হ্যালো' করেও কোনো উত্তর না পাওয়াতে আমরা নিজেরাই একটু ঘুরে দেখব বলে স্থির করলাম। ক্রোলের হাবভাবে বুঝলাম সে মার্কোভিচকে একা ছাড়বে না। সোনার প্রতি যার এমন লোভ, তাকে এখানে একা ছাড়া যায় না। সন্ডার্স হল-ঘরের বাঁ দিকের দরজার দিকে এগিয়ে গেল, আমি আর অবিনাশবাবু গেলাম ডান দিকে। গুম্ফার মেঝেতে ধুলো জমেছে, ইঁদুর বসবাসের চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো। আমরা দুজনে সবেমাত্র ডানদিকের ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় একটা বিকট চিৎকারে আমাদের রক্ত জল হয়ে গেল।

সন্ডার্সের গলা। দৌড়ে গেলাম অনুসন্ধান করতে। ক্রোল, মার্কোভিচ আর আমরা দুজন প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছলাম বাঁ দিকের একটা মাঝারি আয়তনের ঘরে। সন্ডার্স পুবদিকের দরজার পাশে শরীরটা কুঁকড়ে ফ্যাকাশে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি ঘরের পিছন দিকে।

এবার বুঝতে পারলাম তার আতঙ্কের কারণ।
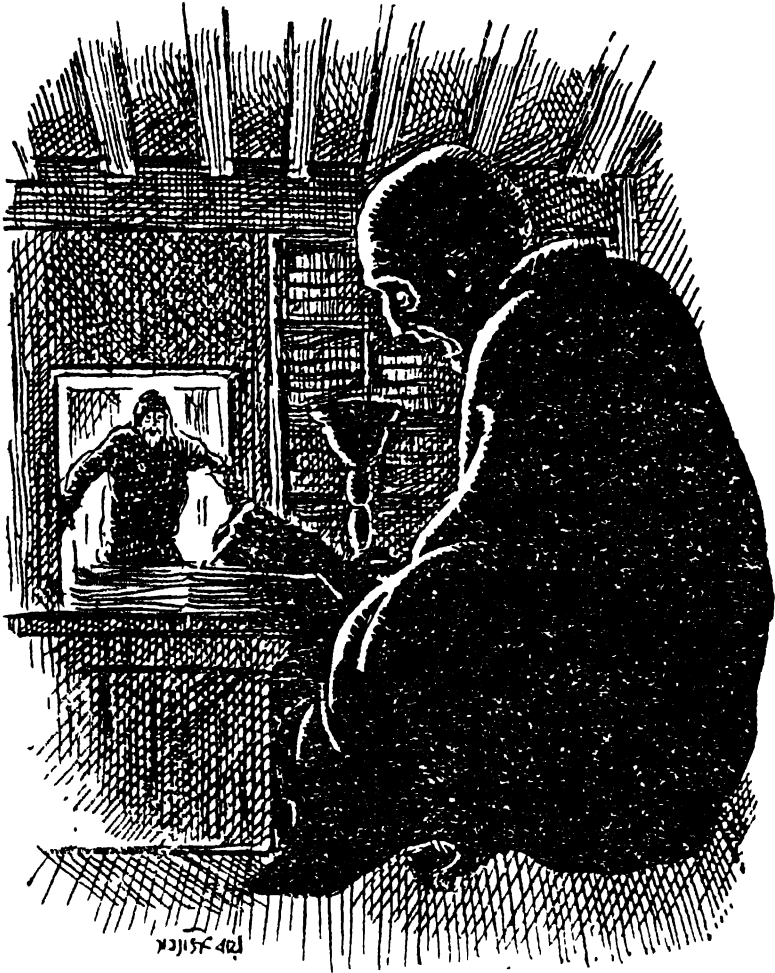
একটি অতিবৃদ্ধ শীর্ণকায মুণ্ডিতমস্তক লামা ঘরেব পিছন দিকটায বসে আছেন। পদ্মাসনের ভঙ্গিতে। তাঁর শবীর সামনেব দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাঁর হাত দুটো উপুড় করে রাখা রয়েছে একটা কাঠের ডেস্কেব উপর খোলা একটা জীর্ণ পুঁথির পাতায়। লামার দেহ নিস্পন্দ, তাঁব চামড়াব যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তার রঙ ছেয়ে নীল, আর সে চামড়ার নিচে মাংসের লেশমাত্র নেই।

লামা মৃত। কবে কীভাবে মরেছেন সেটা জানার কোনো উপায় নেই, আর কীভাবে যে তাঁর দেহ মৃত্যুজনিত বিকারের হাত থেকে বক্ষা পেয়েছে সেটাও

বোঝার কোনো উপায় নেই।

সন্ডার্স এতক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছে। কিছুদিন থেকেই তার স্নায়ু দুর্বল হয়েছে, তাই সে এতটা ভয় পেয়েছে। আমি জানি আমাদের অভিযান সার্থক হলে সে নিঃসন্দেহে তার স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

এবারে আমার দৃষ্টি গেল ঘরের অন্যান্য জিনিসের দিকে। একদিকের দেয়ালের সামনে পিতল ও তামার নানারকম পাত্র। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি। এগিয়ে গিয়ে দেখি পাত্রগুলোর মধ্যে নানা রঙের পাউডার, তরল ও চিটচিটে পদার্থ রয়েছে। সেগুলো চেনা খুব মুশকিল। অন্যদিকের দেয়ালে সারি সারি তাকে রাখা রয়েছে অজস্র পুঁথি, আর তার নিচে মেঝেতে রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর কাজ করা পাথর বসানো আট জোড়া তিব্বতী পশমের বুট জুতো। এছাড়া ঘরের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে নানারকম হাড়, মাথার খুলি, জানোয়ারের লোম ইত্যাদি। ক্রোল বলে উঠল, 'এই প্রথম একটা গুম্ফায় এসে তিব্বতী ম্যাজিকের গন্ধ পাচ্ছি।'

আমার ভয় ডর বলে কিছু নেই, তাই আমি এগিয়ে গেলাম লামার মৃতদেহের দিকে। তিনি কোন্ বিষয়ে অধ্যয়ন করতে করতে দেহরক্ষা করেছেন সেটা জানা দরকার। আগেই লক্ষ করেছি যে, পুঁথির অক্ষরগুলো দেবনাগরী, তিব্বতী নয়।

পুঁথিটা ধরে টান দিতে সেটা মৃত লামার হাতের তলা থেকে বেরিয়ে চলে এল আমার হাতে। লামার হাত দুটো সেই একইভাবে রয়ে গেল চৌকির দু-ইঞ্চি উপরে।

পুঁথির পাতা উলটে পালটে বুঝতে পারলাম তার বিষয়টা বৈজ্ঞানিক। ক্রোল জিজ্ঞেস করাতে বললাম, সেটা চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে, যদিও জানি আসলে তা নয়। যাই হোক, আর সময় নষ্ট না করে, সেটাকে সঙ্গে নিয়ে মৃত লামাকে সেই বসা অবস্থাতেই রেখে আমরা গুম্ফার অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এলাম।

এখন দুপুর দুটো। আমি গুম্ফার সামনেই একটা পাথরের উপর বসে আছি। পুঁথির অনেকখানি পড়া হয়ে গেছে। তিব্বতে যে ধর্মের বাইরেও কোনো কিছুর চর্চা হয়েছে, এই পুঁথিই তার প্রমাণ। অবিশ্যি এই বিশেষ লামাটি ছাড়া এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে কেউ চর্চা করেছে কিনা সন্দেহ। এতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। পুঁথির নাম উড্ডয়নসূত্রম্। নিছক রাসায়নিক উপায়ে মানুষ কী ভাবে আকাশে উড়তে পারে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতে। এই উড্ডয়নসূত্রমের কথা আমি শুনেছি। বৌদ্ধ যুগে তক্ষশিলায় একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বিদ্যুদ্ধমনী। তিনিই এই বৈজ্ঞানিক

সূত্র রচনা করেন এবং করার কিছু পরেই তিব্বত চলে যান। আর তিনি ভারতবর্ষে ফেরেননি। তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ভারতবর্ষে কেউ কোনোদিন কিছু জানতে পারেনি।

পুঁথি পড়ে এক আশ্চর্য পদার্থের কথা জানা যাচ্ছে, যার নাম ংমুং। এই ংমুং-এর সাহায্যে মানুষের ওজন এত কমিয়ে দেওয়া যায় যে, একটা দমকা বাতাস এলে সে-মানুষ রাজহংসের দেহচ্যুত পালকের মতো শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে। এই ংমুং যে কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা পুঁথিতে লেখা আছে, কিন্তু তার জন্যে যে সব প্রয়োজনীয় উপাদানের কথা বলা হয়েছে তার একটারও নাম আমি কখনো শুনিনি। বলীক, যলক্র, ত্রিগন্ধা, অভ্রনীল, থূমা, জড়া—এর কোনোটাই আমার জানা নয়। যাঁর হাতের তলা থেকে পুঁথিটা নিয়ে এলাম তিনি নিশ্চয়ই জানতেন এবং এই সব উপাদানের সাহায্যে তিনি নিশ্চয়ই ংমুং তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে ইনিই সেই 'টু হান্ড্রেড ইয়ার ওল্ড লামা'—যাঁর সঙ্গে উইলার্ড ওই ংমুং-এর সাহায্যেই আকাশে উড়েছিলেন। ইনি যে গত এক বছরের মধ্যে পরলোকগমন করবেন সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য ; না হলে আমাদের পক্ষেও নিশ্চয়ই উইলার্ডের মতো আকাশে ওড়া সম্ভব হতো।

সকলে রওনা হবার জন্য তৈরি। লেখা বন্ধ করি।

২০শে আগস্ট। ল্যা. ৩৩·৩ ন, ৮৪ লং ই।

উইলার্ডের ডায়রিতে এই জায়গাতেই ক্যাম্প ফেলার উল্লেখ আছে। আমরাও তাই করেছি। আমরা বলতে, যা ছিল তার চেয়ে দু জন কম, কারণ মার্কোভিচ ওরফে মার্কহ্যাম উধাও, আর সে-ই নিশ্চয়ই সঙ্গে করে টুণ্ডুপকে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দুটি চমরীর একটিও গেছে। আমি ক'দিন থেকেই মার্কোভিচকে মাঝে মাঝে টুণ্ডুপের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তখন অতটা গা করিনি। এখন বুঝতে পারছি ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল।

ঘটনাটা ঘটে কাল বিকেলে। গুম্ফা থেকে রওনা হবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমাদের একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে পড়তে হয়েছিল। যাকে বলে ব্লাইন্ডিং স্টর্ম। সাময়িক ভাবে সত্যিই আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কে কোথায় রয়েছে, কোন্‌দিকে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঝড় কমলে পর দেখি দুটি মানুষ আর একটি চমরী কম। তার উপরে যখন দেখলাম যে একটি বন্দুকও কম, তখন বুঝ.ত বাকি রইল না যে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। মার্কোভিচ প্ল্যান করেই পালিয়েছে এবং তার ফেরার কোনো মতলব নেই। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে আপদ বিদেয় হল, কিন্তু সেই

সঙ্গে আবার আপসোস হল যে তার শয়তানির উপযুক্ত শাস্তি হল না। ক্রোল তো চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে। বলছে এসব লোকের সঙ্গে ভালোমানুষী করার ফল হচ্ছে এই। যাই হোক যে চলে গেছে তার কথা ভেবে আর লাভ নেই। আমরা তাকে ছাড়াই ডুংলুং-ডোর উদ্দেশে পাড়ি দেবো।

উত্তরে চাইলেই এখন ডুংলুং-ডোর প্রাচীর দেখতে পাচ্ছি। এখনো মাইল পাঁচেক দূর। তা সত্ত্বেও প্রাচীরের বিশালত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। পুব-পশ্চিমে অন্তত মাইল কুড়ি-পঁচিশ লম্বা বলে মনে হয়। উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য বোঝার কোনো উপায় নেই। বোধ হয় ডুংলুং-ডোর দিক থেকেই একটা গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসছে, সেটাকে প্রথমে কস্তুরী বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন অন্যরকম লাগছে। সেটা কিসের গন্ধ বলা শক্ত, শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এমন খোস্‌বু আমাদের কারুর নাকে এর আগে কখনো প্রবেশ করেনি।

আবার ঝোড়ো বাতাস আরম্ভ হল। এবার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকি।

২০শে আগস্ট, দুপুর দেড়টা।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক ঘোলাটে অন্ধকার, তার মধ্যে লক্ষ বাঁশির মতো শব্দ করে বরফের ঝড় বইছে। ভাগ্যিস গিয়ানিমার বাজার থেকে বিলিতি তাঁবুর বদলে তিব্বতী পশমের তাঁবু কিনে নিয়েছিলাম।

আজ সারাটা দিন এ ক্যাম্পেই থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

২০শে আগস্ট, বিকেল পাঁচটা।

আমাদের তিব্বত অভিযানের একটা হাইলাইট বা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই কিছুক্ষণ আগে ঘটে গেল।

তিনটে নাগাদ ঝড়টা একটু কমলে পর রাবসাং আমাদের চারজনকে মাখন-চা দিয়ে গেল। বাইরে ঝড়ের শব্দ কমলেও দমকা বাতাসে আমাদের তাঁবুর কাপড় বার বার কেঁপে উঠছিল। অবিনাশবাবু তাঁর চায়ে চুমুক দিয়ে 'ভেরি গুড' কথাটা সবে উচ্চারণ করেছেন এমন সময় বাইরে, যেন বহুদূর থেকে, একটা চিৎকার শোনা গেল। পুরুষকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার। কথা বোঝার উপায় নেই, শুধু আর্তনাদের সুরটা বোঝা যাচ্ছে। আমরা চারজনে চায়ের পাত্র রেখে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এলাম।

'হেল্‌প, হেল্‌প...সেভ মি! হেল্‌প!...'

এবার বোঝা যাচ্ছে। কণ্ঠস্বরও চেনা যাচ্ছে। অ্যাদ্দিন মার্কোভিচ ইংরিজি বলেছে রাশিয়ান উচ্চারণে, এই প্রথম তার মুখে খাঁটি ইংরেজের উচ্চারণ

শুনলাম। কিন্তু লোকটা কোথায়। রাবসাংও হতভম্বের মতো এদিকে ওদিকে চাইছে, কারণ চিৎকারটা একবার মনে হচ্ছে দক্ষিণ দিকে, একবার মনে হচ্ছে উত্তর থেকে আসছে।

হঠাৎ ক্রোল চেঁচিয়ে উঠল—'ওই তো!'

সে চেয়ে আছে উত্তরে নয়, দক্ষিণে নয়—একেবারে শূন্যে, আকাশের দিকে। মাথা তুলে স্তম্ভিত হয়ে দেখি মার্কোভিচ শূন্যে ভাসতে ভাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একবার সে নিচের দিকে নামে, পরক্ষণেই এক দমকা বাতাস তাকে আবার উপরে তুলে দেয়। এই অবস্থাতেই সে ক্রমাগত হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

কীভাবে সে এই অবস্থায় পৌঁছাল সেটা ভাববার সময় নেই ; কী করে তাকে নামানো যায় সেটাই সমস্যা। কারণ পাগলা হাওয়া যে শুধু থামছেই না তা নয়, ক্ষণে ক্ষণে তার বেগ ও গতিপথ বদলাচ্ছে।

'লেট্ হিম স্টে দেয়ার!' সন্ডার্স হঠাৎ বলে উঠল। ক্রোল সে কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিল। তারা বুঝেছে মার্কোভিচকে শাস্তি দেবার এটা চমৎকার পন্থা। এদিকে আমার বৈজ্ঞানিক মন বলছে মার্কোভিচ নিচে না নামলে তার ওড়ার কারণটা জানা যাবে না। রাবসাং কিন্তু ইতিমধ্যে তার তিব্বতী বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে লেগে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে খান দশেক লম্বা চমরীর লোমের দড়ি পরস্পরের সঙ্গে গেরো বেঁধে তার এক মাথায় একটা পাথর বেঁধে সেটাকে মার্কোভিচের দিকে তাগ করে ছোঁড়ার জন্য তৈরি হল।

ক্রোল তাকে গিয়ে বাধা দিল। মার্কোভিচ এখন আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছে। ক্রোল তার দিকে ফিরে কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলল, 'ড্রপ দ্যাট গান ফার্স্ট।' অর্থাৎ, আগে তোমার হাত থেকে বন্দুকটা নিচে ফেল। মার্কোভিচের হাতে বন্দুক রয়েছে সেটা এতক্ষণ দেখিনি।

মার্কোভিচ বাধ্য ছেলের মতো তার হাতের মান্‌লিখারটা ছেড়ে দিল, আর সেটা আমাদের দশ হাত দূরে মাটিতে পড়ে খানিকটা আল্‌গা বরফ চারদিকে ছিটিয়ে দিল।

এবার রাবসাং দড়ির মাথায় বাঁধা পাথরটা মার্কোভিচের দিকে ছুঁড়ে দিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। মার্কোভিচ খপ্ করে সেটা লুফে নিল। তারপর রাবসাং একাই অনায়াসে তাকে টেনে মাটিতে নামিয়ে আনল।

এইবার লক্ষ করলাম যে, মৃত লামার ঘরে যে বাহারের বুট জুতো দেখেছিলাম, তারই একজোড়া রয়েছে মার্কোভিচের পায়ে। এছাড়া তার কাঁধের ঝোলার ভিতর থেকেও গুম্ফার অনেক জিনিস বেরোল, তার অধিকাংশই সোনার। ডাকাত হাতে হাতে ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমনই একটা

আশ্চর্য জিনিসের সন্ধান সে আমাদের দিয়েছে যে, তাকে শাস্তি বা ধমক দেওয়ার কথাটা আমাদের মনেই হল না।

মার্কোভিচ আমাদের ছেড়ে পালিয়েছিল ঠিকই, আর তার মতলব ছিল যাবার পথে মৃত লামার গুম্ফা থেকে বেশ কিছু মূল্যবান দ্রব্য সরিয়ে নেওয়া। মূর্তি-টুর্তি ঝোলায় ভরার পর তার বুটের কথাটা মনে পড়ে। সেদিন থেকেই তার লোভ লেগেছিল ওই জিনিসটার ওপর। বুট নিয়ে বাইরে এসে সেটা পরে দু-এক পা হেঁটেই বুঝতে পারে নিজেকে বেশ হাল্‌কা লাগছে। এইভাবে টুগুপ সমেত দু মাইল সে দিব্যি চলেছিল, এমন সময় এক উত্তরমুখী ঝড় এসে তার সমস্ত ফন্দি ভণ্ডুল করে দিয়ে তাকে আকাশে তুলে নিয়ে আবার আমাদেরই কাছে এনে হাজির করে।

ক্রোল ও সন্ডার্স স্বভাবতই এই কাহিনী শুনে একেবারে হতভম্ব। তখন আমি তাদের পুঁথি আর ংমুং-এর কথাটা বললাম। 'কিন্তু তার সঙ্গে এই বুটের সম্পর্ক কী?' প্রশ্ন করল সন্ডার্স। আমি বললাম, 'পুঁথিতে এই ংমুং-এর সঙ্গে মানুষের গুল্‌ফ বা গোড়ালির একটা সম্পর্কের কথা বলা আছে। আমার বিশ্বাস এই দুইয়ের সংযোগেই মানুষের দেহের ওজন কমে যায়। আমি জানি ওই বুটের সুকতলায় ংমুং-এর প্রলেপ লাগানো আছে।'

অন্য সময় হলে কী হতো জানি না, চোখের সামনে মার্কোভিচকে উড়তে দেখে ক্রোল ও সন্ডার্স দুজনকেই আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল। বলা বাহুল্য, এই তিব্বতী বুট আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে চাই। রাবসাংকে বলতে সে বলল, সে নিজেই গুম্ফা থেকে আমাদের চারজনের জন্য চার জোড়া জুতো নিয়ে আসবে।

মার্কোভিচ এখন একেবারে সুবোধ বালকটি। তার কাছে চোরাই মাল যা ছিল সব আমরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছি। সেগুলো ফেরার পথে দল যথাস্থানে রেখে দেওয়া হবে। মার্কোভিচ জানে যে, আমাদের কাছে তার মুখোশ খুলে গেছে। এর পর সে আর কোনো বাঁদরামি করবে বলে তো মনে হয় না। তবে 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন...' ইত্যাদি।

২১শে আগস্ট।

আমরা ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের সামনে ক্যাম্প ফেলে বসে আছি কাল বিকেল থেকে। খাড়াই উঠে গেছে প্রাচীর প্রায় দেড়শ ফুট! এটা যে কী দিয়ে তৈরি তা ভূতত্ত্ববিদ্ সন্ডার্স পর্যন্ত বলতে পারল না কোনো চেনা পাথরের সঙ্গে এই গোলাপী পাথরের কোনো মিল নেই। এ পাথর আশ্চর্য রকম মসৃণ ও আশ্চর্য রকম মজবুত। ধাপে ধাপে গর্ত করে তাতে পা ফেলে ওপরে ওঠার কোনো প্রশ্ন

ওঠে না। ক্রোল তিব্বতী বুট পরে দু-একবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হাওয়ার অভাবে বিশ-পঁচিশ ফুটের ওপরে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ প্রাচীরের পিছনে কী আছে জানবার একটা অদম্য কৌতূহল হচ্ছে। সন্ডার্স বলছে এটা একটা দুর্গ জাতীয় কিছু। আমি এখনো বলছি হ্রদ।

অবিনাশবাবু আরো পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তৈরি হয়ে আছেন। প্রাচীরের পিছন থেকে কোনোরকম শব্দ না পেলেও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মনমাতানো গন্ধে চারিদিক মশ্‌গুল হয়ে আছে। আমরা তিন-তিনজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক এই গন্ধের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে বোকা ব'নে আছি।

২২শে আগস্ট।

আশ্চর্য বুদ্ধি প্রয়োগ—অভাবনীয় তার ফল।

আমাদের সঙ্গে পুরানো খবরেব কাগজ ছিল অনেক। সেইগুলোর সঙ্গে দুটো তিব্বতী ম্যাপ আর কিছু র‍্যাপিং পেপার জুড়ে, আমাদের স্টকের তার দিয়ে কাঠামো বানিয়ে, একেবারে খাঁটি দিশি উপায়ে একটা ফানুস তৈরি করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে গ্যাস ভরলাম। তারপর সেটার সঙ্গে একটা দুশো ফুট লম্বা দড়ি বাঁধলাম। সেই দড়িতে আমার ক্যামেরা বেঁধে, পাঁচিলের দিকে তার মুখ ঘুরিয়ে, পনের সেকেন্ড পরে আপনি ছবি উঠবে এবকম একটা ব্যবস্থা কবে ফানুস ছেড়ে দিলাম। দড়ি-ক্যামেরা সমেত সাঁই সাঁই কবে ফানুস উপরের দিকে উঠে গেল। প্রাচীরের মাথা ছাড়িয়ে যেতে লাগল ছ'সেকেন্ড। তারপর আব দড়ি ছুঁড়লাম না। বিশ সেকেন্ড পরে ফানুস সমেত ক্যামেরা নামিয়ে আনলাম।

ছবি উঠেছে। রঙীন ছবি। হ্রদেব ছবি নয়। দুর্গেরও ছবি নয়। গাছপালা লতাগুল্মে ভরা এক অবিশ্বাস্য সুন্দর সবুজ জগতের ছবি। এরই নাম ডুংলুং-ডো।

আপাতত আমরা প্রাচীর থেকে প্রায় বারশো গজ দূরে একটা পাথরের ঢিবির পাশে বসে আছি। আমাদের পাঁচজনেরই পায়ে তিব্বতী বুট। আমরা অপেক্ষা করছি ঝড়ের জন্য। আশা আছে, সেই ঝড আমাদেব উড়িয়ে নিয়ে ডুংলুং-ডোর প্রাচীবের ওপারের রাজ্যে গিয়ে ফেলবে। তারপর কী আছে কপালে জানি না।

৫

৩০শে আগস্ট।

দূরে—বহু দূরে—একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এটা যদি দস্যুদল হয় তাহলে আমাদের আর কোনো আশা নেই। ডুংলুং-ডোর আবহাওয়ায় পাঁচ দিনে আমাদেব যে স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছিল তার জোরেই আমরা

এই দশ মাইল পথ হেঁটে আসতে পেরেছি। কিন্তু এখন শক্তি কমে আসছে। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, হাওয়া বইছে তার উল্টো দিকে ; তাই তিব্বতী বুটগুলোও কোনো কাজে আসছে না। খাবার-দাবারও ফুরিয়ে আসছে, বড়িও বেশি নেই। এ অবস্থায় পিস্তল-বন্দুক সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও, একটা বড় দস্যুদল এসে পড়লে আমাদের চরম বিপদে পড়তে হবে। এমনিতেই আমরা একজনকে হারিয়েছি। অবিশ্যি তার মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী। তার অতিরিক্ত লোভই তাকে শেষ করেছে।

অবিনাশবাবুর ধারণা, যে দলটা এগিয়ে আসছে সেটা যাযাবরের দল। বললেন, 'আপনার যন্ত্রে কী দেখলেন জানি না মশাই। ওরা দস্যু হতেই পারে না। কৈলাস, মানস সরোবর ও ডুংলুং-ডো দেখার ফলে আমি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি। আমি স্পষ্ট দেখছি ও দল আমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারে না।'

যাযাবরের দল হলে অনিষ্ট করার কথা নয়। বরং তাদের কাছ থেকে ঘোড়া, চমরী, খাবার-দাবার ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যাবে। তার ফলে আমরা যে নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারব সে ভরসাও আছে আমার।

সাঁইত্রিশ ঘণ্টা ঝড়ের অপেক্ষায় বসে থেকে তেইশ তারিখ দুপুরে দেড়টা নাগাদ আকাশের অবস্থা ও তার সঙ্গে একটা শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আমরা যে রকম ঝড় চাই—অর্থাৎ যার গতি হবে উত্তর-পশ্চিম—সেরকম একটা ঝড় আসছে। অবিনাশবাবুর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, তাঁকে ঠেলে তুলে দিলাম। তারপর আমরা পাঁচজন বুটধারী ঝড়ের দিকে পিঠ করে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের দিকে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালাম। তিন মিনিট পরে ঝড়টা এসে আমাদের আঘাত করল। আমার ওজন এমনিতেই সবচেয়ে কম—এক মন তেরো সের—কাজেই সবচেয়ে আগে আমিই শূন্যে উঠে পড়লাম।

এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঝড়ের দাপটে সাঁই সাঁই করে এগিয়ে চলেছি শূন্যপথ দিয়ে, আর ক্রমেই উপরে উঠছি। সেই সঙ্গে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরও আমার দিকে এগিয়ে আসছে আর নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সামনের দৃশ্য দ্রুত বদলে যাচ্ছে, কারণ প্রাচীর আর আমাদের দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করছে না। প্রথমে পিছনে বহু দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো দেখা গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে প্রাচীর যে আশ্চর্য জগৎটাকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল, সেই সবুজ জগৎ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে আমরা সেই জগতে প্রবেশ করতে চলেছি। আমার পিছন থেকে ক্রোল, সন্ডার্স ও মার্কোভিচ ইংরিজি ও জর্মান ভাষায় ছেলেমানুষের মতো উল্লাস প্রকাশ করছে, আর অবিনাশবাবু বলছেন, 'ও মশাই—এ যে নন্দন কানন মশাই—এ যে দেখছি নন্দন কানন!'

প্রাচীর পেরোতেই ঝড়ের তেজ ম্যাজিকের মতো কমে গেল। আমরা পাঁচজন বাতাসে ভেসে ঠিক পাখির পালকের মতোই দুলতে দুলতে ঘাসে এসে নামলাম। সবুজ রং, তাই ঘাস বললাম, কিন্তু এমন ঘাস কখনো চোখে দেখিনি। সন্ডার্স চেঁচিয়ে উঠল—'জান শঙ্কু—এখানের একটি গাছও আমার চেনা নয়, একটিও নয় ! এ একেবারে আশ্চর্য নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশ !'

কথাটা বলেই সে পাগলের মতো ঘাস পাতা ফুলের নমুনা সংগ্রহ করতে লেগে গেল। ক্রোল তার ক্যামেরা বার করে পটাপট ছবি তুলছে। অবিনাশবাবু ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিয়ে বললেন, 'এইখানেই থেকে যাই মশাই। আর গিরিডি গিয়ে কাজ নেই। এ অতি উর্বর জমি। চাষ হবে এখানে। চাল ডাল সবজি সব হবে।' মার্কোভিচ ভার বুট খুলে লম্বা ঘাসের ভিতব দিয়ে জায়গাটা অনুসন্ধান করতে এগিয়ে গেল।

ডুংলুং-ডো আয়তনে প্রায় মানস সরোবরের মতোই বড়। বৃত্তাকার প্রাচীরের মধ্যে একটা অগভীর বাটির মতো জায়গা। দেখে মনে হয় কেউ যেন হাত দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীরের বাইরেটা নিচের দিকে খাড়া নেমে গেলেও ভিতরটা ঢালু হয়ে নেমেছে। সন্ডার্স ঠিকই বলেছে। এখানে একটা গাছও আমাদের চেনা নয়। তারও নয়, আমারও নয়। তবে প্রতিটি গাছই ডাল পালা ফুল পাতা মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর।

আমরা চারজন বুট পরে লাফিয়ে লাফিয়ে অর্ধেক হেঁটে অর্ধেক উড়ে জায়গাটার ভিতর দিকে এগোচ্ছি এমন সময় হঠাৎ একটা শন্‌শন্‌ শব্দ পেলাম। তারপর সামনের একটা বড় বড় পাতাওয়ালা গাছের মাথার উপর দিয়ে দূরে আকাশে প্রকাণ্ড একটা কী যেন দেখা গেল। সেটা ক্রমেই আমাদেব দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝতে পারলাম সেটা একটা পাখি। শুধু পাখি নয়—একটা অতিকায় পাখি। পাঁচশো ঈগল এক করলে যা হয় তেমন তার আয়তন।

'মাইন গট্‌ !' বলে এক অস্ফুট চিৎকার করে ক্রোল তার মান্‌লিখারটা পাখির দিকে উচোতেই আমি হাত দিয়ে সেটার নলটা নিচের দিকে নামিয়ে দিলাম। শুধু যে বন্দুকে ও পাখির কোনো ক্ষতি করা সম্ভব হবে না তা নয়, আমার মন বলছে পাখি আমাদের কোনো অনিষ্ট করবে না।

ঈগলের মুখ ও সাউথ আমেরিকান ম্যাকাওয়ের মতো ঝলমলে রঙের পালকওয়ালা অতি-বিশাল পাখিটা মাথার উপর তিনবার চক্রাকারে ঘুরে সমুদ্রগামী জাহাজের ভোঁয়ের মতো শব্দ করতে করতে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকেই চলে গেল। আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই একটা কথা বেরিয়ে পড়ল—'রক্‌ !'

'হোয়াট?' ক্রোল বন্দুক হাতে নিয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করল।

আমি আবার বললাম—'রক্। অথবা রখ। সিন্দবাদের গল্পে এই রকমই একটা পাখির কথা ছিল।'

ক্রোল বলল, 'কিন্তু আমরা তো আর অ্যারেবিয়ান নাইটস-এর রাজ্যে নেই। এ তো একেবারে বাস্তব জগৎ। পায়ের তলায় মাটি রয়েছে, হাত দিয়ে গাছের পাতা ধরছি, নাকে ফুলের গন্ধ পাচ্ছি।'

সন্ডার্স তার বিস্ময় কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'জঙ্গলের মধ্যে একটিও পোকা মাকড় দেখছি না, সেটা খুবই আশ্চর্য লাগছে আমার।'

আমরা চারজন এগোতে এগোতে হঠাৎ একটা বাধা পেলাম। এই প্রথম উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কিছুর সামনে পড়তে হল। প্রায় দুমানুষের সমান উঁচু একটা নীল ও সবুজে মেশানো পাথুরে ঢিবি আমাদের সামনে পড়েছে। সেটা দুপাশে কতদূর পর্যন্ত গেছে জানি না। হয়তো ডাইনে বাঁয়ে কাছাকাছির মধ্যেই তার শেষ পাওয়া যাবে, কিন্তু ক্রোল আর ধৈর্য রাখতে পারল না। সে তার বুট সমেত একটা বিরাট লাফ দিয়ে অনায়াসে উড়ে গিয়ে ঢিবিটার মাথার উপর পড়ল। আর তার পরেই এক কাণ্ড। ঢিবিটা নড়ে উঠল। তারপর সেটা সবসুদ্ধ বাঁ দিকে চলতে আরম্ভ করল। ক্রোলও তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, এমন সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'মাইন গট! ইটস এ ড্রাগন!'

ড্রাগনই বটে। ক্রোল ভুল বলেনি। সেই ড্রাগনের একটা বিশাল পিছনের পা এখন আমাদের সামনে দিয়ে চলেছে। অবিনাশবাবু 'বাবা!' বলে ঘাসের উপর বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে ক্রোলও ড্রাগনের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে আমাদের কাছে চলে এসেছে। আমরা অবাক হয়ে এই মন্থরগতি দানবতুল্য জীবের যেটুকু অংশ দেখতে পাচ্ছি তার দিকে চেয়ে রইলাম। প্রায় তিন মিনিট সময় লাগল ড্রাগনটার আমাদের সামনে দিয়ে চলতে। এঁকিয়ে বেঁকিয়ে গাছপালার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে। যে ধোঁয়াটা এখন বনের বেশ খানিকটা অংশ ছেয়ে ফেলেছে সেটা ওই ড্রাগনের নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এতক্ষণে ক্রোলের বোধহয় আমার কথায় বিশ্বাস হয়েছে। ওর অদ্ভুত নিরীহ ভ্যাবাচ্যাকা ভাব থেকে তাই মনে হয়। সন্ডার্স বলল, 'চারদিকের এই সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে নিজেকে একেবারে অশিক্ষিত বর্বর বলে মনে হচ্ছে, শঙ্কু।'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু ভালোই লাগছে। আমাদের এই গ্রহে যে জ্ঞানী মানুষের বিস্ময় জাগানোর মতো কিছু জিনিস এখনো রয়েছে এটা আমার কাছে একটা বড়ো আবিষ্কার।'

আরো ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়িয়ে বিস্ময় জাগানোর মতো কতো প্রাণী যে দেখলাম তার হিসেব নেই। একটা ফীনিক্সকে আগুনে পোড়ার ঠিক আগের মুহূর্ত থেকে তার জায়গায় নতুন ফীনিক্সকে জন্মে পাখা মেলে সূর্যের দিকে উড়ে যেতে দেখেছি। এছাড়া উপকথার পাখির মধ্যে গ্রিফন দেখেছি ; পারস্যের সিমুর্ঘ, আরবদের আঙ্কা দেখেছি ; রুশদের নোর্ক আর জাপানীদের ফেং ও কির্নে দেখেছি। সরীসৃপের মধ্যে চোখের চাহনিতে ভস্ম করা ব্যাসিলিস্ক দেখেছি। একটা আগুনে অদাহ্য স্যালিম্যান্ডারকে দেখলাম তার বিশেষত্ব জাহির করার জন্যই যেন বার বার একটা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করছে, আর অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসছে। একটা প্রকাণ্ড চতুর্দন্ত শ্বেতহস্তী দেখেছি, সেটা ইন্দ্রের ঐরাবত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আর সেটা যে-গাছের ডালপালা ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তার পত্রপুষ্পের চোখ ঝলসানো বর্ণচ্ছটা দেখে সেটা যে স্বর্গের পারিজাত, তা অবিনাশবাবুও সহজেই অনুমান করলেন।

তবে জায়গাটা যে সবটাই বৃক্ষলতাগুল্মশোভিত নন্দন কানন, তা নয়।

উত্তরের প্রাচীর ধরে মাইলখানেক যাবার পর হঠাৎ দেখি, গাছপালা ফুলফল সব ফুরিয়ে গিয়ে ধূসর রুক্ষ এক পাথরের রাজ্যে হাজির হয়েছি। সামনে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ নিয়ে এক পাহাড়, তার গায়ে একটা গুহা, আর সেই গুহার ভিতর থেকে রক্ত-হিম-করা বিচিত্র সব হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

বুঝতে পারলাম আমরা রাক্ষসের রাজ্যের প্রবেশপথে এসে পড়েছি। রাক্ষস সব দেশেরই উপকথাতে আছে, আর তাদের বর্ণনাও মোটামুটি একই রকম। সন্ডার্স গুহায় প্রবেশ করতে মোটেই রাজি নয়। ক্রোলের দোনামনা ভাব।" এটা দেখেছি যে এখানকার প্রাণীরা আমাদের গ্রাহ্যই করে না ; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ইতস্তত করছি, কারণ অবিনাশবাবু আমার কোটের আস্তিন ধরে চাপ মেরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—ঢের হয়েছে, এবার চলুন ফিরি—এমন সময় একটা তারস্বরে চিৎকার শুনে আমাদের সকলেরই মনটা সেইদিকে চলে গেল।

'ইউনিকর্নস ! ইউনিকর্নস ! ইউনিকর্নস !'

বাঁ দিকে একটা মস্ত ঝোপের পিছন থেকে মার্কোভিচের গলায় চিৎকারটা আসছে।

'ও কি আবার কোকেন খেল নাকি ?' ক্রোল প্রশ্ন করল।

'মোটেই না' বলে আমি এগিয়ে গেলাম ঝোপটার দিকে। সেটা পেরোতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল।

ছোটো বড় মাঝারি নানান সাইজের একটা জানোয়ারের পাল আমাদের সামনে দিয়ে চলেছে। তাদের গায়ের রং গোলাপী আর খয়েরি মেশানো। গরু আর ঘোড়া—এই দুটো প্রাণীর সঙ্গেই তাদের চেহারার মিল রয়েছে, আর রয়েছে

প্রত্যেকটার কপালে একটা করে প্যাঁচানো শিং। বুঝতে পারলাম যে, এদের সন্ধানেই আমাদের অভিযান। এরাই হল একশৃঙ্গ বা ইউনিকর্ন। প্লিনির ইউনিকর্ন, বিদেশের রূপকথার ইউনিকর্ন, মোহেঞ্জোদাড়োর সীলে খোদাই করা ইউনিকর্ন।

জানোয়ারগুলোর সব কটাই যে হাঁটছে তা নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটা ঘাস খাচ্ছে, কয়েকটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফিয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে, আবার কয়েকটা বাচ্চা ইউনিকর্ন খেলাচ্ছলে পরস্পরকে গুঁতোচ্ছে। মনে পড়ল উইলার্ডের ডায়রিতে লেখা 'আই স এ হার্ড অফ ইউনিকর্নস টুডে।' আমরাও উইলার্ডের মতো সুস্থ মস্তিষ্কেই দলটাকে দেখছি।

কিন্তু মার্কোভিচ কই?

সবে প্রশ্নটা মাথায় এসেছে এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য। জানোয়ারের মধ্যে থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে মার্কোভিচ—তার লক্ষ হল আমাদের পিছনে ঘাসের শেষে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের দিকে। আর সে যাচ্ছে একা নয়—তার দুহাতে জাপ্‌টে ধরা রয়েছে একটা গোলাপী রঙের ইউনিকর্নের বাচ্চা।

সন্ডার্স চেঁচিয়ে উঠল—'থামাও, শয়তানকে থামাও!'

'বুট পরো, বুট পরো!'—চিৎকার করে উঠল ক্রোল। সে ছুটেছে মার্কোভিচকে লক্ষ করে। আমরাও তার পিছু নিলাম।

কথাটা ঠিক সময়ে কানে গেলে হয়তো মার্কোভিচের খেয়াল হতো। কিন্তু তা আর হল না। ঘাসের জমি ছাড়িয়ে প্রাচীরের মাথায় পৌঁছিয়েই সে এক মরিয়া, বেপরোয়া লাফ দিল! অবাক হয়ে দেখলাম যে লাফটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কোল থেকে ইউনিকর্নের বাচ্চাটা উধাও হয়ে গেল, আর পরমুহূর্তেই মার্কোভিচের নিম্নগামী দেহ প্রাচীরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরে রাবসাং-এর সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে মার্কোভিচকে প্রাচীরের উপর থেকে দেড়শ ফুট নিচে মাটিতে পড়তে দেখে তার দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু তার আর কিছু করবার ছিল না। হাড়গোড় ভেঙে মার্কোভিচের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ইউনিকর্নের কথা জিজ্ঞেস করাতে সে অবাক হয়ে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'সাহেব একাই পড়েছিলেন। তাঁর হাতে কিচ্ছু ছিল না!'

ডুংলুং-ডো সম্পর্কে আমি যে ধারণায় পৌঁছেছি সন্ডার্স ও ক্রোল তাতে সায় দিয়েছে। আমার মতো অনেক দেশের অনেক লোক অনেক কাল ধরে যদি এমন একটা জিনিস বিশ্বাস করে যেটা আসলে কাল্পনিক, তাহলে সেই বিশ্বাসের জোরেই একদিন সে কল্পনা বাস্তব রূপ নিতে পারে। এইভাবে বাস্তবরূপ পাওয়া কল্পনার জগৎ হল ডুংলুং-ডো। হয়তো এমন জগৎ পৃথিবীতে আর কোথাও

নেই। ডুংলুং-ডোর কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদকে তার গণ্ডীর বাইরে আনা মানেই তাকে আবার কল্পনার জগতে ফিরিয়ে আনা। মার্কোভিচ তাই ইউনিকর্ন আনতে পারেনি, সন্ডার্সের থলি থেকে তার সংগ্রহ করা ফুলপাতা তাই উধাও হয়ে গেছে।

মৌনী লামার একসঙ্গে হ্যাঁ-না বলার মানেও এখন স্পষ্ট। একশৃঙ্গ সত্যিই থেকেও নেই। অবিশ্যি ওড়ার ব্যাপারে উনি 'না' বলে ভুল করেছিলেন, তার কারণ উড্ডয়নসূত্রমের কথাটা উনি বোধহয় জানতেন না।

অবিনাশবাবু সব শুনেটুনে বললেন, 'তার মানে বলছেন দেশে ফিরে গিয়ে দেখাবার কিছু নেই—এইতো?'

আমি বললাম, 'ক্রোলের তোলা ছবি আছে। অবিশ্যি সাধারণ লোকের কাছে সেটা খুব বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে হয় না। আর আছে আমাদের তিব্বতী বুট জুতো। কিন্তু পুঁথিতে বলছে ংমুং জিনিসটা গরমে গলে গিয়ে তার গুণ চলে যায়।'

অবিনাশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এবার আমি আমার মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লাম।

'আমরা যে প্রায় পঁচিশ বছর বয়স কমিয়ে দেশে ফিরছি সেটা বোধহয় খেয়াল করেননি।'

'কি রকম?'

আমি আমার দাড়ি-গোঁফ থেকে বালি আর বরফের কুচি ঝেড়ে ফেলে দিতেই অবিনাশবাবুর চোখ গোল হয়ে গেল।

'এ কী, এ যে কালো কুচকুচে কাঁচা!'

আমি বললাম, 'আপনার গোঁফও তাই। আয়নায় দেখুন।'

অবিনাশবাবু আয়না নিয়ে অবাক বিস্ময়ে নিজের গোঁফের দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় সন্ডার্স এল। সন্ডার্সেরও বয়স কমে গেছে, তার উপরের পাটির পিছন দিকের একটা দাঁত নড়ছিল, সেটা আবার শক্ত হয়ে গেছে। সে একটা গভীর নিশ্চিন্তির হাঁফ ছেড়ে বলল—

'নোম্যাড্স, নট রবারস্—থ্যাঙ্ক গড!'

বাইরে থেকে যাযাবরদের হৈ-হল্লার শব্দ, ঘোড়ার খুরের শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পাচ্ছি। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। ওঁ মণিপদ্মে হুম্।

প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু

১৬ই এপ্রিল

আজ জার্মানি থেকে আমার চিঠির উত্তরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর পমারের চিঠি পেয়েছি। পমার লিখছেন—

প্রিয় প্রোফেসর শঙ্কু,

তোমার তৈরি রোবোট (Robot) বা যান্ত্রিক মানুষ সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ, তাতে আমার যত না আনন্দ হয়েছে, তার চেয়েও বেশি হয়েছে বিস্ময়। তুমি লিখেছ আমার রোবোট-সম্পর্কে গবেষণামূলক লেখা তুমি পড়েছ, আর তা থেকে তুমি অনেক জ্ঞান লাভ করেছ। কিন্তু তোমার রোবোট যদি সত্যিই তোমার বর্ণনার মতো হয়ে থাকে, তাহলে বলতেই হবে যে আমার কাজকে তুমি অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছ।

আমার বয়স হয়েছে, তাই আমার পক্ষে ভারতবর্ষে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তুমি যদি একটিবার তোমার তৈরি মানুষটিকে নিয়ে আমার এদিকে আসতে পার, তাহলে আমি শুধু খুশিই হব না, আমার উপকারও হবে। এই হাইডেলবার্গেই আমারই পরিচিত আরেকটি বৈজ্ঞানিক আছেন ডক্টর বোর্গেল্ট। তিনিও রোবোট নিয়ে কিছু কাজ করেছেন। হয়তো তাঁর সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দিতে পারব।

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। যদি আসো, বাড়ি থাক, তাহলে একদিকের ভাড়াটার আমি নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমার এখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা হবে, বলাই বাহুল্য।

ইতি

রুডলফ পমার

পমারের চিঠির উত্তর আজই দিয়ে দিয়েছি। বলেছি আগামী মাসের মাঝামাঝি আসব। ভাড়ার ব্যাপারে আর আপত্তি করলাম না, কারণ জার্মানি যাতায়াতের খরচা কম নয়, অথচ ওদেশটা দেখার লোভও আছে যথেষ্ট।

আমার রোবু সঙ্গে যাবে অবশ্যই, তবে ও এখনো বাংলা আর ইংরিজি ছাড়া কিছু বলতে পারে না। এই একমাসে জার্মানটা শিখিয়ে নিলে ও সরাসরি পমারের সঙ্গে কথা বলতে পারবে ; আমাকে আর দোভাষীর কাজ করতে হবে না।

রোবুকে তৈরি করতে আমার সময় লেগেছে দেড় বছর। আমার চাকর প্রহ্লাদ সব সময় আমার পাশে থেকে জিনিসপত্র এগিয়ে-টেগিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছে, কিন্তু আসল কাজটা সমস্ত আমি নিজেই করেছি। আর যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সেটা হচ্ছে রোবুকে তৈরি করার খরচ। সবসুদ্ধ মিলিয়ে খরচ পড়েছে মাত্র তিনশ তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনা। এই সামান্য টাকায় যে জিনিসটা তৈরি হল সেটা ভবিষ্যতে হবে আমার ল্যাবরেটরির সমস্ত কাজে আমার সহকারী, যাকে বলে রাইট হ্যান্ড ম্যান। সাধারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অঙ্ক কষতে রোবুর লাগে এক সেকেন্ডের কম সময়। এমন কোনো কঠিন অঙ্ক নেই যেটা করতে ওর দশ সেকেন্ডের বেশি লাগবে। এ থেকে বোঝা যাবে আমি জলের দরে কী এক আশ্চর্য জিনিস পেয়ে গেছি। 'পেয়ে গেছি' বলছি এই জন্যে যে, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেই আমি সম্পূর্ণ মানুষের সৃষ্টি বলে মনে করতে পারি না। সম্ভাবনাটা আগে থেকেই থাকে, হয়তো চিরকালই ছিল ; মানুষ কেবল হয় বুদ্ধির জোরে না হয় ভাগ্যবলে সেই সম্ভাবনাগুলোর হদিস পেয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে নেয়।

রোবুর চেহারাটা যে খুব সুশ্রী হয়েছে তা বলতে পারি না। বিশেষ করে দুটো চোখ দুরকম হয়ে যাওয়াতে ট্যারা বলে মনে হয়। সেটাকে ব্যালান্স করার জন্য আমি রোবুর মুখে একটা হাসি দিয়ে দিয়েছি। যতই কঠিন অঙ্ক করুক না সে—হাসিটা ওর মুখে সব সময় লেগে থাকে। মুখের জায়গায় একটা ফুটো দিয়ে দিয়েছি, কথাবার্তা সব ঐ ফুটো দিয়ে বেরোয়। ঠোঁট নাড়ার ব্যাপারটা করতে গেলে অযথা সময় আর খরচ বেড়ে যেতো তাই ওদিকে আর যাইনি।

মানুষের যেখানে ব্রেন থাকে, সেখানে রোবুর আছে একগাদা ইলেক্‌ট্রিক তার, ব্যাটারি, ভ্যাল্‌ভ ইত্যাদি। কাজেই ব্রেন যা কাজ করে, তার অনেকগুলোই রোবু পারে না। যেমন সুখ-দুঃখ অনুভব করা, বা কারুর ওপর রাগ করা বা হিংসে করা—এসব রোবু জানেই না। ও কেবল কাজ করে আর প্রশ্নের উত্তর দেয়। অঙ্ক সব রকমই পারে, তবে শেখানো কাজের বাইরে কাজ করে না, আর শেখানো প্রশ্নের জবাব ছাড়া কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। পঞ্চাশ

হাজার ইংরিজি আর বাংলা প্রশ্নের উত্তর ওকে শিখিয়েছি—একদিনও ভুল করেনি। এবার হাজার দশেক জার্মান প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিলেই আমি জার্মানি যাবার জন্য তৈরি হয়ে যাব।

এত অভাব থেকে রোবু যা করে তা পৃথিবীর আর কোনো যান্ত্রিক মানুষ করেছে বলে মনে হয় না। এমন একটা জিনিস সৃষ্টি করে গিরিডি শহরের মধ্যে সেটাকে বন্দী করে রাখার কি কোনো মানে হয়? বাংলা দেশে সামান্য রসদে বাঙালী বৈজ্ঞানিক কী করতে পারে, সেটা কি বাইরের জগতের জানা উচিত নয়? এতে নিজের প্রচারের চেয়ে দেশের প্রচার বেশি। অন্তত আমার উদ্দেশ্য সেটাই।

১৮ই এপ্রিল

অ্যাদ্দিনে অবিনাশবাবু আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা স্বীকার করলেন। আমার এই প্রতিবেশীটি ভালো মানুষ হলেও, আমার কাজ নিয়ে তাঁর ঠাট্টার ব্যাপারটা মাঝে মাঝে বরদাস্ত করা মুশকিল হয়।

উনি প্রায়হ্ আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে আসেন—কিন্তু গত তিনমাসের মধ্যে যতবার এসেছেন, ততবারই আমি প্রহ্লাদকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি যে আমি ব্যস্ত, দেখা হবে না।

আজ রোবুকে জার্মান শিখিয়ে আমার ল্যাবরেটরির চেয়ারে বসে একটা বিজ্ঞান পত্রিকার পাতা উলটোচ্ছি, এমন সময় উনি এসে হাজির। আমার নিজেরও ইচ্ছে ছিল উনি একবার রোবুকে দেখেন, তাই ভদ্রলোককে বৈঠকখানায় না বসিয়ে একেবারে ল্যাবরেটরিতে ডেকে পাঠালাম।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'আপনি কি হিং-এর কারবার ধরেছেন নাকি?' পরমুহূর্তেই রোবুর দিকে চোখ পড়তে নিজের চোখ গোল গোল করে বললেন, 'ওরে বাস্—ওটা কী? ওকি রেডিও, না কলের গান, না কী মশাই?'

অবিনাশবাবু এখনো গ্রামোফোনকে বলেন কলের গান, সিনেমাকে বলেন বায়স্কোপ, এরোপ্লেনকে বলেন উড়ো জাহাজ।

আমি ওঁর প্রশ্নের উত্তরে বললাম, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন না ওটা কী। ওর নাম রোবু।'

'রোবুস্কোপ?'

'রোবুস্কোপ কেন হতে যাবে? বলছি না ওর নাম রোবু! আপনি ওর নাম ধরে জিজ্ঞেস করুন ওটা কি জিনিস, ও ঠিক জবাব দেবে।'

অবিনাশবাবু 'কী জানি বাবা এ আপনার কী খেলা' বলে যন্ত্রটার সামনে

দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি কী হে, রোবু ?'

রোবুর মুখের গর্ত থেকে পরিষ্কার উত্তর এলো, 'আমি যান্ত্রিক মানুষ। প্রোফেসর শঙ্কুর সহকারী।'

ভদ্রলোকের প্রায় ভিরমি লাগার জোগাড় আর কি। রোবু কী কী করতে পারে শুনে, আর তার কিছু কিছু নমুনা দেখে অবিনাশবাবু একেবারে ফ্যাকাশে মুখ করে আমার হাত দুটো ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বুঝলাম এবার তিনি সত্যিই ইম্প্রেস্ড।

আজ একটা পুরনো জার্মান বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রোফেসর বোর্গেল্টের লেখা রোবোট সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। উনি বেশ দেমাকী মেজাজেই লিখেছেন যে, যান্ত্রিক মানুষ তৈরির ব্যাপারে জার্মানরা যা কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমন আর কোনো দেশে কেউ দেখায়নি। তিনি আরো লিখেছেন যে, যান্ত্রিক মানুষকে দিয়ে চাকর বাকরের মতো কাজ করানো সম্ভব হলেও, তাকে দিয়ে কাজের কাজ বা বুদ্ধির কাজ কোনোদিনই করানো যাবে না।

প্রোফেসর বোর্গেল্টের একটা ছবিও প্রবন্ধটার সঙ্গে রয়েছে। প্রশস্ত ললাট, ভুরু দুটো অস্বাভাবিক রকম ঘন, চোখ দুটো কোটরে ঢোকা, আর থুৎনির মাঝখানে একটা দু ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা আর সেই রকমই চওড়া প্রায় চারকোনা কালো দাড়ির চাবড়া।

ভদ্রলোকের লেখা পড়ে আর তাঁর চেহারা দেখে তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহটা আরো বেড়ে গেল।

২৩শে মে

আজ সকালে হাইডেলবার্গ পৌঁছেছি। ছবির মতো সুন্দর শহর, ইউরোপের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতির জন্য প্রসিদ্ধ। নেকার নদী শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে, পেছনে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর রয়েছে হাইডেলবার্গের ঐতিহাসিক কেল্লা।

শহর থেকে পাঁচ মাইল বাইরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রোফেসর পমারের বাসস্থান। সত্তর বছরের বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আমাকে যে কী খাতির করলেন তা বলে বোঝানো যায় না। বললেন, 'ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানির একটা স্বাভাবিক টান আছে জানো বোধহয়। আমি তোমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির অনেক বই পড়েছি। ম্যাক্স মুলার এসব বইয়ের চমৎকার অনুবাদ করেছেন। তার কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। তুমি একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক হয়ে আজ যে কাজ করেছ, তাতে আমাদের দেশেরও গৌরব বাড়ল।'

রোবুকে তার সাইজ অনুযায়ী একটা প্যাকিং কেসে খড়, তুলো, করাতের গুঁড়ো ইত্যাদির মধ্যে খুব সাবধানে শুইয়ে নিয়ে এসেছিলাম। পমারের তাকে দেখার জন্য খুবই কৌতূহল হচ্ছে জেনে আমি দুপুরের মধ্যেই তাকে বাক্স থেকে বার করে ঝেড়ে পুঁছে পমারের ল্যাবরেটরিতে দাঁড় করালাম। পমার এ জিনিসটি নিয়ে এত গবেষণা এত লেখালেখি করলেও নিজে কোনোদিন রোবোট তৈরি করেননি।

রোবুর চেহারা দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠে গেলো। বললেন, 'এ যে তুমি দেখছি আঠা, পেরেক, আর স্টিকিং প্লাস্টার দিয়েই সব জোড়ার কাজ সেরেছ! তুমি বলছ এই রোবোট কথা বলে, কাজ করে?'

পমারের গলায় অবিশ্বাসের সুর অতি স্পষ্ট।

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনি ওকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ওকে প্রশ্ন করুন না।'

পমার রোবুর দিকে ফিরে বললেন, 'Welche arbeit machst du? (তুমি কী কাজ কর?)'

রোবু স্পষ্ট গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে উত্তর দিল, 'Ich helfe meinem herrn bei seiner arbeit, und lose mathematische probleme (আমি আমার মনিবের কাজে সাহায্য করি, আর অঙ্কের সমস্যার সমাধান করি)।'

পমার রোবুর দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে কিছুক্ষণ মাথা নাড়লেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'শঙ্কু, তুমি যা করেছ, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার কোনো তুলনা নেই। বোর্গেল্টের ঈর্ষা হবে।'

এর আগে বোর্গেল্ট সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। হঠাৎ পমারের মুখে তাঁর নাম শুনে একটু চমকেই গেলাম। বোর্গেল্টও কি নিজে কোনো রোবোট তৈরি করেছেন নাকি?

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পমার বললেন, 'বোর্গেল্ট হাইডেলবার্গেই আছে—আমারই মতো নির্জন পরিবেশে, তবে নদীর ওপারে। আমার সঙ্গে আগে যথেষ্ট আলাপ ছিল—বন্ধুত্বই বলতে পার। একই স্কুলে পড়েছি বার্লিনে—তবে ওর চেয়ে আমি তিন বছরের সিনিয়র ছিলাম। তারপর আমি হাইডেলবার্গে এসে ডিগ্রী পড়ি। ও বার্লিনেই থেকে যায়। বছর দশেক হল ও এখানে এসে ওদের পৈতৃক বাড়িতে রয়েছে।'

'উনি কি নিজে রোবোট তৈরি করেছেন?'

'অনেকদিন থেকেই লেগে আছে—কিন্তু বোধহয় সফল হয়নি। মাঝে তো শুনেছিলাম ওর মাথাটা একটু বিগড়েই গেছে। গত ছ'মাস ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। আমি টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছি কয়েকবার, প্রতিবারই

ওর চাকর বলেছে বোর্গেল্ট অসুস্থ। ইদানীং আর ফোন-টোন করিনি।'

'আমি এসেছি সেটা কি উনি জানেন?'

'তা তো বলতে পারি না। তুমি আসছ সেকথা এখানকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে আমি বলেছি—তাদের সঙ্গে তোমার দেখাই হবে। খবরের কাগজের লোকও কেউ কেউ জেনে থাকতে পারে। বোর্গেল্টকে আর আলাদা করে জানাবার প্রয়োজন দেখিনি।'

আমি চুপ করে রইলাম। দেয়ালে একটা কুকু-ক্লকে কুক্-কুক্ করে চারটে বাজল। খোলা জানলার বাইরে বাগান দেখা যাচ্ছে; তারও পিছনে পাহাড়। দু একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

পমার বললেন, 'রাশিয়ার স্ট্রেগোনাফ, আমেরিকার প্রোফেসর স্টাইনওয়ে, ইংলন্ডের ডাঃ ম্যানিংস—এঁরা সকলেই রোবোট তৈরি করেছেন। জার্মানিতেও তিনচারটে রোবোট তৈরি হয়েছে—আর সেগুলো সবই আমি দেখেছি। কিন্তু তাদের কোনোটাই এত সহজে তৈরি হয়নি, আর এমন স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না।'

আমি বললাম, 'ও কিন্তু অঙ্কও করতে পারে। ওকে যে-কোনো অঙ্ক দিয়ে আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

পমার অবাক হয়ে বললেন, 'বল কী! ও আউয়েরবাখের ইকুয়েশন জানে?'

'জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

রোবুকে পরীক্ষা করে পমার বললেন, 'এ একেবারে তাজ্জব কাণ্ড। সাবাস তোমার প্রতিভা।' তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'তোমার রোবু কি মানুষের মতো অনুভব করতে পারে?'

আমি বললাম, 'না—ও জিনিসটা ও পারে না।'

পমার বললেন, 'আর কিছু না হোক, তোমার ব্রেনের সঙ্গে ওর যদি একটা সংযোগ থাকত তাহলে খুব ভালো হত। অন্তত তোমার সুখ দুঃখ যদি ও বুঝতে পারত তাহলে ওকে দিয়ে তোমার অনেক উপকার হতে পারত। ও সত্যিই তাহলে তোমার একজন নির্ভরযোগ্য সাথী হতে পারত।'

পমার যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, 'আমি ওই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি—একটা যান্ত্রিক মানুষকে কী করে একটা রক্ত-মাংসের মানুষের মনের কথা বোঝানো যায়। এ নিয়ে অনেক দূর আমি এগিয়েও ছিলাম, কিন্তু তারপর বুড়ো হয়ে পড়লাম। ব্রেনটা ঠিকই ছিল, কিন্তু হৃদ্‌রোগ ধরে কাবু করে দিল। আর, যে রোবোটের উপর এইসব পরীক্ষা চালাব, সেটা তৈরি করারও আমার সামর্থ্য রইল না।'

আমি বললাম, 'আমি রোবুর কাজে দিব্যি খুশি আছি। ও যতটুকু করে তাই

আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

পমার কিছু বললেন না। তিনি দেখি একদৃষ্টে রোবুর দিকে চেয়ে আছেন। রোবুর মুখে সেই হাসি। ঘরের জানলা দিয়ে পড়ন্ত রোদ ঢুকে রোবুর বাঁ চোখটার উপর পড়েছে। রোদের ঝলসানিতে ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌বের চোখও মনে হয় হাসছে।

২৪শে মে

এখন রাত বারোটা। আমি পমারের বাড়ির দোতলার ঘরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকাল মাঝ রাত্তির থেকে আরম্ভ করে আজ সারাদিনের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো সব গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি। কতদূর পারব তা জানি না, কারণ আমার মন ভালো নেই। জীবনে আজ প্রথম আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে আমি নিজেকে যত বড় বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেছিলাম, সত্যিই আমি তত বড় কিনা। তাই যদি হতাম, তাহলে এভাবে অপদস্থ হলাম কেন?

কাল রাত্রের ঘটনাটাই আগে বলি। এটা তেমন কিছু না, তবু লিখে রাখা ভালো।

রাত্রে পমার আর আমি ডিনার শেষ করে উঠেছি ন'টায়। তারপর দুজনে বৈঠকখানায় বসে কফি খেতে খেতে অনেক গল্প করেছি। তখনও পমারকে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে দেখেছি। কী ভাবছিলেন কে জানে। হয়তো রোবুকে দেখা অবধি ওঁর নিজের অক্ষমতার কথাটা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে। সত্যিই, উনি যে রকম বুড়ো হয়ে গেছেন, তাতে ওঁর পক্ষে আর রোবোট নিয়ে নতুন করে কোনো গবেষণা করা সম্ভব বলে মনে হয় না।

আমি শুতে গেছি দশটার কিছু পরে। যাবার আগে রোবুকে দেখে গেছি। পমারের ল্যাবরেটরিতে ও দিব্যি আরামে আছে বলেই মনে হল। জার্মানির আবহাওয়া, এখানকার শীত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—এসবের প্রতি ওর কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। ও যেন শুধু অপেক্ষা করে আছে আমার আদেশের জন্য। ঘুমোতে যাবার আগে আমরা দুই বৈজ্ঞানিক জার্মান ভাষায় ওর কাছে বিদায় নিলাম। রোবুও পরিষ্কার গলায় বলল, 'গুটে নাখট্, হের্ প্রোফেসর শঙ্কু—গুটে নাখট্ হের্ প্রোফেসর পমার।'

বিছানার পাশের বাতি জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ একটা ম্যাগাজিন উলটে পালটে ঢংঢং করে নিচের সিঁড়ির গ্রান্ডফাদার ঘড়িতে এগারটা বাজা শুনে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছি।

মাঝরাত্তিরে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন কটা বেজেছে জানি না। ঘুমটা ভেঙেছে একটা আওয়াজ শুনেই—আর সে আওয়াজটা আসছে আমার ঘরের ঠিক নিচে পমারের ল্যাবরেটরি থেকে। খট খট খট ঠং ঠং—খটখট। একবার মনে হচ্ছে কাঠের মেঝের উপর মানুষের পায়ের আওয়াজ, আরেকবার মনে হচ্ছে যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটির শব্দ।

তবে আওয়াজটা পাঁচ মিনিটের বেশি আর শুনতে পেলাম না। তাও বেশ কিছুক্ষণ কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম—যদি আরো কোনো শব্দ হয়। কিন্তু তারপরে ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনিনি।

সকালে ব্রেকফাস্টের সময় পমারকে আর এ বিষয়ে কিছু বললাম না। কারণ আমার ঘুমের কোনোরকম ব্যাঘাত হয়েছে শুনে উনি হয়তো ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

ব্রেকফাস্টের পর একটু বেড়াতে যাবো বলে ঠিক কবেছিলাম, কিন্তু টেবিল ছেড়ে ওঠার আগেই পমারের চাকর কুর্ট এসে একটা ভিজিটিং কার্ড তার মনিবের হাতে দিল। নাম পড়ে পমার অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, বোর্গেল্ট এসেছে দেখছি!'

আমিও খবরটা জেনে রীতিমতো অবাক হলাম।

বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি, গিরিডিতে থাকতে জার্মান পত্রিকার ছবিতে যে মুখ দেখেছিলাম, এ সে-ই মুখ, কেবল চুলে আরো অনেক বেশি পাক ধরেছে। আমরা ঢুকতেই বোর্গেল্ট সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন। এত বয়স সত্ত্বেও তাঁর চটপটে মিলিটারি ভাব দেখে আশ্চর্য লাগল। এঁরও তো প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স—কিন্তু কী জোয়ান স্বাস্থ্য!

পমার বললেন, 'কই, বোর্গেল্ট, তোমাকে দেখে তো লম্বা অসুখ থেকে উঠেছ বলে মোটেই বোধ হচ্ছে না—বরং মনে হচ্ছে চেঞ্জে গিয়ে শরীর সারিয়ে এসেছ।'

বোর্গেল্ট ভারী গলায় হো হো করে হেসে বললেন, 'অসুখ বললে লোকে উৎপাতটা কম করে; ব্যস্ত আছি বললে অনেক সময়েই কাজ হয় না—বরং লোকের তাতে কৌতূহলটা বেড়েই যায়, আর তখন তারা টেলিফোন করে বার বার জানতে চায় ব্যস্ততার কারণ কী। বুঝতেই পারছ সে কারণটা সব সময় বলা যায় না।'

'তা অবিশ্যি যায় না।'

পমার বোর্গেল্টকে পানীয় অফার করতে ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'ও জিনিসটা একদম ছেড়ে দিয়েছি, আর আমার সময়ও খুব বেশি নেই। আমি আজকের খবরের কাগজে রোবোট-সহ প্রোফেসর শঙ্কুর এখানে আসার কথা

পড়লাম। ও ব্যাপারে আমার কী রকম কৌতূহল সে তো জানই। তাই খবর না দিয়েই একেবারে সটান চলে এলাম। আশা করি কিছু মনে করনি।'

'না, না।'

আমি বললাম, 'আপনি বোধহয় তাহলে আমার যন্ত্রটা একবার দেখতে চান।'

'সেই জন্যেই তো আসা। আপনি কীভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন সেটা জানার স্বভাবতই একটা আগ্রহ হচ্ছে।'

বোর্গেল্টকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এলাম।

রোবুকে দেখেই বোর্গেল্টের প্রথম কথা হল, 'আপনি বোধহয় চেহারার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। আমার মনে হয় এ জিনিসটাকে যান্ত্রিক মানুষ না বলে কেবল যন্ত্র বলাই ভালো—তাই নয় কি ?'

এটা অবিশ্যি আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। বললাম, 'আমি কাজের উপরই জোরটা দিয়েছি বেশি—সেটা ঠিক। অ্যাপোলোর মতো নিখুঁত সুদর্শন মানুষ ওকে নিশ্চয়ই বলা চলে না।'

'আপনাব রোবোট ভালো অঙ্ক কষতে পারে শুনেছি !'

'টেস্ট করবেন ?'

বোর্গেল্ট রোবুর দিকে ফিরে বললেন, 'দুইয়ে দুইয়ে কত হয় ?'

উত্তরটা রোবুর মুখ থেকে এত জোরে এল যে পমারের ল্যাবরেটরির কাঁচের জিনিসপত্র সব ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। এত জোরে রোবু কখনো কথা বলে না। স্পষ্ট বুঝলাম—আর বুঝে একটু অবাক হলাম যে, বোর্গেল্টের প্রশ্নে রোবু বিরক্ত হয়েছে।

বোর্গেল্টের নিজের হাবভাবও এই দাবড়ানির চোটে একটু আড়ষ্ট বলে মনে হল। তিনি একের পর এক কঠিন অঙ্কের প্রশ্ন রোবুকে করতে লাগলেন, আর রোবুও যথারীতি পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলো। গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল। বোর্গেল্টের দিকে চেয়ে দেখি এই চল্লিশ ডিগ্রী শীতের মধ্যেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট প্রশ্ন করার পর বোর্গেল্ট আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অঙ্ক ছাড়া আর কী জানে ও ?'

আমি বললাম, 'আপনার বিষয়ে ওর অনেক তথ্য জানা আছে—জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

আসবার আগে একটা জার্মান বিজ্ঞানকোষ থেকে বোর্গেল্ট-এর জীবন সংক্রান্ত অনেক খবর রোবুর মধ্যে 'পুরে' দিয়েছিলাম। আমি আন্দাজ করেছিলাম যে, বোর্গেল্ট রোবুকে প্রশ্ন করতে পারেন।

বোর্গেল্ট আমার কথা শুনে যেন বেশ একটু অবাক হলেন। তারপর

বললেন, 'এত জ্ঞান আপনার যন্ত্রের ? বেশ, বল তো হের্‌ রোবু...আমার নামটি কী।'

রোবুর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড, দশ সেকেন্ড, এক মিনিট—কোনো উত্তর নেই, কোনো শব্দ নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। রোবু যেন ঘরের আর সব টেবিল চেয়ার আলমারি যন্ত্রপাতির মতোই নিষ্প্রাণ, নির্জীব।

এবারে আমার ঘাম ছোটার পালা। আমি এগিয়ে রোবুর মাথার উপরের বোতমটা নিয়ে টেপাটেপি করলাম, এটা নাড়লাম, ওটা নাড়লাম—এমন কি রোবুর সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে বারবার ঝাঁকুনি দিলাম—ভিতরের কলকব্জা সব ঝনঝন করে উঠল— কিন্তু কোনো ফল হল না।

রোবু আজ আমার এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের সমস্ত মানসম্মান এই দুই বিখ্যাত বিদেশী বৈজ্ঞানিকের সামনে মাটিতে মিশিয়ে দিল।

বোর্গেল্ট মুখ দিয়ে হুঁঃ করে একটা শব্দ করে বললেন, 'ওটায় যে একটা বড় রকম ডিফেক্ট রয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক—অঙ্কটা ও ভালোই জানে। যদি অসুবিধা না হয়, কাল বিকেলে ওটাকে নিয়ে একবাব আমার বাড়িতে গেলে আমি সারিয়ে দিতে পারব বলে মনে হয়। আর আমাবও কিছু দেখাবার আছে। তোমাদের দুজনেরই নেমন্তন্ন রইল।'

বোর্গেল্ট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

পমার আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন, আর আমিও বুঝতে পারছিলাম তিনি নিজেও খুব বিব্রত বোধ করছেন। বললেন, 'আমার কাছে ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য লাগছে। এসো তো দেখা যাক ও এখন আবার ঠিকমতো কথা বলছে কিনা।'

ল্যাবরেটরিতে ফিরে গিয়ে রোবুকে প্রশ্ন করতে সে আবার যথারীতি জবাব দিতে শুরু করল। হাঁটা চলাও ঠিকই করল। বুঝতে পারলাম যে ঠিক ওই একটা প্রশ্নের মুহূর্তে ওর মধ্যে কোনো একটা সাময়িক গণ্ডগোল হয়েছিল যার জন্য বেচারা জবাবটা দিতে পারেনি। এ ব্যাপারে দায়ী করতে হলে আমাকেই করতে হয়। ওর আর কী দোষ ?

সন্ধ্যার দিকে বোর্গেল্টেব কাছ থেকে টেলিফোন এলো। ভদ্রলোক আগামীকালের নেমন্তন্নের কথা মনে করিয়ে দিলেন। রোবুকে নিয়ে আসার কথাটাও আবার বলে বললেন, 'আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না, কাজেই তোমার যন্ত্র যদি গণ্ডগোল করে, বাইরের কারুর কাছে অপদস্থ হবার কোনো ভয় নেই তোমার।'

মন থেকে অসোয়াস্তি যাচ্ছিল না। কাজেই রাত্রে পাছে ঘুম না হয় সেই জন্য

আমার তৈরি ঘুমের ওষুধ সম্নোলিনের একটা বড়ি খেয়ে নিয়েছি।

একটা কথা মনে পড়ে একটু খটকা লাগলো। কাল মাঝ রাত্রিতে খুট খুট আওয়াজ কেন হচ্ছিল ? পমার নিজেই কি ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন নাকি ? রোবুর ভিতরের কলকব্জা তিনি কিছু বিগড়ে দেননি তো ?

পমার আর বোর্গেল্টের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র চলছে না তো ?

২৭শে মে

কাল দেশে ফিরব। হাইডেলবার্গের বিভীষিকা কোনোদিন মন থেকে মুছবে বলে মনে হয় না।

তবে একটা নতুন জ্ঞান লাভ করেছি এখানে এসে। এটা বুঝেছি যে, বৈজ্ঞানিকেরা সম্মানের যোগ্য হলেও, তাঁরা সকলেই বিশ্বাসের যোগ্য নন। কিন্তু যখন ঘটনাটা ঘটল, তখন এসব কথা কিছুই মনে হয়নি। তখন কেবল মনে হয়েছিল—আমার এত কাজ বাকি, কিন্তু আমি কিছুই করে যেতে পারলাম না। কীভাবে যে প্রাণটা—

ঘটনাটা খুলেই বলি।

বোর্গেল্ট আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করে গিয়েছিলেন। রোবুকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করা সহজ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক যখন বলেইছেন তখন ওকে নিয়ে যাওয়াই স্থির করলাম। বিকেল চারটে নাগাদ রোবুকে বাক্সে পুরে একটা ঘোড়াব গাড়ির একদিকের সীটে তাকে কাৎ করে শুইয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে, তার উলটো দিকের সীটে আমরা দুজন বসে বোর্গেল্টের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। মাইল তিনেকের পথ, যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে।

পথে যেতে যেতে রাস্তার দুধারে বসন্তকালীন চেরি ফুলের শোভা দেখতে দেখতে পমারের কাছে বোর্গেল্টের পূর্বপুরুষদের কথা শুনলাম। তাঁদের মধ্যে একজন—নাম জুলিয়াস বোর্গেল্ট—ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনেব মতো মরা মানুষকে জ্যান্ত করতে গিয়ে নিজেই রহস্যময়ভাবে প্রাণ হারান। এ ছাড়া দু একজন উন্মাদ পুরুষদের কথা শোনা যায় যাঁরা নাকি বেশির ভাগ জীবনই পাগলাগারদে কাটিয়েছিলেন।

বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ে রাস্তা উঠে গেছে। এখানে ঠাণ্ডাটা যেন আরো বেশি, তাছাড়া রোদও পড়ে আসছে। আমি মাফলারটা বেশ ভালো করে জড়িয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা কারুকার্য করা বিরাট গেট দেখা গেল। পমার বললেন, 'এসে গেছি।' গেটের উপর নক্শা করে লেখা রয়েছে 'ভিলা মারিয়ান'।

আরো সত্যজিৎ

একজন প্রহরী এসে গেটটা খুলে দিল। আমার গাড়ি তার ভিতর দিয়ে ঢুকে খট্ খট্ করতে করতে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হল। বাড়ির চেয়ে প্রাসাদ বা কেল্লা বললেই বোধহয় ভালো।

বোর্গেল্ট সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের নামার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁর ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমাদের করমর্দন করে বললেন, 'তোমরা আসাতে আমি ভারী খুশি হয়েছি।'

তারপর দুজন ষণ্ডামার্কা চাকর বেরিয়ে এসে রোবুর বাক্সটা তুলে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। আমরা ভিতরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম, আর তার পাশেই লাইব্রেরিতে বোর্গেল্টের আদেশ মতো রোবুকে বাক্স থেকে বার করে দাঁড় করানো হল।

সমস্ত বাড়িটা, বিশেষ করে এই বৈঠকখানা এবং তার প্রত্যেকটি জিনিস—ছবি, আয়না, ঘড়ি, ঝাড়লণ্ঠন—সব কিছুতেই যেমন প্রাচীনত্ব তেমনি আভিজাত্যের ছাপ। একটা কেমন গন্ধ রয়েছে ঘরটার মধ্যে, যেটা কিছুটা পুরনো কাঠের, আর কিছুটা যেন মনে হয় কোনো ওষুধের বা কেমিক্যালের। বোর্গেল্টেরও নিজের একটা ল্যাবরেটরি নিশ্চয়ই আছে, আর সেটা হয়তো এই বৈঠকখানারই কাছাকাছি কোথাও হবে। বাতি জ্বালানো সত্ত্বেও ঘরেব আবছা অন্ধকার ভাবটা কাটল না। কাটবেই বা কী করে, এমন কোনো জিনিস ঘরে নেই যার রং বলা যেতে পারে হাল্‌কা। সবই হয় ব্রাউন না হয় কাল্‌চে—আর সবই পুরনো। সব মিলিয়ে একটা গম্ভীর গা ছম্ ছম্ করা ভাব।

আমি মদ খাই না বলে বোর্গেল্ট আমার জন্য গেলাসে করে আপেলের রস আনিয়ে দিলেন। যে চাকরটি ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে এলো, দেখলে মনে হয় তার অন্তত নব্বুই বছর বয়স হবে। আমি হয়তো তার দিকে একটু বেশি মাত্রায় অবাক হয়ে দেখছিলাম, আর বোর্গেল্ট বোধহয় আমার কৌতূহল মেটাবার জন্যই বললেন, 'রুডি আমার জন্মের আগে থেকেই এ বাড়িতে আছে। ওরা তিনপুরুষ ধরে আমাদের বাড়ির চাকর।'

এখানে বলে রাখি, বোর্গেল্টের মতো এমন গম্ভীর অথচ এত মোলায়েম গলার স্বর আমি আর কখনো শুনিনি।

আমরা তিনজনে হাতে গেলাস তুলে পরস্পরের স্বাস্থ্য কামনা করছি, এমন সময় বাইরে কোথা থেকে যেন টেলিফোন বেজে উঠল। তারপর বুড়ো চাকর রুডি এসে খবর দিল পমারের ফোন। পমার উঠে ফোন ধরতে চলে গেলেন।

বোর্গেল্টের হাতের গেলাসেও আপেলের রস। সেটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, 'প্রফেসর শঙ্কু—তুমি জানো বোধহয়, আজ ত্রিশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিকেরা যান্ত্রিক মানুষ নিয়ে গবেষণা করছেন।'

আমি বললাম, 'জানি।'

'এ নিয়ে কিছু কাজ আমিও করেছি তা জানো বোধহয়।'

'জানি। আমি তোমার কিছু লেখাও পড়েছি।'

'আমি শেষ লেখা লিখেছি দশ বছর আগে। আমার আসল গবেষণা শুরু হয়েছে সেই লেখার পর। এই গবেষণার বিষয় একটি তথ্যও আমি কোথাও প্রকাশ করিনি।'

আমি চুপ করে রইলাম। বোর্গেল্টও চুপ করে একদৃষ্টে তাঁর কোটরগত নীল চোখ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কোথায় যেন একটা দুম্‌দুম্ করে শব্দ হচ্ছে। বাড়িরই মধ্যে, কিন্তু কাছাকাছি নয়। পমার এত দেরী করছেন কেন? উনি কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছেন?'

বোর্গেল্ট বললেন, 'পমারের ফোনটা বোধহয় জরুরী।'

আমি চমকে উঠলাম। আমি তো কিছু বলিনি ওঁকে। উনি আমার মনের কথা বুঝলেন কী করে?'

এবার বোর্গেল্ট একটা প্রশ্ন করে বসলেন যেটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

'তোমার রোবোটটা আমাকে বিক্রী করবে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী কথা! কেন বলুন তো?'

বোর্গেল্ট গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার ওটা দরকার। কারণ শুধু একটাই। আমার রোবোট অঙ্ক কষতে জানে না, অথচ ওটার আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'আপনার রোবোট কি এখানে আছে?'

বোর্গেল্ট মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

থেকে থেকে দুম্ দুম্ দুম্ দুম্ শব্দ, আর পমারের ফিরতে দেরি—এই দুটো ব্যাপারেই কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোর্গেল্টের রোবোট এই বাড়িতেই আছে জেনে, আর তাকে হয়তো দেখতে পাব এই মনে করে, একটা উত্তেজনার শিহরন অনুভব করলাম।

বোর্গেল্ট বললেন, 'আমার রোবোটের মতো রোবোট আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। আমি—গট্‌ফ্রীড বোর্গেল্ট—যা সৃষ্টি করেছি তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু আমার রোবোটে একটি গুণের অভাব। সে তোমারটার মতো অত সহজে অঙ্ক কষতে পারে না। অথচ তার এই অভাব পূরণ করা দরকার। তোমার রোবোটটা পেলে সে কাজটা সম্ভব হবে।'

আমার ভারী বিরক্ত লাগল। এমন জিনিস কি কেউ কখনো পয়সার জন্য হাতছাড়া করে? আমার এত সাধের নিজের হাতের তৈরি প্রথম রোবোট—এটা আমি হাইডেলবার্গের আধপাগলা বৈজ্ঞানিককে বিক্রী করে দেবো? কিসের

জন্য ? আমার এমন কি টাকার দরকার পড়েছে ? আর ওই অঙ্কের ব্যাপারটাতেই তো আমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বোর্গেল্ট যেমন রোবোটই তৈরি করে থাকুন না কেন, উনি নিজে যাই বলুন, আমি জানি আমার চেয়ে আশ্চর্য কোনো যান্ত্রিক মানুষ তিনি কখনোই তৈরি করেননি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'মাপ করুন, বোর্গেল্ট। ও জিনিসটা আমি বেচতে পারব না। সত্যি বলতে কি, আপনি যখন এত বড় বৈজ্ঞানিক—তখন আরেকটু পরিশ্রম করলে আমি যে জিনিসটা করেছি সেটা আপনি করতে পারবেন না কেন ?'

'তার কারণ—' বোর্গেল্ট সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—'সবাই সব জিনিস পারে না। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। চেষ্টা করলে যে পারি তা আমিও জানি, কারণ আমার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু সময় কম। আমার টাকা পয়সাও যা ছিল সবই গেছে। আমার বাড়ি দেনার দায়ে বাঁধা পড়ে আছে। সব কিছু গেছে আমার ওই একটি রোবোট তৈরি করতে। কোটি কোটি মার্ক খরচ করেছি ওটার পিছনে। কিন্তু ওই একটি গুণের অভাবে ওটা নিখুঁৎ হয়নি। ওটা আমার চাই। ওটা পেলে আমি আমার রোবোট থেকেই আমার সমস্ত টাকা আবার ফিরে পাবো। লোকে বলবে, হ্যাঁ—বোর্গেল্ট যা করেছে তার বেশি কিছু করা মানুষের সাধ্য নয়। আমার সিন্দুকে কিছু সোনার গেল্ড রাখা আছে—চারশো বছরের পুরনো। সে গেল্ড আমি তোমাকে দেবো ; তুমি রোবোটটা বিক্রী করে দাও।'

সোনার লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে ! লোভ জিনিসটা যে কতকাল আগে জয় করেছি তা তো আর বোর্গেল্ট জানেন না ! এবার আমিও আমার গলার স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'আপনার কথাবার্তার সুর আমার ভালো লাগছে না, বোর্গেল্ট। সোনা কেন—হীরের খনি দিলেও আমার রোবুকে বিক্রী করব না।'

'তাহলে আর তুমি কোনো রাস্তা রাখলে না আমার জন্য।'

এই বলে বোর্গেল্ট প্রথমেই যে কাজটা করলেন সেটা হল সোজা গিয়ে সিঁড়ির দিকের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া। তারপর উল্‌টো দিকে যে দরজাটা ছিল—বোধহয় খাবার ঘরে যাবার—সেটাও তিনি বন্ধ করে দিলেন। কাঁচের জানালাগুলো এমনিতেই বন্ধ। খোলা রইল শুধু লাইব্রেরির দরজা। রোবু রয়েছে ওই লাইব্রেরি ঘরে, আর এই প্রথম আমার মনে হল যে, আমি হয়তো আর রোবুকে দেখতে পাব না। হয়তো সে আর কয়েকদিনের মধ্যেই অন্য মালিকের হয়ে কাজ করবে, তার হয়ে কঠিন কঠিন অঙ্কের সমাধান করবে। আর পমার ? আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, পমারের সঙ্গে বোর্গেল্ট ষড় করে আমার সর্বনাশ করতে চলেছেন।

দুম্ দুম্ দুম্ দুম—আবার সেই শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হয় মাটির নিচ থেকে আসছে সে শব্দটা। কিসের শব্দ? বোর্গেল্টের রোবোট?

আর ভাববার সময় নেই। বোর্গেল্ট আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবার সেই নিষ্পলক দৃষ্টি। এমন নিষ্ঠুর চাহনি আমি আর কারো চোখে দেখিনি।

এবার যখন বোর্গেল্ট কথা বললেন তখন দেখলাম তাঁর গলায় আর সে মোলায়েম ভাবটা নেই। তার বদলে একটা আশ্চর্য ইস্পাতসুলভ কাঠিন্য।

'প্রাণ সৃষ্টি করার চেয়ে প্রাণ ধ্বংস করা কত বেশি সহজ সেটা তুমি জান না, শঙ্কু?' গলার স্বর বন্ধ ঘরে গম্ গম্ করে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। 'একটি মাত্র ইলেকট্রিক শক্। কত ভোল্টের জান? তোমার রোবু জানতে পারে।...আর সে শক্ দেওয়ার পন্থাটিও ভারী সহজ...'

আমার গায়ে সেই শক্-রোধ করা কার্বোথীনের গেঞ্জিটা পরা আছে। শক-এ আমার কিচ্ছু হবে না। কিন্তু গায়ের জোরে এই জার্মানের সঙ্গে পারব কী করে?

আমি চিৎকার করে উঠলাম—'পমার! পমার!'

বোর্গেল্ট তাঁর ডান হাতটাকে সামনে বাড়িয়ে পাঁচটা আঙুল সামনের দিকে সোজা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর চোখে হিংস্র উল্লাসের দৃষ্টি।

আমি পেছোতে গিয়ে সোফায় বাধা পেলাম। পেছোনোর কোনো উপায় নেই।

বোর্গেল্টের হাতের আঙুল আমার কপাল থেকে ছ' ইঞ্চি দূরে। গিরিডির কথা—

ঠং ঠং ঠং ঠং—

একটা শব্দ শুনে আমার দৃষ্টি ডান দিকে ফিরল। বোর্গেল্টও যেন চমকে গিয়ে ঘাড় ফেরালেন। তারপর এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। ল্যাবরেটরির দরজা দিয়ে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হল আমারই হাতের তৈরি যান্ত্রিক রোবু। তার চোখ এখনো ট্যারা, তার মুখে এখনো আমারই দেওয়া হাসি।

চোখের নিমেষে একটা ইস্পাতের ঝড়ের মতো এগিয়ে এসে তার হাতদুটোকে বাড়িয়ে দিয়ে সে জাপটে ধরল বোর্গেল্টকে।

আর তারপর যেটা ঘটল সে রকম বিচিত্র বীভৎস জিনিস আমি আর কখনো দেখিনি।

রোবুর হাতের চাপে বোর্গেল্টের মাথাটা যেন প্যাঁচের মতো একেবারে পিঠের দিকে ঘুরে গেলো। তারপর রোবুরই টানে সেই মাথাটা শরীর থেকে একেবারে আলগা হয়ে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল, আর শরীরের ভিতর থেকে গলার ফাঁক

দিয়ে বেরিয়ে পড়ল এক রাশ বৈদ্যুতিক তার !

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে প্রায় অবশ অচেতন অবস্থায় ধপ্ করে সোফায় বসে পড়লাম। চোখ, মন, মস্তিষ্ক সব যেন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

প্রায় বেহুঁস অবস্থায় বুঝতে পারলাম সিঁড়ির দিকের দরজায় ধাক্কা পড়ছে।

'শঙ্কু, দরজা খোল—দরজা খোল !'

পমারের গলা।

হঠাৎ যেন আমার শক্তি আর জ্ঞান ফিরে পেলাম। সোফা ছেড়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখি তিনজন লোক—পমার, বোর্গেল্টের বুড়ো চাকর রুডি, আর—হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই—ইনি হলেন আসল বৈজ্ঞানিক গট্‌ফ্রীড বোর্গেল্ট।

এর পরের ঘটনা আর বেশি নেই। আমার মনের কয়েকটা প্রশ্নের মধ্যে একটা পমারের কথায় মুহূর্তেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

'সেদিন মাঝ রাত্তিরে আমি ল্যাবরেটরিতে ঢুকে তোমার রোবুর মাথার ভিতর আমারই আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। তার ফলে তোমার সঙ্গে ওর মনের একটা টেলিপ্যাথিক যোগ হয়ে গিয়েছিল। তোমার বিপদ বুঝে তাই আর ও চুপ করে থাকতে পারেনি।'

বোর্গেল্ট বললেন, 'এসব যান্ত্রিক মানুষ যন্ত্রের মতো হওয়াই ভালো। আমার রোবোটকে আমি তো বেশি আমার মতো করে ফেলেছিলাম বলেই ও আমাকে সহ্য করতে পারল না। ঠিক ওরই মতো আরেকজন কেউ থাকে সেটা ও চাইল না। ভেবেছিলাম আমার মৃত্যুর পর ও আমার কাজ চালিয়ে যাবে, কিন্তু ব্রেন জিনিসটার মতি গতি কী আর মানুষ স্থির করতে পারে ? যেই ওর বাঁধন খুলে দিলাম, অমনি ও আমাকে বন্দী করে ফেলল। আমাকে মারেনি, তার কারণ ও জানত যে বিগড়ে গেলে আমি ছাড়া ওর গতি নেই।'

পমার বললেন, 'রুডি সবই জানত—কিন্তু ভয়ে কিছু করতে পারছিল না। আজকে ফোনের ধাপ্পাটা রুডিরই কারসাজি। ও চেয়েছিল আমাকে বাইরে এনে বোর্গেল্টের বন্দী হওয়ার কথাটা বলে, আর তারপর দুজনে মিলে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। সেই ফাঁকে যে তোমার জীবন এইভাবে বিপন্ন হবে তা আমি ভাবতে পারিনি।'

একটা জিনিস হঠাৎ বুঝতে পেরে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। বললাম, 'রোবু সেদিন বোর্গেল্টের নাম কেন বলেনি বুঝতে পারছেন তো ? যে আসলে বোর্গেল্ট নয়, তার নাম বোর্গেল্ট ও কী করে বলবে ? আমরা বুঝিনি, কিন্তু ও ঠিক বুঝেছিল। যন্ত্রই যন্ত্রকে চেনে ভালো !'

মহাকাশের দূত

২২শে অক্টোবর

১৫ই অক্টোবর

প্রিয় শঙ্কু,

মনে হচ্ছে আমার বারো বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেতে চলেছি। খবরটা এখনো প্রচার করার সময় আসেনি, শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি।

কাল রাত একটা সাঁইত্রিশে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো একটা অংশ থেকে আমার সংকেতের উত্তর পেয়েছি। মৌলিক সংখ্যার সংকেতের উত্তর মৌলিক সংখ্যাতেই এসেছে; সুতরাং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ছায়াপথের ওই অংশে কোনো একটি গ্রহ বা উপগ্রহে এমন প্রাণী আছে যারা আমাদের গণিতের ভাষা বোঝে এবং যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

তবে আশ্চর্য এই যে, পৃথিবী থেকে এই বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের যে দূরত্ব তাতে বেতার তরঙ্গে সংকেত পৌঁছাতে লাগা উচিত দশ বছর। আমি প্রথম সংকেত পাঠাই আজ থেকে বারো বছর আগে; নিয়মমতো উত্তর আসতে লাগা উচিত ছিল আরো আট বছর। সেখানে মাত্র দু'বছর লাগল কেন? তাহলে কি এই প্রাণী বেতার-তরঙ্গের গতির চেয়েও অনেক বেশি দ্রুত গতিতে সংকেত পাঠানোর উপায় আবিষ্কার করেছে? এরা কি তাহলে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত?

যাই হোক, এই নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমাকে খবরটা দিলাম কারণ আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই মিশরের সেই প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ছে।

আশা করি ভালো আছ। নতুন খবর পেলেই তোমাকে জানাব। শুভেচ্ছা নিও।

ফ্রানসিস

ইংলন্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ফ্রানসিস ফীল্ডিং হল আমার বাইশ বছরের বন্ধু। অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কিনা, বহু চেষ্টায় তার কোনো ইঙ্গিত না পেয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যখন প্রায় হাল ছাড়তে বসেছে, ফীল্ডিং তখনো একা তার নিজের তৈরি ৯৫ ফুট ডায়ামিটারের অ্যান্টেনা তার নিজের বাড়ির পিছনের জমিতে বসিয়ে এক নাগাড়ে বছরের পর বছর ছায়াপথের একটি বিশেষ অংশে ২১ সেন্টিমিটারে বেতার তরঙ্গে গাণিতিক সংকেত পাঠিয়ে চলেছে। আজ তার সফলতার ইঙ্গিত পেয়ে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ফ্রানসিস যে প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

প্রাচীন মিশরের একটানা সাড়ে তিন হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে অনেক রাজার উল্লেখ আছে, এবং এদের সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা অনেক আশ্চর্য জিনিস পেয়েছেন। মৃত্যুর পরে রাজার আত্মা যাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য কফিনবদ্ধ শবদেহের সঙ্গে ধনরত্ন পুঁথিপত্র পোশাক-পরিচ্ছদ বাসনকোসন ইত্যাদি বহু সামগ্রী পুরে দেওয়া হত সমাধির মধ্যে। এই সমাধির প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেও, ভিতরের জিনিসপত্র অনেক সময়ই লুট হয়ে যেত। ১৯২২ সালে বালক-রাজা তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার হবার পরে যখন দেখা গেল যে প্রবেশদ্বারের সীলমোহরটি অক্ষত রয়েছে, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। আজ কায়রো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায় কী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল এই সমাধিতে।

গত মার্চ মাসে আমেরিকান ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন কায়রোতে বেড়াতে এসে খবর পান যে সেইদিনই সকালে স্থানীয় পুলিশ দুটি চোর ধরেছে, যাদের কাছে প্রাচীন মিশরের কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে। তারা স্বীকার করেছে যে জিনিসগুলো এসেছে একটি মাস্তাবা বা সমাধি থেকে। নাইলের পুব পারে বেনি হাসানে একটি চুনা পাথরের টিলার গায়ে লুকোনো ছিল এই মাস্তাবার প্রবেশপথ।

মর্গেনস্টার্ন তৎক্ষণাৎ মিশর সরকারের অনুমতি নিয়ে নিজের খরচে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল খাড়া করে এই মাস্তাবার ভিতরে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। ধনরত্ন বিশেষ অবশিষ্ট না থাকলেও, একটি জিনিস পাওয়া যায় যেটা খুবই অদ্ভুত এবং মূল্যবান। সেটা হল একটা প্যাপাইরাসের দলিল।

প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে নিয়ে তাকে পানের তবকের মতো করে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজের মতো ব্যবহার করত মিশরীয়রা। এতদিন যে-সব প্যাপাইরাস পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই রাজপ্রশস্তি, বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বা স্থানীয় উপকথা। কিন্তু এবারের এই প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় সেটা কতকগুলি দৈববাণী, যাকে ইংরেজিতে বলে ওর‍্যাক্‌ল্‌স। ফ্রান্সের দৈবজ্ঞ নস্ট্রাডামুসের ওর‍্যাক্‌ল্‌সের কথা অনেকেই জানে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পদ্যে লেখা এক হাজার ভবিষ্যদ্‌বাণীর অনেকগুলোই পরবর্তী কালে আশ্চর্যভাবে ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসী বিপ্লবে ষোড়শ লুই-র গিলোটিনে মুণ্ডপাত, নেপোলিয়ন-হিটলারের উত্থান-পতন, এমন-কি হিরোশিমা ধ্বংসের কথা পর্যন্ত নস্ট্রাডামুস বলে গিয়েছিলেন।

মিশরের এই প্যাপাইরাসেও এই ধরনের ভবিষ্যদ্‌বাণী রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বিজ্ঞান সংক্রান্ত। হয়তো যাঁর সমাধি, তিনিই করেছেন এইসব ভবিষ্যদ্‌বাণী। যিনিই করে থাকুন, তাঁর গণনায় স্তম্ভিত হতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাষ্পযান আকাশযান টেলিফোন টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা ; যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা আছে ; কম্পিউটারের বর্ণনা আছে, এক্স-রে ইনফ্রারেড রে আল্‌ট্রা ভায়োলেট-রে'র কথা বলা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে—এবং যেটা সবে বৈজ্ঞানিক মহল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে—সেটা হল এই যে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরো অসংখ্য সৌরজগত আছে যেখানে নাকি নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটিমাত্র গ্রহে। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের চেয়ে নাকি অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয়, বহুকাল থেকে নাকি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এবং পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্যাপাইরাসের লেখক নিজেই নাকি এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীর ক্ষমতার জন্য নাকি এই ভিন্‌গ্রহের মানুষই দায়ী।

এই আশ্চর্য প্যাপাইরাসটি মর্গেনস্টার্ন কায়রোর সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে বলে-কয়ে আদায় করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। গত মে মাসে লন্ডনে একটি বিশেষ বৈঠকে পৃথিবীর কয়েকজন বাছাইকরা বৈজ্ঞানিকের সামনে মর্গেনস্টার্ন এই প্যাপাইরাসটি উপস্থিত করেন, এবং সে সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করেন বিখ্যাত মিশর-বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডওয়ার্ড থর্নিক্রফ্‌ট। জীর্ণ প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়তো সেখানে

লেখকের নাম ছিল ; কিন্তু সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তবু যেটুকু জানা গেছে তাও খুবই চমকপ্রদ। সন-তারিখের যা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের সঙ্গে ভিন্‌গ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ঠিক কবে এবং কোথায় আবার সেই গ্রহের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল, এবং তাই নিয়ে মর্গেনস্টার্ন গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

আমার সঙ্গে আমার জার্মান বৈজ্ঞানিক বন্ধু উইল্‌হেল্‌ম ক্রোলও উপস্থিত ছিল এই সভায়। এমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক আমি কমই দেখেছি। বক্তৃতার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে সে যে কতবার 'হামবাগ, ফ্রড, ধাপ্পাবাজ' ইত্যাকার মন্তব্য করেছে তার হিসেব নেই। বক্তৃতার শেষে সে সরাসরি বলে বসল যে প্যাপাইরাসটা সে একবার হাতে নিয়ে দেখতে চায়। ক্রোলের যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলেই বোধহয় মর্গেনস্টার্ন অপমান হজম করে তার অনুরোধ রক্ষা করেন। আমিও দেখলাম প্যাপারাইসটাকে খুব মন দিয়ে, কিন্তু সেটা জাল বলে মনে হল না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ফীল্ডিং যে গ্রহ থেকে তার বেতার-সংকেতের উত্তব পেয়েছে, প্যাপাইরাসে কি সেই গ্রহের প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে ?

ব্যাপারটা আরো কিছু দূর না এগোলে বোঝার উপায় নেই।

২৬শে অক্টোবর

কাগজে আশ্চর্য খবর।

গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন আত্মহত্যা করেছে।

সে ইতিমধ্যে আবার কায়রোয় ফিরে গিয়েছিল ; কেন তা খবরে বলেনি। যেটা বলেছে সেটা হল এই—

কায়রোতে পৌঁছানোর দুদিন পরেই সে হোটেলে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে তার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কারণ ঘুম ভাঙলেই সে দেখতে পায় তার জানালায় একটা শকুনি বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজার নাকি প্রথমে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভালো হয়নি। মর্গেনস্টার্ন রেগে তার টুঁটি টিপে ধরেছিল। এদিকে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে এহেন অবিশ্বাস্য অভিযোগ সত্ত্বেও মর্গেনস্টার্নের বিরুদ্ধে কোনো স্টেপ নিতে পারেনি ম্যানেজার। জানালাটা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করাতে মর্গেনস্টার্ন বলে যে হাঁপানির জন্য সে বন্ধ ঘরে শুতে পারে না।

দু'দিন অভিযোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে কফি নিয়ে রুমবয় মর্গেনস্টার্নের ঘরের বেল বারবার টিপে কোনো জবাব না পেয়ে শেষে মাস্টার-কী

RECEPTION

দিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। ভদ্রলোকের স্যুটকেস রয়েছে, স্নানের ঘরে প্রসাধনের জিনিসপত্র রয়েছে, আর বেডসাইড টেবিলের উপর রয়েছে টিকিট লাগানো একটা ছোট্ট পার্সেল, আর একটা খোলা চিঠি। চিঠিতে লেখা শুধু একটি লাইন—'নেখবেৎ আমায় বাঁচতে দিল না।'

মিশরীয়রা সেই প্রাচীন যুগ থেকে নানারকম জন্তু জানোয়ার পাখি সরীসৃপকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করে এসেছে। শেয়াল কুকুর সিংহ প্যাঁচা সাপ বাজপাখি বেড়াল ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। শকুনি ছিল তাদের কাছে নেখবেৎ দেবী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় মর্গেনস্টার্ন ভোর রাত্তিরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় দ্বাররক্ষককে বেশ ভালো রকম বকশিশ দিয়ে। পুলিশ প্যাকেটটা খুলে দেখে তাতে কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা। সেটা থেকে বেরোয় মর্গেনস্টার্নের মহামূল্য রিস্টওয়াচ, যেটা সে পাঠাতে চেয়েছিল নিউ ইয়র্কে তার এক ভাইপোর কাছে।

এখানে বলা দরকার যে মিশরের প্রাচীন সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের নজির এটাই প্রথম নয়। তুতানখামেনের সমাধি খননের ব্যাপারে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই লর্ড কারনারভনকেও কিছুদিনের মধ্যেই ভারী অদ্ভুতভাবে মরতে হয়েছিল। কায়রোর এক হোটেলেই তার গালে এক মশা কামড়ায়। সেই কামড় থেকে সেপটিক ঘা, তার ফলে রক্তদৌর্বল্য থেকে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু।

কারনারভনের মৃত্যু যে সময়ে ঘটে, ঠিক সেই একই সময়ে ইংল্যান্ডে হ্যাম্পশায়ারে কারনারভনের পোষা কুকুরটি বিনা রোগে অকস্মাৎ মারা যায়। এই দুই মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে এই সমাধির কাজের সঙ্গে জড়িত আরো আটজন পর পর মারা যায় এবং কারুর মৃত্যুই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে ব্রায়ান ডেক্সটার এখন কোথায় আছে। ডেক্সটার একজন তরুণ ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ফোটোগ্রাফার। সে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে ছিল এই সমাধি খননের ব্যাপারে। কথা ছিল কায়রোর কাজ শেষ হলে ও ভারতবর্ষে চলে আসবে। বছর তিনেক আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে; আমার চিঠিতেই ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেক্সটারকে কালিবঙ্গনে গিয়ে হারাপ্পা সভ্যতার নিদর্শনের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দেয়। ও বলে রেখেছে এবার এলে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

২৮শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর চিঠিতে চাঞ্চল্যকর খবর।

ছায়াপথ থেকে সংকেত এখন রীতিমতো স্পষ্ট, এবং তা শুধু মৌলিক সংখ্যায়

নয়।

ফীল্ডিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহই হচ্ছে প্যাপাইরাসের গ্রহ। যেভাবে ঘন ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম-না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, অনেক দিনের পুরানো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

ফীল্ডিং-এর উত্তেজনা আমিও আমার শিরায় অনুভব করছি। গভীর আপসোস হচ্ছে প্যাপাইরাসের ওই হারানো শেষাংশের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহের প্রাণী আবার কবে পৃথিবীতে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তার ইঙ্গিত এই হারানো অংশে ছিল। কালই রাত্রে আমাব বাগানে ডেক-চেয়ারে বসে ছিলাম অন্ধকারে, নিউটন আমার কোলে, আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। এমনিতেই অক্টোবরে উল্কাপাত হয় অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি ; কাল দেড় ঘন্টায় সতেরটা উল্কা দেখেছি, আর প্রতিবারই প্যাপাইরাসের গ্রহের কথা মনে হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর কাছ থেকে জরুরী টেলিগ্রাম—'পত্রপাঠ চলে এসো কায়রো—তোমার জন্য হোটেল কার্নাকে ঘর বুক করা হয়ে গেছে।' আমি জানিয়ে দিয়েছি ৩রা নভেম্বর পৌঁছচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ কায়রো কেন ?

ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা নভেম্বর

আমি কালই পৌঁছেছি, যদিও প্লেন ছিল তিন ঘন্টা লেট। আমার মন বলছিল এয়ারপোর্টে এসে দেখব শুধু ফীল্ডিং নয়, ক্রোলও এসেছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে যে আরেকজন থাকবে, সেটা ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন ব্রায়ান ডেক্সটার। ব্রায়ানকে দেখেই বুঝলাম যে তার ওপর ভারতবর্ষের সূর্যের প্রভাব পড়েছে, কারণ তার এত তামাটে রঙ আগে কখনো দেখিনি।

ব্রায়ান এবারও কালিবঙ্গন গিয়েছিল, আর সেখানে থাকতেই মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সোজা লন্ডনে চলে আসে। আত্মহত্যার বিবরণ শুনে সে নাকি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যদিও আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল, অভিশাপ-টভিশাপে তার বিশ্বাস নেই। ওর ধারণা মর্গেনস্টার্নের সানস্ট্রোক জাতীয় কোনো ব্যারামের সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলে মাথাটা বিগড়ে যায়। ব্রায়ান নাকি বেনি হাসানের সমাধি খননের সময়ই লক্ষ করেছিল যে মর্গেনস্টার্ন

রোদের তাপ একদম সহ্য করতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কি সে সত্যিই উৎসাহী ছিল?'

ব্রায়ান বলল, 'অগাধ টাকা থাকলে অনেক লোক নানারকম শখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তাছাড়া খ্যাতির প্রতিও মর্গেনস্টার্নের একটা লোভ ছিল। শুধু বড়লোক হয়ে আর আজকাল আমেরিকায় বিশেষ কেউ নাম করতে পারে না। সবাই চায় একটা কোনো কীর্তি রেখে যেতে। হয়তো মর্গেনস্টার্ন চেয়েছিল এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ফিনান্স করে সে বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করবে।'

আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফীল্ডিং বাধা দিয়ে বলল বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে।

লাঞ্চের পর কার্নাক হোটেলের দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে বাকি কথা হল। সামনে নীল নদ বয়ে চলেছে, টুরিস্টদের জন্য নানারকম বোট সাজানো রয়েছে জেটিতে, রাস্তায় দেশ-বিদেশের বিচিত্র লোকের ভিড়।

প্রথমেই ব্রায়ান তার ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা বড় খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

'দেখ তো জিনিসটা তোমার চেনা কিনা।'

খুলে দেখি, আরে, এ যে সেই প্যাপাইরাসটার ফোটোগ্রাফ!

'জিনিসটা পাওয়া মাত্র এটার ছবি তুলে রেখেছিলাম,' বলল ব্রায়ান।—'তুমি যে প্যাপাইরাসটা লন্ডনে দেখেছিলে সেটার সঙ্গে কোনো তফাৎ দেখছ কি?'

দেখছি বৈ কি!—ছবিটা হাতে নিতেই তো তফাতটা লক্ষ করেছি। এটা সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।

ব্রায়ানকে জিজ্ঞেস করাতে সে ব্যাপারটা বলল।—

'আসলে প্যাপাইরাসটার অবস্থা এমনিতেও ছিল বেশ জীর্ণ। পাঁচ হাজার বছর পাকানো অবস্থায় সমাধিকক্ষের এক কোণে পড়ে ছিল। এটা আমিই প্রথম পাই। আর পেয়ে প্রথমেই সাবধানে পাক খুলে মাটিতে ফেলে চারকোণে চারটে পাথর চাপা দিয়ে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট ফোটো তুলে নিই। মর্গেনস্টার্ন এটা দেখেই বগলদাবা করে। আমি ওকে বলি সে যেন খুব সাবধানে জিনিসটা হ্যান্ডল করে। মুখে হ্যাঁ বললেও বেশ বুঝতে পারি ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।

'ও প্রথমেই যায় থর্নিক্রফ্‌টের কাছে। থর্নিক্রফ্‌ট লেখাটা পড়ে দেবার পর মর্গেনস্টার্ন সোজা চলে যায় কায়রো মিউজিয়মের কিউরেটর মিঃ এব্রাহিমের কাছে। আমার মনে আছে সেদিন খুব ঝড় ছিল; বালিতে শহর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস তখনই প্যাপাইরাসের শেষ অংশটা খোয়া গেছে।'

'ওয়েল, শঙ্কু?'

ক্রোল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রথম থেকেই লক্ষ করছি। ক্রোল হায়রোগ্লিফিক্সের ভাষা ভালো ভাবেই জানে, এবং বুঝতেই পারছি সে ইতিমধ্যে শেষ অংশটির মানে বার করে ফেলেছে, আর তাই তার এই উত্তেজনা।

আমি বললাম, 'এই অংশতে তো দেখছি দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে—মেনেফ্রু। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তাও দেওয়া রয়েছে।'

ফীল্ডিং বলল, 'সেই জন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনালাম। অমাবস্যা তো আর দু'দিন পরেই আর দৈবজ্ঞ যদি সনে ভুল না করে থাকেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'এতে যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে তার থেকেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার হিসেব করে দেখেছিলাম, ছিয়াত্তর বছর পর পব যদি হ্যালির ধূমকেতু আসে, তাহলে আজ থেকে ঠিক পাঁচ হাজার বছর আগে একবার সেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল—অর্থাৎ ৩০২২ বি সি-তে।'

ক্রোল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, 'আমারও হিসেব তোমার সঙ্গে মিলছে। প্যাপাইরাসে বলছে দৈবজ্ঞের যখন অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আকাশে ধূমকেতু ছিল। সেটা ৩০২২ হওয়া এই জন্যই সম্ভব কারণ তখন ঈজিপ্টে মেনিসের রাজত্বকাল, আর সেটাকেই বলা হয় ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু। সব মিলে যাচ্ছে, শঙ্কু!'

ডেক্সটার বলল, 'কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি? এক-আধ বছরও কি এদিক-ওদিক হতে পারে না?'

ফীল্ডিং তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, 'আমার ধারণা, এতে কোনো ভুল নেই, কারণ আমি এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে, আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এবং তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা হল এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।'

'তার মানে মরুভূমিতে?' ডেক্সটার প্রশ্ন করল।

'সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?'

'কিন্তু কী ভাষায় পেলে এই সংকেত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'টেলিগ্রাফের ভাষা,' বলল ফীল্ডিং, 'মর্স।'

'তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর?'

'সেটা আর আশ্চর্য কী, শঙ্কু। ভুলে যেও না তাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে

অনেক বেশি অগ্রসর।'

'তাহলে তো তারা ইংরেজিও জানতে পারে।'

'কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে আমি ইংরেজ কিনা সেটা হয়তো তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তারা মর্স কোড ব্যবহার করেছে।'

'তাহলে আমাদের গন্তব্যস্থল হল কোথায় ?' আমি প্রশ্ন করলাম।—'তারা তো আর এই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না !'

ফীল্ডিং হেসে বলল, 'না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমরা যাব বাওয়িতি—এখান থেকে দুশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তা আছে, তবে তাকে হাইওয়ে বলা চলে না। অবিশ্যি তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। ক্রোলের গাড়িটা তো তুমি দেখেছ।'

তা দেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে ক্রোলের গাড়িতেই এসেছি। বিচিত্র গাড়ি—যেন একটি ছোটখাটো চলন্ত হোটেল। সেই সঙ্গে মজবুতও বটে। 'অটোমোটেল' নামটা ক্রোলেরই দেওয়া।

'ডাঃ থর্নিক্রফটও আসছেন কাল সকালে,' বলল ফীল্ডিং, 'তিনিও হবেন আমাদের দলের একজন।'

এ খবরটা জানা ছিল না। তবে থর্নিক্রফ্‌টের আগ্রহের কারণটা স্পষ্ট। হাজার হোক তিনিই তো প্যাপাইরাসেব পাঠোদ্ধার করেছেন।

'তোমার অ্যানাইহিলিনটা সঙ্গে এনেছ তো ?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল।

আমি জানিয়ে দিলাম যে এ ধরনের অভিযানে সেটা সব সময়ই সঙ্গে থাকে। আমার তৈরি এই আশ্চর্য পিস্তলের কথা এরা সকলেই জানে। যত বড় এবং যত শক্তিশালী প্রাণীই হোক না কেন, তার দিকে তাগ করে এই পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই সে প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবসুদ্ধ বার দশেক চরম সংকটের সামনে পড়ে আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। প্যাপাইরাসের বিবরণ থেকে এই ভিন্‌গ্রহের প্রাণীকে হিংস্র বলে মনে হয় না, কিন্তু এবার যারা আসবে তাদের অভিপ্রায় যখন জানা নেই, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলে ক্ষতি কী ?

আমরা চারজনে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রইলাম যেন আমাদের এই আসন্ন অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আমরা উঠে যে-যার ঘরে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দেখি হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুম আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখানে বলে রাখি যে এই কার্নাক হোটেল থেকেই মর্গেনস্টার্ন উধাও হয়েছেন, এবং এই মিঃ নাহুমকেই মর্গেনস্টার্নের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

নাহুম জানালেন যে মর্গেনস্টার্নের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজেই ধরে নিতে হয় মর্গেনস্টার্ন শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলের জলে

ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

'আর কোনো শকুনি-টকুনি এসে কোনো ঘরের জানলায় বসছে না তো?' ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল ক্রোল।

জিভ কাটার অভ্যাস ঈজিপ্সিয়দের থাকলে অবশ্যই মিঃ নাহুম জিহ্বা দংশন করতেন। তার বদলে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'আপনাদের বলতে দ্বিধা নেই—আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ কোনোদিন শকুনি দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বেড়াল-কুকুর যে এক-আধটা দেখা যাবে না তার ভরসা দিতে পারছি না, হে হে।'

আমরা ঠিক করেছি কাল লাঞ্চের পরেই রওনা দেব। কী আছে কপালে জানি না, তবে আমি মনে করি ঈজিপ্টে আসার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। এখানে এসে দু'মিনিট চুপ করে থাকলেই চারপাশের আধুনিক শহরের সব চিহ্ন মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই প্রাচীন যুগের মিশর। ইমহোটেপ, আখেনাতন, খুফু, তুতানখামেনের দেশে এসে নামবে ছায়াপথের কোন্‌ এক অজ্ঞাত সৌরজগতের প্রাণী? ভাবতেও অবাক লাগে।

৫ই নভেম্বর

আজ মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুটো ঘটনা আমাদের সকলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখনো তার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

আমি ঠিক করেছিলাম আজ ভোর পাঁচটায় উঠে হোটেল থেকে বেরিয়ে নাইলের ধারে একটু ঘুরে আসব। গিরিডিতে রোজ ভোরে উশ্রীর ধারে বেড়ানোর অভ্যেসটা আমার বহুকালের।

ঘুম আমার আপনা থেকেই সাড়ে চারটেয় ভেঙে যায়। আজ কিন্তু ভাঙল স্বাভাবিক ভাবে নয়। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাই এই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

ব্যস্তভাবে উঠে জাপানে উপহার পাওয়া বেগুনী কিমোনোটা চাপিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডেক্সটার—তার চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, দম ফেলছে যেন ম্যারাথন দৌড়ে এল!

'কী ব্যাপার?'

'এ স্নেক—এ স্নেক ইন মাই রুম!'

কথাটা শেষ করে টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকে সে ধপ্‌ করে আমার খাটে বসে পড়ল।

আমি জানি ডেক্সটারের ঘর আমার তিনটে ঘর পরে। বাকি দু'জন রয়েছে আমাদের উপরের তলায়, তাই সে আমার কাছেই এসেছে।

ডেক্সটারকে আশ্বাস দিয়ে দৌড়ে প্যাসেজে গিয়ে হাজির হলাম।

মেঝেতে মিশরীয় নকশা-করা কার্পেট বিছানো সুদীর্ঘ প্যাসেজের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় একটি প্রাণীও নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘড়ি বলছে আড়াইটে। যা করার আমাকেই করতে হবে।

স্যুটকেস থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে ছুট দিলাম একশো ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের দিকে। ডেক্সটারের কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছিল তা বলব না, তবে জরুরী অবস্থার জন্য তৈরি থাকা দরকার।

ঘরের দরজা হাট হয়ে আছে, ভিতরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘর আর আমার ঘরের মধ্যে তফাত শুধু দেয়ালের ছবিতে।

বাঁয়ে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম সাপটাকে। গোখুরো। খাটের পায়া বেয়ে মেঝের কার্পেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্ধেক দেহ খাটের উপর। ভারতীয় গোখুরোর মতো মারাত্মক না হলেও, বিষধর তো বটেই। প্রাচীন যুগে এই সাপকেও মিশরীয়রা পুজো করত দেবী হিসেবে।

আমার পিস্তলের সাহায্যে নিঃশব্দে নাগদেবীকে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এলাম আমার ঘরে।

ডেক্সটার এখনো কাবু। মেনেফ্রুর রুষ্ট আত্মার অভিশাপে যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি, এই গোখুরো তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমার মন অন্য কথা বলছে, তাই তরুণ ত্রস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌কে আমার তৈরি নার্ভিগারের এক ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

তাতেও অবিশ্যি পুরোপুরি কাজ হল না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তার ঘরের আর কোথাও কোনো সাপ নেই সেটা দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

ম্যানেজারের সঙ্গে একটা তুলকালাম হয়ে যেত, কিন্তু সাপটা কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হত বলে সেটা আর হল না। যেহেতু আজই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটালাম না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল হোটেলের পিরামিড রুমে, ব্রেকফাস্টের সময়। থর্নিক্রফ্‌টের প্লেন এসে পৌঁছাবে ভোর ছ'টায়, সুতরাং তার হোটেলে পৌঁছে যাওয়া উচিত সাড়ে সাতটার মধ্যে। আটটায়, তখনো আমাদের প্রাতরাশ শেষ হয়নি, ম্যানেজার স্বয়ং এসে খবর দিলেন যে থর্নিক্রফ্‌ট এসে পৌঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটি আঘাত পেয়ে থর্নিক্রফ্‌ট সংজ্ঞা হারান। দু'জন সুইস্‌ টুরিস্ট পুলিশের সাহায্যে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটা রাহাজানি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনশো পাউন্ড

সমেত থর্নিক্রফ্‌টের ওয়লেটটি লোপ পেয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয়নি। ভয় ছিল থর্নিক্রফ্‌টকে হয়তো দল থেকে বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রস্তাবটা উনি কানেই নিলেন না। বললেন ওঁর যে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য উনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'জানি তোমাদের যুক্তিবাদী মন এসব মানতে চায় না, আমি কিন্তু অভিশাপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তোমাদের যদি আমার মতো পড়াশুনা থাকত, তাহলে তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হতে।'

৫ই নভেম্বর, বিকেল পৌনে তিনটে

আমরা আর আধ ঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা লিখে রাখছি।

মিনিট পনের আগে মিঃ নাহুম একটি আজব জিনিস এনে দেখালেন আমাকে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পকেট ডায়রি। বোঝাই যায় সেটা বেশ কিছুকাল জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। ভিতরে লেখা যা ছিল তা সব ধুয়ে-মুছে গেছে ; ছাপা অংশগুলোও আর পড়া যায় না। শুধু একটা কারণে জিনিসটার মালিকানা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না ; সেটা হল ডায়রির ভিতরে পাতার সঙ্গে জেম ক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ফোটোগ্রাফ। বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, যার ফোটো তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। লণ্ডনের সেই সভায় এনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ইনি মর্গেনস্টার্নের স্ত্রী মিরিয়াম। কায়রো থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে একটি জেলের বাড়ি থেকে পুলিশ এই ডায়রিটা উদ্ধার করেছে। জেলের একটি সাত বছরের ছেলে নদীর ধারে কাদার মধ্যে এটাকে পায়।

মর্গেনস্টার্ন যতই বেআক্কেলি করে থাকুক না কেন, এই ডায়রিটা দেখে তার জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ফীল্ডিং।

৫ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

বাওয়িতি যাবার পথে কায়রো থেকে তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে অল্ ফাইয়ুমের একটা সরাইখানায় বসে কফি আর আখরোট খাচ্ছি আমরা পাঁচজনে।

থর্নিক্রফ্‌ট অনেকটা সুস্থ। ডেক্সটার চুপ মেরে গেছে। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, এবং তাকে বলা হয়েছে সে যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও না

যায়। ক্রোল তার ক্যামেরার সরঞ্জাম সাফ করছে। তিনটে নতুন মডেলের লাইকা। তার একটায় বিরাট টেলিফোটো লেন্স। মহাকাশযানের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা সে ক্যামেরায় তুলে রাখবে। কয়েক বছর থেকে 'আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট' বা 'অনির্দিষ্ট উড়ন্ত বস্তু' নিয়ে যে পৃথিবীর বেশ কিছু লোক মাতামাতি করছে, তাদের সম্বন্ধে ক্রোলের অবজ্ঞার শেষ নেই। বলল, 'এই সব লোকের তোলা বহু ছবি পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে, কিন্তু ধাপ্পাটা ধরা পড়ে এতেই যে, সব ছবিতেই উড়ন্ত বস্তুটিকে দেখানো হয় একটি চাকতির মতো। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? অন্য গ্রহের মহাকাশযান হলেই কি তার চেহারা চাকতির মতো হবে ?'

ফীল্ডিং আমাদের দিকে চোখ টিপে প্রশ্ন করল, 'ধরো যদি আমাদের এই মহাকাশযানটিও চাকতির মতো দেখতে হয় ?'

'তাহলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত আমার এই তিনটে ক্যামেরাই নাইলের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেব,' বলল ক্রোল, 'চাকতি দেখার প্রত্যাশায় আসিনি এই বালি আর পাথরের দেশে।'

একটা চিন্তা কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা আর না বলে পারলাম না।

'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যে এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে বেশ কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে ? পাঁচ হাজার বছর আগে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু সে তো দেখেইছি। আরো পাঁচ হাজার পিছোলে দেখছি মানুষ প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে। আরো পাঁচ হাজার পিছিয়ে গেলে দেখছি মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়শী ইত্যাদি তৈরি করছে, আবার সেই সঙ্গে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকছে। ত্রিশ হাজার বছর আগে দেখছি মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে।...পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই পাঁচের হিসেবে যতটুকু ধরা পড়েছে সেটা আশ্চর্য নয় কি ?'

আমার কথায় সবাই সায় দিল।

ক্রোল বলল, 'হয়তো এদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আছে—একেবারে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু অবধি।'

'তা তো থাকতেই পারে,' বলল ফীল্ডিং।—'এরা যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কী চাই, তাহলে ওই দলিলের কথাটাই বলব। ওটা বাগাতে পারলে আর কোনো কিছুর দরকার আছে কি ?'

কফি আর আখরোটের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।
আজ অমাবস্যা।
বাকি পথটা আকাশের দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

৬ই নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছ'টা

বিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখায় আমার অবাধ গতি বলে আমি নিজেকে সব সময় বৈজ্ঞানিক বলেই বলে এসেছি, কোনো একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি করিনি। আমাদের দলের বাকি চারজনেই বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে, যদিও বয়স, অভিজ্ঞতা, কীর্তি বা খ্যাতিতে সকলে সমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, ফীল্ডিং, ক্রোল, থর্নিক্রফ্‌ট, ডেক্সটার, আমি—এদের কারুর মধ্যেই এখন আর কোনো তারতম্য ধরা পড়ছে না। মহাসাগরের তুলনায় টলির নালা আর গঙ্গার মধ্যে খুব একটা তফাত আছে কি ?

কালকের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পর পর গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

অল্ ফাইয়ুমের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে মিনিট দশেক চলার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যেটার বিষয় বলার আগে ক্রোলের আটোমোটেলের ভিতরটা কীরকম সেটা একটু বলা দরকার।

সামনে ড্রাইভারের পাশে দু'জনের বসার জায়গা। তার ঠিক পিছনেই একটা সরু প্যাসেজের একদিকে একটা বাথরুম ও একটা স্টোররুম, আর অন্যদিকে একটা কিচেন ও একটা প্যানট্রি। প্যাসেজ থেকে বেরিয়েই দু'দিকে দুটো করে বাঙ্ক—আপার ও লোয়ার। একজন অতিরিক্ত লোক থাকলে সে অনায়াসে দু'দিকের বাঙ্কের মাঝখানে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে পারে।

গাড়ি চালাচ্ছিল ক্রোল, আর আমি বসে ছিলাম তার পাশে। পিছনে, লোয়ার বাঙ্কের একটায় বসে ছিল থর্নিক্রফ্‌ট, আরেকটায় ফীল্ডিং আর ডেক্সটার।

আমরা যখন বেরিয়েছি, তখন পৌনে সাতটা। আকাশে তখনো আলো রয়েছে। পথের দু'ধারে বালি আর পাথর। জায়গাটা মোটামুটি সমতল হলেও মাঝে মাঝে চুনা পাথরের টিলা বা টিলার সমষ্টি চোখে পড়ছে, তার মধ্যে এক-একটা বেশ উঁচু।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মিঃ নাহুমের মুখটা মনে পড়ছে, আর মনটা খচ্ খচ্ করে উঠছে। ভদ্রলোকের অতি-অমায়িক আচরণটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে—যেন তিনি কোনো একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আকাশে সবে দু-একটা তারা দেখা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা

আর্তনাদ, আর তার পরমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের শব্দে স্টিয়ারিং-এ ক্রোলের হাতটা কেঁপে গিয়ে গাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারে একটা খানায় পড়ছিল।

দুটো শব্দই এসেছে আমাদের গাড়ির পিছন দিক থেকে।

জায়গা ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে পিছনে এসে দেখি থর্নিক্রফ্‌টের হাতে রিভলভার, ডেক্সটার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে, আর ফীল্ডিং যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হতভম্বের মতো বসে আছে, তার চশমার কাচে কোনো তরল পদার্থের ছিটে লেগে তাকে যেন সাময়িকভাবে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ডেক্সটারের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে মাথা-থেঁতলানো অবস্থায় পড়ে আছে আরেকটি গোখুরো। এর জাত কালকের গোখুরোর থেকে আলাদা। ইনিও মিশরের অধিবাসী। এঁর নাম স্পিটিং কোবরা। ইনি ছোবল না মেরে শিকারের চোখের দিকে তাগ করে বিষের থুতু দাগেন। এতে মৃত্যু না হলেও অন্ধত্ব অবধারিত। ফীল্ডিং বেঁচে গেছে তার চশমার জন্য। আর সাপবাবাজী মরেছেন থর্নিক্রফটের সঙ্গে হাতিযার ছিল বলে।

অটোমোটেল থামিয়ে ফীল্ডিং-এর পিছনে কিছুটা সময় দিতে হল। বিষের ছিটে চশমার কাচের তলা দিয়ে বাঁ চোখের কোলে লেগেছিল, সেখানে আমার মিরাকিউরল অয়েন্টমেন্ট লাগিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অভিশাপ-টভিশাপ নয় ; কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। আমরা যখন সরাইখানায় বসে কফি খাচ্ছিলাম সেই সময় গাড়ির জানালা দিয়ে সাপটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে এই কাজটা করেছে, সে নিশ্চয় কায়বো থেকেই এসেছে।

আবার যখন রওনা দিলাম তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাওয়িতি এখান থেকে আরো একশো কিলোমিটার। ম্যাপে তার পরে আর কোনো রাস্তার ইঙ্গিত নেই, তবে মোটামুটি সমতল জমি পেলে বালি পাথর অগ্রাহ্য করে এ গাড়ি এগিয়ে চলবে যদি সেটার প্রয়োজন হয়।

মিনিট দশেক চলার পর পথে একই সঙ্গে মানুষ ও জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল।

একটি বছর পনেরর ছেলে, হাতে লাঠি, এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে আমাদেরই দিকে, তার পিছনে এক পাল গাধা।

আমাদের গাড়িটা দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে হাত দুটোকে মাথার উপরে তুলে ঝাঁকাতে শুরু করল ছেলেটা।

'এস্‌টাপ্‌, এস্‌টাপ্‌, সাহিব ! এস্‌টাপ্‌ !'

ক্রোল বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল, কারণ পথ বন্ধ।

ব্যাপারটা কী ? হেডলাইটের আলোতে ছেলেটির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, গাধাগুলোও যেন কেমন অস্থির।

হাতছানি দিয়ে আমাদের বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করাতে আমি থামলাম। ছেলেটি দৌড়ে এল আমার দিকে।

'পিরমিট, সাহিব, পিরমিট !'

ছেলেটি যে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত সেটা তার ঘন ঘন নিশ্বাস আর চোখের চাহনি থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে পিরামিড কোথায় ?

জিজ্ঞেস করাতে সে সামনে বাঁয়ে দেখিয়ে দিল।

'ওগুলো তো পাহাড়—চুনো পাথরের পাহাড়। ওখানে পিরামিড কোথায় ?'

ছেলেটি তবুও বার বার ওই দিকেই দেখায়।

'তার মানে ওগুলোর পিছনে ?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল। ছেলেটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল—হ্যাঁ, ওই পাহাড়গুলোর পিছনে।

আমি ক্রোলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনও এসে জুটেছে। তাদের বললাম ব্যাপারটা। ফীল্ডিং বলল, 'আস্ক হিম হাউ ফার।'

জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি আবার বলল, টিলাগুলোর পিছনে। কত দূর সেটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি পৃথিবীর সব দেশেই অশিক্ষিত চাষাভুষোদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা থাকে না। অর্থাৎ পিরামিড এখান থেকে দু' কিলোমিটারও হতে পারে, আবার বিশ কিলোমিটারও হতে পারে।

'হিয়ার'—থর্নিক্রফ্‌ট পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিলেন—এবার তুমি প্রস্থান কর।

ছেলেটি মহা উল্লাসে পিরমিট পিরমিট করতে করতে গর্দভবাহিনী সমেত যে পথে যাচ্ছিল সে পথেই চলে গেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। আকাশে আলোকবিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে, তবে চলমান বিন্দু এখনো কোনো চোখে পড়েনি। আমি জানি পিছনের কামরার তিনজনই জানালায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, বেচারা ক্রোলই শুধু রাস্তা থেকে চোখ তুলতে পারছে না।

মিনিট তিনেক যাবার পরই বাঁয়ে চোখ পড়তে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভুল বলেনি।

টিলার আড়াল সরে যাওয়াতে সত্যিই একটা পিরামিড বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কত দূর বা কত বড় তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আকৃতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপগুলোর পাশে ওটা একটা পিরামিডই

বটে।

ঈজিপ্টের সব জায়গা দেখা না থাকলেও এটুকু জানি যে এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়, আর ভুঁইফোঁড়ের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠাটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ক্রোলই বলল যে রাস্তা খারাপ হোক না কেন, একবার কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে আসা দরকার। মহাকাশযান সত্যিই যদি আজ রাত্রেই এসে নামে, তাহলে তার সময় আছে এখনো প্রায় আট ঘন্টা। আর, আকাশযান এলে আকাশে তার আলো তো দেখা যাবেই, কাজেই কোনো চিন্তা নেই।

অতি সন্তর্পণে বালি আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে অটোমোটেল এগিয়ে চলল পিরামিডের দিকে।

শ'খানেক মিটার যাবার পরই বুঝতে পারলাম যে মিশরের বিখ্যাত সমাধিসৌধগুলির তুলনায় এ পিরামিড খুবই ছোট। এর উচ্চতা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়।

আরো খানিকটা কাছে যেতে বুঝলাম পিরামিডটা পাথরের তৈরি নয়, কোনো ধাতুর তৈরি। ক্রোলের গাড়ির হেডলাইট পড়ে পিরামিডের গা থেকে একটা তামাটে আলো প্রতিফলিত হয়ে বাঁয়ের টিলাগুলোর উপর পড়ছে।

ক্রোল গাড়ি থামিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমরা পাঁচজন নামলাম।

ফীল্ডিং এগোতে শুরু করেছে পিরামিডটার দিকে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ক্রোল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, 'কীপ ইওর হ্যান্ড অন ইওর গান। দিস্ মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।'

আমারও অবিশ্যি সেই কথাই মনে হয়েছে। গাড়ির ভিতর ছিলাম, তাই আকাশের সব অংশে চোখ রাখতে পারিনি। এই ফাঁকে কখন ল্যান্ড করে বসে আছে কে জানে।

সামনে ফীল্ডিং থেমে হাত তুলেছে। বুঝতে পারলাম কেন। শরীরের একটা উত্তাপ অনুভব করছি। সেটা স্পেসশিপটা থেকেই বেরোচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ কেন?

আলো নেই কেন?

নামবার কোনো শব্দ পাইনি কেন?

আর উত্তাপের কারণ কি এই যে এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?

কিন্তু না, তা তো নয়। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে। মাথার

উপরে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ দেখা দিয়েছে। মরু অঞ্চলের রাতের আকাশ আমার চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু।

'ওয়ান—থ্রী—সেভেন্—ইলেভ্নে—সেভ্নটীন—টোয়েন্টি থ্রী...'

ফীল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র—স্পেসশিপের ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।

'ফর্টি ওয়ান—ফর্টি সেভ্ন—ফিফ্‌টি নাইন...'

এটা মানুষেরই কণ্ঠস্বর, তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কারুর নয়। এর উৎস ওই পিরামিড।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা দেখছি, শুনছি, আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

এবার কথা শুরু হল।—

'পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।'

ফীল্ডিং তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ডেক্সটার ও ক্রোলের হাতে ক্যামেরা। কিন্তু এখনো ছবি তোলার মতো কিছু ঘটেনি।

আবার কথা। নিখুঁত ইংরিজি, নিখাদ উচ্চারণ, নিটোল কণ্ঠস্বর।

'তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনো প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর তখনই আমরা প্রথম তোমাদের গ্রহে আসি, এবং সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর এসেছি। প্রত্যেকবারই এসেছি একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণপোত এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছে। আমরা যখনই এখানে আসি, তখন পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোনো স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝো, সেই মানুষ আমাদের সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই, যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান—পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।

'এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনো হাত

নেই। অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি, শ্রেণীভেদ শেখাইনি, কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত, তাহলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তার সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে। সেটা কী সেটা বলার আগে আমরা জানতে চাই তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কিনা।'

'আছে।'—চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল।

'করো প্রশ্ন।'

'তোমরা মানুষেরই মতো দেখতে কিনা সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে,' বলল ক্রোল।—'তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তাহলে তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনো বাধা নেই নিশ্চয়ই।'

ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে রেডি।

উত্তর এল

'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'—ক্রোলের অবাক প্রশ্ন।

'কারণ এই মহাকাশযানে কোনো প্রাণী নেই।'

আমরা পাঁচজনেই স্তম্ভিত।

'প্রাণী নেই?' ফীল্ডিং প্রশ্ন করল, 'তার মানে কি—?'

'কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়। অবশিষ্ট আছে কয়েকটি গবেষণাগার ও কয়েকটি যন্ত্র—যার মধ্যে একটি হল এই মহাকাশযান। দুর্যোগের দশ বছর আগে, দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্ব-পরিকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। আমি নিজে যন্ত্র। এই আমাদের শেষ অভিযান।'

এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী জানতে পারি?'

'বলছি শোন', উত্তর এল পিরামিডের ভিতর থেকে।—'তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এক—ইচ্ছামতো আবহাওয়া বদলানো—যাতে খরা বা বন্যা কোনোটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই—শহরের দূষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়। তিন—বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে

সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায় ; এবং চার—সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর পাঁচশো বছর পরে শুকনো ডাঙায় আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না।...এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।'

'সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে?' প্রশ্ন করল ফীল্ডিং।

'হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজেশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাত বছর আগে আমাদের গ্রহে দুর্ঘটনার পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আশা করি এই ক' বছরে মিনিয়েচারাইজেশনে তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ?'

'হয়েছি বই-কি!' বলে উঠল ক্রোল। 'গণিতের জটিল অঙ্কের জন্য আমরা এখন যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, তা একটা মানুষের হাতের তেলোর চেয়ে বড় নয়।'

'বেশ। এবার লক্ষ কর, মহাকাশযানের গায়ে একটি দরজা খুলে যাচ্ছে।'

দেখলাম, জমি থেকে মিটারখানেক উপরে পিরামিডের দেয়ালে একটা ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারের আবির্ভাব হল।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বলে চলল—

'মহাকাশযানের ভিতরে একটি টেবিল ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। সেই টেবিলের উপর একটি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের নীচে যে বস্তুটি রয়েছে, তাতেই পাওয়া যাবে চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। তোমাদের মধ্যে থেকে যে-কোনো একজন প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে আচ্ছাদন তুলে বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে। তবে মনে রেখো, সমাধানগুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য ; এই বস্তুটি যদি কোনো স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তাহলে—'

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

কারণ মাঝখানেই চোখের পলকে আমাদের সকলের অজান্তে অন্ধকার থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে তীরবেগে মহাকাশযানে প্রবেশ করে, আবার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পর মুহূর্তে দেখলাম, ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গগনভেদী হাহাকারের মতো শব্দ করে পিরামিড মিশরের মাটি ছেড়ে শূন্যে উত্থিত হল।

আমরা পাঁচ হতভম্ব অভিযাত্রী অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম একটি
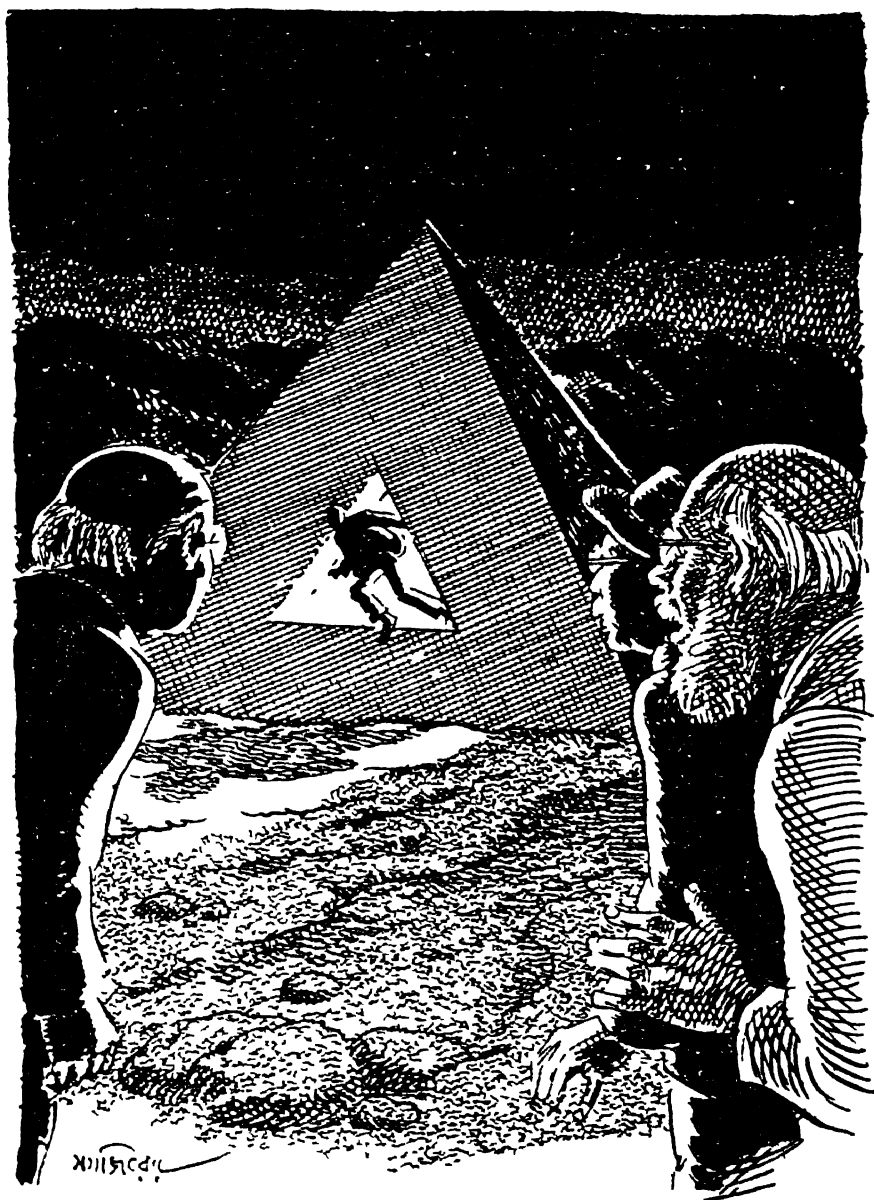
চতুষ্কোণ জ্যোতি ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রের ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দে আমরা সকলে আবার সংবিৎ ফিরে পেলাম।

গাড়িটা আমাদের না। শুনে মনে হচ্ছে জীপ, এবং সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে।

'কাম অ্যালং!'—চাবুকের মতো আদেশ এল ক্রোলের কাছ থেকে। সে তার অটোমোটেলের দিকে ছুটেছে।

এক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িও ছুটে চলল রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে।

কোন্ দিকে গেল জীপ? রাস্তায় গিয়ে তো উঠতেই হবে তাকে।

শেষ পর্যন্ত একটা কানফাটা সংঘর্ষের শব্দ, ও ক্রোলের গাড়ির তীব্র হেডলাইট জীপটার হদিস দিয়ে দিল। হেডলাইট না জ্বালিয়েই মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল সেটা, আর তার ফলেই জমিতে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সজোর সশব্দ সংঘাত।

আর তাড়া নেই, তাই সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রোল তার গাড়িটাকে জীপের দশ হাত দূরে দাঁড় করাল। আমরা পাঁচজনে নেমে এগিয়ে গেলাম।

জীপের দফা শেষ। সেটা উল্টে কাত হয়ে পড়ে আছে বালি ও পাথরেব মধ্যে, আর তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে দু'জন লোক। একজন স্থানীয়, সম্ভবত গাড়ির চালক, আর অন্যজন—থর্নিক্রফটের টর্চেব আলোয় চেনা গেল তাকে—হলেন মার্কিন ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন।

সাপ ও শকুনের রহস্য মিটে গেল। কার্নাক হোটেলের ম্যানেজার-সাহেবের সঙ্গে এনার ষড় ছিল নিঃসন্দেহে। স্বার্থান্বেষণের পথে যাতে কোনো বাধা না আসে, তাই আমাদের হটাবার জন্য এত তোড়জোড়। এটা বেশ বুঝতে পারছি যে মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু হয়েছে প্রাচীন মিশরের কোনো দেবতাব অভিশাপে নয়, তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে ছায়াপথের একটি বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রহ।

'লোকটার পকেটে ওটা কী?'

ক্রোল এগিয়ে গিয়ে মর্গেনস্টার্নেব কোটের পকেট থেকে একটি জীর্ণ কাগজের টুকরো টেনে বার করল। সেটা যে মেনেফ্রুর প্যাপাইরাসের ছেঁড়া অংশ সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি।

মর্গেনস্টার্নের মুঠো করা ডান হাতটা বালির উপর পড়ে আছে, আর সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা নীল আভা বেরিয়ে পাশের বালির উপর পড়েছে।

ফীল্ডিং এগিয়ে গিয়ে মুঠোটা খুলল।

এই কি সেই বস্তু, যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান, আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস ?

ফীল্ডিং তার ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে ধরে আছে একটি দেদীপ্যমান প্রস্তরখণ্ড, যার আয়তন একটি মটরদানার অর্ধেক ।

২৭শে নভেম্বর, গিরিডি

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা যদি কেউ বের করতে পারে তো আমিই পারব, এই বিশ্বাসে আমার চার বন্ধু সেটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। আমি গত দু' সপ্তাহ ধরে আমার গবেষণাগারে অজস্র পরীক্ষা করেও এটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারিনি। আমি বুঝেছি আরো সময় লাগবে, কারণ আমাদের বিজ্ঞান এখনো এতদূর অগ্রসর হয়নি।

পাথরটা আপাতত আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি আংটির উপর বসানো রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যখন বিছানায় শুয়ে এটার দিকে দেখি, তখন এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।

ডাঃ দানিয়েলির আবিষ্কার

১৫ এপ্রিল, রোম

কাল এক আশ্চর্য ঘটনা। এখানে আমি এসেছি একটা বিজ্ঞানী-সম্মেলনে। কাল স্থানীয় বায়োকেমিস্ট ডাঃ দানিয়েলির বক্তৃতা ছিল। তিনি তাঁর ভাষণে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন। অবিশ্যি আমি যে অন্যদের মতো অতটা অবাক হয়েছি তা নয়, কিন্তু তার কারণটা পরে বলছি।

দানিয়েলির আশ্চর্য ভাষণের কথা বলার আগে একটা কথা বলা দরকার। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের উপন্যাস 'ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড'-এর কথা অনেকেই জানে। যারা জানে না তাদের জন্য বলছি যে ডাঃ জেকিল বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা ভালো দিক আর একটা মন্দ দিক থাকে। এই মন্দ প্রবৃত্তিগুলো মানুষ দমন করে রাখে কারণ তাকে সমাজে বাস করতে হলে সমাজের কতকগুলো নিয়ম মানতে হয়। কিন্তু ডাঃ জেকিল দাবি করেছিলেন তিনি এমন ওষুধ বার করতে পারেন যে-ওষুধ কেউ খেলে তার ভিতরে হীন প্রবৃত্তিগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে একটা নৃশংস জীবে পরিণত করবে। ডাঃ জেকিলের এ কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, তাই তিনি তাঁর গবেষণাগারে ঠিক এইরকমই একটা ওষুধ তৈরি করে নিজের উপর প্রয়োগ করে এক ভয়ঙ্কর মানুষ মিঃ হাইডে পরিণত হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি খুনও করেছিলেন, যদিও ডাঃ জেকিল এমনিতে ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি।

স্টিভেনসনের এই উপন্যাস যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এমন ওষুধ বাস্তবে আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। দানিয়েলি দাবি করছেন তিনি করতে চলেছেন, এবং দানিয়েলির আগেই গিরিডিতে আমার ল্যাবরেটরিতে

আমি করেছি। আমার ওষুধ আমি নিজে খাইনি, কিন্তু আমার পোষা বেড়াল নিউটনকে এক ফোঁটা খাইয়েছিলাম। খাওয়ানোর তিন মিনিটের মধ্যে সে আমাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে আক্রমণ করে আমার ডান হাতে আঁচড় দিয়ে আমাকে জখম করে। আমি আমার ওষুধের নাম দিয়েছিলাম 'এক্স'। একই সঙ্গে 'অ্যান্টি-এক্স' নামে আরেকটা ওষুধ বার করি যেটা 'এক্স'-এর অ্যান্টিডোট ; অর্থাৎ যেটা খেলে মানুষ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। নিউটনকেও 'অ্যান্টি-এক্স' খাইয়ে শান্ত করতে হয়েছিল।

দানিয়েলির বক্তৃতার সময় তাঁর অবস্থা জেকিলের মতোই হয়েছিল। অন্তত তিনজন বৈজ্ঞানিক—ইংল্যান্ডের ডাঃ স্টেবিং, জার্মানির প্রোফেসর ক্রুগার ও স্পেনের ডাঃ গোমেজ—দানিয়েলির কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে মিটিং-এ একটা তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দানিয়েলির পক্ষে তাঁব মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতে দানিয়েলির সঙ্গে আমার এখানে এসেই আলাপ হয়েছে। অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র স্বভাবের লোক বলে মনে হয়েছিল। অনেকদিন পরে একটা বিজ্ঞানী-সম্মেলনে আজকের মতো একটা গোলমাল হতে দেখলাম। আমি অবিশ্যি আমার নিজের ওষুধের কথা দানিয়েলি বা অন্য কাউকে বলিনি। দানিয়েলি বললেন তাঁর ওষুধ দু-একদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। তারপর তিনি সেটা নিজের উপর পরীক্ষা করে দেখবেন, যেমন স্টিভেনসনের গল্পে ডাঃ জেকিল করেছিলেন। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগল না, কারণ এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয় তা হলে ওষুধ-খাওয়া দানিয়েলি কীরকম

ব্যবহার করবেন তা বলা কঠিন। নিউটনের যা হিংস্র ভাব দেখেছি তাতে আমার রীতিমতো ভয় ঢুকে গেছে।

আজ আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেলিগেটদের লাঞ্চ আছে। আমরা আছি হোটেল সুপার্বাতে। এইখানেই একতলায় ডাইনিং রুমে লাঞ্চ। সম্মেলন চলবে আর দু দিন। তারপর আরো দিন দু-তিন রোমে থেকে দেশে ফিরব।

১৭ এপ্রিল

আজ সম্মেলনের পর দানিয়েলির সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম তাঁর বক্তৃতায় তিনি যা বলেছেন তা আমি বিশ্বাস করি। আমারও একই মত। তাতে ভদ্রলোক যারপরনাই খুশি হলেন।

আমি বললাম, 'তুমি যে ওষুধ বানাচ্ছ, সেই সঙ্গে তার প্রভাব দূর করার জন্যও ওষুধ তৈরি করছ আশা করি।'
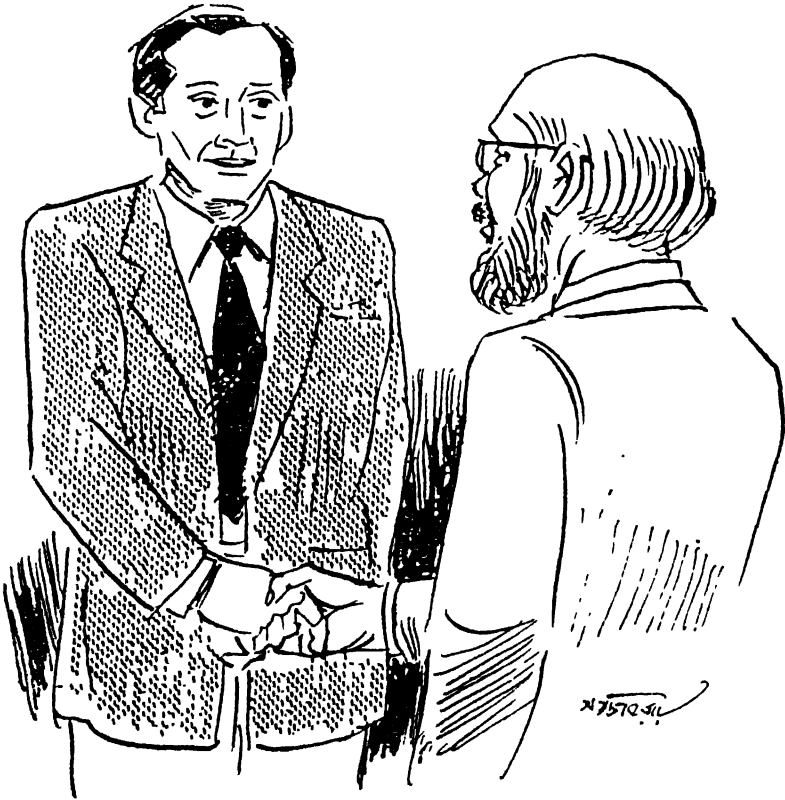
'তা তো বটেই,' বললেন দানিয়েলি। 'এ ব্যাপারে আমি স্টিভেনসনের উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। এতদিন কেন যে কেউ এরকম একটা ওষুধ তৈরি করতে চেষ্টা করেনি তা জানি না।'

আমি বললাম, 'তার কারণ স্টিভেনসনের গল্পতেই পাওয়া যাবে। মিঃ হাইডের মতো এমন মানুষ যদি সেই ওষুধ তৈরি করতে পারে, তা হলে সে ওষুধ খাওয়ার কী বিপদ সে তো বুঝতেই পারছ।'

'কিন্তু তা বলে তো বিজ্ঞানকে থেমে থাকতে দেওয়া যায় না,' বললেন দানিয়েলি। 'পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই হবে। এবং আমার পরীক্ষা যদি সফল হয় তাহলে তার পরিণাম যাই হোক না কেন, এটা মানতেই হবে যে সেটা হবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটা নিদর্শন।'

'তবে তুমি যদি একটা হাইডে পরিণত হও তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমার সেটা মোটেই ভালো লাগবে না।'

'দেখা যাক কী হয়।'

'তুমি কী কী উপাদান দিয়ে ওষুধটা তৈরি করেছ সেটা জানতে পারি কি?'

ভদ্রলোক যা উত্তর দিলেন তা শুনে আমি একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

আমিও ঠিক একই উপাদান দিয়ে আমার ওষুধটা তৈরি করেছি।

সেটা অবিশ্যি আর দানিয়েলিকে বললাম না, এবং দানিয়েলিও তাঁর উপাদানের পরিমাণ আমাকে বললেন না।

১৮ এপ্রিল

আজ কাগজে সাংঘাতিক খবর।

ডাঃ স্টেবিংকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের হোটেলটা টাইবার নদীর উপর। স্টেবিং নাকি রোজ ডিনারের আগে টাইবারের ধারে হাঁটতে যেতেন। আজও গিয়েছিলেন, কিন্তু আর ফেরেননি। পুলিশ সন্দেহ করছে তিনি কোনো গুণ্ডার দ্বারা নিহত হয়েছেন, এবং গুণ্ডারা তাঁর মৃতদেহ টাইবারের জলে ফেলে দিয়েছে।

আমার কিন্তু ধারণা অন্যরকম। স্টেবিং দানিয়েলির বক্তৃতার পর তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং দানিয়েলিকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেন। দানিয়েলিও বলেছিলেন তাঁর ওষুধ দু দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।

আমি টেলিফোন ডিরেক্টরি খুলে দেখলাম যে দানিয়েলির বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে ২৭ নং ভিয়া সাক্রামেন্টো। আমি আর দেরি না করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা তাঁর বাড়িতে চলে গেলাম।

বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হল না, কিন্তু গিয়ে শুনি দানিয়েলি বাড়ি নেই। দানিয়েলির চাকর দরজা খুলেছিল ; আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'সিনিয়র আলবের্তির সঙ্গে কথা বলবেন ?'

'তিনি কে ?'

'তিনি প্রোফেসর দানিয়েলির সহকর্মী।'

আমি বললাম, 'বেশ, তাঁকেই ডাকো।'

চাকর চলে গেল। দু মিনিটের মধ্যেই একটি বছর ত্রিশের যুবক বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। কালো চুল, কালো চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

'তুমি কি দানিয়েলির সহকর্মী ?'

'সহকর্মীর চেয়ে সহকারী বললেই ঠিক হবে। আমি মাত্র তিন বছর দানিয়েলির সঙ্গে আছি। আপনি কি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর শঙ্কু ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

যুবকের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, 'আমি আপনার বিষয় অনেক শুনেছি। আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক পড়েছি। আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি।'

আমি বললাম, 'সে কথা শুনে আমারও খুব ভালো লাগছে। কিন্তু আমি ডাঃ দানিয়েলির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। তিনি কখন আসবেন ?'

'যে কোনো মুহূর্তে,' বলল আলবের্তি। 'তিনি বাজারে গেছেন কিছু কেনা-কাটা করতে। আপনি একটু বসে যান।'

আমি অপেক্ষা করাই স্থির করলাম। সময় কাটানোর জন্য আলবের্তিকে প্রশ্ন করলাম, 'প্রোফেসরের ওষুধ কি তৈরি হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, সে তো পরশুই হয়ে গেছে।' বলল আলবের্তি, 'তারপর থেকেই প্রোফেসর কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। সামান্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি তাঁর মধ্যে। সেটা যে কী সেটা স্পষ্টভাবে বলতে পারব না।'

'তিনি কি ওষুধটা খেয়েছেন ?'

'তা তো বলতে পারছি না। ওষুধটা উনি সম্পূর্ণ নিজে তৈরি করেছেন। আমি ওঁকে কোনোরকম ভাবে সাহায্য করিনি। ওষুধের ফরমুলাও আমি জানি না। তবে ওষুধটা যে হয়ে গেছে সেটা উনি আমাকে বলেছেন। অবিশ্যি না বললেও আমি বুঝতাম, কারণ গত এক মাস উনি সারাদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন দরজা বন্ধ করে। দু দিন থেকে ওঁকে আর কাজ করতে দেখছি না।'

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। চাকর এসে দরজা খুলে দিতে দানিয়েলি হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঢুকলেন।

'গুড মর্নিং প্রোফেসর শঙ্কু। দিস ইজ এ ভেরি প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ !'

আমিও ভদ্রলোককে প্রত্যাভিবাদন জানালাম। বললাম, 'খবর না দিয়ে এসে পড়েছি বলে আশা করি কিছু মনে করছ না।'

'মোটেই না, মোটেই না। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তারপর কী খবর বল।'

'খবর তো তোমার—তোমার ওষুধের খবর। ওটা তৈরি হল ?'

'হয়েছে বৈকি। পরশুই রাত্রে হয়েছে তৈরি।'

'পরীক্ষা করে দেখেছ ?'

'আমি চায়ের চামচের এক চামচ খেয়ে দেখেছি।'

'তারপর ?'

'তারপর কী হল জানি না।'

'তার মানে ?'

'মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। সকালে উঠে দেখি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। শরীরে কোনো গ্লানি নেই। রাত্রে কী ঘটেছে কিচ্ছু জানি না।'

'আজ কাগজে স্টেবিং-এর মৃত্যু সংবাদ পড়েছ ?'

'পড়েছি বৈকি—আর পড়ে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। যদিও সে আমার বক্তৃতার প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী ছিল।'

'স্টেবিং-এর মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছ ?'

'এতো বোঝাই যাচ্ছে স্থানীয় গুণ্ডাদের কীর্তি। তাকে মেরে শুনলাম টাইবারের জলে লাশ ফেলে দিয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যেই অবিশ্যি সে লাশ আবার ভেসে উঠবে।'

আমি আর দানিয়েলির সময় নষ্ট করলাম না। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। দানিয়েলির ওষুধ খাওয়ার কথাটা এখনও মাথায় ঘুরছে। তিনি যে কিছুই টের পেলেন না, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। আমার ওষুধেও কি এই একই প্রতিক্রিয়া হবে ? নিউটন যে আমাকে আক্রমণ করে সেটা কি সে অজান্তে করে ?

১৯ এপ্রিল

কাল রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় জার্মানির প্রোফেসর ক্রুগার আর স্পেনের ডাঃ গোমেজ খুন হয়েছেন তাঁদের ঘরে। সেইসঙ্গে টাইবার নদীতে স্টেবিং-এর লাশও পাওয়া গেছে। লাশের গলায় আঙুলের গভীর দাগ। অর্থাৎ তাঁকে গলা টিপে মারা হয়েছিল।

এবার আর আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তিনটে খুনই দানিয়েলির কীর্তি। পুলিশ অবশ্য তদন্ত করছে। ক্রুগার বা গোমেজের কোনো টাকা-পয়সাও চুরি যায়নি। কাজেই এটা চোর-ডাকাতের কীর্তি নয়।

পুলিশ আমাদের হোটেলের রিসেপশনিস্টকে জেরা করে জানতে পারে যে কাল রাত্রে এগারোটার সময় একটি কুৎসিত লোক নাকি হোটেলে এসে ক্রুগার আর গোমেজের ঘরের নম্বর জানতে চায়। তারপর সে দুজনকেই টেলিফোন করে।

'কী কথা বলেছিল সেটা শুনেছিলে ?' পুলিশ জিজ্ঞেস করে।

'আজ্ঞে না, তা শুনিনি।'

ক্রুগার আর গোমেজ দুজনকেই স্টেবিং-এর মতোই গলা টিপে মারা হয়েছে। আততায়ী যে অত্যন্ত শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ দানিয়েলিকে

দেখলে তাঁর মধ্যে শারীরিক শক্তির কোনো লক্ষণ পাওয়া যায় না। ওঁর বয়সও হয়েছে অন্তত ষাট।

আমি এবার দানিয়েলির বাড়িতে একটা ফোন করলাম। তিনি নিজেই ফোন ধরলেন। শান্ত কণ্ঠস্বর। কোনো উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। আমি ফোন করছি শুনে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে অভিবাদন জানালেন। আমি বললাম, 'আমি একবার তোমার বাড়িতে আসতে চাই।'

'এক্ষুনি চলে এস,' বললেন দানিয়েলি। 'আমি সারা সকাল বাড়িতে আছি।'

দশ মিনিটে দানিয়েলির বাড়িতে হাজির হলাম। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমায় সোফায় বসতে বলে বললেন, 'বল কী খবর।'

আমি বসে বললাম, 'তুমি কি কাল রাত্রে আবার ওষুধটা খেয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ, এবং সেই একই প্রতিক্রিয়া,' বললেন দানিয়েলি। 'ওষুধ খাবার পরে কী করেছি, কোথায় ছিলাম, কখন ফিরলাম—কিছুই মনে নেই।'

'এক চামচই খেয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।

'তুমি বোধহয় জান যে কাল ক্রুগার আর গোমেজ খুন হয়েছে, এবং স্টেবিং-এর লাশ পাওয়া গেছে।'

'জানি।'

'এরা তিনজনেই কিন্তু তোমার বক্তৃতায় ঘোর আপত্তি তুলেছিল।'

'তাও জানি।

'আমার একটা কথা শুনবে ?'

'কী ?'

'ওষুধটা আর খেও না। তুমি যখন নিজে কিছুই অনুভব করছ না তখন খেয়ে লাভ কী ? বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তো তুমি কোনো জ্ঞান আহরণ করছ না। সত্যি বলতে কি, তুমি তো কিছুই জানতে পারছ না।'

'তা পারছি না, কিন্তু একটা যে কিছু হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিছু মনে কোরো না, কিন্তু আমার ধারণা এই তিনটে খুনের জন্যই তুমি দায়ী ; অর্থাৎ তোমার ওষুধই দায়ী।'

'ননসেন্স !'

'ননসেন্স নয়। কেন সেটা আমি বলছি। আমি নিজে একই ওষুধ আবিষ্কার করেছি ভারতবর্ষে আমার ল্যাবরেটরিতে। আমি সেটা আমার পোষা বেড়ালের উপর পরীক্ষা করেছিলাম। ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা ওষুধ তার মুখে ঢেলে দিয়েছিলাম। তিন মিনিটের মধ্যে সে আমাকে আক্রমণ করে জখম করে। তার

আধ ঘণ্টার মধ্যেই অবিশ্যি সে আমারই তৈরি একটা অ্যান্টিডোট খেয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।'

দানিয়েলি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি লক্ষ করলাম তাঁর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। তারপর চাপা স্বরে তিনি বললেন, 'তুমি আমাব আগে এই ওষুধ আবিষ্কার করেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'আই ডোন্ট বিলিভ ইট।'

দানিয়েলির কণ্ঠস্বরে এই প্রথম একটা তিক্ততার আভাস পেলাম। তিনি আবার বললেন, 'আই ডোন্ট বিলিভ ইট।'

আমি বললাম, 'তুমি বিশ্বাস না করতে পার। কথাটা কিন্তু সত্যি। তুমি তোমাব ওষুধের উপাদানের কথা আমাকে বলেছ, কিন্তু পরিমাণ বলনি। আমিও এই একই উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করেছি, এবং আমার পরিমাণ মুখস্থ আছে। সেটা আমি তোমাকে বলছি। দেখ তোমার সঙ্গে মেলে কি না।'

আমার পুরো ফরমুলাটা কণ্ঠস্থ ছিল। আমি সেটা দানিয়েলিকে বললাম। তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপর তিনি ফিস্‌ফিস কবে বললেন, 'আই কান্ট বিলিভ ইট ; পরিমাণ দুজনের হুবহু এক।'

'তাহলেই বুঝতে পারছ।'

'তুমি নিজে খাওনি তোমার ওষুধ ?'

'না, এবং কোনোদিনও খাব না।'

'কিন্তু আমাকে খেতেই হবে। যত দিন না জানতে পারছি ওষুধ খেয়ে আমার কী হচ্ছে, আমি কী করছি, তত দিন আমাকে এ ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। দরকার হলে পরিমাণ বাড়াতে হবে ; এক চামচের জায়গায় দু চামচ।'

'তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছ না ওষুধ খেয়ে তুমি কী কর ?'

'প্রথম দিন কিছুই বুঝিনি। কালকের সামান্য স্মৃতি আছে। আমি জানি আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার গাড়িতে উঠেছিলাম।'

'তোমার কি ড্রাইভার আছে ?'

'না। আমি নিজেই গাড়ি চালাই।'

'তারপর কী হয় কিছুই মনে নেই ?'

'না। কিন্তু এই ভাবেই আমি আস্তে আস্তে জানতে পারব আমি কী করছি, আমার কী পরিবর্তন হচ্ছে।'

'এর ফল ভালো হবে না, দানিয়েলি।'

'তা না হলেও, বিজ্ঞানের খাতিরে এটা আমাকে করতেই হবে। তুমি আর আমি এক লোক নই। আমার কৌতূহল তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'

আমি বুঝলাম দানিয়েলিকে অনুরোধ করে কোনো ফল হবে না। ওঁর মাথায় ভূত চেপেছে।

আমি বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমায় একটা কিছু ভেবে বার করতে হবে। এ দু দিনে দানিয়েলির তিনটি শত্রু খুন হয়েছে। আরো কত শত্রু আছে তাঁর কে জানে?

২০ এপ্রিল

আজ চতুর্থ খুনের খবর কাগজে বেরিয়েছে। রোমের বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ডাঃ বার্নিনিকে কেউ কাল রাত্রে তাঁর বাড়িতে গিয়ে গলা টিপে মেরে এসেছে। পুলিশ গলায় আঙুলের ছাপ পেয়েছে, সেই অনুসারে তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

আমি তো অবাক। এ আবার কে খুন হল? কেন?

আমি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দানিয়েলির বাড়িতে আলবের্তিকে ফোন করলাম। আলবের্তি ফোন ধরার পর বললাম, 'তুমি একবার আমার হোটেলে আসতে পারবে? আমার ঘরের নম্বর হচ্ছে ৭১৩। বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

পনের মিনিটের মধ্যে আলবের্তি আমার ঘরে চলে এল।

আমি তাকে প্রথমেই বললাম, 'আমার একটা বিশ্রী সন্দেহ হচ্ছে যে এ ক'দিন যে খুনগুলো হয়েছে সেগুলো দানিয়েলির কীর্তি। সে ওষুধ খেয়ে এই কাণ্ডটি করছে। তোমার কী মনে হয়?'

আলবের্তি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমারও কাল থেকে সেই ধারণা হয়েছে, কারণ যাঁরা খুন হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সময় দানিয়েলির বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন, তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি বা তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছেন।'

'কিন্তু কাল রাত্রে যিনি খুন হলেন—এই বার্নিনি ভদ্রলোকটি কে?'

'ইনি এখানকার একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী। দানিয়েলির একটা প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি তিন বছর আগে একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেটা একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল।'

'সেই রাগ দানিয়েলি এখনো ভোলেনি?'

'তাই তো দেখছি। এবং দানিয়েলিকে কোনো না কোনো সময় আক্রমণ করেছেন এরকম বিজ্ঞানী রোমে অনেক আছে। প্রোফেসর তুচ্চি, ডাঃ আমাটি, ডাঃ মাৎসিনি—আর কত নাম করব? আমার এখন ধারণা হয়েছে এঁদের প্রত্যেকের উপরই দানিয়েলি রাগ পুষে রেখেছেন। এতদিন কিছু করেননি, কারণ দানিয়েলি এমনিতে খুবই ভদ্র এবং অমায়িক ব্যক্তি। কিন্তু এই ওষুধই হয়েছে ওঁর কাল। আর আরেকটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই।'

'কী ?'

'আপনি বোধহয় প্রোফেসরের আগে এই ওষুধ তৈরি করেছেন, তাই না ?'

'সেটা তুমি কী করে জানলে !'

'আমি কাল প্রোফেসরের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম। উনিই বললেন, এবং যে ভাবে বললেন তাতে মনে হয় না যে উনি আপনার উপর খুব প্রসন্ন।'

'তাই কি ?'

'তাই—এবং আমি বলি আপনি সাবধানতা অবলম্বন করুন। রাত্রে আপনার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেবেন না।'

'কিন্তু শুধু তা হলেই তো হবে না। এখানে হত্যাকাণ্ড যে চলতেই থাকবে। এরপর নিরীহ লোককেও দানিয়েলি খুন করতে আরম্ভ করবে সামান্য ছুতো পেলেই।'

'তাহলে কী করা যায় ?'

'সেটাই ভাবছি।'

আমি কিছুক্ষণ ভেবে একটা ফন্দি বার করলাম। বললাম, 'তুমি প্রোফেসরের ল্যাবরেটরিতে যাও ?'

'হ্যাঁ, যাব না কেন ? দিনের বেলাতে যাই।'

'ওই ওষুধ কি তোমার নাগালের মধ্যে থাকে ?'

'না। ওটা উনি আলমারিতে বন্ধ করে রাখেন। চাবি ওঁর কাছে থাকে।'

আমি আরেকটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'তুমি কি ওর বাড়িতেই থাক ?'

'না। আমি সকালে দশটার সময় আসি, আবার সন্ধ্যা ছটায় বাড়ি চলে যাই।'

'ওর ল্যাবরেটরির চাবি তোমার কাছে আছে ?'

'তা আছে।'

'তাহলে রাত্রে আমাদের দুজনকে ওর ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে হবে। ও যাতে ওষুধ আর না খায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কাল আমি একটু মিলান যাচ্ছি। পরশু সন্ধ্যাবেলা আপনার কাছে চলে আসব।'

'বেশ, তাই কথা রইল।'

আলবের্তি চলে গেল। ঘটনাটা আজকে ঘটলেই ভালো হত, কিন্তু উপায় নেই। আলবের্তিকে প্রয়োজন।

২১ এপ্রিল

আজ দুটো খুনের খবর বেরিয়েছে কাগজে। তার মধ্যে একজনের নাম আলবের্তি কালকে করেছিল। আরেকজন প্রোফেসর বেলিনি—জীববিদ্যাবিশারদ। দুজনকেই রাত্তিরে গলা টিপে মারা হয়েছে। আঙুলের ছাপ আগের খুনের সঙ্গে মিলে গেছে। পুলিশ এটা বুঝেছে যে সব খুন একই লোক করেছে। বেলিনির চাকর পুলিশকে বলেছে যে রাত এগারটার সময় সে দরজার ঘণ্টা শুনে দরজা খুলে দেখে যে একজন বীভৎস দেখতে লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতে সে বলে তার নাম আরতুরো ক্রোচে। ক্রোচে বেলিনির সঙ্গে দেখা করতে চায়। বেলিনি তখনো ঘুমোতে যায়নি। ক্রোচের নাম শুনে সে চাকরকে বলে লোকটিকে ভিতরে আসতে বলতে। পনের মিনিট পরে এই ক্রোচে লোকটি চলে যায়। বেলিনির চাকরই তার হ্যাট আর কোট তাকে এনে দেয়। তারপর মনিব ঘুমোতে যাচ্ছেন না দেখে চাকরটি তাঁর ঘরে উঁকি মেরে দেখে বেলিনি মেঝেতে পড়ে আছেন—মৃত অবস্থায়। সে তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ বেলিনির গলাতে আততায়ীর আঙুলের ছাপ পায়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আততায়ীর সন্ধান পায়নি।

২৩ এপ্রিল

কাল রাত্রের সাংঘাতিক ঘটনার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু তাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

কাল সকালে রোমের কিছু দ্রষ্টব্য দেখতে বেরিয়েছিলাম একটা টুরিস্ট দলের সঙ্গে। ফিরেছি বিকেল সাড়ে চারটায়। তারপর কফি খেয়ে টাইবারের ধারে হাঁটলাম আধ ঘণ্টা।

রাত সাড়ে আটটা নাগাৎ আলবের্তি আমার হোটেলে এল। আমরা দুজনে এক সঙ্গেই ডিনার খেলাম। তারপর স্থির করলাম সাড়ে দশটা নাগাৎ দানিয়েলির বাড়ি যাব। বাড়ি যাব মানে বাড়ির বাইরে ওৎ পেতে থাকব। ল্যাবরেটরিটা বাইরে থেকে দেখা যায়, তাতে আলো জ্বললেই বুঝব দানিয়েলি ঢুকেছেন। তখন আমরা বাড়িতে গিয়ে ঢুকব।

দানিয়েলির পাড়াটা এমনিতেই নির্জন—তার উপরে রাত্রে তো বটেই। বাড়ির সামনেই একটা পার্ক আছে ; আমরা দুজনে সেই পার্কের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ল্যাবরেটবি অন্ধকার, অথচ বাড়ির অন্য ঘরে আলো জ্বলছে।

বাড়ির দুশো গজের মধ্যেই একটা গির্জা, তাতে সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ল্যাবরেটরির আলো জ্বলে উঠল।

আমি আর আলবের্তি দানিয়েলির বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘণ্টা টিপলাম। চাকর এসে দরজা খুলে আমাদের দেখেই বলল, 'এখন সিনিয়র দানিয়েলির সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর বারণ আছে।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলবের্তি তাকে একটা মোক্ষম ঘুঁষি মেরে অজ্ঞান করে দিল। আমরা চাকরকে টপ্‌কে ভিতরে প্রবেশ করলাম। আলবের্তি বলল, 'ফলো মি।'

সিঁড়ির পাশে একটা ঘর পেরিয়ে একটা প্যাসেজ, সেটা দিয়ে বাঁ দিকে হাত দশেক গেলেই ল্যাবরেটরির দরজা। দরজা অল্প ফাঁক, তা দিয়ে আলো এসে বাইরে পড়েছে, প্যাসেজে কোনো আলো জ্বলছে না।

আমি আলবের্তিকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললাম, 'আমি ঢুকছি ভিতরে। তুমি দরজার বাইরে থেকো, দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

তারপর ল্যাবরেটরির ভিতরে ঢুকেই দেখলাম দানিয়েলি আমার দিকে পিঠ করে একটা খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একটা বোতল থেকে চামচে ওষুধ ঢালছেন।

'দানিয়েলি !'

আমার গলা শুনে তিনি চরকি বাজির মতো ঘুরে আমাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সে কি, তুমি নিজেই এসে গেছ ? আমি তো তোমার হোটেলেই যাচ্ছিলাম।'

এই বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওষুধটা খেয়ে ফেললেন, আর তারপরে অবাক হয়ে চোখের সামনে দেখলাম মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চেহারার পরিবর্তন হতে।

তিনি এখন আর সৌম্যদর্শন বৈজ্ঞানিক নন, তিনি হিংস্র চেহারার আধা মানুষ আধা জানোয়ার।

এর পরেই তিনি আর এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমি বিদ্যুদ্বেগে পাশ কাটাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় চরম ফন্দিটা এসে গেল। দানিয়েলি হাত দুটো বাড়িয়ে আবার আমার দিকে লাফ দেবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আলমারির তাকে রাখা ওষুধের বোতলটা হাতে নিয়ে এক ঢোক ওষুধ মুখে পুরে দিলাম।

তারপর এইটুকু মনে আছে যে আমি ভীমবিক্রমে দানিয়েলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি, এবং দুজনে একসঙ্গে মেঝেতে পড়ছি জড়াজড়ি অবস্থায়। এও মনে আছে যে আমার দেহে তখন অসুরের শক্তি। এ ছাড়া আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি আমি আমার হোটেলের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার সর্বাঙ্গে বেদনা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে আলবের্তি ঘরে ঢুকল।

'আপনি নিজে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না বলে রুম বয়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলেছি—আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

'গুড মর্নিং,' বললাম আমি।

'আপনি আছেন কেমন ?'

'শরীরে কোনো জখম নেই, কেবল বেদনা।'

'আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, সে এসে আপনার ব্যবস্থা করবে।'

'কিন্তু কাল কী হল ?'

'কাল দুই হিংস্র পিশাচকে মরণ পণে লড়াই করতে দেখলাম। আমি এসে আপনার পক্ষ না নিলে কী হত বলা যায় না। আমি এককালে বক্সিং করেছি। দানিয়েলিকে একটা আপার কাট মেরে নক আউট করে দিই। তার আগে অবশ্য আপনিও ওঁকে যথেষ্ট কাবু করেছিলেন। তিনি অজ্ঞান হলে আমি আপনাকে নিয়ে হোটেলে চলে আসি। যখন আপনাকে বিছানায় শুইয়ে দিই তখনও

আপনার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। যতক্ষণ না আমার চেনা প্রোফেসর শঙ্কুকে আমার সামনে দেখতে পাই ততক্ষণ আমি আপনার ঘরে ছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে আসি। তখন রাত সাড়ে বারোটা।'

'আর দানিয়েলি ?'

এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার চলে এলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি কাল কারুর সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছিল ?'

'আমি বললাম, "হ্যাঁ। তাঁর বাড়ি এই যুবকটি জানে। তিনি থাকেন সাতাশ নম্বর ভিয়া সাক্রামেন্টোতে। তাঁর নাম ডাঃ এনরিকো দানিয়েলি। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত একটি ওষুধের প্রভাবে এই দশা করেছেন আমার। গত চার-পাঁচ দিনে যে ক'জন বৈজ্ঞানিক খুন হয়েছেন তাঁদেব গলার আঙুলের ছাপের সঙ্গে এই দানিয়েলির আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে তাতে কোনো পার্থক্য

নেই

'এটা তাহলে পুলিশের কেস ?'

'তা তো বটেই।'

'আমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি।'

ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন।

এবার আলবের্তি তার পকেট থেকে একটা বোতল বার করে টেবিলের উপর রেখে বলল, 'এই হল বাকি ওষুধ। এটা আপনার কাছেই থাক ; আপনার গবেষণাগারে যে বোতলটা রয়েছে সেটার পাশে রেখে দেবেন। আশা করি এখন খানিকটা সুস্থ বোধ করছেন।'

'ওষুধ পড়েছে, আর চিন্তা কী। আমার মনে হয় পরশুর মধ্যেই দেশে ফিরতে পারব। তোমার সাহায্যের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তোমার কথা ভুলব না কখনো।'

রূ প ক থা

কানাইয়ের কথা

নসু কবরেজ প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে বলরামের নাড়ী ধরে বসে রইলেন। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলরামের সতের বছরের ছেলে কানাই কবরেজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আজ দশ দিন হল তার বাপের অসুখ। কোনো কিছু খাবারে তার রুচি নেই ; এক টানা দশ দিন না খেয়ে সে শুকিয়ে গেছে, তার চোখ কোটরে বসে গেছে, তার সর্বাঙ্গ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তিন ক্রোশ পায়ে হেঁটে কানাই নসু কবরেজের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে পায়ে ধরে তাঁকে নিয়ে এসেছে তার বাপের চিকিৎসার জন্য। এ রোগের নাম কী তা কানাই জানে না। কবরেজ জানেন কি ? তাঁর চোখের ভ্রূকুটি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হয়। মোট কথা এ যাত্রা তার বাপ না বাঁচলে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। আপন লোক বলতে তার আর কেউ নেই। নন্দীগ্রামে দু বিঘে জমি আর একজোড়া হাল বলদ নিয়ে থাকে বাপ-ব্যাটায়। ক্ষেতে যা ফসল হয় তাতে মোটামুটি দুবেলা দু মুঠো খেয়ে চলে যায় দুজনের। কানাইয়ের মা বসন্ত রোগে মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে, আর এখন বাপের এই বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম।

'চাঁদনি', নাড়ী ছেড়ে মাথা নেড়ে বললেন কবরেজ মশাই। নসু কবরেজের খ্যাতি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। তাঁর নাড়ী জ্ঞান নাকি যেমন-তেমন নয়। তিনি জবাব দিয়ে গেলে রোগীকে বাঁচানো শিবের অসাধ্যি, আর তিনি ওষুধ বাতলে গেলে রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠবেই। কিন্তু চাঁদনি আবার কী ? 'আজ্ঞে ?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কানাই।

'চাঁদনি পাতার রস খাওয়াতে হবে, তাহলেই রোগ সারবে। সংস্কৃত নাম চন্দ্রায়ণী। আর রোগের নাম হল শুখ্‌নাই।'

'চাঁদনি একটা গাছের নাম বুঝি ?' ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল কানাই।

নসু কবরেজ ওপর নীচে মাথা নাড়লেন দুবার। কিন্তু তাঁর চোখ থেকে

ভ্রূকুটি গেল না।

'কিন্তু চাঁদনি তো যেখানে সেখানে পাবে না বাপু', শেষটায় বললেন তিনি।

'তবে ?'

'বাদড়ার জঙ্গলে যেতে হবে। একটা পোড়ো মন্দির আছে মহাকালের। তার উত্তর দিকে পঁচিশ পা গেলেই দেখবে চাঁদনি গাছ। কিন্তু সে তো প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ ; পারবে যেতে ?'

'নিশ্চয়ই পারব', বলল কানাই। 'হাঁটতে আমার কোনো কষ্ট হয় না।'

কথাটা বলেই কানাইয়ের আরেকটা প্রশ্ন মাথায় এল।

'কিন্তু গাছ চিনব কী করে কবরেজ মশাই ?'

'ছোট ছোট ছুঁচলো বেগনে পাতা, হলদে ফুল আর মন-মাতানো গন্ধ। বিশ হাত দূর থেকে সে গন্ধ পাওয়া যায়। স্বর্গের পারিজাতকে হার মানায় সে গন্ধ। তিন চার হাতের বেশি উঁচু নয় গাছ। একটি পাতা বেটে রস খাওয়ালেই আর দেখতে হবে না। ব্যারাম বাপ-বাপ বলে পালাবে, আর শরীর দুদিনেই তাজা হয়ে যাবে। তবে সময় আছে আর মাত্র দশ দিন। দশ দিনের মধ্যে না খাওয়ালে...'

নসু কবরেজ আর কথাটা শেষ করলেন না।

'আমি কাল সক্কাল-সক্কাল বেরিয়ে পড়ব, কবরেজ মশাই', বলল কানাই। 'গণেশ খুড়োকে বলব আমি যখন থাকব না তখন যেন বাবাকে এসে দেখে যায়। খাওয়ানো তো যাবে না বোধ হয় কিছুই ?'

নসু কবরেজ মাথা নাড়লেন। 'সে চেষ্টা বৃথা। এ ব্যারামের লক্ষণই এই। পেটে কিছুই সহ্য হয় না, আর দিনে দিনে শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে। তবে চাঁদনির রস এর অব্যর্থ ওষুধ। আর, ইয়ে, ব্যারাম সারবার পর বাকি কথা হবে।'

পড়শী গণেশ সামন্তকে বাপের দিকে একটু নজর রাখার কথা বলে পরদিন ভোর থাকতে গুড়-চিঁড়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে কানাই বেরিয়ে পড়ল বাদড়ার জঙ্গলের উদ্দেশে। পৌঁছতে পৌঁছতে সেই বিকেল হয়ে যাবে, কিন্তু কানাই পরোয়া করে না। বাপকে সে দেবতার মতো ভক্তি করে আর বাপও ছেলেকে ভালোবাসে প্রাণের চেয়েও বেশি। দিব্যি সুস্থ মানুষটার হঠাৎ যে কী হল !—দেখতে দেখতে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল।

পথ জানা নেই, তাই একে তাকে জিজ্ঞেস করে করে চলতে হচ্ছে। বনের নাম শুনে সকলেই জিজ্ঞেস করে, 'কেন, সেখানে আবার কী ?' শুনে কানাই বুঝতে পারে বনটা খুব নিরাপদ নয়, কিন্তু তাহলে কী হবে ? বাপের জন্য চাঁদনি পাতা জোগাড় করতে সে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

সূর্যি যখন লম্বা ছায়া ফেলতে শুরু করছে তখন একটা ধানক্ষেতের ওপারে কানাই দেখল একটা গভীর বন দেখা যাচ্ছে। ক্ষেত থেকে এক কৃষক কাঁধে লাঙল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তাকে জিজ্ঞেস করে কানাই জানল ওটাই বাদড়ার বন। কানাই পা চালিয়ে এগিয়ে চলল।

শাল সেগুন শিমুলের সঙ্গে আরো কত কী গাছ মেশানো ঘন বনে সূর্যের আলো ঢোকে না বললেই চলে। এই বিশাল বনে তিন চার হাত উঁচু গাছ খুঁজে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? তবে কাছে মন্দির আছে সেই একটা সুবিধে।

বিশ পঁচিশ হাত ভেতরে ঢুকতেই একটা হরিণের পাল দেখতে পেল কানাই। তাকে দেখেই হরিণগুলো ছুটে পালালো। হরিণ তো ভালো, কিন্তু জাঁদরেল কোনো জানোয়ার যদি সামনে পড়ে? যাই হোক, সে ভেবে কোনো লাভ নেই। তার লক্ষ হবে এখন একটাই; প্রথমে মহাকালের মন্দির, তারপর চাঁদনি গাছ খুঁজে বার করা।

মন্দির দেখতে পাবার আগে কিন্তু গন্ধটা পেল কানাই। তত জোরালো নয়; মিহি একটা গন্ধ, কিন্তু তাতেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

এবার একটা মহুয়া গাছ পেরিয়ে পোড়ো মন্দিরটা চোখে পড়ল। দিন ফুরিয়ে এসেছে, তবে মন্দিরের চারপাশটায় গাছ একটু পাতলা বলে পড়ন্ত রোদ এখানে ওখানে ছিটিয়ে পড়েছে।

'তুই কেরে ব্যাটা?'

প্রশ্নটা শুনে কানাই চমকে তিন হাত লাফিয়ে উঠেছিল। এখানে অন্য মানুষ থাকতে পারে এটা তার মাথাতেই আসেনি। এবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল একটা গোলপাতার ছাউনির সামনে তিন হাত লম্বা সাদা দাড়িওয়ালা একটা লোক ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে তার দিকে।

'তুই যা খুঁজছিস তা এখানে পাবি না', এবার বলল বুড়ো কয়েক পা এগিয়ে এসে। সে কি মনের কথা বুঝতে পারে নাকি?

'কী খুঁজছি তা তুমি জান?' জিজ্ঞেস করল কানাই।

'দাঁড়া দাঁড়া, একটু মনে করে দেখি। তোকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এখন আবার মন থেকে হঠাৎ ফস্‌কে গেল। একশো ছাপান্ন বছর বয়সে স্মরণশক্তি কি আর জোয়ান বয়সের মতো কাজ করে?'

বুড়ো মাথা হেঁট করে ডান হাত দিয়ে গাল চুলকে হঠাৎ আবার মাথা সিধে করে বলল, 'মনে পড়েছে। চাঁদনি। তোর বাপের অসুখ, তার জন্য চাঁদনি পাতা নিতে এসেছিস তুই। ওই মন্দিরের উত্তর দিকটায় ছিল আজ দুপুর অবধি। কিন্তু সে তোর আর নেই! গিয়ে দেখ—শেকড় অবধি তুলে নিয়ে গেছে।'

কানাইয়ের বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে। এতটা পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে?

সত্যজিৎ রায়

সে মন্দির লক্ষ করে এগিয়ে গেল। উত্তর দিক। উত্তর দিক কোন্‌টা ? হ্যাঁ, এইটে। ওই যে গর্ত। ওইখানে ছিল গাছ—শেকড় অবধি তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু কে ?

কানাইয়ের চোখে জল। সে বুড়োর কাছে ফিরে এল।

'কে নিল সে গাছ ? কে নিল ?'

'রূপসার মন্ত্রী সেপাই-সান্ত্রী নিয়ে এসে গাছ তুলে নিয়ে গেছে। রূপসার প্রজাদের ব্যারাম হয়েছে—শুখ্‌নাই ব্যারাম—বিশদিন না খেয়ে হাত পা শুকিয়ে মরে যায় তাতে। একমাত্র ওষুধ হল চাঁদনি পাতার রস।'

কানাইয়ের আর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। সে চোখে অন্ধকার দেখছিল। কিন্তু বুড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলল।

'চাঁদনি এখানে নেই বটে, কিন্তু আমি যে দেখছি তোর বাপ ভালো হয়ে উঠবে।'

কানাই চমকে উঠল।

'তাই দেখছেন ? সত্যি তাই দেখেছেন ? কিন্তু ওষুধ না পেলে কি করে ভালো হবে ? এ গাছ আর কোথায় আছে সে আপনি জানেন ?'

বুড়ো মাথা নাড়ল। 'আর কোথাও নেই। এই একটি মাত্র জায়গায় ছিল, তাও এখন চলে গেছে রূপসার রাজ্যে।'

'সে কতদূর এখান থেকে ?'

'দাঁড়া, একটু ভেবে দেখি ?'

বুড়ো বোধহয় আবার ভুলে গেছে, তাই মনে করার চেষ্টায় মাথা হেঁট করে টাক চুলকোতে লাগল।

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ত্রিশ ক্রোশ পথ। বিশাল রাজ্য।'

এবার কানাইয়েরও মনে পড়েছে। বলল, 'রূপসা মানে যেখানের তাঁতের কাপড়ের খুব নামডাক ?'

'ঠিক বলেছিস। রূপসার শাড়ি ধুতি চাদর দেশ-বিদেশে যায়। এমন বাহারের কাপড় আর কোথায় বোনা হয় না।'

'আপনি এত জানলেন কী করে ? আপনি কে ?'

'আমি ত্রিকালজ্ঞ। আমার নাম একটা আছে। তবে এখন মনে পড়ছে না। ভালো কথা, তোকে তো একবার রূপসা যেতে হচ্ছে। চাঁদনির খোঁজ তোকে তো করতে হবে।'

'কিন্তু কবরেজ বলেছে দশ দিনের মধ্যে বাপকে ওষুধ খাওয়াতে না পারলে বাপ আর বাঁচবে না। তার মধ্যে একদিন তো চলেই গেল।'

'তাতে কী হল। যা করতে হবে ঝটপট করে ফেল।'

'কী করে করব ? ত্রিশ ক্রোশ পথ। সেখানে যাওয়া আছে, গাছ খুঁজে বার করা আছে, ফেরা আছে...।'

'দাঁড়া, মনে পড়েছে।'

বুড়ো এবার তার কুটিরের মধ্যে ঢুকে একটা থলি বার করে আনল। তারপর তার থেকে তিনটে গোল গোল জিনিস বার করল—একটা লাল, একটা নীল, একটা হল্‌দে।

'এই দ্যাখ্‌', লালটা হাতে তুলে বলল বুড়ো। 'এটা একরকম ফল। এটা খেলে তুই হরিণের চেয়ে তিন গুণ জোরে ছুটতে পারবি। এক ক্রোশ পথ তোর যেতে লাগবে তিন মিনিট। তার মানে দেড় ঘণ্টায় তুই পৌঁছে যাবি রূপসা। এই তিনটেই ফল, আর তিনটেই তোকে দিলাম।'

'কিন্তু হলদে আর নীল ফল খেলে কী হয় ?'

'এই তো মুশকিলে ফেললি', বলে বুড়ো আবাব মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর এপাশ ওপাশ মাথা নাড়িয়ে বলল, 'উঁহু, মনে পড়ছে না। তবে কিছু একটা হয়, আর সেটা তোর উপকারেই লাগবে। যদি কখনো মনে পড়ে তবে তোকে জানাব।'

'কী করে জানাবে ? আমি তো চলে যাব।'

'উপায় আছে।'

বুড়ো আবার থলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে এবার একটা ঝিনুক বার করল, সেটা প্রায় হাতের তেলোর সমান বড়। সত্যি বলতে কি, কানাই এত বড় ঝিনুক কখনো দেখেনি। ঝিনুকটা কানাইকে দিয়ে বুড়ো বলল, 'এটা সঙ্গে রাখবি। আমার কিছু বলার দরকার হলে আমি তোকে নাম ধরে ডাকব। তোর নাম কানাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ডাক তুই এই ঝিনুকের মধ্যে শুনতে পাবি। ওটা তোর ট্যাঁকে থাকলেও শুনতে পাবি। তারপর ঝিনুকটাকে কানের উপর চেপে ধরলেই তুই পষ্ট আমার কথা শুনতে পাবি। আমার কথা যখন শেষ হবে তখন ঝিনুকে শোনা যাবে সমুদ্রের গর্জন। তখন আবার ঝিনুকটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখবি।'

কানাই ঝিনুকটা নিয়ে তার ট্যাঁকেই রাখল। বুড়ো এবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'আজ তো সন্ধে হয়ে গেল। তুই এখন রূপসা গিয়ে কিছু করতে পারবি না। আমি বলি আজ রাতটা আমার কুটিরেই থাক, কাল ভোরে রওনা হবি। তাহলে ওখানে সারা দিনটা পাবি, অনেক কাজ হবে। আমার ঘরে ফলমূল আছে, তাই খাবি এখন।'

কানাই রাজি হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করছিল তখনই লাল ফলটা খেয়ে রওনা

দেয় ; বুড়োর কথা ঠিক কিনা সেটা পরখ করে দেখতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সেটাকে সে দমন করল। সকালে রওনা দেওয়াই সব দিক দিয়ে ভালো হবে।

'ভালো কথা', বলল বুড়ো, 'মনে পড়েছে। আমায় লোকে জগাইবাবা বলে ডাকে। তুইও বলিস।'

॥ ২ ॥

পরদিন সকালে লাল ফলটা খেয়ে জগাইবাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় পা দিতেই কানাই বুঝল তার গায়ের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। তারপর হাঁটতে গিয়ে দেখল হাঁটলে চলবে না—দৌড়তে হবে। সে দৌড় যে কী বেদম দৌড় সে আর কী বলব। রাস্তার দুপাশে গাছপালা ঘরবাড়ি মানুষজন গরু ছাগল সব তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে উল্টোদিকে, পায়ের তলা দিয়ে মাটি সরে যাচ্ছে শন্ শন্ করে, দুকানের পাশে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে কানে প্রায় তালা লাগে, দেখতে দেখতে দুদিকের দৃশ্য বদলে যাচ্ছে—গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে মাঠ, মাঠ থেকে বন, বন থেকে আবার গ্রামে। পথে দুটো নদী পড়ল, মুহুর্তের মধ্যে সে নদী কানাইয়ের পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল, পায়ের গোড়ালিটুকুও ভিজবার সময় পেল না।

সূর্য মাথায় ওঠার আগেই কানাই বুঝতে পারল সামনে একটা বড় শহর দেখা যাচ্ছে। সে তখনই দৌড়ানো বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করল। বাকি পথটুকু এমনিভাবেই হেঁটে যাবে, নইলে অন্য পথচারীরা কী ভাববে ? তাকে নিয়ে একটা হৈচৈ পড়ে এটা কানাই মোটেই চায় না।

শহরে ঢোকবার মুখে একটা তোরণ, তার দুদিকে দুজন সশস্ত্র সেপাই। এটা আগে থেকে জানা ছিল না, তাই কানাইকে একটু মুশকিলেই পড়তে হয়েছিল। সেপাইরা কানাইকে দেখেই তার পথ রোধ করতে গিয়েছিল, তাই নিরুপায় হয়ে কানাইকে সামান্য একটু দৌড় দিতে হয়েছিল। ফলে কানাই এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখান থেকে তোরণটা এত দূরে যে সেটাকে প্রায় দেখাই যায় না।

আর কোনো ভাবনা নেই। কানাই এখন একটা বাজারের মধ্যে দিয়ে চলেছে। দুদিকে দোকানপাট, তাতে নানারকম জিনিসের মধ্যে কাপড়ই বেশি, আর সেই কাপড়ের বাহার দেখেই কানাই তো থ। দেশ-বিদেশের লোকেরা সে কাপড় দেখছে, দর করছে, কিনছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে কানাইয়ের ভারী অদ্ভুত লাগল। যারা সে কাপড় বেচছে তাদের কারুর মুখে হাসি নেই। আর, আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, হাটের এখানে সেখানে হাতে বল্লমওয়ালা সেপাইরা

ঘোরাফেরা করছে।

কানাইয়ের ভারী কৌতূহল হল। সে একটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'এই শহরের নাম কি রূপসা?' লোকটা মুখে কিছু না বলে কেবল মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল। এবার কানাই বলল, 'তা তোমরা সবাই এত গম্ভীর কেন বল তো? কেনা-বেচা তো বেশ ভালোই হচ্ছে; তবু তোমাদের মুখে হাসি নেই কেন?'

লোকটা এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'তুমি বুঝি ভিন দেশের লোক?'

কানাই বলল, 'হ্যাঁ; আমি সবে এখানে এলাম।'

'তাই তুমি জানো না', বলল দোকানদার। 'এখানে মড়ক লেগেছে।'

'মড়ক?'

'শুখ্‌নাইয়ের মড়ক। এখন তাঁতি পাড়ায় লেগেছে, কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে আর কতদিন? তাঁতিরা সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে।'

'কিন্তু—'

কানাই ওষুধের কথাটা বলতে গিয়ে বলল না। আশ্চর্য ব্যাপার!—মন্ত্রী গিয়ে চাঁদনি গাছ নিয়ে এসেছে, তাও তাঁতিদের কেন অসুখ সারছে না? এই গাছের পাতায় কি তাহলে কাজ দেয় না? একটা আস্ত গাছে কত পাতা হয়? চার-পাঁচশো তো বটেই। তার একটা খেলেই একটা লোকের অসুখ সারার কথা। কিন্তু সে গাছ তাহলে গেল কোথায়?

কানাই উঠে পড়ল। তার মনে পড়ে গেছে যে এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হল চাঁদনির পাতা জোগাড় করা। কিন্তু সেই গাছ তার নাগালে আসবে কি করে? মন্ত্রীমশাই সে গাছ কোথায় রেখেছেন সেটা সে জানবে কী করে?

কানাই হাঁটতে আরম্ভ করল। বাজার ছাড়িয়ে সে দেখল একটা পাড়ার মধ্যে এসে পড়েছে। এখানে চারিদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে। এটাই কী তাঁতি পাড়া?

রাস্তার ধারে একটা বুড়ো বসে আছে দেখে কানাই তার দিকে এগিয়ে গেল।

'হ্যাঁ গো, এটা কি তাঁতি পাড়া?' কানাই জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এটাই তাঁতি পাড়া। তবে তাঁতি আর এখানে বেশিদিন নেই। চারটে করে তাঁতি রোজ মরছে ব্যারামে। শশী গেল, নীলমণি গেল, লক্ষ্মণ গেল, বেচারাম গেল—আর কি! এ রোগের তো কোনো চিকিৎসা নেই। আমায় এখনো ধরেনি রোগে, তবে ধরতে আর কত দিন?'

'চিকিৎসা নেই বলছ কেন? একটা গাছের পাতার রস খেলেই তো এ ব্যারাম সারে। সে গাছ তো তোমাদের মন্ত্রীমশাই বাদড়ার জঙ্গলে গিয়ে নিয়ে

এসেছেন।'

'তাঁতিদের তাতে লাভটা কী? সে গাছ তো মন্ত্রীমশাই আমাদের দেবেন না।'

'কেন, দেবে না কেন?'

'আমাদের রাজা বড় সর্বনেশে।' বুড়ো এদিক ওদিক সন্দেহের দৃষ্টি দিল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'এ রাজা পিশাচ। পেয়াদারা বল্লমের খোঁচা মেরে তাঁতিদের দিয়ে কাপড় বোনায়। যারা বোনে না তাদের শূলে চড়ায়। রূপসার কাপড় বিদেশ থেকে সদাগর এসে কিনে নিয়ে যায়। যা টাকা আসে তার চার ভাগের তিন ভাগ যায় রাজকোষে। তাঁতিরা সব এক জোটে রাজাকে হটিয়ে তার ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে ঠিক করেছিল। সে কথা কেউ গিয়ে তোলে রাজার কানে। আর সেই সময় লাগে এই মড়ক। রাজা চায় তাঁতিরা সব মরুক। তাই ওষুধ এনে সরিয়ে রেখেছে।'

কানাইয়ের মনটা শক্ত হয়ে উঠল। এমন শয়তান রাজা এই রূপসার রাজ্যে? সে যে-করে হোক চাঁদনির পাতা এনে দেবে তাঁতিদের জন্য। যে-করে হোক্!

বুড়ো বলে চলল, 'রাজা শয়তান, কিন্তু তার ছেলে রাজকুমার, সে সোনার চাঁদ ছেলে। তোমারই মতন বয়স তার। সে যদি রাজা হয় তাহলে দেশের সব দুঃখু দূর হবে।'

'এই রাজাকে সরাবার কোনো রাস্তা নেই বুঝি?'

'সে কি আর আমরা জানি? আমরা মুখ্য-সুখ্যু মানুষ, আমরা শুধু দুঃখু পেতেই জানি।'

আরো একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল বুড়োকে।

'রাজবাড়িটা কোন্ দিকে বলতে পার?'

'এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে রাজপথ পড়বে। বাঁয়ে ঘুরে দেখবে দূরে রাজার কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে। তবে তোমায় সেখানে ঢুকতে দেবে না। পাহারা বড় কড়া।'

কানাই বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে কিছুদূর গিয়েই রাজপথে পড়ল। বাঁ দিকে ঘুরে সত্যিই দেখল দূরে কেল্লার ফটক দেখা যাচ্ছে।

কানাই ইতিমধ্যেই মতলব এঁটে নিয়েছে। সে এমনি ভাবে হেঁটে গিয়ে যখন ফটক থেকে বিশ হাত দূরে, প্রহরী তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে, তখন সে দিল ফটক লক্ষ করে বেদম ছুট।

চোখের পলকে কানাই প্রথম ফটক দ্বিতীয় ফটক পেরিয়ে পৌঁছে গেল একটা বাগানে। এখানে আশেপাশে কোনো লোক নেই দেখে কানাই থামল। বাঁ দিকে বাগান, তাকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে আছে শ্বেত পাথরের দালান।

কানাই কী করবে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল। বাগানে ফুলের ছড়াছড়ি, চারিদিক রঙে রঙ, কে বলবে এই দেশে শুখ্‌নাইয়ের মড়ক লেগেছে !

এই ফুলের মধ্যেই কি চাঁদনি গাছ রয়েছে ? ছোট ছোট ছুঁচলো বেগুনী পাতা আর হলদে ফুল। যদি এর মধ্যেই থাকে তাহলে সে কাজ অনেক সহজে হয়ে যায়।

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে কানাই এগোচ্ছিল, হঠাৎ তাব পিঠে পড়ল একটা হাত, আর আরেকটা হাত তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে কোলপাঁজা করে তুলে নিল।

কানাই দেখলে সে এক অতিকায় প্রহরীর হাতে বন্দী।

॥ ৩ ॥

প্রহরী কানাইকে সোজা নিয়ে গেল রাজসভায়। কানাই দেখল রাজা সিংহাসনে বসে আছেন, আব তাঁকে ঘিরে রয়েছে সভাসদবা। রাজা যে শয়তান সেটা তাঁর কুৎকুতে চোখ, ঘন ভুরু আর গালপাট্টা দেখলেই বোঝা যায়।

'এটাকে কোত্থেকে পেলি ?' রাজা কানাইয়ের দিকে চোখ রেখে পেয়াদাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'মহারাজ, এ অন্দরমহলের বাগানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছিল।'

'এ ব্যাটা ফটক দিয়ে ঢুকল কী করে ? দু দুটো সশস্ত্র প্রহরী রয়েছে সেখানে !'

'তা জানি না মহারাজ।'

'হুঁ। বলবন্ত আর যশোবন্তকে শূলে চড়াও। ফটকে নতুন প্রহরী মোতায়েন করো। এ রাজ্যে কাজে ফাঁকির শাস্তি মৃত্যু।'

মহারাজের পাশে দু-তিনজন কর্মচারী আদেশ পালন করার জন্য হাঁ হাঁ করে উঠল।

রাজা এবার কানাইয়েব দিকে দৃষ্টি দিলেন।

'তোর ব্যাপার কী শুনি। তোর নাম কী ?'

'আজ্ঞে আমার নাম কানাই।'

'কোত্থেকে আসছিস ?'

কানাই ঠিক করেছিল যে রাজার কাছে সে সব কথা সত্যি বলবে না। সে বলল, 'আজ্ঞে পাশের গাঁ থেকে।'

'কাগমারি ?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'বাগানে কী খুঁজছিলি ?'

'কই, কিছু খুঁজিনি তো। শুধু দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

রাজা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, 'ঠিক আছে ; এখন একে হাজতে পোরো। পরে এর বিচার হবে।'

তিন মিনিটের মধ্যে কানাই দেখল যে সে কারাগারে বন্দী। গরাদওয়ালা দরজা খড়াং শব্দে বন্ধ হতেই সে হতাশ হয়ে কারাগারের এক কোণে বসে পড়ল। আর আট দিন বাকি আছে। তার মধ্যে চাঁদনির পাতা নিয়ে দেশে ফিরতে না পারলে তার বাপকে সে চিরতরে হারাবে।

এমন হতাশ কানাইয়ের কোনোদিনও লাগেনি। জগাইবাবার কথা মনে পড়ল তার। নীল আর লাল ফল দুটো আর ঝিনুকটা এখনো তার ট্যাঁকে রয়েছে। কিন্তু কই, জগাইবাবা তো তাকে আর ডাকল না। ওগুলো দিয়ে কী কাজ হয় তাও জানা গেল না।

কয়েদখানার একটা মাত্র খুপরি জানালা ; সেটা পশ্চিম দিকে হওয়াতে তার ভিতর দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে। কমলা রঙের রোদ দেখে কানাই বুঝল যে সূর্য অস্ত যাবার মুখে।

ক্রমে সেই আলোটুকুও চলে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের বাইরে একজন প্রহরী, সে সেখানে টহল ফিরছে। তার পায়ের একটানা খট খট শব্দে কানাইয়ের চোখে ঘুম এল, আর দশ মিনিটের মধ্যে কানাই ঘুমে ঢলে পড়ল।

এই ভাবে জেগে ঘুমিয়ে, কয়েদখানার অখাদ্য খাওয়া খেয়ে, তিনদিন চলে গেল। সময় আর মাত্র পাঁচ দিন। সন্ধ্যা হয়-হয়, কানাইয়ের চোখে ঘুমের আমেজ, মন থেকে আশা প্রায় মুছে এসেছে, এমন সময় সে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। বাইরে প্রহরী এখনো টহল দিচ্ছে, কে যেন এর মধ্যে বাইরে একটা মশাল জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, তার আলোয় ফটকের গরাদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে কারাগারের মেঝেতে।

কিন্তু কানাইয়ের ঘুমটা ভাঙল কেন ?

কান পাততেই কানাই কারণটা বুঝল।

তার ট্যাঁকের ঝিনুক থেকে একটা শব্দ আসছে।

'কানাই ! কানাই ! কানাই !'

কানাই তাড়াতাড়ি ঝিনুকটা বার করে কানের উপর চেপে ধরল। তার পরেই সে পরিষ্কার শুনতে পেল জগাইবাবার কথা।

'শোন্, কানাই, মন দিয়ে শোন্। আরো কিছু কথা মনে পড়েছে। তোর কাছে যে নীল ফলটা আছে সেটা খেলে তোর মধ্যে অদৃশ্য হবার শক্তি আসবে। কিন্তু অদৃশ্য হতে গেলে আগে একটা কথা বলে নিতে হবে। সেটা

হল "ফক্কা" । সেটা বললেই তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না। আবার যখন নিজের চেহারায় ফিরে আসতে চাইবি, তখন বলতে হবে "টক্কা" । বুঝলি ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি', মনে মনে বলল কানাই।

'আচ্ছা, এবার আরেকটা কথা বলি—সেটাও হঠাৎ মনে পড়ল। রূপসার রাজা তার ছেলেকে বন্দী করে রেখেছে প্রাসাদের ছাতের কোণে একটা ঘরে। বাবাকে হটিয়ে ছেলে সিংহাসনে না বসা অবধি রূপসার কোনো গতি নেই ; শুখ্‌নাই অসুখে সারা দেশ ছারখার হয়ে যাবে। রাজাকে এক সদাগর এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে একটা পান্না বিক্রী করে' আজ থেকে সাত বছর আগে। এই পান্না রাজার গলার হারে বসানো। এই পান্নায় জাদু আছে ; এটাই যত নষ্টের গোড়া। বুঝছিস ?'

কানাই বুঝেছে ঠিকই, কিন্তু চাঁদনির পাতা কী করে পাওয়া যাবে সেই নিয়ে তো জগাইবাবা কিছুই বললেন না !

ঝিনুকের ভিতর আবার কথা শোনা গেল।

'চাঁদনি উদ্ধার করায় বড় বিপদ। কিন্তু তারও রাস্তা আছে।'

'কী রাস্তা ?'

'সেটা মনে পড়ছে না', বলল জগাইবাবা। 'পড়লে বলব।'

ব্যস, কথা শেষ। কানাই কানে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছে। সে ঝিনুকটাকে আবার ট্যাঁকে গুঁজে নিল।

প্রহরী এখনো টহল দিচ্ছে। লম্বা টহল, তার গোড়ায় আর শেষটায় প্রহরী কানাইয়ের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বাঁ দিকে একবার প্রহরী অদৃশ্য হতেই ট্যাঁক থেকে নীল ফলটা বার করে কানাই টপ্ করে মুখে পুরে দিল। তারপর প্রহরী ডান দিকে অদৃশ্য হতেই কানাই ধাঁ করে বলে দিল 'ফক্কা !'

প্রহরী ফেরার পথে কয়েদখানার দিকে দেখেই চমকে উঠল। তার টহল থেমে গেল।

সে প্রথমে গরাদের ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখল—এ-কোণ, ও-কোণ, সে-কোণ।

তারপর মশালটা গরাদের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে আবার দেখল।

তারপর মশাল রেখে চাবি দিয়ে ফটক খুলে অতি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তার চোখে অবাক ভাবটা তখন দেখবার মতো।

কানাই এই সময়টার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। প্রহরীকে বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকতে দিয়ে টুক্ করে পাশ কাটিয়ে খোলা ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

পা টিপে টিপে কোনো শব্দ না করে দুজন প্রহরীর নাকের সামনে দিয়ে কানাই

বেরিয়ে এসে পৌঁছাল একটা ঘোরানো সিঁড়ির মুখে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে সে উঠতে লাগল উপরে। নির্ঘাত এ সিঁড়ি ছাতে গিয়ে পৌঁছেছে।

হ্যাঁ, কানাইয়ের আন্দাজে ভুল নেই। সিঁড়ি উঠে গিয়ে একটা দরজার মুখে পৌঁছেছে, সেই দরজা পেরোতেই কানাই দেখল সে ছাতে এসে পড়েছে।

পেল্লায় ছাত, এক কোণে একটা ঘর। তাতে একটা জানালা। সেই জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা টিমটিমে আলো। ঘরেব দরজার বাইরে বসে আছে একটা প্রহরী, তার মাথা হেঁট।

অদৃশ্য কানাই এগিয়ে গেল প্রহরীর দিকে। যা আন্দাজ করেছিল তাই ; প্রহরী মুখ হাঁ করে ঘুমোচ্ছে, তার নাক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে।

ঘরের দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। বোধহয় তাবই চাবি রয়েছে প্রহরীব কোমরে গোঁজা।

কানাই খুব সাবধানে প্রহবীর ঘুম না ভাঙিয়ে চাবিটা বার করে নিল। তাবপর সেটা তালায় ঢুকিয়ে একটা প্যাঁচ দিতেই খুট্ করে তালা খুলে গেল। কী ভাগ্যি এই শব্দেও প্রহরীব ঘুম ভাঙেনি।

এবার দরজা খুলে অদৃশ্য কানাই ঘরেব ভিতর ঢুকল। ঘরে একটা টেমি জ্বলছে, আর একটা খাটিয়ায় চোখে অবাক দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে তাবই বয়সী একটি ফুটফুটে ছেলে। ঘরের দবজা খুলল, অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তাতে রাজকুমারের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। একি ভেল্‌কি নাকি ?

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে কানাই এবাব খাটের দিকে ঘুবে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'টক্কা !'—আর অমনি তার চেহারা দেখা যাওয়াতে রাজকুমার আবো চমকে উঠে ফিস্‌ফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে ? কোনো জাদুকর নাকি ?'

ফিস্‌ফিসিয়েই কথা হল, যদিও প্রহরীর নাক ডাকানি থেকে মনে হয় বাজ পড়লেও তার ঘুম ভাঙবে না।

কানাই রাজকুমারকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলল। রাজকুমার বলল, 'গাছের কথা তুমি বলছ বটে, কিন্তু সে গাছ তুমি পাবে কী করে ? সে তো সহজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'কী করে পাব তা জানি না', বলল কানাই, 'কিন্তু গাছের পাতা আমার চাই-ই। শুধু আমার বাবার জন্য নয় ; তোমাদের এখানে তাঁতিরা সব মরতে বসেছে। তাদের জন্য পাতা লাগবে। কম করে হাজার পাতা তো থাকবেই সে গাছে ; তাতে হাজার লোকের প্রাণ বাঁচবে।'

'আমিও তো তাদের বাঁচাতে চাই', বলল রাজকুমার। 'বাবাকে আমি সে কথা বলেছিলাম। বাবা তাতেই আমাকে বন্দী করে রাখার হুকুম দিলেন। বাবা
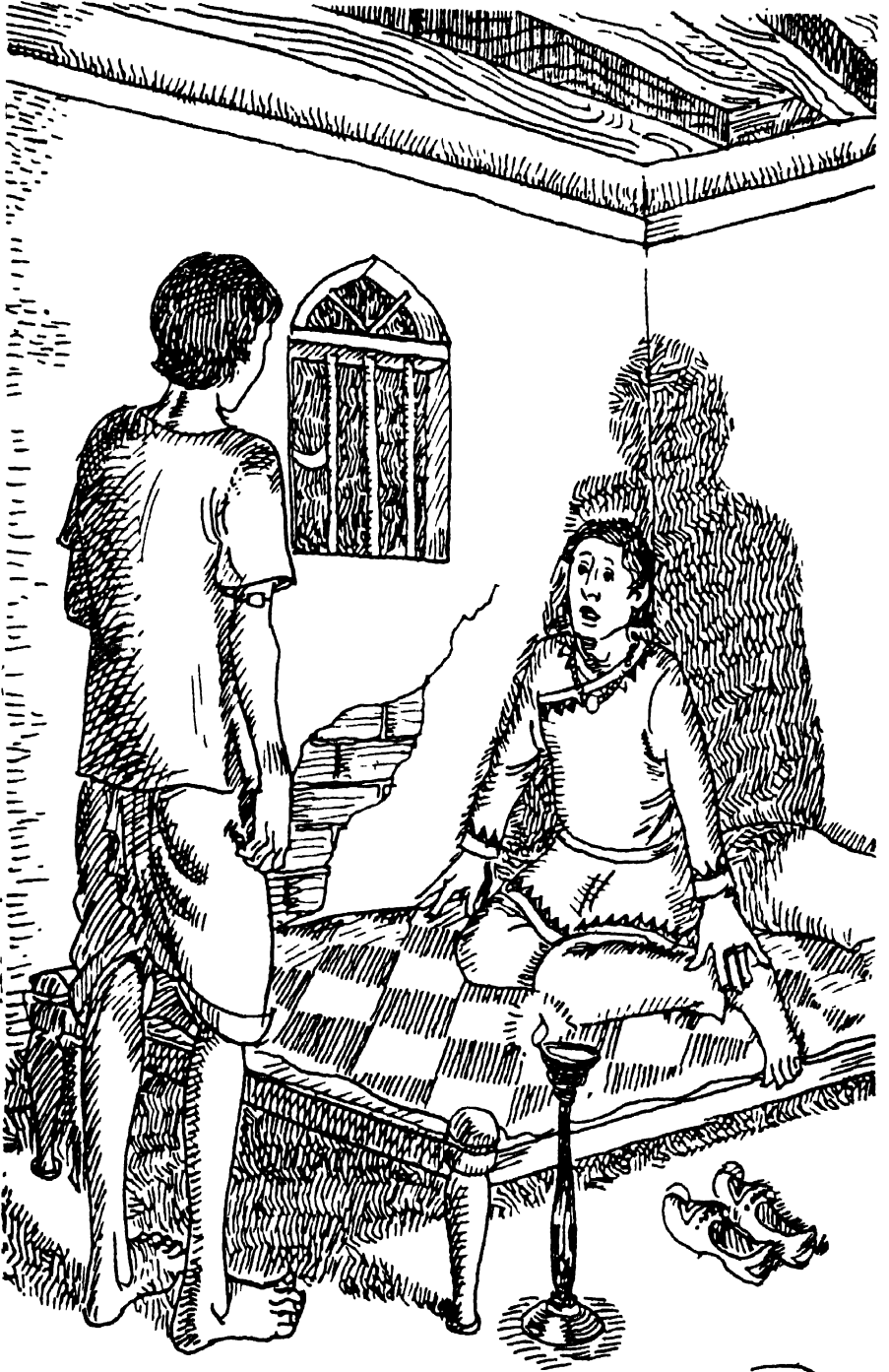
নিজের ছাড়া আর কারুর ভালো চান না। নিজের ভালো মানে যত বেশি টাকা আসে কোষাগারে ততই ভালো। ধর্মেকর্মে বাবার মতি নেই, প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তা নেই, আমি যে তার নিজের ছেলে তার জন্যেও মায়া-মমতা কিচ্ছু নেই।'

কানাই বলল, 'আচ্ছা, তোমার বাবার গলার হারে একটা জাদুপান্না আছে, তাই না?'

'তা তো বটেই। সাত বচ্ছর আগে এক সদাগর বাবাকে সেটা বেচে। সেই থেকে বাবার একটা দিনের জন্যও কোনো অসুখ হয়নি, আর বাবার অত্যাচারও বেড়ে গেছে তিন গুণ। এখানকার তাঁতিরা তাঁকে সিংহাসন থেকে সরাবার ফন্দি করেছিল। হয়তো তাবা সে কাজে সফল হত, কিন্তু সেই সময়ই লাগে শুখ্‌নাইয়ের মড়ক।'

কানাই একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, একটা কথা বল দেখি। রাজামশাইয়ের শোবার ঘরটা কোথায়? আমি তো ইচ্ছা করলে অদৃশ্য হতে পারি। আমি যদি তার গলা থেকে হারটা খুলে নিয়ে আসি?'

রাজকুমার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বাবার শোবার ঘর রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে। কিন্তু তার দরজায় প্রহরী ছাড়াও একটা ভয়ানক হিংস্র কুকুর পাহারা দেয়। সে তোমাকে দেখতে না পেলেও তোমার গন্ধ পাবে, আর পেলেই চিৎকার শুরু করবে। না, ওভাবে হবে না। অন্য উপায় দেখতে হবে। যা করতে হবে দিনের বেলা।'

কানাই একটুক্ষণ চুপ করে ভেবে বলল, 'তোমাকে তো এবার পালাতে হবে। আমি যখন এসেই পড়েছি, তখন আর তুমি বন্দী থাকবে কেন? রাজবাড়ি ছাড়া তোমার কোনো ঠাঁই আছে?'

'তা আছে', বলল রাজকুমার। 'তাঁতিদের মধ্যে আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম গোপাল। তার এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার নিজের মা-কে হারিয়েছি আমি তিন বছর বয়সে। গোপালের মা-কে আমি নিজের মায়ের মতো ভালোবাসি। বাবা গোপালের সঙ্গে মিশতে দেন না আমাকে; কিন্তু আজ যদি তার কাছে যাই, সে আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।'

'তার বাড়িতে কি দুজনের জায়গা হবে?'

'হবে বই কি। তিনজনে এক ঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকব। আমার খুব অভ্যাস আছে।'

'তাহলে চলো, চাঁদের আলোয় বেরিয়ে পড়ি।'

'কিন্তু ফটকে প্রহরী আছে যে?'

'প্রহরী আমাদের কিছু করতে পারবে না। তোমাকে পিঠে করে নিয়ে আমি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাব। কেউ আমাদের নাগাল পাবে না।'

'সত্যি বলছ ?'

'সত্যি।'

'কিন্তু যে আমার এমন বন্ধুর কাজ করল, তার নামটা তো এখনো জানলাম না।'

'আমার নাম কানাই।'

'আর আমার নাম কিশোর।'

'তবে চলো যাই এবার। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে যাবো।'

'বেশ। নীচে সিঁড়ির মুখে দরজা পেরোলেই বাগান।'

'সেইখান থেকেই দেবো ছুট!'

॥ ৪ ॥

গোপালদের বাড়ি তাঁতি পাড়ার এক প্রান্তে। সেখানে শুখ্‌নাই রোগ এখনো পৌঁছায়নি, কিন্তু কবে এসে পৌঁছবে তার ঠিক কি ? গোপালের মা সেই কথা ভেবে কানাই আর কিশোরকে বলেছিলেন, 'আমার এখানে থাকার বিপদটা কী তা জানো। সেটা ভেবেও কি তোমরা তিনজনে একসঙ্গে থাকতে চাও ?'

তিনজনেই মাথা নেড়ে বলেছিল—হ্যাঁ, তারা তাই চায়। সেই সঙ্গে কানাই বলেছিল, 'আপনি ভাববেন না। শুখ্‌নাই রোগের ওষুধ আছে রাজবাড়িতে। সে ওষুধ আমি জোগাড় করবই যে করে হোক। তাহলে আর কারুর ব্যারাম থাকবে না।'

কিন্তু মুখে বলা এক, আর কাজে আরেক।

তিনদিন কেটে গেল, তবু কাজ এগোলো না একটুও। আর মাত্র দুদিন আছে কানাইয়ের বাপ, তারপরেই তার আয়ু শেষ। এদিকে ঝিনুকেও আর কোনো কথা শোনা যায়নি। জগাইবাবা এমন চুপ কেন ?

এর মধ্যে অবিশ্যি আরো অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। কানাই আর রাজকুমার দুজনেই কয়েদী অবস্থা থেকে পালিয়েছে দেখে রাজবাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেছে! এ জিনিস কেমন করে হয় ? যে প্রহরী দুজন পাহারায় ছিল তাদের দুজনকেই শূলে চড়ানো হয়েছে। কানাই আর কিশোরকে ধরার জন্য শয়ে শয়ে সেপাই সারা রাজ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। গোপাল তাঁতির সঙ্গে যে রাজকুমারের ভাব ছিল সেটা রাজা জানতেন, তাই গোপালের বাড়িতেও পেয়াদা পাঠিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় কানাই বুদ্ধি করে 'ফক্কা' বলে অদৃশ্য হয়ে পেয়াদার হাত থেকে বল্লম টেনে নিয়ে তাকে ল্যাঙ মেরে ফেলে দিয়েছে; পেয়াদা এই ভেল্‌কিতে ভড়কে গিয়ে দিয়েছে চম্পট।

তারপর থেকে গোপালের বাড়িতে আর কেউ আসেনি।

আজ কানাই আর সবুর সইতে না পেরে কিশোরকে বলল, 'হ্যাঁ ভাই, সেই জাদুপান্না না সরাতে পারলে তো আর চলছে না। একবার একটু ভেবে বল দেখি তোমার বাবা একা কখন থাকেন, তার কাছাকাছি যাবার সুযোগটা কখন পাওয়া যায়?'

কিশোর বলল, 'জাদুপান্না নিলেই যে সব গোল মিটে যাবে তেমন ভেবো না। বরং উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হতে পারে, বাবার রাগ সপ্তমে চড়ে যেতে পারে।'

কানাই বলল, 'তাও চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? তুমি একবার একটু ভেবে বল।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে ভেবে রাজকুমার বলল, 'একটা কথা মনে পড়েছে।'

'কী কথা?'

'বাবা রোজ ভোরে সূর্যোদয়ের সময় রাজবাড়ির অন্দরমহলের দীঘিতে স্নান করতে যান। সেই সময় প্রহরী থাকে দূরে। বাবার কাছাকাছি কেউ থাকে না।'

'তবে আর কী!' বলল কানাই, 'এই তো সুযোগ। কাল ভোরে আমি রাজবাড়ি যাব অদৃশ্য হয়ে। দেখি তোমার বাবার সঙ্গে দীঘিতে গিয়ে কিছু করা যায় কিনা।'

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই কানাই 'ফক্কা' বলে অদৃশ্য হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে রাজবাড়ি পৌঁছে দীঘির শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঘাটের কাছেই একটা বকুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। পুব আকাশে পদ্মের রং ধরেছে কিন্তু সূর্য তখনো ওঠেনি।

কিছু পরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কানাই খট খট শব্দ শুনে বুঝল রাজা খড়ম পায়ে ঘাটে আসছেন।

ওই যে রাজা! রাজার গা খালি। পরনে কেবল ধুতি আর কাঁধের উপর একটা রেশমের উত্তরীয়। উত্তরীয়টা ঘাটের পাশের বেদীতে রেখে রাজা খড়ম খুলে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। গলার হারের পান্নাতে সূর্যের আলো পড়ে যেন তার থেকে আগুন বেরোচ্ছে।

এবার রাজা জলে নামলেন। কানাইও এগিয়ে গেল ঘাটের সিঁড়ির দিকে, তারপর ধীরে ধীরে সেও জলে নেমে রাজার সাত হাত দূরে গলা জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাজা যেই ডুব দিলেন, অমনি কানাইও ডুব দিয়ে সাঁতরে এগিয়ে এসে পলকের মধ্যে রাজার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে আবার ডুব সাঁতার দিয়ে দীঘির উল্টো পারে গিয়ে জল থেকে উঠল।

ততক্ষণে রাজা দিশেহারা হয়ে জলে তাঁর হার খুঁজছেন আর 'প্রহরী, প্রহরী' বলে ডাকছেন।

প্রহরী ছুটে এল। 'কী হল মহারাজ?'

'এই সেই শয়তান রাঘব বোয়ালের কাজ। আমার গলা থেকে হার খুলে নিয়ে গেল। খবর দিয়ে দে। দরকার হলে দীঘির জল সেঁচতে হবে। হার আমার ফেরত চাই।'

ইতিমধ্যে অদৃশ্য কানাই হাতের মুঠোয় হার নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এক ছুটে মুহূর্তের মধ্যে চলে এল একেবারে গোপালের বাড়ি। তারপর 'টক্কা' বলে আবার নিজের চেহারায় ফিরে এসে রাজকুমারকে দেখিয়ে দিল যে তার কাজ সে করে এসেছে।

কিন্তু এর ফলে রাজার মধ্যে কোনো পরিবর্তন এল কিনা সেটা কী করে বোঝা যাবে?

কানাইয়ের সে বুদ্ধিও মাথায় এসে গেছে। সে বলল, 'আমি কাল অদৃশ্য হয়ে রাজসভায় যাবো। রাজার হাবভাব কীরকম সেটা দেখে আসব।'

তাই ঠিক হল, আর কানাই পরদিন রাজসভায় গিয়ে হাজির হল।

সভাসদরা এসে গেছেন, কিন্তু রাজা তখনো আসেননি।

কানাই পিছনের দিকে এক কোনায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

সময় চলে যায়, কিন্তু রাজার দেখা নেই।

প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর রাজামশাই এসে ঢুকলেন সভায়।

কিন্তু কই, রাজার চেহারায় ভালোর দিকে পরিবর্তনের তো কোনো লক্ষণ নেই। চোখে তো সেই একই শয়তানের দৃষ্টি, কেবল ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির বদলে আজ প্রচণ্ড রাগ।

রাজা সিংহাসনে বসে চারিদিকে একবার লাল চোখে দেখে নিয়ে বললেন, 'আমার রাজ্যে মহা শয়তান এক জাদুকরের আবির্ভাব হয়েছে। সে নিজে কয়েদখানা থেকে প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, আমার ছেলেকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে, আমার গলা থেকে আমার সাধের পান্নার হার খুলে নিয়েছে। গতকাল ভোরে দীঘিতে ডুব দেবার সময় এই ঘটনা ঘটে। আমি ভেবেছিলাম এ বোয়াল মাছের কাণ্ড, কিন্তু দীঘির জল সেঁচে সেই বোয়াল মাছকে ধরেও সে হার পাওয়া যায়নি। আজ থেকে শাসন হবে আরো দশগুণ কড়া। যতদিন সেই জাদুকর আর রাজকুমারকে খুঁজে না পাওয়া যায়, ততদিন হাটবাজার সব বন্ধ। লোকে না খেয়ে মরে মরুক!'

এই ভীষণ কয়েকটা কথা বলে রাজা সিংহাসন ছেড়ে চলে গেলেন। কানাই

একেবারে মুসড়ে পড়ল। জাদুপন্না খুলে নিয়ে ফল আরো খারাপ হল। এখন কী উপায় ?

কানাই গোপালের বাড়ি ফিরে এল।

তার কাছে সব শুনে-টুনে কিশোর আর গোপালের মুখও শুকিয়ে গেল। একে দেশে মড়ক, তার উপর রাজার এই মূর্তি ! সারা দেশ তো ছারখার হয়ে যাবে।

কানাই তখন মনে মনে ভাবছে—আর একদিন মাত্র সময়। এই একদিনের মধ্যে চাঁদনির পাতা জোগাড় না হলে সে বাবাকে হারাবে।

দূর থেকে ঢ্যাঁড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ঘোষণা। আজ থেকে বাজারে কেনাবেচা বন্ধ। সেই সঙ্গে এও ঘোষণা হচ্ছে যে রাজকুমার আর জাদুকরকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। ঢ্যাঁড়ার দুম্ দুম্ শব্দ ক্রমে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাঁতি পাড়াতেও ঘোষণা হবে।

এই ডামাডোলের মধ্যে কানাই হঠাৎ চমকে উঠল।

তার নাম ধরে কে ডাকে ক্ষীণ স্বরে ?

সে তৎক্ষণাৎ ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে কানে দিল। পরিষ্কার শোনা গেল জগাইবাবার কথা।

'শোন্ কানাই, মন দিয়ে কাজের কথা শোন্। কাল সকালে এক প্রহরে তুই যাবি রাজবাড়ির অন্দরমহলের বাগানের ঈশান কোণে। সেই কোণে জলে ঘেরা একটা ছোট্ট দ্বীপে চাঁদনি গাছ পোঁতা আছে। সেই গাছ তোকে উদ্ধার করতে হবে।'

'কী করে জগাইবাবা ?'

'সেটা হবে তোর নিজের বুদ্ধি আর সাহসের জোরে। কাজটা সহজ নয়। বুঝলি ?'

'বুঝলাম,কিন্তু—'

'কিন্তু কী ?'

'হল্‌দে ফলের গুণ কী সেটা তো বললেন না।'

'এখনো মনে পড়েনি। পড়লে বলব। আগে তোর বাপকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর। তার প্রায় শেষ অবস্থা। তবে পাতার রস খেলেই সে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আসি।'

ঝিনুকের মধ্যে আবার সমুদ্রের গর্জন।

কানাই সব ঘটনা বলল কিশোর আর গোপালকে। 'কাল এক প্রহর', সব শেষে বলল কানাই। 'কালই এসপার নয় ওসপার।'

॥ ৫ ॥

জগাইবাবার নির্দেশ মতো কানাই সকাল থেকেই অদৃশ্য হয়ে বাগানে হাজির হল। তারপর বাগানের ঈশান কোণে গিয়ে যা দেখল তাতে তার চক্ষুস্থির। একটা ছোট্ট দ্বীপে চাঁদনি গাছটা পোঁতা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই এক-মানুষ উঁচু গাছটার গোড়ায় পেঁচিয়ে আছে একটা শঙ্খচূড় সাপ, যার এক ছোবলেই একটা মানুষ পায় অক্কা। আর দ্বীপটাকে ঘিরে আছে একটা পাঁচ হাত চওড়া পরিখা, তাতে কিলবিল করছে পাঁচ-সাতটা কুমীর। কানাই যখন পৌঁছাল তখন সেই কুমীরগুলোর দিকে কোলা ব্যাঙ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে একটা লোক আর সেগুলো কপ্ কপ্ করে গিলে খাচ্ছে কুমীরগুলো। একটা ব্যাঙ সাপটার দিকেও ছুঁড়ে দেওয়া হল, আর সেটা তক্ষুনি সে মুখে পুরে গিলতে আরম্ভ করল।

খাওয়া শেষ হলে কানাই দুগ্গা বলে কাজে লেগে গেল। আজই শেষ দিন, আজ তাকে যে করে হোক চাঁদনির পাতা জোগাড় করতেই হবে।

বাগানের এক পাশে পাঁচিলের ধারে কিছু বাঁশ পড়ে আছে। অদৃশ্য কানাই তার থেকে দুটো বাঁশ নিয়ে সেগুলোকে পরিখার পাঁচিলে এমনভাবে শুইয়ে রাখল যে বাঁশের অন্য দিক দ্বীপের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে বেশ একটা সেতু তৈরি হয়ে গেল কুমীর বাঁচিয়ে দ্বীপে যাবার জন্য।

কিন্তু সাপের কী হবে?

তার জন্য চাই অস্ত্র।

কানাই বাগানের ফটকে গিয়ে দেখল সেখানে হাতে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে একটা সেপাই দাঁড়িয়ে আছে। অদৃশ্য কানাই তার হাত থেকে একটানে তলোয়ারটা বার করে নিল। তারপর সেপাইকে হতভম্ব করে দিয়ে শূন্য দিয়ে সে তলোয়ার নিয়ে বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে দ্বীপে পৌঁছে এক কোপে শঙ্খচূড়ের মাথা শরীর থেকে আলগা করে দিল. তারপর তলোয়ারটাকে পরিখার জলে ফেলে অদৃশ্য কানাই এক হ্যাঁচকায় শেকড়সুদ্ধ চাঁদনি গাছটাকে তুলে সেতু পেরিয়ে এসে ঝড়ের বেগে চলে এল গোপালের বাড়ি। তারপর 'টক্কা' বলে সে নিজের চেহারায় ফিরে এল।

গোপাল কানাইয়ের হাতে গাছ দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'চলো যাই ঘরে ঘরে পাতা বিলিয়ে আসি!'

'তাই যাও', বলল কানাই। 'তবে একটা পাতা আমি নিচ্ছি। আমি আবার ফিরে আসব বিকেল পড়তে না পড়তেহ। আজই শেষ দিন; আজ আমার বাবাকে বাঁচাবার শেষ সুযোগ।'

তীরের বেগে দেখতে দেখতে নন্দীগ্রামে তার বাড়িতে পৌঁছে গেল কানাই।

বাবা বিছানায় পড়ে আছে, তার শরীরের প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়।

'কানাই এলি ?' ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করল বলরাম কৃষক।

কানাই তখন পাতার রস বার করতে শুরু করছে। বেগুনী পাতার বেগুনী রস।

'এই নাও বাবা, খেয়ে নাও।'

কোনো মতে ঘাড় উঁচু করে রস খেয়ে 'আঃ' বলে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে আবার বালিশে মাথা দিল বলরাম। আর তার পরমুহূর্তেই তার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। 'অনেক আরাম বোধ করছি রে কানাই ! তুই আমাকে বাঁচালি এ-যাত্রা।'

কানাই বাবাকে বলল তার একবার রূপসা যেতে হবে, সেখানকার খবর নেওয়া দরকার। কাজ সেরেই সে আবার ফিরে আসবে।

'তা যা', বলল বলরাম, 'তবে যাবার আগে কিছু ফল আর এক বাটি দুধ রেখে যাস খাটের পাশে। মনে হচ্ছে খিদে পাবে।'

কানাই বাবার ফরমাশ পালন করে রূপসা গিয়ে হাজির হল।

শহরের চেহারাই বদলে গেছে। তাঁতি পাড়ায় ঘরে ঘরে হাসিমুখ দেখতে দেখতে কানাই পৌঁছাল গোপালের বাড়ি। কিশোরও রয়েছে সেখানে, কিন্তু তার মুখ গম্ভীর।

'কী ভাবছ কিশোর ?' জিজ্ঞেস করল কানাই।

'ভাবছি বাবার কথা', বলল কিশোর। 'বাবারও ব্যারাম হয়েছে।'

'অ্যাঁ, সে কী ? কী করে জানলে ?'

'ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে গেল। বলল রাজার অসুখ; রাজা আমাকে দেখতে চায়। আমি যেখানেই থাকি যেন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি।'

'ব্যারাম মানে কী ব্যারাম ?' জিজ্ঞেস করল কানাই।

'শুখনাই। তাঁতির যা অসুখ; তোমার বাপের যা অসুখ, বাবারও সেই অসুখ। আর তার একমাত্র ওষুধ এখন আমাদের কাছে।'

'তা বেশ তো', বলল কানাই, 'সে ওষুধ তাকে দাও, কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী শর্ত ?'

'তিনি যেন রোগ সারলেই রাজকার্য ছেড়ে তীর্থে যান। আর তাঁর জায়গায় তুমি বসো সিংহাসনে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম', বলল কিশোর।

'একটা কথা বলব ?' হঠাৎ বলে উঠল গোপাল তাঁতি।

'কী কথা ভাই ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তুমি রাজা হলে আমায় একটা নতুন তাঁত দেবে ? যেটা আছে সেটা আমার
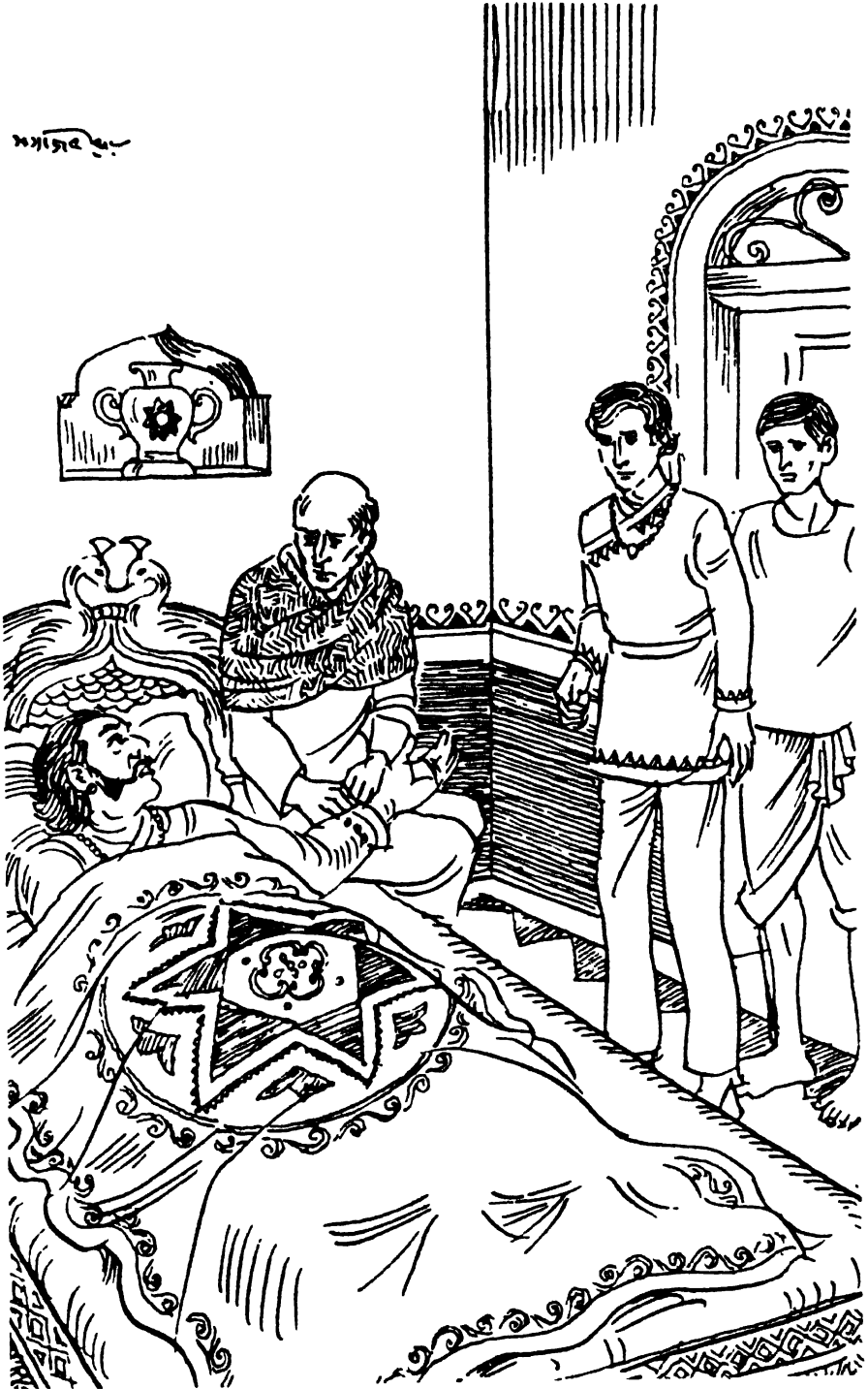
ঠাকুরদাদার। তাতে ভালো বোনা যায় না।'

'নিশ্চয়ই দেব', বলল কিশোর। 'তুমি হবে তাঁতির সেরা তাঁতি। তোমার বোনা কাপড় পরে আমি সিংহাসনে বসব।' তারপর কানাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'চলো যাই বাবার কাছে।'

কানাইয়ের পিঠে চড়ে এক মুহূর্তে প্রাসাদের অন্দরমহলে পৌঁছে গেল কিশোর। রাজবাড়িতে শোকের ছায়া পড়েছে। রাজার অসুখের একমাত্র ওষুধ চাঁদনি পাতা ভেলকির বশে রাজার উদ্যান থেকে উধাও হয়ে গেছে। আর বিশ দিন মাত্র আয়ু তাঁর।

রাজার শোবার ঘরের বাইরে প্রহরী কিশোর আর কানাইকে দেখে চমকে উঠল, কিন্তু তাদের কোনো বাধা দিল না। কিশোর আর কানাই সোজা গিয়ে ঢুকল রাজার ঘরে।

রাজা শয্যা নিয়েছেন, পাশে রাজ কবিরাজ মাথায় হাত দিয়ে বসে রাজার প্রশ্নের উত্তরে বলছেন আর কোনো জায়গায় চাঁদনি গাছ নেই, আর এ-রোগের আর কোনো চিকিৎসাও নেই।

ঠিক সেই সময় গিয়ে উপস্থিত হল কিশোর আর কানাই।

'তুই এলি!' ছেলেকে দেখে কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন রাজা। 'তবে তোর সঙ্গে এ কেন? এ যে পিশাচসিদ্ধ জাদুকর!'

'না বাবা', বলল কিশোর। 'এ হল রূপসার ভবিষ্যৎ মন্ত্রী।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ বাবা। আমি সঙ্গে করে তোমার ওষুধ এনেছি। এই ওষুধ তোমাকে দেব যদি কথা দাও যে অসুখ সারলেই তীর্থে চলে যাবে চিরকালের মতো।'

'তা কেন দেব না কথা', বললেন রাজা, 'যত নষ্টের গোড়া ছিল ওই জাদুপান্না, যদিও রোগের হাত থেকে ওটাই আমাকে এতদিন রক্ষা করেছে। সেই পান্না যাবার পর থেকেই আমার দেহে আর মনে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আমি বুঝেছি কত ভুল করেছি। আমি যাবো তীর্থে, আর তুই বসবি আমার জায়গায় সিংহাসনে। রূপসার গৌরব ফিরিয়ে আনবি। লোকে ধন্য ধন্য করবে।'

রাজকুমার এবার তার হাতের মুঠো খুলে ধরল বাপের সামনে। সেই মুঠোয় চাঁদনির বেগুনী পাতা, তার সৌরভে রাজার শয়নকক্ষ ভরপুর হয়ে গেল।

রাজা সেরে উঠলেন একদিনেই।

তিনদিন পরে যুবরাজের অভিষেক হল। রাজা নিজে তার হাত ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন ছেলেকে, তার পরনে গোপালের তৈরি পোষাক। তারপর কিশোর কানাইকে বসিয়ে দিল মন্ত্রীর আসনে। ইতিমধ্যে কানাই নন্দীগ্রামে গিয়ে তার বাবাকে নিয়ে এসেছে, কিশোর বলরামকে থাকবার ঘর

দিয়েছে, তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

চারদিকে শাঁখ বাজছে, রোশন চৌকিতে সানাই বাজছে, তারই মধ্যে মন্ত্রীর আসনে বসে কানাই শুনতে পেল জগাইবাবার ডাক।

'কানাই ! কানাই ! কানাই !'

কানাই রাজসভার মধ্যেই ট্যাঁক থেকে ঝিনুক বার করে কানে দিল। খ্যান খ্যান করে শোনা গেল জগাইবাবার কথা।

'তোর তো আস্পর্ধা কম না—তোর বিদ্যেবুদ্ধি নেই তুই রূপসার মন্ত্রীর আসনে বসেছিস ?'

'কী করব জগাইবাবা', মনে মনে বলল কানাই, 'আমি কি আর নিজে থেকে বসেছি ?—এরা আমায় বসিয়েছে।'

'তবে শোন বলি', এলো জগাইবাবার কথা। 'অ্যাদ্দিনে মনে পড়েছে। সেই হলদে ফলটা আছে তো ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আছে !'

'এইবার সেইটে খেয়ে নে। সেটা খেলে তোর বিদ্যেবুদ্ধি হাজার গুণ বেড়ে যাবে। মন্ত্রাগিরি কীভাবে করতে হয়, রাজাকে মন্ত্রণা কীভাবে দিতে হয়, দেশের মঙ্গল কিসে হয়, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কাকে বলে—সব জানতে পারবি। তখন আর তোকে বেমানান লাগবে না, কেউ বলবে না তুই বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেছিস। বুঝেছিস ?'

'বুঝেছি জগাইবাবা, বুঝেছি।'

'তাহলে আসি।'

ঝিনুকে আবার সমুদ্রের গর্জন।

কানাই ঝিনুকটা আবার ট্যাঁকে গুঁজে তার পাশ থেকে হলদে ফলটা বার করে মুখে পুরল।

অনুবাদ

রে ব্র্যাডবেরি

মঙ্গলই স্বর্গ

মহাকাশ থেকে রকেটটা নেমে আসছে তার গন্তব্যস্থলের দিকে। এতদিন সেটা ছিল তারায় ভরা নিঃশব্দ নিকষ কালো মহাশূন্যে একটি বেগবান ধাতব উজ্জ্বলতা। অগ্নিগর্ভ রকেটটা নতুন। এর দেহ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে উত্তাপ। এর কক্ষের মধ্যে আছে মানুষ—ক্যাপ্টেন সমেত সতেরজন। ওহাইয়ো থেকে রকেটটা যখন আকাশে ওঠে তখন অগণিত দর্শক হাত নাড়িয়ে এদের শুভযাত্রা কামনা করেছিল। প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গারের সঙ্গে সঙ্গে রকেটটা সোজা উঠে ছুটে গিয়েছিল মহাশূন্যের দিকে। মঙ্গল গ্রহকে লক্ষ করে এই নিয়ে তৃতীয়বার রকেট অভিযান।

এখন রকেট মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। তার গতি ক্রমশ কমে আসছে। এই মন্থর অবস্থাতেও তার শক্তির পরিচয় সে বহন করছে। এই শক্তিই তাকে চালিত করেছে মহাকাশের কৃষ্ণসাগরে। চাঁদ পেরোনোর পরেই তাকে পড়তে হয়েছিল অসীম শূন্যতার মধ্যে। যাত্রীরা নানান প্রতিকূল অবস্থায় বিধ্বস্ত হয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিল। একজনের মৃত্যু হয়। বাকি ষোলজন এখন স্বচ্ছ জানালার ভিতর দিয়ে বিমুগ্ধ চোখে মঙ্গলের এগিয়ে আসা দেখছে।

'মঙ্গল গ্রহ !' সোল্লাসে ঘোষণা করল রকেটচালক ডেভিড লাস্টিগ।

'এসে গেল মঙ্গল', বলল প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল হিংস্টন।

'যাক !' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক।

রকেটটা একটা মসৃণ সবুজ ঘাসে ঢাকা লনের উপর এসে নামল। যাত্রীরা লক্ষ করল ঘাসের ওপর দাঁড়ানো একটি লোহার হরিণের মূর্তি। তারও বেশ কিছুটা পিছনে দেখা যাচ্ছে রোদে ঝলমল একটা বাড়ি যেটা ভিক্টোরীয় যুগের পৃথিবীর বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সর্বাঙ্গে বিচিত্র কারুকার্য, জানালায় হলদে নীল সবুজ গোলাপী কাঁচ। বাড়ির বারান্দার সামনে দেখা যাচ্ছে

জেরেনিয়াম গাছ আর বারান্দায় মৃদু বাতাসে আপনিই দুলছে ছাত থেকে ঝোলানো একটি দোলনা। বাড়ির চুড়োয় রয়েছে জানালা সমেত একটি গোল ঘর, যার ছাতটা যেন একটা গাধার টুপি।

রকেটের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মঙ্গলের এই শান্ত শহর যাব উপর বসন্ত ঋতুর প্রভাব স্পষ্ট। আরো বাড়ি চোখে পড়ে, কোনোটা সাদা, কোনোটা লাল,—আর দেখা যায় লম্বা লম্বা এল্‌ম্‌ মেপল্‌ ও হর্স চেস্টনাট গাছের সারি। গির্জাও রয়েছে দু-একটা, যার সোনালী ঘন্টাগুলো এখন নীরব।

রকেটের মানুষগুলি এ দৃশ্য দেখল। তারপর তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আবার বাইরে দৃষ্টি দিল। তারা সকলেই এ-ওর হাত ধরে আছে, সকলেই নির্বাক, নিশ্বাস নিতেও যেন ভরসা পাচ্ছে না তারা।

'এ কী তাজ্জব ব্যাপার!' ফিসফিসিয়ে বলল লাস্টিগ।

'এ হতে পারে না!' বলল স্যামুয়েল হিংস্টন।

'হে ঈশ্বর।' বললেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক। রাসায়নিক তাঁব গবেষণাগার থেকে স্পীকারে একটি তথ্য ঘোষণা করলেন—'বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে। নিশ্বাস নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।'

লাস্টিগ বলল, 'তাহলে আমরা বেরোই।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক, 'আগে তো ব্যাপারটা বুঝতে হবে।'

'ব্যাপারটা হল এটি একটি ছোট্ট শহর, যাতে মানুষের নিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট অক্সিজেন আছে—ব্যস।'

প্রত্নতাত্ত্বিক হিংস্টন বলল, 'আর এই শহর একেবারে পৃথিবীর শহরের মতো। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছে।'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক হিংস্টনের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর যে দুটি বিভিন্ন গ্রহে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে গড়ে উঠতে পারে?'

'সেটা সম্ভব বলে আমার জানা ছিল না।'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বাইরের শহরের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমাদের বলছি শোন,—জেরেনিয়াম হচ্ছে এমন একটি গাছ যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল না। ভেবে দেখ, কত হাজার বছর লাগে একটি উদ্ভিদের আবির্ভাব হতে! এবার তাহলে বলো এটা যুক্তিসম্মত কিনা যে আমরা মঙ্গল গ্রহে এসে দেখতে পাব—এক, রঙীন কাঁচ বসানো জানালা; দুই, বাড়ির মাথায় গোল ঘরের উপর গাধার টুপি; তিন, বারান্দার ছাত থেকে ঝুলন্ত দোলনা; চার, একটি বাদ্যযন্ত্র, যেটা পিয়ানো ছাড়া আর কিছু হতে পারে না আর পাঁচ—যদি তোমরা

এই দূরবীনের মধ্যে দিয়ে দেখো তাহলে দেখবে পিয়ানোর উপর একটি গানের স্বরলিপি রয়েছে, যার নাম "বিউটিফুল ওহাইয়ো"। তার মানে কি মঙ্গলেও একটি নদী আছে যার নাম ওহাইয়ো ?'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন উইলিয়াম্‌স্ কি এর জন্য দায়ী হতে পারেন না ?'

'তার মানে ?'

'ক্যাপ্টেন উইলিয়াম্‌স্ ও তাঁর তিন সহযাত্রী ! অথবা ন্যাথেনিয়াল ইয়র্ক ও তাঁর সহযাত্রী। এটা নিঃসন্দেহ এঁদেরই কীর্তি।'

'এই বিশ্বাস যুক্তিহীন,' বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। 'আমরা যতদূর জানি ইয়র্কের রকেট মঙ্গলে পৌঁছনোমাত্র ধ্বংস হয়। ফলে ইয়র্ক ও তাঁর সহযাত্রীর মৃত্যু হয়। উইলিয়াম্‌সের রকেট মঙ্গল গ্রহে পৌঁছনোর পরের দিন ধ্বংস হয়। অন্তত দ্বিতীয় দিনের পর থেকে তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উইলিয়াম্‌সের দল যদি বেঁচে থাকত তাহলে তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করত। ইয়র্ক মঙ্গলে এসেছিল এক বছর আগে. আর উইলিয়াম্‌স্ গত আগস্ট মাসে। ধর যদি তারা এখনো বেঁচে থাকে, এবং মঙ্গল গ্রহে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী বাস করে. তাহলেও কি তাদের পক্ষে এই ক'মাসের মধ্যে এমন একটা শহর গড়ে তোলা সম্ভব ? শুধু গড়ে তোলা নয়,—সেই শহরের উপর কৃত্রিম উপায়ে বয়সের ছাপ ফেলা সম্ভব ? শহরটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা অন্তত বছব সত্তরের পুরোনো। ওই বাড়ির বারান্দার কাঠের থামগুলো দেখ। গাছগুলোর বয়স একশো বছরের কম হওয়া অসম্ভব। না—এটা ইয়র্ক বা উইলিয়ামসের কীর্তি হতে পারে না। এর রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। এই শহরের অস্তিত্বের কারণ না জানা পর্যন্ত আমি এই রকেট থেকে বেরোচ্ছি না !'

লাস্টিগ বলল, 'এটা ভুললে চলবে না যে ইয়র্ক ও উইলিয়াম্‌স্ নেমেছিল মঙ্গলের উল্টোপিঠে। আমরা ইচ্ছে করেই এ পিঠ বেছে নিয়েছি।'

'ঠিক কথা,' বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। 'হিংস্র মঙ্গলবাসীদের হাতে যদি ইয়র্ক ও উইলিয়াম্‌সের দলের মৃত্যু হয়ে থাকে, তাই আমাদের বলা হয়েছিল ল্যান্ডিং-এর জন্য অন্য জায়গা বেছে নিতে যাতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। তাই আমরা নেমেছি এমন একটি জায়গায় যার সঙ্গে ইয়র্ক বা উইলিয়াম্‌সের কোনো পরিচয়ই হয়নি।'

হিংস্টন বলল, 'যাই হোক, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে শহরটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। এমনও হতে পারে যে দুই গ্রহ ঠিক একই সঙ্গে একই নিয়মের মধ্যে গড়ে উঠেছে। একই সৌরজগতের গ্রহে হয়তো এটা সম্ভব। হয়তো

আমরা এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।'

'আমার মতে আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। হয়তো এই আশ্চর্য ঘটনাই সর্বপ্রথম ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করবে।'

'ঈশ্বরের বিশ্বাসের জন্য এমন একটা ঘটনার কোনো প্রয়োজন হয় না, হিংস্টন।'

'আমি নিজেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী,' বলল হিংস্টন, 'কিন্তু এমন একটা শহর ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত গড়ে উঠতে পারে না। শহরের প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ করুন। আমি তো হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না।'

'আসল রহস্যটা কী সেটা জানার আগে হাসি কান্না কোনোটারই প্রয়োজন নেই।'

লাস্টিগ এবার মুখ খুলল।

'রহস্য ? দিব্যি মনোরম একটি শহর, তাতে আবার রহস্য কী ? আমার তো নিজের জন্মস্থানের কথা মনে পড়ছে।'

'তুমি কবে জন্মেছিলে, লাস্টিগ ?' ব্ল্যাক প্রশ্ন করলেন।

'১৯৫০ সালে, স্যার।'

'আর তুমি, হিংস্টন ?'

'১৯৫৫। আমার জন্ম আইওয়ার গ্রিনেল শহরে। এই শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি আমার জন্মস্থানে ফিরে এসেছি।'

'তোমাদের দুজনেরই বাপের বয়সী আমি', বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। 'আমাব বয়স আশী। ইলিনয়ে ১৯২০ সালে আমার জন্ম। বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বছরে বৃদ্ধদের নবযৌবন দান করার উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তার জোরেই আমি আজ মঙ্গল গ্রহে আসতে পেরেছি, এবং এখনো ক্লান্তি বোধ করছি না। কিন্তু আমার মনে সন্দেহের মাত্রা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। এই শান্ত শহরের চেহারার সঙ্গে ইলিনয়ের গ্রীন ক্লাফ্ শহরের এত বেশি মিল যে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি। এত মিল স্বাভাবিক নয়।'

কথাটা বলে ব্ল্যাক রেডিও অপারেটরের দিকে চাইলেন।

'শোনো—পৃথিবীতে খবর পাঠাও। বলো যে আমরা মঙ্গল গ্রহে ল্যান্ড করেছি। এইটুকু বললেই হবে। বলো কালকে বিস্তারিত খবর পাঠাব।'

'তাই বলছি স্যার।'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক এখনো চেয়ে আছেন শহরটার দিকে। তাঁর চেহারা দেখলে তাঁর আসল বয়সের অর্ধেক বলে মনে হয়। এবার তিনি বললেন, 'তাহলে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এই—লাস্টিগ, হিংস্টন আর আমি একবার নেমে ঘুরে দেখে আসি। অন্যেরা রকেটেই থাকুক; যদি প্রয়োজন হয় তখন তারা

বেরোতে পারে। কোনো গোলমাল দেখলে তারা এর পরে যে রকেটটা আসার কথা আছে সেটাকে সাবধান করে দিতে পারে। এর পর ক্যাপ্টেন ওয়াইলডারের আসার কথা। আগামী ডিসেম্বরে রওনা হবেন। যদি মঙ্গল গ্রহে সত্যিই অমঙ্গল কিছু থাকে তাহলে তাদের সে বিষয় তৈরি হয়ে আসতে হবে।'

'আমরাও তো সে ব্যাপারে তৈরিই আছি। আমাদের তো অস্ত্রের অভাব নেই।'

'তাহলে সকলে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুক। —চলো, আমরা নেমে পড়ি।'

তিনজন পুরুষ রকেটের দরজা খুলে নীচে নেমে গেল।

দিনটা চমৎকার। তার উপর আবার বসন্তকালের সব লক্ষণই বর্তমান। একটি রবিন পাখি ফুলে ভরা আপেল গাছেব ডালে বসে আনমনে গান গাইছে। মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের পাপড়ি মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে মাটিতে। ফুলের গন্ধও ভেসে আসছে সেই সঙ্গে। কোথা থেকে যেন পিয়ানোর মৃদু টুং টাং শোনা যাচ্ছে, আব সেই সঙ্গে অন্য কোন বাড়ি থেকে ভেসে আসছে সেই আদ্যিকালের চোঙাওয়ালা গ্রামোফোনে বাজানো আদ্যিকালেব প্রিয় গাইয়ে হ্যারি লডারের গান।

তিনজন কিছুক্ষণ রকেটের দবজার বাইবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তারা হাঁটতে শুরু কবল খুব সাবধানে, কাবণ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পবিমাণ পৃথিবীর চেয়ে কিছু কম, তাই বেশি পবিশ্রম করা চলবে না।

এবারে গ্রামোফোনেব রেকর্ড বদলে গেছে। এবার বাজছে 'ও, গিভ মি দ্য জুন নাইট।'

লাস্টিগের স্নায়ু চঞ্চল। হিংস্টনেরও তাই। পরিবেশ শান্ত। দূরে কোথা থেকে যেন একটা জলের কুল কুল শব্দ আসছে, আর সেই সঙ্গে একটা ঘোড়ায় টানা ওয়্যাগনের অতি পরিচিত ঘড় ঘড় শব্দ।

হিংস্টন বলল, 'স্যাব, আমার এখন মনে হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই আসতে আরম্ভ করেছে।'

'অসম্ভব।'

'কিন্তু তাহলে এইসব ঘববাড়ি, এই লোহার হরিণমূর্তি, এই পিয়ানো, পুরনো রেকর্ডের গান—এগুলোর অর্থ করবেন কী করে?' হিংস্টন ক্যাপ্টেনের হাত ধরে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার মুখের দিকে চাইল। —'ধরুন যদি এমন হয় যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছু যুদ্ধবিরোধী লোক একজোট হয়ে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে একটা রকেট বানিয়ে এখানে চলে আসে?'

'সেটা হতেই পারে না, হিংস্টন।'

'কেন হবে না? তখনকার দিনে পৃথিবীতে ঢাক না পিটিয়ে গোপনে কাজ

করার অনেক বেশি সুযোগ ছিল।'

'কিন্তু রকেট জিনিসটা তো আর মুখের কথা নয়। সেটা নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা তখনকার দিনেও অসম্ভব হত।'

'তারা এখানেই এসে বসবাস শুরু করে', হিংস্টন বলে চলল, 'এবং যেহেতু তাদের রুচি, তাদের সংস্কৃতি, তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তাই তাদের বসবাসের পরিবেশও তৈরি করে নিয়েছিল পৃথিবীর মতো করেই।'

'তুমি বলতে চাও তারাই এতদিন এখানে বসবাস করছে?'

'হ্যাঁ, এবং পরম শান্তিতে। হয়তো তারা আরো বার কয়েক পৃথিবীতে ফিরে গিয়েছিল আরো লোকজন সঙ্গে করে আনার জন্য। একটা ছোট শহরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে এমন সংখ্যক লোক এনে তারা যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল। পৃথিবীর লোকে তাদের কীর্তি জেনে ফেলে এটা নিশ্চয়ই তারা চায়নি। এই কারণেই এই শহরের চেহারা এত প্রাচীন। এ শহর ১৯২৭-এর পর আব একদিনও এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই নয় কি? অথবা এমনও হতে পারে যে মহাকাশ অভিযান ব্যাপারটা আমরা যা মনে করছি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। হয়তো পৃথিবীর কোনো একটা অংশে কয়েকজনের চেষ্টায় এটার সূত্রপাত হয়েছিল। তাদের লোক হয়তো মাঝে মাঝে পৃথিবীতে ফিরে গেছে।'

'তোমার যুক্তি প্রায় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।'

'হতেই হবে, স্যার। প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এখন শুধু দরকার এখানকার কিছু লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া।'

পুরু ঘাসের জন্য তিনজনের হাঁটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। ঘাসের গন্ধ তাজা। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মনে যতই সন্দেহ থাকুক না কেন একটা পরম শান্তির ভাব তাঁর দেহমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ত্রিশ বছর পরে তিনি এমন একটা শহরে এলেন। মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন তার মনে একটা প্রসন্নতা এনে দিয়েছিল। আর পরিবেশের সুস্থ সবলতা তাঁর আত্মাকে পরিতুষ্ট করছিল।

তিনজনেই বাড়িটার সামনে বারান্দায় গিয়ে উঠল। দরজার দিকে এগোনোর সময়ে কাঠের মেঝেতে ভারী বুটের শব্দ হল। ভিতরের ঘরটা এখন দেখা যাচ্ছে। একটা পুঁতির পর্দা ঝুলছে। উপরে একটা ঝাড়লণ্ঠন। দেয়ালে ঝুলছে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক জনপ্রিয় শিল্পীর আঁকা একটা বাঁধানো ছবি। ছবির নীচে একটা চেনা ঢঙের আরাম কেদারা। শব্দও শোনা যাচ্ছে—জাগের জলের বরফের টুং টাং। ভিতরের রান্নাঘরে কে যেন পানীয় প্রস্তুত করছে। সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠে গুনগুন করে গাওয়া একটি গানের সুর।

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক কলিং বেল টিপলেন।

ঘরের মেঝের উপর দিয়ে হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। একটি বছর

চল্লিশেকের মহিলা—যাঁর পরনে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ঢঙের পোশাক—পর্দা ফাঁক করে তিনজন পুরুষের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

'আপনারা?'

'কিছু মনে করবেন না।'—ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের কণ্ঠস্বরে অপ্রস্তুত ভাব—'আমরা,—মানে এ ব্যাপারে আপনি কোনো সাহায্য করতে পারেন কিনা...'

ভদ্রমহিলা অবাক দৃষ্টিতে দেখলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে।

'আপনারা কি কিছু বিক্রিটিক্রি করতে এসেছেন?'

'না—না! ইয়ে...এই শহরের নামটা যদি—'

'তার মানে?' মহিলার ভ্রূ কুঞ্চিত। 'এখানে এসেছেন আপনারা, অথচ এই শহরের নাম জানেন না।'

ক্যাপ্টেন বেশ বেকায়দায় পড়ছেন তা বোঝাই যাচ্ছে। বললেন, 'আসলে আমরা এখানে আগন্তুক। আমরা জানতে চাইছি এ শহর এখানে এল কী করে, আর আপনারাই বা কী করে এসেছেন?'

'আপনারা কি সেনসাস নিতে বেরিয়েছেন?'

'আজ্ঞে না।'

'এখানে সবাই জানে যে এ শহর তৈরি হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। আপনারা কি ইচ্ছা করে বোকা সাজছেন?'

'না—না- -মোটেই না', ব্যস্তভাবে বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক, 'আসলে আমরা আসছি পৃথিবী থেকে।'

'পৃথিবী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পৃথিবী। সৌর জগতের তৃতীয় গ্রহ রকেটে করে এসেছি আমরা। আমাদের লক্ষই ছিল চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল।'

মহিলা যেন কতগুলি শিশুকে বোঝাচ্ছে এইভাবে উত্তর দিলেন, 'এই শহর হল ইলিনয়ে। নাম গ্রীন ক্লাফ। আমরা থাকি যে মহাদেশে তার নাম আমেরিকা। তাকে ঘিরে আছে অতলান্তিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। আমাদের গ্রহের নাম পৃথিবী। আপনারা এখন আসতে পারেন। গুড বাই।'

ভদ্রমহিলা বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তিনজন হতভম্বভাবে পরস্পরের দিকে চাইল।

লাস্টিগ বলল, 'চলুন, সোজা ভিতরে গিয়ে ঢুকি।'

'সে হয় না। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি। কিন্তু কী আপদ রে বাবা!'

তিনজনে বারান্দার সিঁড়িতে বসল।

ব্ল্যাক বললেন, 'এমন একটা কথা কি তোমাদের মনে হয়েছে যে আমরা

হয়তো ভুল পথে আবার পৃথিবীতেই ফিরে এসেছি ?'

'সেটা কী করে সম্ভব ?' বলল লাস্টিগ।

'জানি না ! তা জানি না ! মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার শক্তি দাও। হে ভগবান !'

হিংস্টন বলল, 'আমরা সমস্ত রাস্তা হিসাব করে এসেছি। আমাদের ক্রোনোমিটার প্রতি মুহূর্তে বলে দিয়েছে আমরা কতদূর অগ্রসর হচ্ছি। চাঁদ পেরিয়ে আমরা মহাকাশে প্রবেশ করি। এটা মঙ্গল গ্রহ হতে বাধ্য।'

লাস্টিগ বলল, 'ধরো যদি দৈবদুর্বিপাকে আমাদের সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে—আমরা ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে এসেছি ?'

'তোমার বকবকানি বন্ধ করো তো, লাস্টিগ !' অসহিষ্ণুভাবে বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক।

লাস্টিগ উঠে গিয়ে আবার কলিং বেল টিপল। ভদ্রমহিলার পুনর্বাবির্ভাব হতে সে প্রশ্ন করল, 'এটা কোন্ সাল ?'

'এটা যে উনিশশো ছাব্বিশ সেটাও জানেন না ?'

ভদ্রমহিলা ফিরে গিয়ে একটা দোলনা চেয়ারে বসে লেমনেড খেতে শুরু করলেন।

'শুনলেন তো ?' লাস্টিগ ফিরে এসে বলল। 'উনিশশো ছাব্বিশ। আমরা সময়ে পিছিয়ে গেছি। এটা পৃথিবী।'

লাস্টিগ বসে পড়ল। তিনজনেরই মনে এখন গভীর উদ্বেগ। হাঁটুর উপর রাখা তাদের হাতগুলো আর স্থির থাকছে না। ক্যাপ্টেন বললেন, 'এমন একটা অবস্থায় পড়তে হবে সেটা কি আমরা ভেবেছিলাম ? এ কী ভয়াবহ পরিস্থিতি ! এমন হয় কী করে ? আমাদের সঙ্গে আইনস্টাইন থাকলে হয়তো এর একটা কিনারা করতে পারতেন !'

হিংস্টন বলল, 'আমাদের কথা এখানে কে বিশ্বাস করবে ? শেষকালে কী অবস্থায় পড়তে হবে কে জানে। তার চেয়ে ফিরে গেলে হয় না ?'

'না। অন্তত আরেকটা বাড়িতে অনুসন্ধান করার আগে নয়।'

তিনজনে আবার রওনা দিয়ে তিনটে বাড়ির পর ওক গাছের তলায় ছোট্ট সাদা বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

'রহস্যের সন্ধান যুক্তিসম্মত ভাবেই হবে', বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক, 'কিন্তু সে যুক্তির নাগাল আমরা এখনো পাইনি। আচ্ছা, হিংস্টন—ধরা যাক তুমি যেটা বলেছিলে সেটাই ঠিক ; অর্থাৎ মহাকাশ ভ্রমণ বহুকাল আগেই শুরু হয়েছে, ধরা যাক পৃথিবীর লোক এখানে এসে থাকার কিছুদিন পরেই তাদের নিজেদের গ্রহের জন্য তাদের মন ছটফট করতে শুরু করেছিল। সেটা ক্রমে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় একজন মনোবিজ্ঞানী হলে তুমি কী করতে ?'

হিংস্টন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'আমি মঙ্গল গ্রহের জীবনযাত্রাকে ক্রমে বদলিয়ে পৃথিবীর মতো করে আনতাম। যদি এক গ্রহের গাছপালা নদনদী মাঠঘাটকে অন্য আরেক গ্রহের মতো রূপ দেওয়া সম্ভব হত তাহলে আমি তাই করতাম। তারপর শহরের সমস্ত লোককে এক জোটে হিপনোসিসের সাহায্যে বুঝিয়ে দিতাম যে তারা যেখানে রয়েছে সেটা আসলে পৃথিবী, মঙ্গল গ্রহ নয়।'

'ঠিক বলেছ, হিংস্টন। এটাই যুক্তিসম্মত কথা। ওই মহিলার ধারণা তিনি পৃথিবীতেই রয়েছেন। এই বিশ্বাসে তিনি নিশ্চিন্ত। ওঁর মতো এই শহরের প্রত্যেকটি অধিবাসী এক বিরাট মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাসে দিন কাটাচ্ছে।'

'আমি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।' বলল লাস্টিগ।

'আমিও।' বলল হিংস্টন।

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। 'যাক, এতক্ষণে কিছুটা সোয়াস্তি বোধ করছি। রহস্যের একটা কিনারা হল। সময়ে এগিয়ে-পিছিয়ে যাবার ধারণাটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। কিন্তু এই ভাবে ভাবতে বেশ ভালো লাগছে।'—ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। 'আমার তো মনে হচ্ছে এবার আমরা নিশ্চিন্তে এদের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারি।'

'তাই কি ?' বলল লাস্টিগ। 'ধরুন যদি এরা এখানে এসে থাকে পৃথিবী থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে। আমরা পৃথিবীর লোক জানলে এরা খুশি নাও হতে পারে।'

'আমাদের অস্ত্রের শক্তি অনেক বেশি। চলো দেখি সামনের বাড়ির লোকে কী বলে।'

কিন্তু মাঠটা পেরোনোর আগেই লাস্টিগের দৃষ্টি হঠাৎ রুখে গেল সামনের রাস্তার একটা অংশে।

'স্যার—'

'কী হল, লাস্টিগ ?'

'স্যার, এ কী দেখছি চোখের সামনে !' লাস্টিগের দৃষ্টি উদ্ভাসিত, তার চোখে জল। সে যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এই মুহূর্তেই আনন্দের আতিশয্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। সে বেসামাল ভাবে হোঁচট খেতে খেতে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

লাস্টিগ দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল। বাড়ির ছাদে একটা লোহার মোরগ।

তারপর শুরু হল দরজায় ধাক্কার সঙ্গে চিৎকার। হিংস্টন ও ক্যাপ্টেন ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে। দুজনেই ক্লান্ত।

'দাদু ! দিদিমা ! দিদিমা !' চেঁচিয়ে চলেছে লাস্টিগ।

বারান্দার দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ডেভিড !!' তারপর তাঁরা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন লাস্টিগকে।

'ডেভিড ! কত বড় হয়ে গেছিস তুই ! ওঃ, কতদিন পরে দেখছি তোকে ! তুই কেমন আছিস ?'

ডেভিড লাস্টিগ কান্নায় ভেঙে পড়েছে। 'দাদু ! দিদিমা ! তোমরা তো দিব্যি আছ !' বার বার বুড়োবুড়িকে জড়িয়ে ধরেও যেন লাস্টিগের আশ মেটে না। বাইরে সূর্যের আলো, মনমাতানো হাওয়া, সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ আনন্দের ছবি।

'ভেতরে আয় ! বরফ দেওয়া চা আছে—অফুরন্ত !'

'আমার দুই বন্ধু সঙ্গে আছে দিদিমা।' লাস্টিগ দুজনের দিকে ফিরে বলল, 'উঠে আসুন আপনারা।'

'এস ভাই এস,' বললেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। 'ভিতরে এস। ডেভিডের বন্ধু মানে তো আমাদেরও বন্ধু। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?'

বৈঠকখানাটা দিব্যি আরামেব। ঘরের এক কোণে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক চলছে টিক টিক করে, চারিদিকে সোফার উপর নরম তাকিয়া, দেয়ালের সামনে আলমারিতে বইয়ের সারি, মেঝেতে গোলাপের নকশায় ভরা পশমের গালিচা। সকলের হাতেই এখন গেলাসে বরফ-চা তাদের তৃষ্ণা উপশম করছে।

'তোমাদের মঙ্গল হোক।' বৃদ্ধা তাঁর হাতের গেলাসটা ঠোঁটে ঠেকালেন।

'তোমরা এখানে ক'দিন আছ ?' লাস্টিগ প্রশ্ন করল।

'আমাদের মৃত্যুর পর থেকেই।' অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বললেন মহিলা।

'কিসের পর থেকে ?' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের হাতের গেলাস টেবিলে নেমে গেছে।

'ওঁরা মারা গেছেন প্রায় তিবিশ বছর হল,' বলল লাস্টিগ।

'আর সে কথাটা তুমি অম্লানবদনে উচ্চারণ করলে ?' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক চেঁচিয়ে উঠলেন।

বৃদ্ধা উজ্জ্বল হাসি হেসে চাইলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে, তাঁর দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা। 'কখন কী ঘটে তা কে বলতে পারে বলো ! এই তো আমরা রয়েছি এখানে। জীবনই বা কী আর মৃত্যুই বা কী, তা কে বলবে ? আমরা শুধু জানি যে আমরা আবার বেঁচে উঠেছি। বলতে পার আমাদের একটা দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়েছে।'

বৃদ্ধা উঠে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সামনে তাঁর ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। 'ধরে দেখ।' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বৃদ্ধার কবজির উপর হাত রাখলেন।

'এটা যে রক্তমাংসের হাত তাতে কোনো সন্দেহ আছে কি ?'

ব্ল্যাককে বাধ্য হয়েই মাথা নেড়ে স্বীকার করতে হল যে নেই।

'তাই যদি হয়', বৃদ্ধা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, 'তাহলে আর সন্দেহ কেন ?'

'আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মঙ্গল গ্রহে এসে এমন একটা ঘটনা ঘটবে সেটা আমরা ভাবতেই পারিনি।'

'কিন্তু এখন তো আর সন্দেহের কোনো কারণ নেই', বললেন মহিলা। 'আমার বিশ্বাস প্রত্যেক গ্রহেই ভগবানের লীলার নানান নিদর্শন রয়েছে।'

'এই জায়গাকে কি তাহলে স্বর্গ বলা চলে ?' হিংস্টন প্রশ্ন করল।

'মোটেই না। এটা একটা গ্রহ, এবং এখানে আমাদের দ্বিতীয়বার বাঁচার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেটা কেন দেওয়া হয়েছে তা কেউ আমাদের বলেনি। কিন্তু তাতে কী এসে গেল ? পৃথিবীতেই বা কেন আমরা ছিলাম তার কারণ তো কেউ বলেনি। আমি অবিশ্যি সেই অন্য পৃথিবীর কথা বলছি—যেখান থেকে তোমরা এসেছ। সেটার আগেও যে আরেকটা পৃথিবীতে আমরা ছিলাম না তার প্রমাণ কোথায় ?'

'তা বটে।' বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক।

লাস্টিগ এখনো হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে তার দাদু-দিদিমার দিকে। 'তোমাদের দেখে যে কী ভালো লাগছে !'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক উঠে পড়লেন।

'এবার তাহলে আমাদের যেতে হয়। আপনাদের আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।'

'আবার আসবে তো ?' বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন। 'রাত্রের খাওয়াটা এখানেই হোক না।'

'দেখি, চেষ্টা করব। কাজ রয়েছে অনেক। আমার লোকেরা রকেটে রয়েছে, আর—'

ক্যাপ্টেনের কথা থেমে গেল। তাঁর অবাক দৃষ্টি বাইরের দরজার দিকে। দূর থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অনেকে সোল্লাসে কাদের যেন স্বাগত জানাচ্ছে।

ব্ল্যাক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দূরে রকেটটা দেখা যাচ্ছে। দরজা খোলা, ভিতরের লোক সব বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সবাই হাত নাড়ছে আনন্দে। রকেটটাকে ঘিরে মানুষের ভিড়, আর তাদের মধ্যে দিয়ে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে রকেটের তেরজন যাত্রী। জনতার উপর দিয়ে যে একটা ফুর্তির ঢেউ বয়ে চলেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

এরই মধ্যে একটা ব্যান্ড বাজতে শুরু করল। তার সঙ্গে ছোট ছোট মেয়েদের সোনালী চুল দুলিয়ে নাচ, 'হুরে ! হুরে !' ছোট ছোট ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল। বুড়োরা এ-ওকে চুরুট বিলি করে তাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করল।

এরই মধ্যে মেয়র সাহেব একটি বক্তৃতা দিলেন। তারপর রকেটের তেরজন প্রত্যেকে তাদের খুঁজে-পাওয়া আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক আর থাকতে পারলেন না। সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে তাঁর চিৎকার শোনা গেল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?'

ব্যান্ডবাদকেরাও চলে গেল। এখন আর রকেটের পাশে লোক নেই, সেটা ঝলমলে রোদে পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'দেখেছ কাণ্ড,' বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। 'রকেটটাকে ছেড়ে চলে গেল ! ওদের ছাল-চামড়া তুলে নেব আমি। আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে—'

'স্যার, ওদের মাফ করে দিন', বলল লাস্টিগ। 'এত পুরানো চেনা লোকের দেখা পেয়েছে ওরা।'

'ওটা কোনো অজুহাত নয় !'

'কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে চেনা লোক দেখলে তখন ওদের মনের অবস্থাটা কল্পনা করুন !'

'কিন্তু তাই বলে হুকুম মানবে না ?'

'এই অবস্থায় আপনার নিজের মনের অবস্থা কী হত সেটাও ভেবে দেখুন !'

'আমি কখনই হুকুম অগ্রাহ্য—'.

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হল না। বাইরে রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছে একটি দীর্ঘাঙ্গ যুবক, বছর পঁচিশ বয়স, তার অস্বাভাবিক রকম নীল চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল।

'জন !' যুবকটি এবার দৌড়ে এল ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে।

'এ কী ব্যাপার !' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের যেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।

'জন ! তুই ব্যাটা এখানে হাজির হয়েছিস ?'

যুবকটি ক্যাপ্টেনেব হাত চেপে ধরে তার পিঠে একটা চাপড় মারল।

'তুই !' অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন এল ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মুখ থেকে।

'তোর এখনো সন্দেহ হচ্ছে ?'

'এডওয়ার্ড !' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক এবার লাস্টিগ ও হিংস্টনের দিকে ফিরলেন, আগন্তুকের হাত তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে।

'এ হল আমার ছোট ভাই এডওয়ার্ড। এড—ইনি হলেন হিংস্টন, আর ইনি

লাস্টিগ।'

দুই ভাইয়ে কিছুক্ষণ হাত ধরে টানাটানির পর সেটা আলিঙ্গনে পরিণত হল। 'এড !'

'জন—হতচ্ছাড়া, তোকে যে আবার কোনোদিন দেখতে পাব— !'

'তুই তো দিব্যি আছিস, এড। কিন্তু ব্যাপারটা কী বল তো ? তোর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স তখন তোর মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন উনিশ। কতকাল আগের কথা—আর আজ...'

'মা অপেক্ষা করছেন', হাসিমুখে বলল এডওয়ার্ড ব্ল্যাক।

'মা !'

'বাবাও।'

'বাবা !' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক যেন মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। তাঁর গতি টলায়মান।—'মা-বাবা বেঁচে আছেন ? কোথায় ?'

'আমাদের সেই পুরানো বাড়ি। ওক নোল অ্যাভিনিউ।'

'সেই পুরানো বাড়ি।' ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

'শুনলে তোমরা ?' হিংস্টন ও লাস্টিগের দিকে ফিরলেন জন ব্ল্যাক। কিন্তু হিংস্টন আর নেই। সে তার নিজের ছেলেবেলার বাসস্থানের দেখা পেয়ে সেই দিকে ছুটে গেছে। লাস্টিগ হেসে বলল, 'এইবার বুঝেছেন ক্যাপ্টেন—আমাদের বন্ধুদেব আচরণের কারণটা ? হুকুম মানার অবস্থা ওদেব ছিল না।'

'বুঝেছি, বুঝেছি !' জন ব্ল্যাক চোখ বন্ধ করে বললেন। 'যখন চোখ খুলব তখন কি আবাব দেখব তুই আর নেই ?' জন চোখ খুললেন। 'না তো ! তুই তো এখনো আছিস। আর কী খোলতাই হয়েছে তোর চেহারা !'

'আয়, লাঞ্চের সময হয়েছে। আমি মাকে বলে রেখেছি।'

লাস্টিগ বলল, 'স্যার, আমি আমার দাদু ও দিদিমার কাছে থাকব। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।'

'অ্যাঁ ? ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।'

এডওয়ার্ড জনের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেল একটা বাড়ির দিকে।—'মনে পড়ছে বাড়িটা ?'

'আরেব্বাস্ ! আয় তো দেখি কে আগে পৌঁছতে পারে !'

দুজনে দৌড়ল। চারপাশের গাছ, পায়ের নীচের মাটি দ্রুত পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এডওয়ার্ডেরই জয় হল। বাড়িটা ঝড়ের মতো এগিয়ে এসেছে সামনে।—'পারলি না, দেখলি তো !' বলল এডওয়ার্ড। 'আমার যে বয়স হয়ে গেছে রে', বললেন জন। 'তবে এটা মনে আছে যে কোনোদিনই তোর সঙ্গে দৌড়ে পারিনি।'

দরজার মুখে মা, স্নেহময়ী মা, সেই দোহারা গড়ন। মুখে উজ্জ্বল হাসি। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে বাবা, চুলে ছাই রঙের ছোপ, হাতে পাইপ।

'মা ! বাবা !'

শিশুর মতো হাত বাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক।

দুপুরটা কাটল চমৎকার। খাওয়ার পর জন তাঁর রকেট অভিযানের গল্প করলেন আর সবাই সেটা উপভোগ করলেন। জন দেখলেন যে তাঁর মা একটুও বদলাননি, আর বাবাও ঠিক আগের মতো করেই দাঁত দিয়ে চুরুটের ডগা ছিঁড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে দেশলাই সংযোগ করছেন। রাত্রে টার্কির মাংস ছিল। টার্কির পা থেকে মাংসের শেষ কণাটুকু চিবিয়ে খেয়ে ক্যাপ্টেন জন পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন। বাইরে গাছপালায় আকাশে মেঘে রাত্রির রং, ঘরের মধ্যে ল্যাম্পগুলোকে ঘিবে গোলাপী আভা। পাড়ায় আরো অন্য শব্দ শোনা যাচ্ছে—গানেব শব্দ, পিয়ানোর শব্দ, দরজা জানালা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ।

মা গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চাপিয়ে নতুন করে ফিরে পাওয়া ছেলের সঙ্গে একটু নাচলেন। মা-র গায়ে সেই সেন্টের গন্ধ। এ গন্ধ সেদিনও ছিল, যেদিন ট্রেনে দুর্ঘটনায় বাপ-মা দুজনেরই একসঙ্গে মৃত্যু হয়। জন যে মা-কে জড়িয়ে ধরে নাচছে সেটা যে খাঁটি বাস্তব সেটা জন বেশ বুঝতে পারছে। মা নাচতে নাচতেই বললেন, 'বল তো জন, দ্বিতীয়বার জীবনধারণেব সুযোগ ক'জনের আসে ?'

'কাল সকালে ঘুম ভাঙবে', আক্ষেপের সুরে বললেন জন, 'আর কিছু পবেই রকেটে করে আমাদেব এই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'ওরকম ভেবো না', বললেন মা। 'কোনো অভিযোগ রেখো না মনে। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। আমরা তাতেই সুখী।'

'ঠিক বলেছ, মা !'

রেকর্ডটা শেষ হল।

'তুমি আজ ক্লান্ত', জনের দিকে পাইপ দেখিয়ে বললেন বাবা। 'তোমার শোবার ঘর তো রয়েইছে, তোমার পিতলের খাটও রয়েছে।'

'কিন্তু আগে আমার দলের লোকদের খোঁজ নিতে হবে তো।'

'কেন ?'

'কেন মানে...ইয়ে, বিশেষ কোনো কারণ নেই। সত্যিই তো। ওরাও হয়তো দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। একটা রাত ভালো করে ঘুমিয়ে নিলে ওদের বরং লাভই হবে।'

'গুড নাইট, জন,' মা তাঁর ছেলের গালে চুমু দিয়ে বললেন। 'তোমাকে পেয়ে আজ আমাদের কত আনন্দ !'

'আমারও মন আনন্দে ভরে গেছে।'

চুরুট আর সেন্টের গন্ধে ভরা ঘর ছেড়ে জন ব্ল্যাক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল, তার পিছনে এডওয়ার্ড। দুজনে কথায় মশগুল। দোতলায় পৌঁছে এডওয়ার্ড একটা ঘরের দরজা খুলে দিল। জন দেখলেন তাঁর পিতলের খাট, দেয়ালে টাঙানো তার স্কুল-কলেজের নানা রকম চিহ্ন, সেই সময়কার একটা অতি পরিচিত র‍্যাকুনের লোমের কোট, যাতে হাত না বুলিয়ে পারলেন না জন। 'এ যেন বাড়াবাড়ি,' বললেন জন। 'সত্যি, আমার অনুভবের শক্তি নেই। দুদিন সমানে বৃষ্টিতে ভিজলে শরীরের যা অবস্থা হয়, আমার মনটা তেমনি সপসপে হয়ে আছে অজস্র বিচিত্র অনুভূতিতে।'

এডওয়ার্ড তার নিজের বিছানায় ও বালিশে দুটো চাপড় মেরে জানালার কাঁচটা উপরে তুলে দিতে জ্যাসমিন ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। বাইরে চাঁদের আলো। দূরে কাদের বাড়িতে যেন নাচগান হচ্ছে।

'তাহলে এটাই হল মঙ্গল গ্রহ—', তাঁর পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বললেন জন ব্ল্যাক।

এডওয়ার্ডও শোবার জন্য তৈরি হচ্ছে। শার্ট খুলে ফেলতেই তার সুঠাম শরীরটা বেরিয়ে পড়ল।

এখন ঘরের বাতি নেভানো হয়ে গেছে। দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছে বিছানায়। কত বছর পরে আবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মন নানান চিন্তায় ভরপুর।

হঠাৎ তাঁর ম্যারিলিনের কথা মনে হল।

'ম্যারিলিন কি এখানে ?'

জানালা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় শোয়া এডওয়ার্ড কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে উত্তরটা দিল।

'সে এখানেই থাকে, তবে এখন শহরের বাইরে। কাল সকালেই ফিরবে।'

ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক চোখ বন্ধ করে প্রায় আপনমনেই বললেন, 'ম্যারিলিনের সঙ্গে একটিবার দেখা হলে বেশ হত।'

ঘরটায় এখন কেবল দুজনের নিশ্বাসের শব্দ।

'গুড নাইট, এড।'

সামান্য বিরতির পর উত্তর এল, 'গুড নাইট, জন।'

জন ব্ল্যাক নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে ভাবতে লাগলেন।

এখন দেহমনে আর অবসাদ নেই, মাথাও পরিষ্কার। এতক্ষণ নানান

পরস্পরবিরোধী অনুভূতি তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দিচ্ছিল না। কিন্তু এখন...

প্রশ্ন হচ্ছে—কী ভাবে এটা সম্ভব হল ? এবং এর কারণ কী ? শুধুই কি ভগবানের লীলা ! ভগবান কি তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তা করেন ?

হিংস্টন ও লাস্টিগের কথাগুলো তাঁর মনে পড়ল। নানান যুক্তি, নানান কারণ তাঁর মনের অন্ধকারে আলেয়ার আলোর মতো জেগে উঠতে লাগল। মা। বাবা। এডওয়ার্ড। মঙ্গল। পৃথিবী। মঙ্গল গ্রহের অধিবাসী...

হাজার বছর আগে কারা এখানে বাস করত ? তারা কি মঙ্গল গ্রহের প্রাণী, নাকি এদেরই মতো পৃথিবীতে মরে যাওয়া সব মানুষ !

মঙ্গল গ্রহের প্রাণী। কথাটা দুবার মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন জন ব্ল্যাক।

হঠাৎ তাঁর চিন্তা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল। সব কিছুর একটা মানে হঠাৎ তাঁর মনে জেগে উঠেছে। রক্ত হিম-করা মানে। অবিশ্যি সেটা বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি নেই, কারণ ব্যাপারটা অসম্ভব। নিছক আজগুবি কল্পনা মাত্র। ভুলে যাও, ভুলে যাও...মন থেকে দূর করে দাও।

কিন্তু তবু তাঁর মন বলল—একবার তলিয়ে দেখা যাক না ব্যাপারটা। ধরা যাক যে এরা মঙ্গল গ্রহেরই অধিবাসী। ওরা আমাদের রকেটকে নামতে দেখেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে। ধরা যাক এরা তৎক্ষণাৎ স্থির করেছে এই পৃথিবীবাসীদের ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু ঠিক সোজাসুজি নয়, একটু বাঁকা ভাবে। যেন তাতে একটু চালাকি থাকে, শয়তানী থাকে ; যাতে সেটা পৃথিবীর প্রাণীদের কাছে আসে অপ্রত্যাশিত ভাবে, আচমকা। এক্ষেত্রে পারমানবিক মারণাস্ত্রের অধিকারী মানুষের বিরুদ্ধে এরা কী অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে ?

এ প্রশ্নেরও উত্তর আছে। টেলিপ্যাথির অস্ত্র, সম্মোহনের অস্ত্র, কল্পনাশক্তির অস্ত্র।

এমন যদি হয় যে এই সব গাছপালা বাড়িঘর, এই পিতলের খাট—আসলে এর কোনোটাই বাস্তব নয়, সবই আমার কল্পনাপ্রসূত, যে কল্পনার উপর কর্তৃত্ব করছে টেলিপ্যাথি ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী এই মঙ্গলবাসীরা—হয়তো এই বাড়ির চেহারা অন্যরকম, যেমন বাড়ি শুধু মঙ্গল গ্রহেই হয়, কিন্তু এদের টেলিপ্যাথি এবং হিপ্নোসিসের কৌশলে আমাদের চোখে এর চেহারা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীরই একটি ছোট পুরানো শহরে বাড়ির মতো। ফলে আমাদের মনে একটা প্রসন্নভাব এসে যাচ্ছে আপনা থেকেই। তার উপর নিজেদের হারানো বাবা-মা ভাইবোনকে পেলে কার না মন আনন্দে ভরে যায় ?

এই শহরের বয়স আমি ছাড়া আমাদের দলের সকলের চেয়ে বেশি। আমার যখন ছ' বছর বয়স তখন আমি ঠিক এই রকম শহর দেখেছি, এই রকম

গানবাজনা শুনেছি, ঘরের ভিতর ঠিক এই রকম আসবাব, এই ঘড়ি, এই কার্পেট দেখেছি। এমন যদি হয় যে এই দুর্ধর্য চতুর মঙ্গলবাসীরা আমারই স্মৃতির উপর নির্ভর করে ঠিক আমারই মনের মতো একটি শহরের চেহারা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। শৈশবের স্মৃতিই সবচেয়ে উজ্জ্বল এমন কথা শোনা যায়। আমার স্মৃতির শহরকে বাস্তব রূপ দিয়ে তারপর তারা আমার রকেটের অন্য যাত্রীদের স্মৃতি থেকে তাদের মৃত প্রিয়জনদের এই শহরের বাসিন্দা করে দিয়েছে।

ধরা যাক পাশের ঘরে যে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা শুয়ে আছেন তাঁরা আসলে মোটেই আমার মা-বাবা নন। আসলে তাঁরা ক্ষুরধার-বুদ্ধিসম্পন্ন দুই মঙ্গলগ্রহবাসী, যাঁরা আমার মনে তাঁদের ইচ্ছামতো ধারণা আরোপ করতে সক্ষম।

আর রকেটকে ঘিরে আজকের ওই আমোদ ও ব্যান্ডবাদ্য ? কী আশ্চর্য বুদ্ধি কাজ করছে ওর পিছনে—যদি সত্যিই এটা টেলিপ্যাথি হয়। প্রথমে লাস্টিগকে হাত করা গেল,—তারপর হিংস্টনকে, তারপর রকেটের বাকি সব যাত্রীদের ঘিরে ফেলা হল গত বিশ বছরের মধ্যে হারানো তাদের আত্মীয় ও প্রিয়জনদের দিয়ে, যাতে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে রকেট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে ? এখানে মনে সন্দেহ প্রবেশ করার সুযোগ কোথায় ? তাইতো এখন দলের সকলেই শুয়ে আছে বিভিন্ন বাড়িতে, বিভিন্ন খাটে, নিরস্ত্র অবস্থায় ; আর রকেটটাও খালি পড়ে আছে চাঁদনী রাতে। কী ভয়াবহ হবে সেই উপলব্ধি যদি সত্যিই জানা যায় যে এই সমস্ত ঘটনার পিছনে রয়েছে আমাদের সকলকে হত্যা করার অভিসন্ধি। হয়তো মাঝরাত্রে আমার পাশের খাটে আমার ভাইয়ের চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে যাবে ভয়ংকর একটা কিছু—যেমন চেহারা সব মঙ্গলবাসীরই হয়। আর সেই সঙ্গে অন্য পনেরটা বাড়িতে আমার দলের লোকদের প্রিয়জনদেরও চেহারা যাবে পাল্টে আর তারা শুরু করবে ঘুমন্ত পৃথিবীবাসীদের সংহার।...

চাদরের তলায় ক্যাপ্টেন জনের হাত দুটো আর স্থির থাকছে না। আর তাঁর সমস্ত শরীর হয়ে গেছে বরফের মতো ঠাণ্ডা। যা এতক্ষণ ছিল কল্পনা, তা এখন বাস্তবরূপ ধরে তাঁর মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করছে।

ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বিছানায় উঠে বসলেন। রাত এখন নিস্তব্ধ। বাজনা থেমে গেছে। বাইরে বাতাসের শব্দও আর নেই। পাশের খাটে ভাই শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

অতি সন্তর্পণে গায়ের চাদরটা গুটিয়ে পাশে রাখলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। তারপর খাট থেকে নেমে কোনো শব্দ না করে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ালেন।
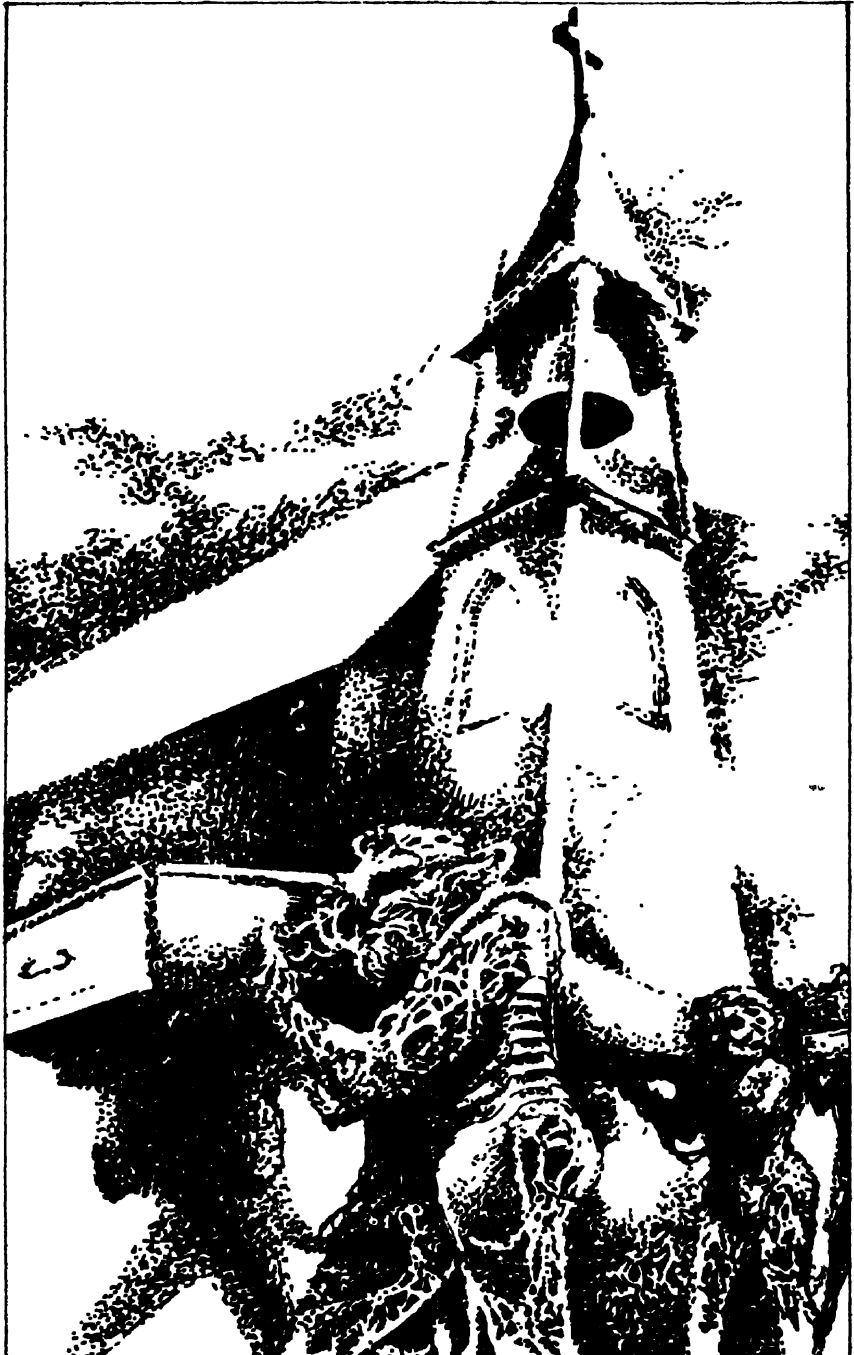
'কোথায় যাচ্ছ দাদা ?'

'কী বললে ?'

'এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ ?'

'জল খেতে যাচ্ছিলাম।'

'কিন্তু তোমার তো তেষ্টা পায়নি।'

'হ্যাঁ, পেয়েছে।'

'আমি জানি পায়নি।'

ক্যাপ্টেন জন পালাবার চেষ্টায় দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না।

পরদিন সকালে মঙ্গলবাসীদের ব্যান্ডে শোনা গেল করুণ সুর। শহরের অনেক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লম্বা লম্বা কাঠের বাক্স বহনকারীর দল। মৃত ব্যক্তিদের বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের চোখেই জল, তারা চলেছে গির্জার দিকে, যেখানে মাটিতে ষোলটি নতুন গর্ত খোঁড়া হয়েছে।

মেয়র আর একটি বক্তৃতা দিলেন—এবার দুঃখ প্রকাশ করার জন্য, যদিও তাঁকে আর চিনতে পারা মুশকিল, কারণ তাঁর চেহারা দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। যেমন হচ্ছে এই শহরের সমস্ত প্রাণীর। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মা, বাবা ও ভাইয়ের চোখে জল হলেও তাদের চেহারা দ্রুত বিকৃত হয়ে আসছে, ফলে তাদের এখন চেনা প্রায় অসম্ভব।

কাঠের কফিনগুলো গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। কে যেন মন্তব্য করল, 'রাতারাতি লোকগুলো শেষ হয়ে গেল।'

এখন কফিনের ঢাকনার ওপর মঙ্গলের মাটি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এই শুভদিনে আজ এখানে সকলের ছুটি।

চলচ্চিত্র-শিক্ষা

সিনেমার কথা

যে-কোনো একটা নতুন আবিষ্কার প্রথম-প্রথম যে চমক জাগায়, কিছুদিন পরে মানুষের অভ্যাস হয়ে গেলে আর সে চমকটা থাকে না। এক একদিন হঠাৎ যখন বিজ্‌লির গড়বড়ানিতে বাড়ির বাতিগুলো ঝুপ করে নিভে যায়, তখন আদ্যিকালের মোমবাতি জ্বালিয়ে বই পড়তে গিয়ে ইলেকট্রিক লাইটের মহিমা কিছুটা বুঝতে পাবা যায়। নযতো এমনিতে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে দশ মাইল দূরের লোকের সঙ্গে কথা বলে, বা কালো ঘুরন্ত চাকতির উপর পিন বসিয়ে গান শুনে, বা জেটেব জোরে একশো জন ছেলে বুড়ো এক সঙ্গে দু-ঘণ্টায় দিল্লী পৌঁছিয়ে আজকের দিনে আমরা আর কেউই বিশেষ অবাক হই না।

তেমনিই, সিনেমা দেখতে গিয়ে, 'ছবি নড়ছে' এ ব্যাপারটা আর আজ কারো মনে বিস্ময় জাগায় না। অথচ আজ থেকে সত্তর বছর আগে এই ছবি নড়াটাই মানুষকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

তখন অবিশ্যি সিনেমার গল্প বলার কথাটা লোকের মাথায়ই আসেনি। একেবারে প্রথম যে সিনেমা লোকে পয়সা দিয়ে দেখতে গিয়েছিল—তাতে দেখানো হয়েছিল, একটা ট্রেন স্টেশনে এসে থামছে আর তার আশেপাশে যাত্রী ও কুলির দল ব্যস্ত ভাবে ঘোরাফেরা করছে। ট্রেনের ফোটোগ্রাফ অবিশ্যি লোকে তার অনেক আগেই দেখেছিল। কিন্তু সে তো ছবির ট্রেন, কাজেই চলা অবস্থায় তোলা হলেও ছবিতে সে থেমেই থাকত। চলন্ত ট্রেন দেখতে হলে তখনকার দিনে রেল লাইনের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। হঠাৎ একদিন লোকে এই চলন্ত ট্রেন দেখতে পেলো একটা অন্ধকার ঘরে একটা পর্দার উপর। এতে যে তারা অবাক হবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? এই চলন্ত ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে বেশ বুঝতে পারল যে সিনেম্যাটোগ্রাফ

জিনিসটা এক আশ্চর্য আবিষ্কার। তবে এই আবিষ্কারের দৌড় যে ঠিক কতখানি, আর কী অদ্ভুত তাড়াতাড়ি যে এই আবিষ্কারের উন্নতি হবে, সে কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

প্রথম চলন্ত ছবি বাজারে দেখানোর কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে এই নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে নতুন ভাবে গল্প বলার একটা উপায় হতে পারে।

সে-যুগে যাঁরা সিনেমা তৈরি করতেন, তাঁরা তাঁদের খরচ তোলার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা নিতেন—যেমন আজকের দিনে টিকিট বিক্রী করে ছবি দেখানো হয়। এমন আশ্চর্য নতুন তামাসা দেখার জন্য লোকে পয়সা দিতে আপত্তি করত না। কিন্তু শুধু ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট গাড়িঘোড়া আর লোকজনের চলাফেরা দেখিয়ে আর কতদিন পয়সা করা যায়? কিছুদিনের মধ্যেই লোকে বলতে আরম্ভ করল—ছবি নড়ছে সে তো বুঝলুম রে বাপু, কিন্তু নড়ে হচ্ছেটা কী? এতে আমোদটা কোথায়?

এর ফলে সিনেমায় এল গল্প। যারা নতুন পড়তে শিখেছে, তাদের যদি কেবল খবরের কাগজ পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে তারা কতদিন চুপ করে থাকবে? বই-পড়িয়েরা গল্পের বই পড়ে যেমন মজা পায়, সিনেমা-দেখিযেরাও প্রথম গল্পের ছবি দেখে সেই মজা পেলো, আর সেই বই থেকে দেখতে দেখতে সিনেমার গল্প বলার রীতিটা চালু হয়ে গেল।

গল্প বলার নানান কায়দা পৃথিবীতে বহুদিন থেকেই চলে আসছে। আমাদের গ্রামেই তো আদ্যিকাল থেকে যাত্রা, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী এই সবের মধ্যে দিয়ে গল্প বলা হত। পটুয়াদের আবার গল্প বলার একটা মজার কায়দা ছিল, যেটার সঙ্গে হয়তো সিনেমার খানিকটা মিল পাওয়া যেতে পারে। ধরা যাক যে পটুয়া রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প বলবে। তারা করত কী—একটা লম্বা কাগজে উপর থেকে নিচে পর পর এই যুদ্ধের প্রধান ঘটনার সব ছবি আঁকত। আঁকা হলে পর কাগজটা তলার দিক থেকে পাকিয়ে গোল করে রেখে দিত। গল্প-বলার সময় সেই পাক খুললে পর পর ঘটনার ছবিগুলো বেরিয়ে পড়ত।

এই সবের তুলনায় সিনেমা হল গল্প বলার একেবারে আনকোরা নতুন কায়দা, যেটার আবিষ্কার আমাদের এই আধুনিক যন্ত্রপাতির যুগেই সম্ভব ছিল।

আমরা ছেলেবেলায় যখন সিনেমা দেখেছি, তখন 'টকি' (Talkie) অথবা কথা-বলা ছবির যুগ আসেনি। কিন্তু তখনই 'সাইলেন্ট' অথবা নির্বাক ছবির গল্প বলার কায়দাটা বেশ ভালো ভাবেই তৈরি হয়ে গেছে। এ হল চল্লিশ বছর আগেকার কথা। তখন কলকাতায় সিনেমা হাউস বেশি ছিল না। হয়তো সবসুদ্ধ আট দশটা। তার কারণ তখন ছবি তোলাই হত অনেক কম। আজ শুধু

ভারতবর্ষেই বছরে যত ছবি তোলা হয়, তখন সারা পৃথিবীতেই তার বেশি হত না। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা দেশে তখনই ছবি তোলা শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ছোটদের ভালো লাগবে এমন ছবি বিশেষ কিছু এখানে তৈরি হত না। আমরা যা ছবি সেকালে দেখেছি তার প্রায় সবই আমেরিকায় তোলা। তার মধ্যে কিছু ছিল মজার ছবি—যেমন চার্লি চ্যাপলিন, হ্যারল্ড লয়েড বা বাস্টার কীটনের ছবি—যা দেখে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরার জোগাড় হত। আর ছিল অ্যাডভেঞ্চারের ছবি—যেমন ডাগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের থীফ অফ বাগদাদ, বা হিংস্র জানোয়ারে গিজগিজ অ্যাফ্রিকার জঙ্গলে টার্জনের বাহাদুরি।

এসব ছবি যখন দেখেছি তখন এর গল্পে এমন মেতে গেছি যে কোনো সময় মনে হয়নি যে এসবের পিছনে আবার খরচ আছে, পরিশ্রম আছে, কারসাজি আছে। টার্জনের সঙ্গে কুমীরের মারাত্মক লড়াই, বা বাগদাদের চোরের ম্যাজিক কার্পেটে চড়ে উড়ে বেড়ানো বা বাস্টার কীটনের 'পোল্‌ ভল্ট' করে একতলার বাগান থেকে দোতলার জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে গুণ্ডার পেটের উপর ল্যান্ড করা—এসব দেখে যেমন ভালো লেগেছে, তেমনি অবাক হয়েছি, আর সেই সঙ্গে মনে হয়েছে যে সিনেমায় বোধ হয় যা ভাবা যায় তাই দেখানো যায়—যেমন গল্প লিখিয়ে যা ভাবেন তাই লিখতে পারেন।

১৯২৯ সনে—কথা নেই বার্তা নেই—এসে গেল 'টকি' বা কথা-বলা ছবি। তখনকার দেখা একটা ছবির কথা মনে আছে যার কিছুটা ছিল টকি আর কিছুটা সাইলেন্ট ; অর্থাৎ মাঝে মাঝে ঠোঁট নাড়লে কথা বেরোচ্ছে, আর মাঝে মাঝে বেরোচ্ছে না। এ রকম কেন ? আসলে 'টকি' জিনিসটা আবিষ্কার হয় হঠাৎ, আর সেটা যখন ঘটে, তখন অনেক সাইলেন্ট ছবি অর্ধেক তোলা অবস্থায় ছিল। এই সব ছবি যাঁরা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা ভড়কে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাকি অর্ধেক ছবিতে কথা জুড়ে দিয়ে না-এদিক না-ওদিক অবস্থায় সেগুলো বাজারে ছেড়ে দিলেন।

প্রথম দিকের পুরোপুরি 'টকি' ছবির বিজ্ঞাপনে সব সময়েই লেখা থাকত '100% Talkie'। ক্রমে যখন সাউন্ড সম্পর্কে লোকের চমক কেটে গেল, আর সাইলেন্ট ছবি তোলা একদম বন্ধ হয়ে গেল তখন আর বিজ্ঞাপনে ও কথাটা লেখার কোনো প্রয়োজন রইল না।

গত বিশ বছরের মধ্যে সিনেমায় আরো অনেক নতুন আবিষ্কার ও উন্নতির কথা আমরা জানি। এখন যেমন সুন্দর রঙীন ছবি তৈরি হয়, আগে তেমন হত না। কার্টুন ছবির ব্যাপারে ওয়াল্‌ট্‌ ডিজ্‌নি ছাড়াও আরো অনেকে অনেক কিছু করেছেন। পুতুলকে কায়দা করে 'জ্যান্ত (animate) করে 'পাপেট' ছবিও তোলা

হয়েছে অনেক। বছর দশেক আগেও সিনেমার ছবির চেহারা লম্বা-চওড়ায় এই রকম—

NORMAL

আজকাল এর চেয়ে অন্য অনেক রকম চেহারা দেখা যায়, যার আবার আলাদা আলাদা নামও দেওয়া হয়েছে। সেগুলো আগের চেহারাটার তুলনায় এইরকম—

NORMAL

WIDE-SCREEN

VISTA-VISION

CINERAMA

CINEMASCOPE OR
TECHNIRAMA OR
PANAVISION 70
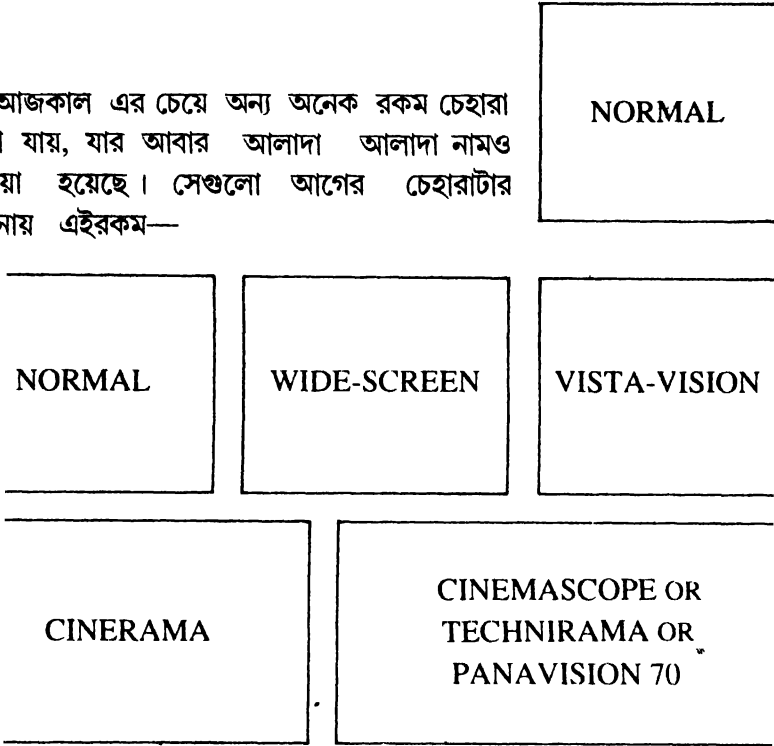
এ ছাড়া ছবি তোলার যন্ত্রপাতি যে কত হয়েছে নতুন রকম তার কোনো ইয়ত্তাই নেই।

ছেলেবেলায় যে ব্যাপারটা জানার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আজ খুব ভালো ভাবেই জানি, সেটা হল এই যে সিনেমা তৈরির মতো মেহনতের কাজ খুব কমই আছে। যেমন তেমন করে ছবি তুলতে গেলেও অনেক হ্যাঙ্গাম, আর ভালো করে তুলতে গেলে তো কথাই নেই। খুব সামান্য দৃশ্যের পিছনেও অনেক ভাবনা, অনেক খাটুনি আর অনেক খরচ থাকতে পারে। তবে এটাও ঠিক যে ছবি তোলার কাজে যেমন মজাও আছে, তেমন মজা আর কোনো খাটুনির কাজে আছে কি না জানি না। ছবি তৈরির খুঁটিনাটির কিছুটা জানতে পারলে এই মজার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। পরে তোমাদের এ বিষয় আরো কিছু বলব।

২

সিনেমা তৈরি করতে গেলে প্রধানত দুটো জিনিসের দরকার। প্রথম দরকার হল সিনেমার যন্ত্রপাতি, আর তারপর, সেগুলো কী করে ব্যবহার করতে হয় সেটা জানা দরকার।

ছবি আঁকার যন্ত্রপাতি হল রং তুলি কাগজ পেনসিল—এই সব। কিন্তু এসব জিনিস যে-কোনো লোকের হাতে দিয়ে দিলেই কি আর সে ছবি আঁকতে পারবে? আঁকতে জানলে তবেই পারবে। গলা সব মানুষেরই আছে, কিন্তু গানের গলা কি সকলের থাকে? গানের বেলা গলাই হল যন্ত্র। তেমনি নাচের বেলা হল হাত পা চোখ মুখ ইত্যাদি শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নাচ, গান, ছবি আঁকা—এ সবই কেউ কেউ আপনা থেকেই পারে। যারা পারে না, কিন্তু করতে চায়, তাদের শিখে নিতে হয়।

কিন্তু সিনেমার কাজটা আরো অনেক বেশি ঝামেলার। এটা যে শুধু না-শিখে হয় না তা নয়, একজন লোকের পক্ষে একা এ কাজটা করা সম্ভব নয়। যে পরিচালনা করবে (ডিরেক্টর) তার সঙ্গে তার দলে আরো লোকের দরকার। তাদের এক একজনে এক এক রকম কাজ করে। সকলের উপরে থাকেন পরিচালক। এই সকলের কাজ মিলে ছবি তৈরি হয়।

সিনেমার কাজে ঝামেলা বেশি কেন জানতে হলে অন্য সব শিল্পের সঙ্গে সিনেমার একটা বড় তফাতের কথা বলতে হয়। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা সহজে বোঝা যাবে। —

তোমাদের মধ্যে যারা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বা তার ছোটদের সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' পড়েছ, তারা ইন্দির ঠাকরুনের কথা নিশ্চয়ই জান। বিভূতিভূষণ তাঁর বইয়ে ইন্দির ঠাকরুনের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : 'পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।' এ ছাড়া বুড়ির ঘর আর জিনিসপত্তরের কথাও বিভূতিভূষণ লিখেছেন : 'হরিহরের পুবের ভিটায় খড়ের ঘর অনেকদিন অমেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ি থাকে। একটা বাঁশের আলনায় খান দুই ছেঁড়া ময়লা থান।...একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা। একটি পুটুলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রা।...একটা পিতলের ঘটি, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড়..'

আমাকে যখন 'আম আঁটির ভেঁপু' বইয়ের ছবি আঁকতে হয়েছিল, তখন ইন্দির ঠাকরুনের ছবি আমি এই সব বর্ণনা থেকে বাড়িতে বসে বসে নিজের মন থেকেই এঁকেছিলাম। কিন্তু যখন 'পথের পাঁচালী' ফিল্ম করব বলে ঠিক করলাম, তখন

কাজটা হয়ে গেল অনেক কঠিন। কারণ গাল-তোবড়ানো বুড়ি এখন আর শুধু মন থেকে আঁকলেই চলবে না—একটি রক্ত মাংসের আসল গাল তোবড়ানো বুড়ি জোগাড় করা চাই, যিনি ইন্দির ঠাকরুন সেজে অ্যাকটিং করবেন, ইন্দিরের মতো হাঁটবেন চলবেন, কথা বলবেন, যাঁকে দেখে লোকের বইয়ের বুড়ির কথা মনে হবে, আর তাদের মন বলবে—হ্যাঁ, এই ঠিক ইন্দির ঠাকরুন।

বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্যি ঘটি বাটি মাদুর ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি, পোড়ো বাড়ি বাঁশবন ডোবা, এমন কি পুরো একটি গ্রামও চাই, যার চেহারার সঙ্গে বইয়ের নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের চেহারা মিলবে। এছাড়া আরো অন্য লোকজন তো আছেনই। বুঝতেই পারছ কাজটা সহজ নয়। আর এগুলো হচ্ছে ছবি তোলা শুরু করার আগে একেবারে গোড়ার কাজ।

পথের পাঁচালী যদি থিয়েটার করা হত তাহলেও অবিশ্যি একজন ইন্দির ঠাকরুনের দরকার হত। কিন্তু থিয়েটারে অনেক সময় কমবয়সী লোকেরাও রং মেখে মেক-আপ করে বুড়ো বুড়ি সেজে অ্যাকটিং করে। সেটাতে খুব এসে যায় না, কারণ থিয়েটার যারা দেখে তারা কিছুটা দূর থেকেই দেখে, তাই মেক-আপটা ততটা ধরা যায় না। সিনেমায় যারা অ্যাকটিং করে তাদের মুখ অনেক সময় খুব কাছ থেকে দেখানো হয়। তাই মেক-আপ অনেক সময় ভীষণভাবে ধরা পড়ে যায়। আর ধরা পড়লেই সব মজা মাটি।

সিনেমার সঙ্গে থিযেটারের তফাতটা এই ফাঁকে আরেকটু বলে নিই। থিয়েটারে স্টেজটা পুরোপুরিই ফাঁকি, আর এই ফাঁকিটা বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে লোকে মেনে এসেছে। স্টেজের উপর যখন লোকে নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামের গল্প দেখতে যাবে, তখন কি আর এই ভেবে যাবে যে সেখানে আসল গ্রামের ঘর বাড়ি মাঠঘাট দেখবে? সবাই জানে যে এটা সম্ভবই না, তাই কেউ আর সেটা আশাও করে না। থিয়েটারে তাই অনেক কিছুই আমাদের কল্পনা করে নিতে হয়—ফাঁকগুলো মনে মনে পুরিয়ে নিতে হয়, ফাঁকিটাকে আসল বলে ভেবে নিতে হয়।

কিন্তু সিনেমায় আমরা আসল জিনিসেরই ছবি দেখব বলে আশা করি। যদিও সেটাও থিয়েটারের মতোই ঘরের মধ্যে বসে দেখি, কিন্তু এটাও জানি যে ছবিগুলো তো আর সব বন্ধ ঘরের মধ্যে তোলা হয়নি। তাই যদি হত, তাহলে তো সিনেমা না দেখে থিয়েটার দেখাই ভালো ছিল। আসলে, সেই যে প্রথম সিনেমার ছবিতে লোকে ঘরে বসে চলন্ত ট্রেনের ছবি দেখেছিল, সেই থেকেই লোকে ধরে নিয়েছে যে সিনেমায় তারা বাড়ি ঘর মাঠ ঘাট নদী বন সবই যেমনটি হয় তেমনটি দেখবে।

তবে, সিনেমাতেও মাঝে মাঝে ফাঁকি দিতে হয়, নকলকে আসল বলে

চালাতে হয়, কিন্তু সেটা এমন ভাবে করতে হয় যাতে ফাঁকি ধরা না পড়ে। লোকে ছবি দেখে দেখে আজকাল অনেক বেশি চালাক হয়ে গেছে, কাজেই, যে সিনেমা করবে সে যদি আরো বেশি চালাক না হয় তাহলেই ফাঁকি ধরা পড়ে যায়। পরে তোমাদের এই সব ফাঁকির কথা কিছু বলব। আগে একটা খুব জরুরী কাজের কথা বলি। এ কাজটাও সিনেমা তোলা শুরু হবার আগেই করতে হয়। এটা লেখার কাজ। এই লেখাটার উপর ভর করেই ছবিটা তোলা হয়। একে বলে চিত্রনাট্য, আর সেটা যে লেখে তাকে বলে চিত্রনাট্যকার।

চিত্রনাট্য (Scenario বা Screenplay)

যে সব ছবি তোমরা দেখ (এখানে 'ছবি' বলতে সিনেমাকেই বোঝাচ্ছি), তার বেশির ভাগই লক্ষ করবে কোনো গল্প বা উপন্যাস থেকে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের সকলের গল্প বা উপন্যাস থেকেই ছবি করা হয়েছে। এ ছাড়া অবিশ্যি সিনেমার জন্যে আলাদা করেও গল্প লেখা হয়। আবার অনেক সময় বিখ্যাত লোকদের জীবন নিয়ে অথবা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেও সিনেমা হয়।

যাই হোক্ না কেন, সব গল্প বা ঘটনাকেই ছবি তোলার আগে সিনেমার মতো করে লিখে নিতে হয়। এইভাবে লিখে যে জিনিসটা তৈরি হয়, তাকে বলে চিত্রনাট্য।

গল্প উপন্যাস বইয়ে যেভাবে লেখা থাকে, সিনেমায় ঠিক হুবহু সেইভাবে তোলা প্রায় কখনই সম্ভব হয় না। অনেক বড় উপন্যাস আছে যার পুরোটা ছবিতে রাখতে গেলে সেটা এত বড় হয়ে যাবে যে সে-ছবি কেউ ধৈর্য ধরে বসে দেখবে না। পথের পাঁচালি বইয়ের সবটা ছবিতে রাখতে গেলে সেটা অন্তত দশ ঘণ্টার ছবি হত। গল্পকে সিনেমার উপযোগী করে সাজিয়ে নেওয়ার কাজ হল চিত্রনাট্যকারের কাজ।

যে চিত্রনাট্য লিখবে, বুঝতেই পারছ তাকে সিনেমার ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই জানতে হবে। একটা কথা তাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে, সেটা হল—যে, চিত্রনাট্য যেটা লেখা হল, সেটা যখন ছবি হবে তখন আর সেটা পড়বার জিনিস থাকবে না, সেটা হয়ে যাবে দেখবার আর শোনবার জিনিস। চিত্রনাট্যকার যদি লেখেন—'হরিবাবুর ঘুম থেকে উঠেই মনে হল তাঁর আজ তাড়াতাড়ি আপিস যাওয়া দরকার'—তাহলে বলতে হবে তিনি সিনেমার ব্যাপারটা ঠিক বোঝেননি। কারণ, সিনেমায় হরিবাবুকে ঘুম থেকে উঠতে দেখানো যায়, কিন্তু তখন তাঁর কী মনে হল সেটা আমরা কী করে জানব?

চিত্রনাট্যকার যদি লিখতেন—'হরিবাবু ঘুম থেকে উঠে চাকরকে ডেকে বলবেন—ওরে জগা, আমার স্নানের জলটা চট্ করে দিয়ে দে তো, আমায় একটু তাড়াতাড়ি আপিস যেতে হবে'—তাহলে জিনিসটা চিত্রনাট্যের পক্ষে ঠিক হত।

এক একটা জিনিস আছে যেগুলো সিনেমায় খুব সহজেই কথা না বলে বোঝানো যায়। একজন লোকের চেহারা, তার বয়সের আন্দাজ, সে গরীব না বড়লোক, বাঙালি না বিদেশী—এসব কিছুই একবার লোকের চেহারাটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এক একটা জিনিস বোঝানো ভারি মুশকিল হয়। যেমন, 'পথের পাঁচালী' বইয়ে এক জায়গায় বলা হয়েছে, ইন্দির ঠাকরুন ছিলেন হরিহরের দূর সম্পর্কের বোন। এটা ছবিতে কী করে বোঝানো যাবে ? ইন্দির বয়সে হরিহরের চেয়ে অনেক বড়। যারা গল্পটা জানে না, তারা ছবিতে দুজনকে পাশাপাশি দেখলে হয়তো ইন্দিরকে হরিহরের মা বা মাসি পিসি ভেবে বসতে পারে। হরিহর যদি ইন্দিরকে দিদি বলে ডাকে, তাহলেও সে যে আপন দিদি না দূর সম্পর্কের দিদি তা কী করে বুঝব ? এখানে কোনো একটা সুযোগে কারুর মুখ দিয়ে এই দূর সম্পর্কের বোনের ব্যাপারটা বলিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আরো একটা উদাহবণ দিই। কোনো গল্পের হয়তো প্রথমেই বলা হল—রাম বড় ভালো ছেলে। লেখায় এটা পড়লেই আমরা মেনে নিই যে বাম ভালো ছেলে। কিন্তু সিনেমায় যদি এ-গল্প বলা হয়, তাহলে গোড়াতেই এক কথায় রাম ভালো ছেলে বোঝানোর কোনো উপায় নেই। রাম যতক্ষণ না এমন একটা কিছু করছে যাতে প্রমাণ হয় সে ভালো ছেলে, ততক্ষণ সে ভালো না খাবাপ সেটা বোঝাই যাবে না। রামের চেহারার মধ্যে একটা ভালোমানুষী ভাব থাকতে পারে, কিন্তু সে তো অনেক দুষ্টু ছেলের মধ্যেও থাকে।

অন্য কারুর মুখ দিয়ে যদি বলানো হয় যে রাম ভালো ছেলে, তাহলে কিছুটা কাজ হতে পারে কিন্তু কথাটা কে বলবে সেটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। যে কোনো লোকের চেয়ে যদি রামের বাবা মা, বা তার খুব কাছের কোনো লোক সেটা বলেন তাহলে আরো ভালো, কারণ তাঁরা রামকে রোজ দেখছেন বলে অন্য লোকদের চেয়ে বেশি জানেন। কাজেই তাঁদের কথার দাম আছে।

কিন্তু সিনেমাতে দেখা গেছে যে মুখে বলার চেয়ে কাজে করিয়ে দেখানোতে অনেক বেশি কাজ হয়। চীনেদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে—একটা ছবি এক হাজার কথার সমান। সিনেমাতেও এই কথাটা খাটে। তাই রামের বাবা যদি বা বলেন যে রাম ভালো ছেলে, যতক্ষণ না রামকে একটা ভালো কাজ করতে দেখি, ততক্ষণ আমাদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে।

তোমরা একটু ভেবে দেখবে কি, যে রাম 'ভালো ছেলে'—এই জিনিসটা খুব

পরিষ্কার ভাবে শুধু দেখিয়ে কীভাবে বোঝানো যায় ? বুঝতেই পারছ, রামকে দিয়ে একটা কোনো ভালো কাজ করাতে হবে—কিন্তু সেটা কী কাজ তা যদি তোমরা আমায় লিখে জানাও তো খুব ভালো হয়। রামের বিষয় আরো কয়েকটা জিনিস তোমাদের বলে দিচ্ছি—ধরে নাও যে তার বয়স বারো, সে গ্রামে থাকে, তার এক বুড়ো দাদু ছাড়া আর কেউ নেই। গল্পের শুরু হচ্ছে সকালে, রাম ইস্কুলে রওনা হচ্ছে। বাদবাকি তোমরা নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে নিও।

তোমরা খেটে ভেবে যা বার করবে সেটা একটা খাতার পাতায় বা ফুলস্ক্যাপের একদিকে লিখে সন্দেশ-এ পাঠিয়ে দিও। খামের উপর বাঁ দিকের কোণে 'রাম' লিখে দিও। ১লা মার্চের বেশি দেরি কোর না পোস্ট করতে।

তোমাদের লেখা নিয়ে সিনেমার কথায় আলোচনা করব। তেমন ভালো লেখা হলে পুরস্কার দেওয়া হবে।

৩

গতবার তোমাদেব 'রাম ভালো ছেলে' বোঝানোর জন্য একটা চিত্রনাট্য লিখতে বলেছিলাম। অনেকেই সেটা লিখে পাঠিয়েছে, আর তার মধ্যে কয়েকজনের লেখা সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। সামনের বারে কার কার লেখা ভালো হয়েছে সেটা ছাপিয়েও দেবো। এবারে চিত্রনাট্যের পরে কী আসে সেটা বলি।

চিত্রনাট্য শেষ হয়ে গেলে লেখাজোখার কাজ মোটামুটি শেষ হল বলা যেতে পারে। 'শুটিং' (বা ছবি তোলা) শুরু হবার আগে অবিশ্যি এই চিত্রনাট্যের উপরেও আরো কিছুটা কাজ করার থাকে—সেটা হল, এই চিত্রনাট্যকে ছবিতে তোলার সুবিধের জন্য টুক্‌রো টুকরো করে বিভিন্ন 'শট্'-এ ভাগ করা। এটার প্রয়োজন কেন হয় সেটা একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

ধরো, চিত্রনাট্যতে বলা হয়েছে, 'রাম ঘুম থেকে উঠে তার শোবাব ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো'। এই ঘটনাটা যদিও লেখার সময় মাত্র একটা বাক্য বা Sentence-এই বুঝিয়ে দেওয়া হল, ছবি তোলার সময় দেখা যাবে যে এটাকে দুটো 'শট্'-এ ভাগ করলে সুবিধা হয়। সেই দুটো শট্‌কে বর্ণনা করতে গেলে এই রকম দাঁড়াবে—

শট্ (১) রামের শোবার ঘরের ভিতর।
রাম ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে নেমে পাশের দরজা দিয়ে এগিয়ে গেল।

শট্ (২) রামের বাড়ির বারান্দা।

রাম শোবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় এলো।

এমনও হতে পারে যে এই শট্-এর একটা হয়তো আজ নেওয়া হল, আরেকটা নেওয়া হল দু মাস পরে। কিন্তু শট্-দুটো যখন একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে ফেলা হল, তখন দেখা গেল সে জোড়াটা আর টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো মিলে একেবারে একটা গোটা Sentence-এর মতো হয়ে গেছে।

এইভাবে—যেমন একটা গল্প বলতে অনেকগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো Sentence-এর দরকার হয়—তেমনি অনেকগুলো আলাদা আলাদা শট্-কে জুড়ে তবে একটা সিনেমার গল্পকে বলা যায়। হিসেব করলে দেখা যায় যে এক একটা ছবিতে গড়ে প্রায় চার পাঁচশ আলাদা আলাদা শট্ থাকে। কোনো পরিচালক যদি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেন, তাহলেও তাঁর পক্ষে দিনে পনর-বিশটার বেশি শট্ নেওয়া সম্ভব হয় না। তাই সাধারণত দেখা যায় যে একটা খুব সাদাসিধে ছবি করতে প্রায় ২৫/৩০ দিন শুটিং করার প্রয়োজন হয়।

আর শুধু শুটিং করলেই তো কাজ ফুরিয়ে গেল না। যে ছবি তোলা হল তাকে ডেভেলাপ করতে হবে, প্রিন্ট করতে হবে, সেগুলোকে দেখে তার মধ্যে ভালো মন্দ বাছাই করতে হবে। তারপর সেগুলো কাটা ছাঁটা জোড়া ও আরো খুঁটিনাটি অনেক কাজ করে, একটা ছবিকে দাঁড় করাতে কমপক্ষে তিন-চার মাস লেগে যায়। এই তিন-চার মাসে অনেক লোক তাদের হাতের কাজের ছাপ ছবিতে রেখে যায়। একটা ছবি দেখতে গিয়ে আসল গল্প শুরু হবার আগে যে নামের তালিকাটা তোমরা দেখো (যাকে বলে credit list)—সেটা হচ্ছে এই সব কাজের লোকেদের নাম।

এই কর্মীদের সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা হয়। এক হল যারা ক্যামেরার সামনে থাকেন—অর্থাৎ যাদের চেহারা আমরা ছবিতে দেখি। এরা হলেন অভিনেতা—তা সে ছেলেই হোক বুড়োই হোক বা কুকুর বেড়ালই হোক।

অন্য দলের কর্মীরা থাকেন ক্যামেরার পিছনে। এদের প্রত্যেকেরই এক একটা নাম আছে সে নামগুলো হল—

(১) পরিচালক (Director)—

ছবি তৈরির সব ব্যাপারেই এঁর কর্তৃত্ব করার অধিকার আছে, কারণ তোলা আর জোড়া শেষ হলে পর পুরো ছবিটা কেমন দাঁড়াবে, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা একমাত্র পরিচালকেরই থাকে। অভিনয়টা কেমন ধরনের হবে, ক্যামেরা কোন্‌খানে বসিয়ে ছবি তোলা হবে, দৃশ্যগুলি কীভাবে বিভিন্ন শট্-এ ভাগ করা হবে—ইত্যাদি সবই পরিচালকের জানার কথা।

পরিচালকের সঙ্গে তিন চারজন সহকারী থাকেন যাঁরা অনেক ব্যাপারেই তাঁকে

সাহায্য করতে পারেন।

(২) ক্যামেরাম্যান বা আলোকচিত্রশিল্পী—

ইনি ছবি তোলেন। এঁকে কোনো কোনো সময়ে খোলা রাস্তাঘাট বন পাহাড় নদীর ধার ইত্যাদি আসল জায়গায় গিয়ে ছবি তুলতে হয়। আবার কোনো কোনো সময় স্টুডিওর ভিতরে নকল ঘর বাড়িতে নকল দিন বা নকল রাতের আলো তৈরি করে ছবি তুলতে হয়। এই দুটো কাজই এঁর জানা দরকার।

ক্যারেম্যানেরও দু-একজন সহকারী থাকেন।

(৩) শব্দ-যন্ত্রী (Sound Recordist) —

ক্যামেরাম্যান যেমন দৃশ্যের ছবি তুলে রাখেন, তেমনি শব্দ-যন্ত্রী মাইক্রোফোন দিয়ে একটি দৃশ্যের কথাবার্তা হাঁটা চলা হাঁচি কাশি হাসিকান্না চড়চাপড় পাখির ডাক মেঘের ডাক নাক ডাকানি ইত্যাদি সব কিছু যা কানে শোনা যায় তাই তুলে রাখেন।

এঁরও দু-একজন করে সহকারী থাকেন।

(৪) শিল্প-নির্দেশক (Art Director) —

ইনি স্টুডিওর ভেতর ফাঁকি-দেওয়া নকল বাড়ি ঘর তৈরি করেন এমন ভাবে যে ছবিতে তাকে আসল বলে মনে হয়। কাজেই বুঝতে পারছ যে এঁর কাজটাও নেহাৎ ফেলনা নয়।

কাজের জোগান দেবার জন্য এঁরও সহকারী থাকেন।

(৫) সম্পাদক (Editor) —

মাসিকপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে কিন্তু এই সম্পাদকের কোনোই মিল নেই। ক্যামেরায় তোলার সময় যে-গল্পকে টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে ভাগ করে তোলা হল, তাকে আবার জোড়া দিয়ে গল্পের চেহারায় ফিরিয়ে আনার ভার হল সম্পাদকের উপর। এঁর কাজেও অনেক ঝামেলা, তাই এঁকেও হয় একটি না হয় দুটি সহকারী নিতেই হয়।

যে সব লোকের কাজের ছাপ ছবিতে থাকে, অভিনেতা বাদে তাদের মধ্যে উপরের পাঁচজনই প্রধান। এঁদের প্রত্যেকের কাজ সম্বন্ধে আলাদা করে পরে তোমাদের বলব। তার আগে সিনেমা তৈরির যন্ত্রগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী হল ক্যামেরা। আর সব কিছু বাদ দিয়ে ছবি তোলা যায়, কিন্তু ক্যামেরা বাদ দিয়ে যায় না।

৪

গত মাঘ মাসেব সন্দেশে তোমাদেব একটা চিত্রনাট্য লিখতে বলেছিলাম যাব বিষয ছিল 'বাম ভালো ছেলে'। উত্তব যে খুব বেশি পাওযা গেছে তা নয। কিন্তু যে ক'জন লিখে পাঠিযেছ, তাব মধ্যে অনেকেই চিত্রনাট্যব ব্যাপাবটা বেশ ভালো ভাবে বুঝেছ. এটা কম আনন্দেব কথা নয। যাদেব সামান্য ভুলচুক হযেছে তাদেব দমবাব কোনো কাবণ নেই, চিত্রনাট্য লেখাটা মোটেই সহজ কাজ নয।

লেখা বিচাব কবাব সময বিশেষ কবে দুটো জিনিসেব দিকে আমি লক্ষ বেখেছিলাম। এক হল, লেখাটা সিনেমাব উপযোগী হযেছে কিনা, আব দুই, বাম যে ভালো ছেলে সেটা অল্প কথায অল্প সমযেব মধ্যে বেশ 'ইন্টাবেস্টিং' ভাবে বোঝানো হযেছে কিনা।

যে ভুলটা অনেক নামকবা চিত্রনাট্যকাবেবও হযে থাকে (আব স্বভাবতই সেটা তোমাদেবও কাবো হযেছে) সেটা হল, লেখাটা ঠিক সিনেমাব উপযোগী না হযে কিছুটা গল্পেব মতো বা কিছুটা নাটকেব মতো হযে পডে। যাবাই কথা (সংলাপ বা ডাযালগ) বেশি ব্যবহাব কবেছ তাদেব লেখাতেই থিযেটাবেব ঢং এসে পডেছে। এটা হবেই, কাবণ কথা জিনিসটা থিযেটাবেব একেবাবে একচেটিযা। মনে বাখবে সিনেমায যত কম কথোপকথনে কাজ সাবা যায ততই ভালো

একটা উদাহবণ দিই। একটা দৃশ্যে দেখানো হবে যদুবাবুব সঙ্গে মধুবাবুব দেখা হল। আব তাবা দুজনে কথা বলতে শুব কবলেন। অনেক চিত্রনাট্যকাবই হযতো এই দৃশ্য এইভাবে শুরু কবলেন—

যদু . নমস্কার।

মধু : নমস্কার। কী খবব ?

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পাববে গল্পে প্রযোজন হলেও, চিত্রনাট্যে ওই দুটো 'নমস্কাব' কথাব কোনো প্রযোজন নেই কাবণ সিনেমায আমবা চোখেই দেখতে পাবো যে দুজন দুজনকে নমস্কাব কবছেন। তাই চিত্রনাট্যকাবেব উচিত হবে দৃশ্যটা এইভাবে শুরু কবা—

যদুবাবুর সঙ্গে মধুবাবুর দেখা হল। দুজনে পবস্পবকে নমস্কাব কবলেন।

মধু : কী খবর ?.

ছবিতে হাবে ভাবে এবং ক্যামেবাব চোখ দিযে কী দেখানো যায সেটা যদি সব সময খেযাল বাখা যায তাহলে কথোপকথনেব উপব অনেক কম নির্ভব কবে চিত্রনাট্য লেখা যায।

গল্পেব ধাঁচ বলতে কী বলছি সেটা তোমাদেবই একজনেব লেখা থেকে একটা

উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই। একজন গ্রাহক চিত্রনাট্য শুরু করেছে এইভাবে—

'আষাঢ় মাসের সকাল। চড়চড়ে রোদ্দুর। রাম ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি দাদুর সঙ্গে কথা কয়ে এসে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কয়েকদিন ধরেই দাদুর শরীর ভালো ছিল না, প্রথমে রুটি করতে গিয়ে হাত পুড়ে যাওয়া, তারপরেই জ্বর'...

প্রথমেই বলা হয়েছে, 'আষাঢ় মাসের সকাল।' ছবির শুরুতেই যদি এটা বোঝাতে হয় তাহলে কারুর মুখ দিয়ে কথাটা বলাতে হবে, আর না হয় একটা বাংলা ক্যালেন্ডার আষাঢ় মাসের পাতায় খোলা রয়েছে দেখাতে হবে। সুতরাং, গল্পের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, চিত্রনাট্যের শুরুর পক্ষে এটা ঠিক নয়।

'চড়চড়ে রোদ্দুর' জিনিসটাও ছবিতে বোঝানো সহজ নয়।

ক্যামেরায় রোদের ছবি তুলে সেটা গ্রীষ্মকালের রোদ কি শীতকালের রোদ বোঝানো ভারী শক্ত। একজন লোককে যদি দেখানো যায় যে সে রোদে কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে হয়তো কিছুটা কাজ হতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে হয়তো সে লোককে দিয়ে আবার মুখে বলাতে হবে—বাপ্‌রে, কী গরম!

'রাম ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছে'—এটা চিত্রনাট্যের পক্ষে ঠিকই আছে, তবে এখানেও আরেকটু বর্ণনা দিলে আরো ভালো হয়—যেমন, রাম কী পোশাক পরেছে, তার হাতে বই খাতা কী আছে—ইত্যাদি।

'কিন্তু এক্ষুনি দাদুর সঙ্গে কথা কয়ে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল।' দাদুর সঙ্গে কথা বলার দৃশ্য যদি ছবিতে না থাকে তাহলে সেটা বোঝানো যায় কী ভাবে? ছবি শুরু হবার আগে রাম কী করেছে সেটা তো আমাদের জানার কোনো উপায় নেই।

'কয়েকদিন ধরে দাদুর শরীর ভালো না।' এ জিনিসটাও যতক্ষণ না কারুর মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে, ততক্ষণ বোঝার কোনো উপায় নেই। একজন লোক যে অসুস্থ সেটা ছবি দেখিয়ে বোঝানো যায়। হয়তো সে কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটে শুয়ে আছে, একজন তার মাথায় বাতাস করছে, তার খাটের পাশে টেবিলের উপর ওষুধের বোতল রয়েছে, তার মুখে থারমোমিটার গোঁজা রয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে অসুখের ব্যাপারটা কথা বলিয়েই বোঝাতে হয়।

আরেকটি চিত্রনাট্যের শুরুতে আছে—'কিন্তু কে জানত তার আজ স্কুলে গিয়ে পৌঁছতে এতটা দেরি হয়ে যাবে? অবশ্য স্কুলটা ওর বাড়ি থেকে অনেক দূর। সব সময়ই তো হেঁটে স্কুলে যায়। এত দূর হেঁটে যেতে ভারী কষ্ট, কিন্তু কী করবে, দাদুকে বলেও আর কোনো লাভ নেই। এত পয়সা কোথায় পাবে দাদু যে ও রিক্সা করে স্কুলে যাবে?'

এ অংশটাও চিত্রনাট্য না হয়ে গল্প হয়ে গেছে! এর প্রত্যেকটি জিনিসই

লোকের মুখ দিয়ে না বলিয়ে সিনেমায় বোঝানোর কোনো উপায় নেই।

এই ধরনের ভুল ত্রুটি এড়িয়ে যে ক'জন চিত্রনাট্য লিখেছ তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হয়েছে তিনজনের লেখা—কাজরী দত্ত (৯৪১), ভাস্কর মিত্র (১৩১৭) ও শঙ্কর কুমার কুণ্ডু (১৯০৯)। এরা প্রত্যেকে পাঁচ টাকা পুরস্কার পাবে। এদের লেখা নীচে ছাপিয়ে দেওয়া হল।

এখানে বলে রাখি, চিত্রনাট্য শেষ হলেই তা থেকে ছবি তোলা যায় না। আগে সেই চিত্রনাট্য থেকে পরিচালকের Shooting Script তৈরি করে নিতে হয়। এই 'শুটিং স্ক্রিপ্ট' কী ব্যাপার, আর সেটা কীভাবে তৈরি হয়, সেটা আগামীবারে তোমাদেরই একটা পুরস্কার-পাওয়া চিত্রনাট্য দিয়ে বুঝিয়ে দেবো।

ভাস্কর মিত্র

১৩১৭—বয়স ১৬

সকালবেলা রাম আর তার বন্ধুরা মিলে ইস্কুলে যাচ্ছে। সবার হাতেই বই খাতা। দুজনের হাত থেকে আবার দড়ি বাঁধা দোয়াত ঝুলছে। পাঁচজন বন্ধু একসঙ্গে যাচ্ছে—কেউ কিন্তু চুপ করে নেই। অনবরত কথা বলে চলেছে পাঁচজনে। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে গিয়ে মাঝে মাঝে গাছপালা এসে পড়ছে আর গাছ দেখলেই রামের বন্ধুরা মাথা তুলে দেখছে গাছে পাখি আছে কিনা—পাখি চোখে পড়লেই হল, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢিল ছুঁড়তে শুরু করছে। রাম কিন্তু কোনবারই ঢিল ছুঁড়ছে না, বরং ওদের ঢিল ছোঁড়া দেখলেই ওর চোখেমুখে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠছে।

ইতিমধ্যে রামের চোখে পড়ল পথের মাঝে এক বুড়ি গাছতলায় বসে আছে। পরনে তার ছেঁড়া শাড়ি। গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়ে ঝুলে পড়েছে, বয়েসের ভারে শরীরটা সামনে নুয়ে পড়েছে। মাথাটা এসে ঠেকেছে প্রায় হাঁটুর কাছে। হাতের কাছে পড়ে রয়েছে একটা সরু লাঠি। বুড়ি একটু পরপরই সরু গলায় ডাকছে—'লালিরে—অ লালু, আয় বাবা, মানিক আমার।' রাম অবাক হয়ে চেয়ে রইল বুড়ির দিকে; কারণ আশেপাশে এমন কিছু চোখে পড়ল না যাকে দেখে মনে হয় বুড়ি তাকে ডাকছে। রামের বন্ধুরা কিন্তু এদিকে হল্লা করতে করতে এগিয়ে গেছে আর বুড়ি একটু পরপরই ডেকে উঠছে লালি লালি করে। রাম এবার আর একবার চাইল চারিদিকে আর তখনি দেখল দূরে মাঠের ভেতর একটা লালচে রঙের ছাগল-এর বাচ্চা ঘাস খেতে খেতে একটু একটু করে ক্রমশই আরো দূরে চলে যাচ্ছে। তার গলায় বাঁধা ছোট্ট একটু দড়ি আর আরো ছোট্ট একটি ঘণ্টা। রাম একবার চাইল বুড়ির দিকে—আর একবার ছাগল আর চড়া রোদে ভরা মাঠের দিকে। তারপরই হাতের বই খাতা গাছতলায় নামিয়ে

একছুট্টে চলে গেল মাঠে। ছাগলের বাচ্চাটাকে পাঁজাকোল করে এনে দিল বুড়ির কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এই নাও বুড়িমা তোমার লালিকে। বুড়ি আচমকা ব্যাপারটা না বুঝে হাঁ করে চেয়ে রইল আর রাম ততক্ষণে বই খাতা তুলে আবার দৌড় দিয়েছে কেননা রামের বন্ধুরা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

কাজরী দত্ত

৯৪১—বয়স ১৩½

সকালবেলা। কাল রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়েছে।

বারো বছরের ছেলে রাম স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। শার্ট গায়ে গলিয়ে, বই-এর ঝোলা কাঁধে নিয়ে, জুতো জোড়ায় পা গলাতে যাবে এমন সময় শোনা গেল দাদু কাশছেন খক্ খক্। রাম এগিয়ে গিয়ে বলল, দাদু কাল রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে তোমার কাশিটা দেখছি খুবই বেড়েছে। দাঁড়াও, আমি একটু মালিশ করে দিয়ে যাই। তাক থেকে মালিশের কৌটা পেড়ে মালিশ করে দিয়ে সে সযত্নে কম্বলটা দাদুর গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলল—আমি না আসা পর্যন্ত, তুমি আর উঠে ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। এবার সে রাস্তায় বেরুল। চারিদিকে কাল রাত্রের দুর্যোগের চিহ্ন। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাঁশের সাঁকোটার কাছাকাছি এসে সে দেখল প্রতিদিনকার মতো তরকারিওলা ঝুঁকে পড়ে মাথায় প্রকাণ্ড ঝাঁকা নিয়ে গুটি গুটি ওপার থেকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সে কাদার পা পিছলে বোঝাসুদ্ধ পড়ে গেল। রাম চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়াও লক্ষ্মণকাকা, আমি এসে ধরছি। এই বলে সে এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে তুলল আর চারিদিক থেকে তরকারিগুলো কুড়িয়ে এনে ঝাঁকায় তুলে দিল। এবার সে একটু তাড়াতাড়িই হাঁটতে লাগল। স্কুলের ফটকটার কাছে পৌঁছে অন্ধ কৃষ্ণদাস বৈরাগীকে রোজকার মতো ঊষাকীর্তন না গেয়ে উবু হয়ে জবুথবু ভাবে বাঁধানো বটগাছটার তলায় বসে থাকতে দেখা গেল।

অভ্যাস মতো রাম পকেট থেকে পয়সা বার করে তার হাতে গুঁজে দিলে। এমন সময় ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা শোনা গেল। রাম—এই রে দেরি হয়ে গেল, বলে এক দৌড়ে স্কুলের বড় ফটকটার ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শঙ্কর কুমার কুণ্ডু

১৯০৯—বয়স ১৫

ডাক্তারবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে চলেছে একটি ছেলে স্কুলে। হাতে বই, জামার পকেটে একটা পেনসিল গোঁজা, পায়ে জুতো নেই কিংবা কাঁধেও ব্যাগ নেই,

পরনে হাফ প্যান্ট আর জামার গায়ে ডোরা কাটা। কৃশাঙ্গ দেহ, দীর্ঘ-তনু ছেলেটি এগিয়ে চলেছে স্কুলে, ডাক্তারবাবুর ঘড়িটা ঢং ঢং করে দশটা বাজিয়ে ঘোষণা করল দশটা বাজে।

পথে পড়ে একটি দীঘি বা পুকুর, জলের গভীরতা আছে বলেই মনে হয় সেখানে পুকুরের পাড় ঘেঁষেই খেলা করছে গোটা কয়েক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, আর ওপাশে কাপড় কাচছে ও বাসন মাজছে কয়েকজন মেয়েলোক। হঠাৎ সঙ্গীদের 'গেল গেল' হতচকিত স্বরে চমকে উঠে রাম দেখল নিরুপায়ের মতো কতকগুলি ছেলে তাদের সঙ্গীকে ডুবে যেতে দেখছে আর বিলাপ করছে, অন্যদিকে তখন ছেলেটি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, একবার মাথাটা ডোবে আবার মাথা ওঠায় যেন সেটা করুণ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। ছেলেটি বই, পেনসিল ফেলে রেখেই ঝাঁপ দিল জলে ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য। সাঁতরে যেয়ে নিয়ে এল ছেলেটাকে পাড়ে। ওর সর্বাঙ্গ তখন ভিজে জলসিক্ত। একজন বৃদ্ধা বলল, 'আহা কি সোনার চাঁদ ছেলে গো, বাবা, তা তোমার নাম কি ?'

'আমার নাম শ্রীরামেশ্বর মণ্ডল, সকলে রাম বলে ডাকে,' প্রত্যুত্তর দিল রাম।

'তোমার বাবার নাম কি ?' 'আমার বাবা ও মা দুজনেই মারা গেছেন, বাবার নাম ছিল শ্রীপরমেশ্বর মণ্ডল।' 'তাহলে তুমি কার কাছে থাক ?' পাশ থেকে প্রশ্ন করল আর একজন মেয়েলোক।

'আমি থাকি আমার দাদুর কাছে, একমাত্র দাদু ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'

পেছন থেকে আর একজন স্ত্রীলোক বলে উঠল, 'আহা, বাছাধনের কেউ নেই গো !'

আর একজন বলে উঠল, 'তোমরা মানুষ না কিগা ! দেখছ না ছেলেটা ভিজে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, চল, তুমি আমাদের বাড়ি চল। সেখানে তোমার কাপড় শুকানোর পর না হয় বাড়ি ফিরে যেও বুঝলে।'

রামসহ সকলেই প্রস্থান করল। (চিত্রনাট্য এখানেই সমাপ্ত)

৫

গত বছরটা সিনেমা তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে তোমাদের জন্য আর সিনেমার কথা লেখাই হয়ে ওঠেনি। তোমাদেরই লেখা কিছু চিত্রনাট্য নিয়ে এর আগেকার আলোচনা করেছিলাম (শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৫)। এবার চিত্রনাট্য থেকে 'শুটিং স্ক্রিপ্ট' (shooting script) কীভাবে তৈরি হয় সেটা একবার দেখা

যাক।

চিত্রনাট্যে যে জিনিসটা লিখে বোঝানো হয়েছে, সেটাকে সিনেমার নিজস্ব ভাষায় কীভাবে বোঝানো হবে, সেটাই লেখা থাকে শুটিং স্ক্রিপ্টে। আগেই বলেছি যে সিনেমার ভাষা শুধু ছবির ভাষা নয়। শব্দেরও ভাষা। শব্দ বলতে মানুষের কথাবার্তা, পাখির ডাক, মেঘের ডাক, রেলগাড়ির শব্দ, গানবাজনা ইত্যাদি যা কিছু আমরা কানে শুনি সবই বোধ হয়। শুটিং স্ক্রিপ্টে তাই ছবির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের কথাটাও থাকে একটা বাড়ি তৈরি করতে যেমন প্ল্যান বা নক্শার প্রয়োজন হয়। সিনেমা করতে গেলেও ঠিক তেমনিই দরকার হয় শুটিং স্ক্রিপ্টের। এ জিনিসটা ঠিকভাবে তৈরি না হলে পরিচালক কাজের সময় খেই হারিয়ে একগাদা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসেন।

লিখে গল্প বলা আর সিনেমার গল্প বলার মধ্যে তফাৎ থাকলেও, দুটোর মধ্যে একটা মিল আছে যেটা লক্ষ করার মতো।

তোমরা জান যে গল্প লিখতে গেলেই সেটাকে বাক্য বা sentence-এ ভাগ ভাগ করে লিখতে হয়। সিনেমার গল্পকেও একটা নিজস্ব কায়দায় ভাগ ভাগ করে বলার প্রয়োজন হয়। ছবি তোলার কাজটাই হয় টুক্‌রো টুক্‌রো ভাবে। তারপর সেই ছবির টুক্‌রো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে সিনেমার গল্প তৈরি হয়।

এই ছবির টুক্‌রোকে বলা হয় 'শট্' (shot)। শট্‌গুলো ঠিক কথার মতো কাজ করে। তবে এমন অনেক কথা আছে যা একটা মাত্র শটে বোঝানো সম্ভব হয় না যেমন একটা শট্-এ দেখা গেল—

শুধু এই শট্‌টার যদি মানে করতে হয় তাহলে দাঁড়ায়—'একটা লোক আকাশের দিকে চেয়ে আছে।'

কিন্তু তার পরে শট্‌টা যদি হয় এই হয় —
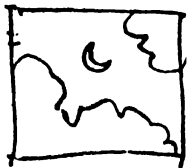
—তাহলে দুটোয় মিলে অন্য মানে হয়ে যাচ্ছে—'একটা লোক আকাশে চাঁদ দেখছে।'

পরিচালক যদি বোঝাতে চাইতেন যে 'একটা লোক এরোপ্লেন দেখছে', তাহলে অবিশ্যি দ্বিতীয় শট্‌টা চাঁদের না হয়ে এরোপ্লেনের হত। কিন্তু এরোপ্লেনের ব্যাপারে পরিচালক একটা কায়দা করতে পারতেন যেটা চাঁদের ব্যাপারে সম্ভব নয়। এরোপ্লেনের শব্দ আছে, চাঁদের নেই। ধরা যাক প্রথম শট্‌টার সঙ্গে সঙ্গে একটা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল। তক্ষুনি মনে হবে যে 'লোকটা আকাশে এরোপ্লেন দেখছে।' ফলে দুটোর জায়গা একটা শটেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

শট্‌-এর পর শট্‌ জুড়ে সিনেমার এক একটা scene বা দৃশ্য, দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে এক একটা sequence (পরিচ্ছেদ বা chapter), আর sequence-এর পর sequence জুড়ে একটা পুরো সিনেমার গল্প তৈরি হয়। শট্‌, সীন, সিকুয়েন্স ইত্যাদি পর পর কীভাবে আসবে সেটাও শুটিং স্ক্রিপ্টে লেখা থাকে।

একটা কথা এই ফাঁকে বলে রাখি—যিনি সিনেমা তৈরি করবেন, তিনি যদি একটু আধটু ছবি আঁকতে পারেন তাহলে তাঁর পক্ষে খুব সুবিধে হয়। শুটিং স্ক্রিপ্ট তৈরি করার ব্যাপারে আঁকাটা অনায়াসেই কাজে লাগানো যেতে পারে। অবিশ্যি এই আঁকা খুব ভালো না হলেও চলে, কারণ এটা নিজের দরকারেই আঁকা—মোটামুটি জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল।

সন্দেশের গ্রাহক (১৩১৭) ভাস্কর মিত্রের পুরস্কার পাওয়া 'রাম ভালো ছেলে' চিত্রনাট্যের প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে কী রকম শুটিং স্ক্রিপ্ট হতে পারে সেটা দেখা যাক। চিত্রনাট্যে আছে—

'সকালবেলা রাম আর তার বন্ধুরা মিলে ইস্কুলে যাচ্ছে। সবার হাতেই বই খাতা। দুজনের হাত থেকে আবার দড়ি বাঁধা দোয়াত ঝুলছে। পাঁচজন বন্ধু একসঙ্গে যাচ্ছে—কেউ কিন্তু চুপ করে নেই। অনবরত কথা বলে চলেছে পাঁচজনে। গ্রামের পথ দিয়ে যেতে মাঝে মাঝে গাছপালা এসে পড়ছে, আর গাছ দেখলেই রামের বন্ধুরা মাথা তুলে দেখছে গাছে পাখি আছে কিনা। পাখি চোখে পড়লেই হল, সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করছে। রাম কিন্তু কোনবারই ঢিল ছুঁড়ছে না, বরং ওদের ঢিল ছোঁড়া দেখলেই ওর চোখে মুখে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠছে।'

এই হল প্রথম প্যারাগ্রাফ।

শুটিং স্ক্রিপ্ট করার আগে একটা জিনিস লক্ষ করা দরকার। চিত্রনাট্যে বলা হয়েছে 'অনবরত কথা বলে যাচ্ছে পাঁচজন'—অথচ কী কথা বলছে সেটা বলা

হয়নি। সিনেমার জন্যে কথাগুলোর দরকার, কাজেই শুটিং স্ক্রিপ্টে সেটা লিখে দিতে হবে।

রামের চার বন্ধুর নাম দেওয়া যাক—হারু, বিশু, পটলা ও কানাই।

রাম ভালো ছেলে (শুটিং স্ক্রিপ্ট)

প্রথম দৃশ্য। গ্রামের রাস্তা। সকালবেলা
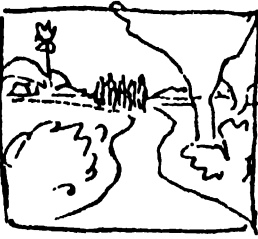
দূর থেকে দেখা যায় পাঁচজন ছেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে। তারা কথা বলছে—কিন্তু এতদূর থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

একজন ছেলে রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে একটা গাছের দিকে তাগ করে মারল।

একটা পাখির ডাক শোনা গেল। মনে হল সেটা গাছ থেকে উড়ে পালাল। ছেলেগুলো আবার হাঁটতে শুরু করল।

এবার পাঁচজনকে আরো কাছ থেকে দেখা যায়। তারা হাতে বই খাতা দোয়াত ইত্যাদি নিয়ে হেঁটে চলেছে—বোঝাই যায় তারা ইস্কুল যাচ্ছে।

ক্যামেরাও এদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

এবারে ছেলেদের কথা বোঝা যায়।

বিশু : হাতের চেয়ে গুলতিতে আরো ভালো টিপ হয়।

পটলা : আর তীর ধনুক ?

কানাই : সবচেয়ে ভালো বন্দুক, তারপর তীর ধনুক, তারপর গুলতি।

হারু : আমার হাতের টিপ বন্দুকের চেয়েও ভালো।

কানাই : অ্যাঃ !

হারু : সেবারে এক ঢিলে একটা শালিক মারলাম যে ! রামের সামনে তো। রাম, তোর মনে নেই ?

রামকে বেশ কাছ থেকে দেখা যায়। সে হারু আবার প্রশ্ন করে।

হারু (নেপথ্যে) : কীরে—মনে নেই ?

রাম আছে।
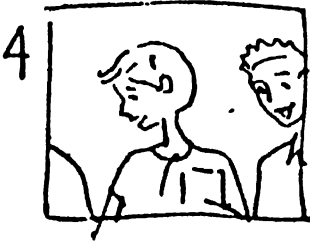
কাছ থেকে হারু ও কানাই। কানাই তার মুখে দুঃখের ভাব আনে।*

কানাই (ঠাট্টার সুরে) : রামের মনটা যে বড্ড নরম—তাই ওর দুঃখু হয়েছিল।
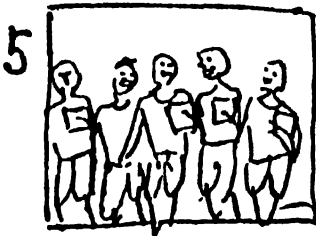
আবার পাঁচজনকেই দেখা যায়। কানাইয়ের কথায় রাম ছাড়া সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে।

কাছেই একটা পাখি ডেকে ওঠে।

সবাই হাঁটা থামিয়ে বাঁয়ে উপর দিকে দেখে।
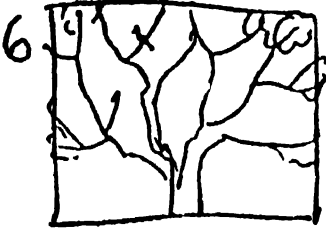
একটা শিমুল গাছের ডালে একটা বুলবুলি বসে আছে। সেটা আবার ডেকে উঠল।

কাছ থেকে হারু ও কানাই।

কানাই (ফিসফিস্ করে): দেখা, তোর হাতের টিপ।

হারু (ফিস্‌ফিস্ করে): দাঁড়া।

হারু ঢিল তুলতে নীচু হয়।
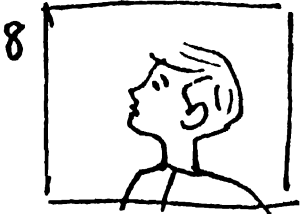
রাম গম্ভীর মুখে হারুর দিক থেকে গাছের দিকে দেখে।
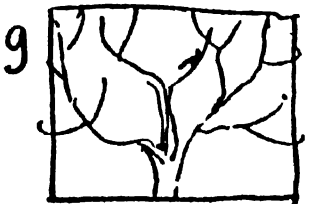
একটা ডাল থেকে পাশের আরেকটা ডালে পাখিটা উড়ে গিয়ে বসে।

রাম আবার হারুর দিকে দেখে

হারু হাতে ঢিল নিয়ে পা টিপে টিপে দল থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আসে।
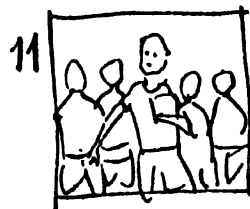
হারু তাগ করে।
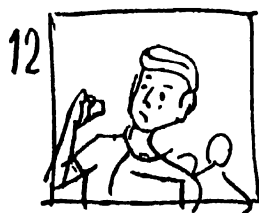
পাখিটা হঠাৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়
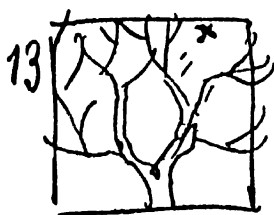
হারু বোবা বনে যায়।

রাম হেসে আবার ইস্কুলের দিকে রওনা দেয়।

চিত্রনাট্যের প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে ১৫টা শটে এইভাবে একটা শুটিং স্ক্রিপ্ট হতে পারে। এ ছাড়া যে আর কোনোভাবে হতে পারে না তা নয়। একই গল্প যেমন দুজন লেখক দুরকমভাবে লিখতে পারেন, সেরকম একই চিত্রনাট্য থেকে বিভিন্ন পরিচালক তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে শুটিং স্ক্রিপ্ট করে নিতে পারেন। আমি এখানে শুধু একটু উপায় বাতলে দিলাম।

এবারে চিত্রনাট্যের সঙ্গে আমার শুটিং স্ক্রিপ্টের যে তফাতগুলো রয়েছে সেটার কারণ বলি।

প্রথমে, চিত্রনাট্যে আছে পাঁচজনেই অনবরত কথা বলছে। অথচ শুটিং স্ক্রিপ্টে রামকে দিয়ে কিছুই বলানো হয়নি, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে রাম যদি পাখি মারার ব্যাপারটা পছন্দ না করে, তাহলে তার বন্ধুদের কাণ্ডকারখানা দেখে সে নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় কথা না বলে মুখ ভার করে থাকাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় কি ?

দ্বিতীয়ত, চিত্রনাট্যে রয়েছে 'মাঝে মাঝে গাছপালা এসে পড়ছে' আর গাছে পাখি দেখলেই ছেলেরা ঢিল মারছে। মাঝে মাঝে ব্যাপারটা সিনেমায় দুবার দেখালেই দিব্যি বুঝিয়ে দেওয়া যায়। বার বার দেখাতে গেলে জিনিসটা একঘেঁয়ে হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

পাখি উড়ে পালানোর ঘটনাটা অবিশ্যি চিত্রনাট্যে নেই, কিন্তু এটার ফলে হারুর বিরক্তি আর হতাশা, আর তার সঙ্গে রামের ফুর্তিতে বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়। রামের চরিত্রটাও এতে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

এবার আরেকবার উপরের শট্‌গুলোর দিকে দেখ।

১নং শটে ছেলেদের খুব দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। একে বলে Long Shot। ২নং শটে অপেক্ষাকৃত কাছ থেকে দেখা যাচ্ছে ; একে বলে Medium Shot বা Med Shot। ৩নং শট্ ২নং-এর চেয়েও বেশি কাছের শট্ ; একে বলে Close Shot। পাখিটাও যে Long Shot সেটা বুঝতেই পারছ। অন্য শট্‌গুলো যে কী সেটা তোমরা ছবি দেখে নিজেরাই আন্দাজ করে নিতে পারবে।

এ ছাড়াও আরো কয়েকরকম শট্ হয়, সেটার কথা তোমাদের পরের বার বলব।

(অসম্পূর্ণ)

শু-টিংয়ের গল্প

অপুর সঙ্গে আড়াই বছর

পথের পাঁচালী ছবি তোলার কাজ চলেছিল আড়াই বছর ধরে। অবিশ্যি এই আড়াই বছরের রোজই যে শুটিং হয়েছে তা নয়। আমি তখন বিজ্ঞাপনের আপিসে কাজ করি। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই শুটিং হত। আর তার অধিকাংশই হত ছুটির দিনে, বা আপিসের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে। পয়সাকড়ি বেশি ছিল না আমাদের। যেটুকু জোগাড় হত সেটা ফুরিয়ে গেলে কাজ বন্ধ করে বসে থাকতে হত যতদিন না আবার কিছু টাকা জোগাড় হয় তার অপেক্ষায়।

শুটিং হবার আগে অভিনয় করার জন্য লোক জোগাড়ের একটা বড় পর্ব ছিল। বিশেষ করে অপুর জন্য কিছুতেই একটি বছর-ছয়েকের ছেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে বাধ্য হয়ে আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিই।

রাসবিহারী এভিনিউ-এর একটা বাড়িতে একটা ঘর নিয়েছিলাম ; সেই ঘরে রোজ বিকেলে একটা নির্দিষ্ট সময় সব ছেলে এসে হাজির হত। অনেক ছেলেই এসেছিল, কিন্তু মনের মতো একটিও নয়। একদিন একটি ছেলে এল, তার ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে দেখে আমার কেমন জানি সন্দেহ হল। তার নাম জিজ্ঞেস করতে ছেলেটি মিহি গলায় বলল 'টিয়া'। সঙ্গের অভিভাবককে জিজ্ঞেস করলাম, 'একে কি সদ্য সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে আনলেন না কি ?' ভদ্রলোক ধরা পড়ে গিয়ে আর আসল ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। বললেন ছেলেটি আসলে মেয়ে, অপুর পার্ট পাবাব লোভে তাকে চুল ছাঁটিয়ে এনেছেন আমাদের কাছে।

বিজ্ঞাপন দিয়ে ছেলে না পাওয়ার ফলে আমাদের প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা হয়েছিল। শেষে আমার স্ত্রী একদিন ছাত থেকে নেমে এসে বললেন, 'পাশের বাড়ির ছাতে একটি ছেলেকে দেখলাম ; তাকে একবার ডেকে পাঠাও

তো।' এই পাশের বাড়ির ছেলে শ্রীমান সুবীর ব্যানার্জিই শেষে হল আমাদের অপু। ছবির কাজ যে আড়াই বছর ধরে চলবে সেতো গোড়ায় ভাবা যায়নি, শেষে যত দিন যায় ততই ভয় হয় অপু-দুর্গা যদি বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে ছবিতে সেটা ধরা পড়বে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে এই বয়সে যতটা বাড়ার কথা, দুজনের একজনও ততটা বাড়েনি। আশি বছরের বুড়ি চুনিবালা দেবী—যিনি ইন্দির ঠাকরুন সেজেছিলেন তিনিও যে শুটিং-এর এত ধকল সত্ত্বেও আড়াই বছর বেঁচেছিলেন, সেটাও আমাদের পরম সৌভাগ্য।

শুটিং-এর একেবারেই শুরুতেই হল গোলমাল। অপু-দুর্গাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরে বর্ধমানের কাছে পালসিট বলে একটা জায়গায়। রেললাইনের ধারে কাশফুলে ভরা মাঠ। অপু-দুর্গার প্রথম ট্রেন দেখার দৃশ্য তোলা হবে। বেশ বড় দৃশ্য, তাই একদিনে কাজ শেষ হবে না, অন্তত দুদিন লাগবে। প্রথম দিন ছিল জগদ্ধাত্রীপুজো। অপু-দুর্গার মধ্যে মন কষাকষি চলছে, দিদির পিছনে ধাওয়া করে অপু গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে পৌঁছেছে কাশবনে। সকাল থেকে শুরু করে বিকেল অবধি কাজ করে প্রায় অর্ধেক দৃশ্য তোলা হল। পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, খুদে অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই নতুন, সকলেরই একটু বাধোবাধো ঠেকছে। তবে উৎসাহের অভাব নেই কারুর। প্রথম দিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে দিন সাতেক পরে আবার সেই একই জায়গায় ফিরে গিয়ে মনে হল—এ কোথায় এলাম? কোথায় গেল সব কাশ? দৃশ্য যে প্রায় চেনাই যায় না! স্থানীয় লোকের কাছে জানা গেল কাশফুল নাকি গরুর খাদ্য। এই সাতদিনে সব কাশ খেয়ে গেছে তারা। এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে জায়গাটা সেখানে ছবি তুললে আর প্রথম দিনের ছবির সঙ্গে মিলবে না।

এ দৃশ্যের বাকি অংশ তোলা হয়েছিল পরের বছরের শরৎ কালে, যখন আবার নতুন কাশে মাঠ ভরে গেছে। এবার অবিশ্যি ট্রেনের শট্‌ও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রেন নিয়ে এতগুলো শট্ ছিল যে একটা ট্রেনে কাজ হয়নি। পর পর তিনটে ট্রেন ব্যবহার করা হয়েছিল। আগে থেকে টাইম টেবল দেখে জেনে নেওয়া হয়েছিল সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে কটা ট্রেন এই লাইনে আসে। প্রত্যেকটি ট্রেন অবিশ্যি একই দিক থেকে আসা চাই—উল্‌টোমুখি ট্রেন হলে চলবে না। যে স্টেশন থেকে ট্রেন আসবে সেখানে আমাদের দলের অনিলবাবুকে রাখা হয়েছিল। ট্রেন এলে অনিলবাবু উঠে পড়তেন এঞ্জিনে ড্রাইভারের সঙ্গে। কারণ গাড়ি শুটিং-এর জায়গার কাছাকাছি এলেই বয়লারে কয়লা দেওয়া দরকার, তা না হলে কালো ধোঁয়া বেরোবে না। সাদা কাশ ফুলের পাশে কালো ধোঁয়া না পেলে দৃশ্য জমবে কেন?

ফিল্মে যখন দৃশ্যটা দেখা যায় তখন বোঝাই যায় না যে দিনের তিনটে বিভিন্ন সময় তিনটে আলাদা ট্রেন ব্যবহার করা হয়েছে। আজকের ডীজেল-ইলেক্ট্রিকের যুগে অবিশ্যি এ দৃশ্য এভাবে তোলাই যেত না !

পয়সার অভাবে এত বেশিদিন ধরে ছবি তোলার জন্য আরো অনেক সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছিল আমাদের। একটা উদাহরণ দিই।

বইয়ে আছে অপু-দুর্গাদের পোষা কুকুর ভুলোর কথা। গ্রাম থেকেই একটা কুকুর জোগাড় হয়েছিল ; সেটা আমাদের সকলেরই বেশ পোষ মেনে গিয়েছিল। ছবির একটা দৃশ্যে অপুর মা সর্বজয়া অপুকে ভাত খাওয়াচ্ছেন। ভুলো দাওয়ার সামনে উঠোনে বসে খাওয়া দেখছে। অপুর হাতে তীর ধনুক, খাওয়ায় তার বিশেষ মন নেই। সে মার দিকে পিঠ করে বসেছে, কখন আবার তীর ধনুক নিয়ে খেলবে তারই অপেক্ষা।

অপু খেতে খেতেই তীর ছোঁড়ে। তারপর খাওয়া ছেড়ে উঠে যায় তীর আনতে। সর্বজয়া বাঁ হাতে থালা ডান হাতে গ্রাস নিয়ে ছেলের পিছনে ধাওয়া করে। কিন্তু ছেলের ভাব দেখে বোঝে সে আর খাবে না। ভুলোও উঠে পড়েছে। তার লক্ষ ভাতের থালার দিকে।

এর পরের শট্-এ দেখানো হবে সর্বজয়া বাকি ভাতটুকু আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়। আর সেটা যায় ভুলোর পেটে। কিন্তু এই শট্টা আর নেওয়া গেল না। দিনের আলো ফুরিয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে আমাদের টাকাও।

মাস ছয়েক পরে টাকা সংগ্রহ হলে পর আবার বোড়াল গ্রামে যাওয়া হয় দৃশ্যের বাকি অংশ তোলার জন্য। কিন্তু গিয়ে জানা গেল ভুলো আর নেই। এই ছ'মাসের মধ্যে সে-কুকুর মরে গেছে। কী হবে ?

খবর পাওয়া গেল আরেকটা কুকুর আছে অনেকটা ভুলোর মতোই দেখতে। আনো ধরে সে কুকুরকে।

সত্যিই তো। দুই কুকুরে আশ্চর্য মিল। গায়ের বাদামী রঙে তো বটেই। সেই সঙ্গে আগেরটার মতো এটারও ল্যাজের ডগা সাদা ! শেষ পর্যন্ত এই নকল ভুলোই সর্বজয়ার পিছন পিছন এসে দিব্যি আস্তাকুঁড়ে ফেলা থালার ভাত খেয়ে ফেলল, আর আমাদেরও পুরো দৃশ্যটা তোলা হয়ে গেল। ফিল্ম দেখে ফাঁকি ধরে কার সাধ্যি।

শুধু কুকুর কেন, মানুষকে নিয়েও ঠিক এই মুশকিলে পড়তে হয়েছিল পথের পাঁচালীর শুটিং-এ।

চিনিবাস ময়রার কাছ থেকে মিষ্টি কেনার সামর্থ্য অপু-দুর্গাদের নেই। তাই ময়রার পিছন পিছন ধাওয়া করে তারা যায় মুখুজ্যেদের বাড়িতে। মুখুজ্যেরা বড়লোক, তারা মিষ্টি কিনবেই, আর তাই দেখেই অপু-দুর্গার আনন্দ।

এই দৃশ্যও খানিকদূর তোলার পর আমাদের শুটিং বেশ কয়েকমাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। টাকা জোগাড় হলে পর আবার যখন আমরা গ্রামে যাবো তখন খবর এলো যিনি চিনিবাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি আর এই জগতে নেই! কুকুরে-কুকুরে সামান্য বেমিল ধরা না গেলেও, প্রথম চিনিবাসের সঙ্গে মোটামুটি মিল হবে এমন মানুষ পাই কোথায়?

শেষ পর্যন্ত যাকে পাওয়া গেল তার মুখে বিশেষ মিল না থাকলেও, দেহটা মোটামুটি আগের চিনিবাসের মতোই নাদুস-নুদুস। তাকে নিয়েই শট্ নেওয়া হল। ছবিতে দেখা গেল এক নম্বর চিনিবাস বাঁশ বন থেকে বেরোলেন, আর পরের শটেই দুনম্বর চিনিবাস ক্যামেরার দিকে পিঠ করে মুখুজ্যেদের বাড়ির ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। পথের পাঁচালী ছবি অনেকে একাধিকবার দেখেছে। কিন্তু কেউ কোনোদিন আমাদের ফাঁকি ধরতে পেরেছে বলে শুনিনি।

এই চিনিবাসের দৃশ্যেই একটা ব্যাপারে আমাদের খুব নাজেহাল হতে হয়েছিল। আর সেটা ওই ভুলো কুকুরকে নিয়ে। পুকুরের ওপারে ময়রা দাঁড়িয়ে আছে। আর এপারে বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপু-দুর্গা তার দিকে চেয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে। ময়রার প্রশ্নের জবাবে তারা জানায় তাদের মিষ্টির দরকার নেই। ময়রা তখন রওনা দেয় মুখুজ্যেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। দুর্গা অপুকে বলে 'চ, আমরাও যাই।' ভাইবোনে ছুট দেয়। আর ঠিক তখনই পিছনে গাছতলায় বসা ভুলো এক লাফে উঠে ছুট দেয় তাদের সঙ্গে যাবার জন্য।

এই হল দৃশ্য; কিন্তু মুশকিল হল কি, এ কুকুর তো আর হলিউডের শেখানো-পড়ানো তৈরি কুকুর নয়—কাজেই ঠিক অপু-দুর্গার সঙ্গে সঙ্গে সেও দৌড় দেবে কিনা এটা বলা ভারী কঠিন। কুকুরের আসল মালিককে বলা আছে, যেই অপু-দুর্গা দৌড় দেবে, তৎক্ষণাৎ ক্যামেরার পিছন থেকে তিনি যেন কুকুরের নাম ধরে ডাক দেন, যাতে সেও দৌড়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল কুকুর ডাকে সাড়া দেয় না। যেমন ছিল তেমনই বসে থাকে। এদিকে ক্যামেরা চলছে, ফিল্মের দাম অনেক, সেই ফিল্ম নষ্ট হচ্ছে, আর আমাকে বার বার বলতে হচ্ছে 'কাট! কাট!'

এখানে ধৈর্য ধরা ছাড়া গতি নেই। ঠিক ভাবে ঠিক সময়ে ছুট দিলে ভুলো সত্যিই হয়ে যাবে এদের পোষা কুকুর, মিষ্টির প্রতি যার লোভ তার মনিবদের চেয়ে কিছু কম নয়।

এগারো বার চেষ্টার পর প্রায় চারশো ফুট ফিল্ম খরচ করিয়ে (তখনকার হিসেবে প্রায় একশো টাকা) বারো বারের বার ভুলো নিখুঁত অভিনয় করে আমাদের সকলের মেহনত সার্থক করল।

এই পয়সার অভাবেই আমাদের বৃষ্টির দৃশ্য তুলতে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়েছিল। বর্ষাকাল এল গেল, অথচ আমাদের হাত খালি বলে শুটিং বন্ধ। শেষটায় যখন পয়সা এল তখন অক্টোবর মাস। শরৎকালে ঝলমলে দিনে বৃষ্টির আশায় অপু-দুর্গা যন্ত্রপাতি লোকজন নিয়ে রোজ গিয়ে গ্রামে বসে থাকতাম। আকাশে এক টুকরো কালো মেঘ দেখলেই হাঁ করে সেদিকে চেয়ে থাকতাম, যদি সেটা জাদুবলে আকাশ ছেয়ে ফেলে বৃষ্টি নামিয়ে দেয়।

শেষে একদিন তাই হল। শরৎকালে ঘনঘটা করে নামল তুমুল বৃষ্টি। তারই মধ্যে দুর্গা বৃষ্টিতে ভিজে দৌড়ে এসে কুলগাছতলায় ভাইয়ের পাশে আশ্রয় নিল। ভাইবোনে জড়াজড়ি করে বসে আছে। দুর্গা বিড়বিড় করছে 'নেবুর পাতা করমচা, হে বৃষ্টি ধরে যা।' শরৎকালের বৃষ্টিতে রীতিমতো ঠাণ্ডা, অপুর খালি গা, অ্যালক্যাথীনের ছাউনিতে ঢাকা ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দেখছি সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। শট্-এর পরে দুধের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে ভাইবোনের শরীর গরম করা হল। অবিশ্যি দৃশ্যটা যে ভালোই হয়েছিল সেটা যাবা ছবিটা দেখেছে তারাই জানে।

কাজের পক্ষে কিন্তু গোপালনগরেব চেয়ে বোডাল গ্রামকে আমাদের বেশি উপযোগী বলে মনে হল। অপু-দুর্গার বাড়ি, অপুর পাঠশালা, গ্রামের মাঠঘাট ডোবা পুকুর আমবন বাঁশবন সবই বোড়ালের মধ্যে বা আশেপাশে পাওয়া গিয়েছিল। এখন সে গ্রামে বিজলি এসে গেছে। পাকা বাড়ি পাকা রাস্তা হয়েছে। তখন সেরকম ছিল না।

এই গ্রামে আমাদের বহুদিন ধরে বহুবার যেতে হয়েছে তাই সেখানকার লোকজনের সঙ্গেও যথেষ্ট আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারী অদ্ভুত চরিত্র। এঁকে আমরা সুবোধদা বলে ডাকতাম। বছর ষাট পঁয়ষট্টি বয়স, মাথায় টাক, একা একটি কুঁড়েঘরে থাকেন আর দাওয়ায় বসে আপন মনে বিড়বিড় করেন। আমরা ফিল্ম তুলতে এসেছি জেনে প্রথম দিকে তিনি মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। আমাদের দেখলেই হাঁক দিতেন—'ফিলিমের দল এয়েচে—বল্লম নিয়ে লাপিয়ে পড়ো!' খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম এঁর মাথায় ছিট আছে। পরে অবিশ্যি সুবোধদার সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়ে যায়। আমাদের ডেকে দাওয়ায় বসিয়ে বেহালায় যাত্রার গৎ বাজিয়ে শোনাতেন। আর মাঝে মাঝে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস্ করে বলতেন, 'ওই যে দেখছ সাইকেলে যাচ্ছে, ও কে জান তো? ও হল রুজভেল্ট। মহা পাজি।' আরেকজন হল চার্চিল, আরেকজন হিটলার, আরেকজন খান আবদুল গফুর খাঁ। সকলেই পাজি, সকলেই সুবোধদার শত্রু।

আমরা যে বাড়িতে শুটিং করতাম, তার পাশের বাড়িতেই এক ধোপা

থাকতেন। তিনিও ছিটগ্রস্ত। তাঁকে নিয়ে আমাদের মুশকিলই হত, কারণ তাঁর বাতিক ছিল হঠাৎ হঠাৎ 'হে বন্ধুগণ' বলে তারপরে দীর্ঘ রাজনৈতিক বক্তৃতা শুরু করা। অন্য সময়ে আপত্তি নেই, কিন্তু শট্-এর মাঝখানে এই বক্তৃতা শুরু হলে আমাদের সাউন্ডের দফারফা হয়ে যায়। তাঁর বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে সাহায্য না করলে আমাদের সমস্যা সমস্যাই থেকে যেত।

যে বাড়িতে শুটিং হত সেটা আমরা পেয়েছিলাম জীর্ণ জংলা অবস্থায়। বাড়ির মালিক থাকতেন কলকাতায়। তাঁর কাছ থেকে মাসিক ভাড়া দিয়ে বাড়িটা আমরা আমাদের ব্যবহারের জন্য নিয়ে নিয়েছিলাম। সেটাকে সংস্কার করে আমাদের কাজের উপযোগী করে নিতে আমাদের লেগেছিল প্রায় একমাস।

বাড়ির একটা অংশে সার বাঁধা পাশাপাশি কয়েকটা ঘর ছিল যেগুলো আমরা ছবিতে দেখাইনি। সেগুলিতে আমাদের মালপত্র রাখা হত। আর একটা ঘরে তাঁর যন্ত্র সমেত বসতেন আমাদের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ভূপেনবাবু। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও, তাঁর গলা শুনতে পেতাম। প্রত্যেকটি শটের পর আমরা হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'সাউন্ড ঠিক আছে তো?' ভূপেনবাবু জবাবে হাঁ কি না জানিয়ে দিতেন।

একদিন একটা শট-এর পর যথারীতি প্রশ্ন করাতে কোনো জবাব পেলাম না। আবার জিজ্ঞেস করলাম—'সাউন্ড ঠিক আছে তো ভূপেনবাবু?' এবারও কোনো উত্তর না পেয়ে কারণটা জানার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি একটি বিরাট গোখরো সাপ ঘরের পিছন দিকের জানালা দিয়ে ঢুকে মেঝেতে নামছে। সেই সাপ দেখে স্বভাবতই ভূপেনবাবুর কথা বন্ধ হয়ে গেছে!

এই সাপটাকে আমরা আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখেছিলাম। ইচ্ছে সত্ত্বেও স্থানীয় লোকে নিষেধ করাতে সেটাকে মারতে পারিনি। সাপটা নাকি বাস্তুসাপ। বহুদিন থেকেই এই পোড়ো বাড়িতে বসবাস করছে।

ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

গোলোকধাম রহস্য

'জয়দ্রথ কে ছিল ?'

'দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামী।'

'আর জরাসন্ধ ?'

'মগধের রাজা।'

'ধৃষ্টদ্যুম্ন ?'

'দ্রৌপদীর দাদা।'

'অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের শাঁখের নাম কী ?'

'অর্জুনের দেবদত্ত, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়।'

'কোন অস্ত্র ছুঁড়লে শত্রুরা মাথা গুলিয়ে সেমসাইড করে বসে ?'

'ত্বাষ্ট্র।'

'ভেরি গুড।'

যাক বাবা, পাশ করে গেছি ! ইদানীং রামায়ণ-মহাভারত হল ফেলুদার যাকে বলে স্টেপল রীডিং। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমিও পড়ছি। আর তাতে কোনো আপসোস নেই। এ তো ওষুধ গেলা না, এ হল একধার থেকে নন্‌স্টপ ভূরিভোজ। গল্পের পর গল্পের পর গল্প। ফেলুদা বলে ইংরিজিতে বইয়ের বাজারে আজকাল একটা বিশেষণ চালু হয়েছে—আনপুটডাউনেব্‌ল। যে বই একবার পড়ব বলে পিকআপ করলে আর পুট ডাউন করবার জো নেই। রামায়ণ-মহাভারত হল সেইরকম আনপুটডাউনেব্‌ল। ফেলুদার হাতে এখন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড। আমারটা অবিশ্যি কিশোর সংস্করণ। লালমোহনবাবু বলেন ওঁর নাকি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকখানি মুখস্থ ; ওঁর ঠাকুমা পড়তেন, সেই শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ নেই : ভাবছি একটা জোগাড় করে জটায়ুর

স্মরণশক্তিটা পরীক্ষা করে দেখব। ভদ্রলোক আপাতত ঘরবন্দী অবস্থায় পুজোর উপন্যাস লিখছেন, তাই দেখা-সাক্ষাৎটা একটু কম।

বই থেকে মুখ তুলে রাস্তার দরজাটার দিকে চাইতে হল ফেলুদাকে। কলিং বেল বেজে উঠেছে। হিজলীতে একটা খুনের রহস্য সমাধান করে গত শুক্রবার ফিরেছে ফেলুদা। এখন আয়েশের মেজাজ, তাই বোধহয় বেলের শব্দে তেমন আগ্রহ দেখাল না। ও যা পারিশ্রমিক নেয় তাতে মাসে একটা করে কেস পেলেই ওর দিব্যি চলে যায়। জটায়ুর ভাষায় ফেলুদার জীবনযাত্রা 'সেন্ট পার্সেন্ট অনাড়ম্বর'। এখানে বলে রাখি, জটায়ুর জিভের সামান্য জড়তার জন্য 'অনাড়ম্বর'টা মাঝে মাঝে 'অনারম্বড়' হয়ে যায়। সেটা শোধরাবার জন্য ফেলুদা ওঁকে একটা সেনটেন্স গড়গড় করে বলা অভ্যেস করতে বলেছিল ; সেটা হল—'বারো হাঁড়ি রাবড়ি বড় বাড়াবাড়ি।' ভদ্রলোক একবার বলতে গিয়েই চারব্যার হোঁচট খেয়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে, 'নতুন চরিত্র যখন আসবে, তখন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে দিবি। তুই না দিলে পাঠক নিজেই একটা চেহারা কল্পনা করে নেবে ; তারপর হয়তো দেখবে যে তোর বর্ণনার সঙ্গে তাব কল্পনার অনেক তফাত।' তাই বলছি, ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর রং ফর্সা, হাইট আন্দাজ পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি, বয়স পঞ্চাশ টঞ্চাশ, কানের দু'পাশের চুল পাকা, থুতনির মাঝখানে একটা আঁচিল, পরনে ছাই রঙের সাফারি স্যুট। ঘুরে ঢুকে যেভাবে গলা খাঁকবালেন তাতে একটা ইতস্তত ভাব ফুটে ওঠে, আব খাঁকরানির সময় ডান হাতটা মুখের কাছে উঠে আসাতে মনে হল ভদ্রলোক একটু সাহেবীভাবাপন্ন।

'সরি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারিনি,' সোফার এক পাশে বসে বললেন আগন্তুক—'আমাদের ওদিকে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে লাইনগুলো সব ডেড।'

ফেলুদা মাথা নাড়ল। খোঁড়াখুঁড়িতে শহবটা কী অবস্থা সেটা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

'আমার নাম সুবীর দত্ত।'—গলার স্বরে মনে হয় দিব্যি টেলিভিশনে খবর পড়তে পারেন।—'ইয়ে, আপনিই তো প্রাইভেট ইনভেস্—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি এসেছি আমার দাদার ব্যাপারে।'

ফেলুদা চুপ। মহাভারত বন্ধ অবস্থায় তার কোলের উপরে, তবে একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল গোঁজা রয়েছে।

'অবিশ্যি তার আগে আমার পরিচয়টা একটু দেওয়া দরকার। আমি করবেট অ্যান্ড নরিস কোম্পানিতে সেল্‌স এগজিকিউটিভ। ক্যামাক স্ট্রীটের দীনেশ চৌধুরীকে বোধহয় আপনি চেনেন ; উনি আমার কলেজের সহপাঠী ছিলেন।'

দীনেশ চৌধুরী ফেলুদার একজন মক্কেল সেটা জানতাম।

'আই সী'—ভীষণ সাহেবী কায়দায় গম্ভীর গলায় বলল ফেলুদা। ভদ্রলোক এবার তাঁর দাদার কথায় চলে গেলেন—

'দাদা এককালে বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব নাম করেছিলেন। নীহার দত্ত। ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। এখানে নয়, আমেরিকায়। মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটিতে। ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে একটা এক্সপ্লোশন হয়। দাদার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয় ; কিন্তু শেষে ওখানকারই হাসপাতালের এক ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে চোখ দুটোকে বাঁচানো যায়নি।'

'অন্ধ হয়ে যান ?'

'অন্ধ। সেই অবস্থায় দাদা দেশে ফিরে আসেন। ওখানে থাকতেই একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেন ; অ্যাক্সিডেন্টের পর মহিলা দাদাকে ছেড়ে চলে যান। তারপর আর দাদা বিয়ে করেননি।'

'তাঁর গবেষণাও তো তাহলে শেষ হয়নি ?'

'না। সেই দুঃখেই হয়তো দাদা প্রায় মাস ছয়েক কারোর সঙ্গে কথা বলেননি। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শেষে ক্রমে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।'

'এখন কী অবস্থা ?'

'বিজ্ঞানে এখনো উৎসাহ আছে সেটা বোঝা যায়। একটি ছেলেকে রেখেছেন—ওঁর হেলপার বা সেক্রেটারি বলতে পারেন—সেও বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল—তার একটা কাজ হচ্ছে সায়েন্স ম্যাগাজিন থেকে প্রবন্ধ পড়ে শোনানো। এমনিতে যে দাদা একেবারে হেল্‌প্‌লেস তা নন ; বিকেলে আমাদের বাড়ির ছাতে একাই লাঠি হাতে পায়চারি করেন। এমন-কি বাড়ির বাইরেও রাস্তার মোড় পর্যন্ত একাই মাঝে মাঝে হেঁটে আসেন। বাড়িতে এঘর ওঘর করার সময় ওঁর কোনো সাহায্যের দরকার হয় না।'

'ইনকাম আছে কিছু ?'

'বায়োকেমিস্ট্রির উপর দাদার একটা বই বেরিয়েছিল আমেরিকা থেকে, তার থেকে একটা রোজগার আছে।'

'ঘটনাটা কী ?'

'আজ্ঞে ?'

'মানে, আপনার এখানে আসার কারণটা..'

'বলছি।'

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, বললেন সুবীর দত্ত—

'দাদার ঘরে কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল।'

'সেটা কী করে বুঝলেন?'

ফেলুদা এতক্ষণে হাত থেকে মহাভারত নামিয়ে সামনের টেবিলের ওপর রেখে প্রশ্নটা করল।

'দাদা নিজে বোঝেননি। ওঁর চাকরটাও যে খুব বুদ্ধিমান তা নয়। ন'টার সময় ওঁর সেক্রেটারি এসে ঘরের চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ডেস্কের দুটো দেরাজই আধখোলা, কাগজপত্র কিছু মেঝেতে ছড়ানো, ডেস্কের উপরের জিনিসপত্র ওলটপালট, এমন-কি গোদরেজের আলমারির চাবির চারপাশে ঘষটানোর দাগ; বোঝাই যায় কেউ আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছে।'

'আপনাদের পাড়ায় চুরি হয়েছে ইদানীং?'

'হয়েছে। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে। পাড়ায় এখন দুটো পুলিশের লোক টহল দেয়। পাড়া বলতে বালিগঞ্জ পার্ক। আমাদের বাড়িটা প্রায় আশি বছরের পুরানো। ঠাকুরদার তৈরি। খুলনায় জমিদারী ছিল আমাদের। ঠাকুরদা চলে আসেন কলকাতায় এইটিন নাইনটিতে। রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ব্যবসা শুরু করেন। কলেজ স্ট্রীটে বড় দোকান ছিল আমাদের। বাবাও চালিয়েছিলেন কিছুদিন ব্যবসা। বছর ত্রিশেক আগে উঠে যায়।'

'আপনার বাড়িতে এখন লোক ক'জন?'

'আগের তুলনায় অনেক কম। বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছেন। আমার স্ত্রীও, সেভেনটি ফাইভে। আমার দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড় ছেলে জার্মানিতে। এখন মেম্বার বলতে আমি, দাদা, আর আমার ছোট ছেলে। দুটি চাকর আর একটি রান্নার লোক আছে। আমরা দোতলায় থাকি। একতলাটা দু'ভাগ করে ভাড়া দিয়েছি।'

'কারা থাকে সেখানে?'

'সামনের ফ্ল্যাটটাতে থাকেন মিঃ দস্তুর। ইলেকট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা। পিছনে থাকেন মিঃ সুখওয়ানি, অ্যান্টিকের দোকান আছে লিন্ডসে স্ট্রীটে।'

'এদের ঘরে চোর ঢোকেনি? শুনে তো বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়।'

'পয়সা তো আছেই। ফ্ল্যাটগুলোর ভাড়া আড়াই হাজার করে। সুখওয়ানির ঘরে দামী জিনিস আছে বলে ও দরজা বন্ধ করে শোয়। দস্তুর বলে বন্ধ ঘরে ওর সাফোকেশন হয়।'

'চোর আপনার দাদার ঘরে ঢুকেছিল কী নিতে অনুমান করতে পারেন।'

'দেখুন, দাদার অসমাপ্ত গবেষণার কাগজপত্র দাদার আলমারিতেই থাকে, আর সেগুলো যে অত্যন্ত মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সাধারণ চোর

আর তার মূল্য কী বুঝবে। আমার ধারণা চোর টাকা নিতেই ঢুকেছিল। অন্ধ লোকের ঘরে চুরির একটা সুবিধে আছে সেটা তো বুঝতেই পারেন।'

'বুঝেছি', বলল ফেলুদা, 'অন্ধ মানে বোধহয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, কারণ চেক সই করা তো...'

'ঠিক বলেছেন। বই বাবদ দাদা যা টাকা পান সব আমার নামে আসে। আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। তারপর আমি চেক কেটে টাকা তুলে দাদাকে দিয়ে দিই। সেই ব্যাঙ্কের টাকা সব ওই গোদরেজের আলমারিতেই থাকে। আমার আন্দাজ হাজার ত্রিশেক টাকা ওই আলমারিতে রয়েছে।'

'চাবি কোথায় থাকে?'

'যতদূর জানি, দাদার বালিশের নীচে। বুঝতেই পারছেন, দাদা অন্ধ বলেই দুশ্চিন্তা। রাত্তিরে দরজা খুলে শোন, চৌকাঠের বাইরে শোয় চাকর কৌমুদী—যাতে মাঝরাত্তিরে প্রয়োজনে ডাক দিলে আসতে পারে। ধরুন যদি তেমন বেপরোয়া চোর হয়, আর চাকরের ঘুম না ভাঙে, তাহলে তো দাদার আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না। অথচ পুলিশে উনি খবর দেবেন না। বলেন ওরা কেবল জানে জেরা করতে, কাজের বেলায় ঢু ঢু, সব ব্যাটা ঘুষখোর ইত্যাদি। তাই আপনার কথা বলতে উনি রাজি হলেন। আপনি যদি একবারটি আমাদের বাড়িতে আসেন, তাহলে অন্তত প্রিভেনশনের ব্যাপারে কী করা যায় সেটা একটু ভেবে দেখতে পারেন। এমন-কি বাইরের চোর না ভেতরের চোর সেটাও একবার—'

'ভেতরের চোর?'

আমি আর ফেলুদা দু'জনেই উৎকর্ণ মানে কান খাড়া।

ভদ্রলোক চুরুটের ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলে গলাটা যতটা পারা যায় খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'দেখুন মশাই, আমি স্পষ্টবক্তা। আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন জানি ঢেকেঢুকে কথা বললে আপনার কোনো সুবিধে হবে না। প্রথমত আমাদের দু'জন ভাড়াটের একটিকেও আমার খুব পছন্দ না। সুখওয়ানি এসেছে বছর তিনেক হল। আমি নিজে জানি না, কিন্তু যারা পুরানো আর্টের জিনিস-টিনিস কেনে, তেমন লোকের কাছে শুনেছি সুখওয়ানি লোকটা সিধে নয়। পুলিশের নজর আছে ওর ওপর।'

'আর অন্য ভাড়াটে?'

'দস্তুর এসেছে মাস চারেক হল। ও ঘরটায় আমার বড় ছেলে থাকত, সে পার্মানেন্টলি দেশের বাইরে। ডুসেলডর্ফে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করে, জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছে। দস্তুর লোকটা সম্বন্ধে বদনাম শুনিনি, তবে সে এত অতিরিক্ত রকম চাপা যে সেটাই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর, ইয়ে—'

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর বাকি কথাটা বললেন মুখ নামিয়ে, দৃষ্টি ছাইদানির দিকে রেখে।

'শঙ্কর, আমার ছোট ছেলে, একেবারে সংস্কারের বাইরে চলে গেছে।'

ভদ্রলোক আবার চুপ। ফেলুদা বলল, 'কত বড় ছেলে ?'

'তেইশ বছর বয়স। গত মাসে জন্মতিথি গেল, যদিও তার মুখ দেখিনি সেদিন।'

'কী করে ?'

'নেশা, জুয়া, ছিনতাই, গুণ্ডাগিরি কোনোটাই বাদ নেই। পুলিশের খপ্পরে পড়েছে তিনবার। আমাকেই গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের একটা খ্যাতি আছে সেটা তো বুঝতেই পারছেন, তাই নাম করলে এখনো কিছুটা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে নাম আর কদ্দিন টিকবে জানি না।'

'চোর যেদিন আসে সেদিন ও বাড়িতে ছিল ?'

'রাত্তিরে খেতে এসেছিল—সেটাও রোজ আসে না—তারপর আর দেখিনি।'

ঠিক হল আজই বিকেলে আমরা একবার যাব বালিগঞ্জ পার্কে। কেসটাকে এখনো ঠিক কেস বলা যায় না, কিন্তু আমি জানি বিস্ফোরণে অন্ধ হয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিকের ব্যাপারটা ফেলুদার মন টেনেছে। তার মাথায় নিশ্চয়ই ঘুরছে ধৃতরাষ্ট্র।

খবরের কাগজের কাটিং-এর বাইশ নম্বর খাতা থেকে মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বিস্ফোরণে উদীয়মান বাঙালী জীবরাসায়নিক নীহাররঞ্জন দত্ত-র চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবরটা খুঁজে বার করে দিতে সিধু জ্যাঠার লাগল সাড়ে তিন মিনিট। তার মধ্যে অবিশ্যি দু'মিনিট গেল ফেলুদা অ্যাদ্দিন ডুব মেরে থাকার জন্য তাকে ধমকানিতে। সিধু জ্যাঠা আমাদের সত্যি জ্যাঠা না হলেও আত্মীয়ের বাড়া। কোনো অতীতের ঘটনার বিষয় জানতে হলে ফেলুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধু জ্যাঠার কাছে যায়। তাতে কাজ হয় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আর অনেক বেশি ফুর্তিতে।

ফেলুদা প্রসঙ্গটা তুলতেই সিধু জ্যাঠা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'নীহার দত্ত ? যে ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিল ? এক্সপ্লোশনে চোখ হারায় ?'

বাপরে বাপ্!—কী স্মৃতিশক্তি! বাবা বলেন শ্রুতিধর। ফেলুদা বলে ফোটোগ্রাফিক মেমরি ; একবার কোনো ইন্টারেস্টিং খবর পড়লে বা শুনলে তৎক্ষণাৎ মগজে চিরকালের মতো ছাপা হয়ে যায়। '—কিন্তু সে তো একা ছিল না!'

এ খবরটা নতুন।

'একা ছিল না মানে ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'তার মানে, যদ্দূর মনে পড়েছে—' সিধু জ্যাঠা ইতিমধ্যে তাঁর বুকশেল্‌ফের সামনে গিয়ে খবরের কাটিং-এর খাতা টেনে বার করেছেন—'এই গবেষণায় তাঁর একজন পার্টনার ছিল—হ্যাঁ এই যে।'

বাইশ নম্বর খাতার একটা পাতা খুলে সিধু জ্যাঠা খবরটা পড়লেন। ১৯৬২-র খবর। তাতে জানা গেল যে নীহার দত্তের গবেষণার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন আরেকটি বাঙালি বায়োকেমিস্ট, নাম সুপ্রকাশ চৌধুরী। অ্যাক্সিডেন্টে চৌধুরীর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ সে ছিল ঘরের অন্য দিকে। এই চৌধুরীর জন্যই নাকি নীহার দত্ত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, কারণ আগুন নেবানো ও তৎক্ষণাৎ নীহার দত্তকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা চৌধুরীই করেন।

'এই চৌধুরী এখন— ?'

'তা জানি না,' বললেন সিধু জ্যাঠা। 'সে খবর আমার কাছে পাবে না। এদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে যদি সেটা খবরের কাগজে স্থান পায় তবেই সেটা আমার নজরে আসে। আমি যেচে কারুর খবর নিই না। কী দরকার ? আমার খবর ক'জন নেয় যে ওদের খবর আমি নেব ? তবে এটা ঠিক যে, এই চৌধুরী যদি বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগানো একটা কিছু করত, তাহলে সে খবর আমি নিশ্চয়ই পেতাম।'

॥ ২ ॥

সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িতে যে বয়সের ছাপ পড়েছে সেটা আর বলে দিতে হয় না। এটাও ঠিক যে বাড়ির মালিকের যদি সে ছাপ ঢাকবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঢাকা পড়ত নিশ্চয়ই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দত্ত পরিবারের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয়। বাগানটা বোধহয় বাড়ির পিছন দিকে। সামনে একটা গোল ঘাসের চাকতির উপর একটা অকেজো ফোয়ারা, সেই গোলের দু'পাশ দিয়ে নুড়িবেছানো রাস্তা চলে গেছে গাড়িবারান্দার দিকে। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে 'গোলোকধাম' দেখে ফেলুদা কৌতূহল প্রকাশ করাতে সুবীরবাবু বললেন যে ওঁর ঠাকুরদাদার নাম ছিল গোলোকবিহারী দত্ত। বাড়িটা তিনিই তৈরি করেছিলেন।

গোলোকধাম যে এককালে দারুণ বাড়ি ছিল সেটা এখনো দেখলে বোঝা যায়। গাড়িবারান্দা থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে শ্বেতপাথরের বাঁধানো

ল্যান্ডিং-এব বাঁ দিক দিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনে একটা দরজা দিয়ে ভিতরে করিডর দেখা যাচ্ছে, তার ডান দিকে নাকি পর পর দুটো ফ্লাট। বাঁ দিকে একটা প্রকাণ্ড হলঘর, যেটা দত্তরা ভাড়া দেননি। এই ঘরে নাকি এককালে অনেক খানাপিনা গানবাজনা হয়েছে।

হলঘরের ঠিক ওপরেই হল দোতলার বৈঠকখানা। আমরা সেখানেই গিয়ে বসলাম। মাথার ওপর কাপড়ে মোড়া চিরকালের মতো অকেজো ঝাড়লণ্ঠন, তার যে কত ডালপালা তার ঠিক নেই। একদিকে দেয়ালে গিল্ট-করা ফ্রেমে বিশাল আয়না, সুবীরবাবু বললেন সেটা বেলজিয়াম থেকে আনানো। মেঝেতে পুরু গালিচার এখানে ওখানে খুবলে গিয়ে দাবার ছকের মতো সাদা-কালো শ্বেতপাথরের মেঝেটা বেরিয়ে পড়েছে।

সুবীরবাবু সুইচ টিপে একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিতে ঘবের অন্ধকার খানিকটা দূর হল। আমরা সোফায় বসতে যাব, এমন সময় বাইরের করিডর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল—খট্ খট্ খট খট্।

লাঠি আর চটি মেশানো শব্দ।

শব্দটা চৌকাঠের বাইরে এসে মুহূর্তের জন্য থামল, আর তার পরেই লাঠির মালিকেব প্রবেশ। সেই সঙ্গে আমরা তিনজনেই দণ্ডায়মান।

'অচেনা গলার আওয়াজ পেলাম—এঁরা এলেন বুঝি ?'

গম্ভীর গলা, ছ'ফুট লম্বা চেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। এনার চুল সব পাকা, কিছুটা এলোমেলো, চোখে কালো চশমা, পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর সিল্কের পায়জামা।' বিস্ফোরণ যে শুধু চোখই নষ্ট করেনি, মুখের অন্যান্য অংশেও যে তার ছাপ রেখে গেছে, সেটা ল্যাম্পের চাপা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

সুবীরবাবু দাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। —'বোস, দাদা।'

'বসছি। আগে এঁদের বসাও।'

'নমস্কার,' ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমার বাঁ পাশে আমার কাজিন তপেশ।'

আমিও খাটো গলায় একটা নমস্কার বলে দিলাম। শুধু হাত জোড় করাটা তো অন্ধ লোকের কাছে মাঠে মারা যাবে।

'আমারই মতো হাইট বলে মনে হচ্ছে মিত্তির মশাইয়ের, আর কাজিন বোধ করি পাঁচ সাত কি সাড়ে সাত।'

'আমি পাঁচ সাত,' বলে ফেললেন তপেশরঞ্জন মিত্র।

মনে মনে ভদ্রলোকের আন্দাজের তারিফ না করে পারলাম না।

'বসুন এবং বোস' বলে ভাইয়ের সাহায্য না নিয়েই আমাদের সামনের সোফায়

বসে পড়লেন নীহার দত্ত। — চায়ের কথা বলেছ ?'

'বলেছি,' বললেন সুবীর দত্ত।

ফেলুদা অভ্যাসমতো ভনিতা না করে সোজা কাজের কথায় চলে গেল।

'আপনি যে রিসার্চ করছিলেন, সে ব্যাপারে বোধ হয় আপনার একজন

পার্টনার ছিল, তাই না ?'

সুবীরবাবুর উসখুসে ভাব দেখে বুঝলাম যে এ ব্যাপারটা তিনিও জানতেন, এবং আমাদের না বলার জন্য অপ্রস্তুত বোধ করেছেন।

'পার্টনার নয়,' বললেন নীহার দত্ত—'অ্যাসিসট্যান্ট। সুপ্রকাশ চৌধুরী। সে আমেরিকাতেই পড়াশুনা করেছিল। পার্টনার বললে বেশি বলা হবে। আমাকে ছাড়া তার এগোনোর পথ ছিল না।'

'তিনি এখন কোথায় বা কী করছেন সে খবর জানেন ?'

'না।'

'অ্যাক্সিডেন্টের পর তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি ?'

'না। এটুকু বলতে পারি যে তার একাগ্রতার অভাব ছিল। বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়াও অন্য পাঁচ রকম ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট ছিল।'

'বিস্ফোরণটা কি অসাবধানতার জন্য হয় ?'

'আমি নিজে সজ্ঞানে কখনো অসাবধান হইনি।'

চা এল। ঘরটা কেমন যেন থমথম করছে। সুবীরবাবুর দিকে আড়চোখে দেখলাম। তাঁরও যেন তটস্থ ভাব। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমাটার দিকে।

চায়ের সঙ্গে সিঙ্গাড়া আর রাজভোগ। আমি প্লেটটা হাতে তুলে নিলাম। ফেলুদার যেন খাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। ও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল—

'আপনি যে ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেটা তাহলে অসমাপ্তই রয়ে গেছে !'

'সে দিকে কেউ অগ্রসর হলে খবর পেতাম নিশ্চয়ই।'

'সুপ্রকাশবাবু সে নিয়ে আর কোনো কাজ করেননি সেটা আপনি জানেন ?'

'এটুকু জানি যে আমার নোট্‌স ছাড়া তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। গবেষণার শেষ পর্বের নোট্‌স আমার কাছে ছিল আমার ব্যক্তিগত লকারে। তার নাগাল পাওয়া বাইরের কারোর সাধ্যি ছিল না। সেসব কাগজপত্র আমার সঙ্গেই দেশে ফিরে আসে, আমার কাছেই আছে। এটা জানি যে গবেষণা সফল হলে নোবেল প্রাইজ এসে যেত আমার হাতের মুঠোয়। ক্যানসারের চিকিৎসার একটা রাস্তা খুলে যেত।'

ফেলুদা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছে। আমিও ইতিমধ্যে চুমুক দিয়ে বুঝেছি এ চা ফেলুদার মতো খুঁতখুঁতে লোককেও খুশি করবে। কিন্তু চুমুক দিয়ে তার মুখের অবস্থা কী হয় সেটা আর দেখা হল না।

ঘরের বাতি নিভে গেছে। লোড শেডিং।

'ক'দিন থেকে ঠিক এই সময়টাতেই যাচ্ছে,' সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন সুবীরবাবু। —'কৌমুদী!'

বাইরে এখনো অল্প আলো রয়েছে; সেই আলোতেই সুবীরবাবু চাকরের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'বাতি গেল বুঝি?' প্রশ্ন করলেন নীহার দত্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতে আমার কিছু এসে যায় না।'

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। ছ'টা।

সুবীরবাবু ফিরলেন, পিছনে মোমবাতি হাতে চাকর কৌমুদী।

মাঝের টেবিলে মোমবাতি রাখায় সকলের মুখ আবার দেখা যাচ্ছে। নীহারবাবুর কালো চশমার দুই কাচে দুটি কম্পমান হলদে বিন্দু। মোমবাতির শিখাব ছায়া।

ফেলুদা চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে আবার চশমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার গবেষণার নোট্‌স যদি অন্য কোনো বায়োকেমিস্টের হাতে পড়ে তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা লাভজনক হবে কি?'

'নোবেল প্রাইজটা যদি লাভ বলে মনে করেন তাহলে হতে পারে বৈকি।'

'আপনার কি মনে হয় এই কাগজপত্র চুরি করার জন্য চোর আপনার ঘরে ঢুকেছিল?'

'সেরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'আরেকটা প্রশ্ন। আপনাব এই নোটসের কথা আব কে জানে?'

'বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই এটার অস্তিত্ব অনুমান করতে পাবে। আর জানে আমার বাড়ির লোকেরা আর আমার সেক্রেটাবি বণজিৎ।'

'বাড়ির লোক বলতে কি একতলাব দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কথাও বলছেন?'

'তারা কী জানে না-জানে তা আমি জানি না। এবা ব্যবসাদাব লোক। জানলেও কোনো ইন্টারেস্ট হবার কথা না। অবিশ্যি আজকাল তো সব জিনিস নিয়েই ব্যবসা চলে, এ ধরনের কাগজপত্র নিয়েই বা চলবে না কেন। বিজ্ঞানী হলেই তো আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয় না।'

নীহারবাবু উঠে পড়লেন; সেই সঙ্গে আমবাও।

'আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক চৌকাঠের মুখে থেমে গিয়ে বললেন, 'দেখবেন বৈকি। সুবীর দেখিয়ে দেবে। আমি ছাতে সান্ধ্যভ্রমণটা সেরে আসি।'

করিডরে বেরিয়ে এলাম চারজনে। অন্ধকার আরো ঘনিয়ে এসেছে।

করিডরের ডাইনে বাঁয়ে ঘরগুলোর ভিতর থেকে মোমবাতির ক্ষীণ আলো বাইরে এসে পড়েছে। নীহারবাবু লাঠি ঠক্ ঠক্ করে ছাতের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুনলাম তিনি বলছেন, 'স্টেপ গোনা আছে। সতের স্টেপ গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে সিঁড়ি। সেভেন প্লাস এইট—পনেরো ধাপ উঠে ছাত। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন...'

॥ ৩ ॥

নীহারবাবুর বেশ বড় ঘরের একপাশে অনেকখানি জুড়ে পুরানো আমলের খাট। খাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। তাতে ঢাকনি-চাপা গেলাসে জল, আর তার পাশে রাঙতার মোড়া গোটা দশেক বড়ি। বোধহয় ঘুমের ওষুধ।

এই টেবিলের পাশে জানালার সামনে একটা আরাম কেদারা। তার পিঠে অনেক দিনের ব্যবহারের ফলে বেতের বুনুনিতে কালসিটে পড়ে গেছে। মনে হল এই আরাম কেদারাতেই বেশির ভাগ সময় কাটান নীহারবাবু।

এছাড়া আছে একটা কাজেব টেবিল—যার উপর এখন একটা মোমবাতি টিমটিম করছে—একটা স্টীলের চেয়ার, টেবিলের উপব লেখার সরঞ্জাম, চিঠির র‍্যাক, একটা পুরানো টাইপরাইটার আর এক তাড়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকা।

এই টেবিলের পাশেই, দরজার ঠিক বাঁয়ে, রয়েছে গোদরেজের আলমারিটা।

ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদা তার মিনি টর্চ দিয়ে আলমারির চাবির গর্তটা ভালো করে দেখে বলল, 'খোলার চেষ্টার অভাব হয়নি। গর্তের চারপাশে দাগ।' তারপর এগিয়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে বড়ির পাতাটা তুলে নিয়ে বলল, 'সোনেরিল।...বুঝেছিলাম নীহারবাবু বেশ কড়া ওষুধ খান। না হলে ঘুম ভেঙে যাবার কথা।'

তারপর চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ানো চাকর কৌমুদীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার ঘুম ভাঙল না ? তুমি কীরকম পাহারা দাও বাবুকে ?'

কৌমুদীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুবীরবাবু বললেন, 'ও বেজায় ঘুমকাতুরে। এমনিতেই তিনবার না ডাকলে ওঠে না।'

বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম আগেই ; এবার একটি বছর ত্রিশেকের ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, চোখে চশমা, চুল কোঁকড়া। সুবীরবাবু আলাপ করিয়ে দিতে বুঝলাম ইনিই নীহারবাবুর সেক্রেটারি, নাম রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'কে জিতল ?'

ফেলুদার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, করা হয়েছে সেক্রেটারি মশাইকে। রণজিৎবাবুর

ফ্যালফ্যালে ভাব দেখে ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনার পাতলা টেরিলিনের শার্টের পকেটে স্পষ্ট দেখছি খেলার টিকিটের কাউন্টারফয়েল। তার উপর রোদে মুখ ঝলসানো—লীগের বড় খেলা দেখে এলেন সেটা অনুমান করাটা কি খুব কঠিন ?'

'ইস্টবেঙ্গল,' হেসে বললেন রণজিৎবাবু। সুবীরবাবুর মুখেও তারিফ আর বিস্ময় মেশানো হাসি।

'আপনি এখানে কদ্দিন কাজ করছেন ?'

'চার বছর।'

'নীহারবাবু তাঁর বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয় কখনো কিছু বলেছেন ?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,' বললেন রণজিৎবাবু, 'কিন্তু উনি খুলে কিছু বলতে চাননি। তবে চোখ গিয়ে যে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে সেটা উনি মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন।'

'আর কিছু বলেন ?'

রণজিৎবাবু একটু ভেবে বললেন, 'একটা কথা বলতে শুনেছি যে, উনি যে এখনো বেঁচে আছেন তার কারণ হল যে ওঁর একটা কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটা কী কাজ আমি জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। মনে হয় উনি এখনো আশা রাখেন যে ওঁর গবেষণাটা শেষ করবেন।'

'নিজে তো আর পারবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন এটাই হয়তো ভেবেছেন। তাই নয় কি ?'

'তাই বোধহয়।'

'আপনার এখানে ডিউটি কতক্ষণ ?'

'ন'টায় আসি, ছ'টায় যাই। আজ খেলা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটি চেয়েছিলাম, উনি আপত্তি করেননি। তবে বাইরে গেলেও সন্ধেবেলা একবার এখানে হয়ে যাই। যদি ওঁর কোনো...'

'গোদরেজের চাবি কোথায় থাকে ?' ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল।—'টাকা আর গবেষণার নোট্স কী অবস্থায় থাকে সেটা একবার দেখে নিতে চাই।'

'ওই বালিশের নীচে।'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে পাঁচটা চাবি সমেত একটা রিং বার করে আনল। তারপর তা থেকে প্রয়োজনীয় চাবিটা বেছে নিয়ে আলমারি খুলল।

'টাকা কোথায় থাকে ?'

'ওই দেরাজে।'—রণজিৎবাবু আঙুল দেখালেন।

ফেলুদা দেরাজটা টেনে খুলল।
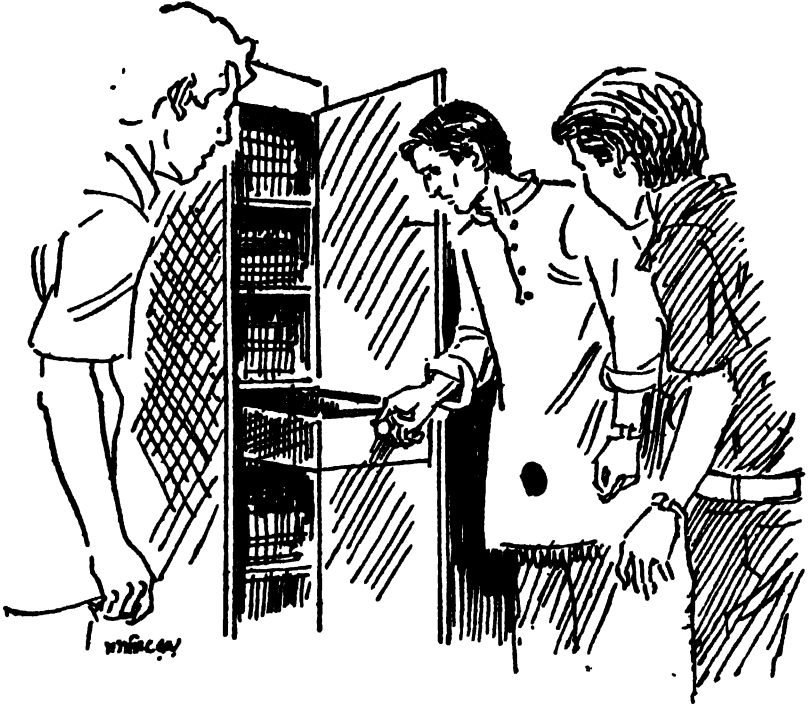
'সে কী !'

রণজিৎবাবুর চোখ কপালে। মোমবাতির আলোতেই বুঝলাম তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

দেরাজের মধ্যে একটা পাকানো কাগজ—খুলে দেখা গেল সেটা কুষ্ঠী—আর একটা কাশ্মীরী কাঠের বাক্সে কিছু পুরানো চিঠিপত্র। আর কিচ্ছু নেই।

'এ কী করে হয় ?'—রণজিৎবাবুর গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরোতে চাইছে না। —'তিনটে বাণ্ডিল করা একশো টাকার নোট...সব মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশ হাজার...'

'গবেষণার কাগজপত্র কি এই অন্য দেরাজটায় ?'

রণজিৎবাবু মাথা নাড়লেন। ফেলুদা দ্বিতীয় দেরাজটা খুলল।

এটা একেবারেই খালি।

বাইরে পায়ের শব্দ—খট্ খট্ খট্ খট্। নীহারবাবু ছাত থেকে নামছেন।

'মিশিগ্যান ইউনিভার্সিটির একটা লম্বা সীলমোহর লাগানো খামে ছিল গবেষণার নোটস...' রণজিৎবাবুর গলা খটখটে শুকনো।

'আজ সকালে ছিল টাকা আর কাগজপত্র ?'

'আমি নিজে দেখেছি,' বললেন সুবীরবাবু।—'একশো টাকার নোটের নম্বরগুলো সব নোট করা আছে। দাদাই এ ব্যাপারে ইনসিস্ট করতেন।'

ফেলুদা থমথমে ভাব করে বলল, 'তার মানে গত মিনিট পনেরোর মধ্যে—অর্থাৎ লোড শেডিং হবার পরেই—ব্যাপারটা ঘটেছে। আমরা যখন বৈঠকখানায় ছিলাম তখন।'

নীহারবাবু ঢুকলেন ঘরে। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বাইরে থেকে সব শুনেছেন।

আমরা পথ করে দিতে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে তাঁর আরাম কেদারায় বসলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বোঝো!—গোয়েন্দার নাকের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল।'

'সামনের সিঁড়ি ছাড়া দোতলায় ওঠার অন্য সিঁড়ি আছে ?' নীহারবাবুর ঘর থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

সুবীরবাবু বললেন, 'জমাদারের সিঁড়ি আছে পিছন দিকে।'

'লোড শেডিং কি রোজই এই সময় হয় ?'

'তা দিন দশেক হল হচ্ছে। অনেকে তো ঘড়ি মেলাতে শুরু করেছে। ছ'টায় যায়, আসে দশটায়।'

ভাবতে চেষ্টা করলাম ফেলুদার গোয়েন্দা জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা আর ঘটেছে কিনা। একটাও মনে পড়ল না।

'নীচের বাসিন্দারা কেউ ফিরেছেন কি ?' সিঁড়ির মুখটায় এসে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'সেটা একবার খোঁজ করা যেতে পারে,' বললেন সুবীরবাবু, 'মোটামুটি এই সময়টাতেই আসে।'

নীচে ল্যান্ডিং-এ সিঁড়ির উল্টোদিকে মিঃ দস্তুরের ঘরের দরজা। সেটা এখন বন্ধ, আর ঘর যে অন্ধকার সেটা বাইরে থেকেই বোঝা যায়।

'সুখওয়ানির ঘরে যেতে হলে পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে,' বললেন সুবীরবাবু।

বাড়ির পুব দিক দিয়ে গিয়ে বাগানের পাশের পথ দিয়ে সুখওয়ানির ঘরের দিকে এগোলাম আমরা। ঘরে ফ্লুওরেসেন্ট আলো জ্বলছে, ব্যাটারি লাইট, যেমন আজকাল চালু হয়েছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদার টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন, অথচ মানুষগুলো কে বোঝার উপায় নেই। সুবীরবাবু ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন—

'একটু আসতে পারি কি ?'

গলা চিনতে পেরে ভদ্রলোকের চাহনি পাল্টে গেল।

'সার্টন্‌লি, সার্টন্‌লি !'

ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'ইউ সী, মিস্টার মিটার—আমার ঘরভর্তি ভ্যালুয়েব্‌ল জিনিস। চুরির কথা শুনলে আমার হৃৎকম্প হয়। আজ সকালে যখন শুনলাম যে রাত্রে চোর এসেছিল, বুঝতেই পারেন তখন আমার কী মনের অবস্থা !'

সত্যি, এত দামী জিনিস যে একটা ঘরে থাকতে পারে সে আমার ধারণাই ছিল না। তাণ্ডবমূর্তি, ভৈরবমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাথর, পেতল আর ব্রঞ্জের স্ট্যাচুয়েটের সংখ্যাই অন্তত গোটা তিরিশ। তাছাড়া ছবি, বই, পুরানো ম্যাপ, নানারকম পাত্র, ঢাল-তলোয়ার, পিকদান, গড়গড়া, আতরদান এসব তো আছেই। ফেলুদা পরে বলেছিল, 'টাকা থাকলে অন্তত বই আর প্রিন্টগুলো সব কিনে ফেলতাম রে তোপ্‌শে !'

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে বললেন তিনি নাকি লোড শেডিং-এর ঠিক দশ মিনিট আগে ফিরেছেন।

'এই দশ মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকটা এসেছিল কি ? দোতলায় যাবার একটা সিঁড়ি রয়েছে আপনাব ঘরেব পিছনেই ; ওদিক থেকে কোনো আওয়াজ পেয়েছিলেন ?'

ভদ্রলোক বললেন উনি এসেই স্নানের ঘরে ঢুকেছিলেন। —'আর তাছাড়া এই অন্ধকারে দেখাব প্রশ্ন আব উঠছে কী করে ? আর ইয়ে, ভালো কথা, আপনারা কি বাইবেব লোককে সন্দেহ করছেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'আপনারা মিঃ দস্তুরের সঙ্গে কথা বলেছেন ?'

ভাবটা যেন, আমরা দস্তুরের সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যাব যে তাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা চলতে পারে না।

ফেলুদা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'হি ইজ এ মোস্ট পিকিউলিযার ক্যারেকটার। আমি জানি আমার প্রতিবেশী সম্বন্ধে এরকম করে বলা উচিত নয়, কিন্তু আমি ওকে কিছুদিন থেকেই ওয়চ্‌ করছি। গোড়ায় আলাপ হবার আগে শুধু ওর নাকডাকার শব্দ পেতাম ওর জানালা দিয়ে। আমার বিশ্বাস সে শব্দ দোতলা অবধি পৌঁছে যায়।'

সুবীরবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে মনে হল সুখওয়ানি খুব বাড়িয়ে বলেনি।

'তারপর আলাপ হয়, যখন একদিন সকালে ও আমার টাইপরাইটার ধার নিতে

আসে। আমার ঘরের জিনিসপত্রের দিকে যেরকম লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিল সেটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। সাধারণ কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করলাম ও কী করে। বলল ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুড্‌সের ব্যবসা। আরে বাপু, তাই যদি হবে, তাহলে এই লোড শেডিং-এর বাজারে ঘরে একটা ব্যাটারি লাইট আর পাখার ব্যবস্থা করোনি কেন ? সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।'

ভদ্রলোক থামলেন, আর আমরা সেই ফাঁকে উঠে পড়লাম। ফেলুদা বেরোবার আগে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মিঃ দত্তকে জানালে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে।'

পুবের গলিটা দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোনোর সময়ই একটা ট্যাক্সির হর্ন পেয়েছিলাম, এবার দেখলাম একটি ভদ্রলোক নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে গাড়িবারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। আবছা আলোতেও দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোক মাঝারি হাইটের এবং মোটা, পরনে খয়েরি টেরিলিনের সুট, পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। রংটা বোধহয় বেশ ফরসাই। হাতের ব্রীফকেসটা দেখে নতুন বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরতেই সুবীরবাবু তাঁকে গুড ইভনিং জানালেন। তাতে উনি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলাম এ বাড়িতে কারুর মুখ থেকে গুড মর্নিং, গুড ইভনিং শুনতে অভ্যস্ত নন।

'গুড ইভনিং, মিঃ ডাট্‌।'

অদ্ভুত খ্যানখ্যানে গলার স্বর। কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, ফেলুদা চাপা ফিস্‌ফিসে গলায় সুবীরবাবুকে বললেন, 'ওকে থামান।'

সুবীরবাবু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন কবলেন।

'ইয়ে, মিঃ দস্তুর !'

দস্তুর থামলেন। সুবীরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম।

সুবীরবাবু সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'এই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল ? ইওর ব্রাদার মাস্ট বি টেরিব্‌লি আপসেট !'

ফেলুদা বলেছিল যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় মানুষেব গলার স্বর এত বদলে যেতে পারে যে অনেক সময় চেনাই যায় না। মিঃ দস্তুর ইংরেজিতে আতঙ্ক ও বিস্ময় মেশানো স্বরে এই কথাগুলো বলার সময় লক্ষ করলাম যে খ্যানখ্যানে ভাবটা একেবারেই নেই। প্রায় মনে হয় যেন আরেকজন মানুষ কথাটা বলল।

'আপনি যখন এলেন তখন কাউকে বেরোতে দেখলেন এ বাড়ি থেকে ?'

ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'কই না তো?' বললেন মিঃ দস্তুর। 'অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে অন্ধকারে দেখতে পাইনি। থ্যাঙ্ক গড যে আমার ঘরে কোনো মূল্যবান জিনিস নেই!'

'কে?'

প্রশ্নটা এল দোতলার ল্যান্ডিং থেকে। নীহারবাবুর গলা। আমরা সবাই গাড়িবারান্দার সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার ভিতরে ঢুকে উপরে চেয়ে দেখলাম অন্ধকারেও নীহারবাবুর কালো চশমাটা চকচক করছে।

'ঈটস্ মী, মিস্টার ডাট্', দৃষ্টি উপরে করে বললেন দস্তুর—'আপনার ভাই এই মাত্র আপনার লস্-এর কথাটা বলল। আমি আপনাকে আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।'

চশমাটা সরে গেল। আর তার পরেই মিলিয়ে এল চটি আর লাঠির শব্দ।

'আপনারা একটু বসে যাবেন না আমার ঘরে!' বললেন মিঃ দস্তুর।—'সারাদিন কাজের পরে একটু সঙ্গ পেলে ভালো লাগে।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। তার কারণ অবিশ্যি আমি জানি। যে বাড়িতে ক্রাইম ঘটেছে, সে বাড়ির লোকেদের চিনে রাখা গোয়েন্দার গোড়ার কাজ।

সুখওয়ানির ঘরের পর মিঃ দস্তুরের বৈঠকখানার নেড়া ভাবটা সত্যিই দেখবার মতো। আসবাব বলতে একটা সোফা, দুটো কাউচ, একটা রাইটিং ডেস্ক আর একটা বুকশেল্ফ। সোফার সামনে একটা নীচু টেবিল আছে বটে, তবে সেটা নেহাতই ছোট। তারই উপর একটা মোমবাতি রাখা ছিল। ফেলুদা সেটা ওর লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল; এখন দেখলাম দেয়ালে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভদ্রলোক ভিতর দিকে গিয়েছিলেন বোধহয় চাকরকে ডাকতে; ফিরে আসতে ফেলুদা তাঁকে একটা সিগারেট অফার করল।

'নো, থ্যাঙ্কস্। ক্যানসারের ভয়ে ধূমপানটা বছর তিনেক হল ছেড়ে দিয়েছি।'

'অন্যের ধূমপানে আশা করি আপত্তি নেই। আপনার অ্যাশট্রেতে অলরেডি একটা আধখাওয়া সিগারেট পড়ে আছে।'

ফেলুদা টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমারই ব্র্যান্ড। চারমিনারের টুকরো আমিও দূর থেকেই চিনতে পারি।'

দস্তুর বলল, 'অনেকবার ভেবেছি সুখওয়ানির মতো আমিও আলো-পাখার একটা ব্যবস্থা করে নিই। তারপর যখনই মনে হয়েছে যে কলকাতার শতকরা নব্বই ভাগ লোককে গরম আর অন্ধকার ভোগ করতে হচ্ছে, তখনই মনটা খারাপ

হয়ে যায়। সেই কারণে আমিও...'

'আপনার তো ইলেক্‌ট্রিক্যাল গুডস-এর ব্যবসা ?'

'ইলেক্‌ট্রিক্যাল ?'

'সুখওয়ানি যে বলছিলেন—'

'সুখওয়ানি ওই রকমই বলে। ইলেক্‌ট্রিক্যাল নয়, ইলেক্‌ট্রনিকস্‌। বছরখানেক হল শুরু করেছি।'

'আপনি নিজেই ?'

'না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে। আমি বোম্বাই-এর লোক, তবে অনেকদিন দেশের বাইরে। জার্মানিতে একটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে কাজ করতাম। বন্ধু কলকাতা থেকে লিখল এখানে চলে আসতে। পয়সা ওর, আমি যোগাচ্ছি অভিজ্ঞতা।'

'কবে এলেন কলকাতায় ?'

'গত নভেম্বরে। বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম মাস তিনেক ; এই ফ্ল্যাটের খবরটা পেয়ে এখানে চলে আসি।'

চাকর কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এল। থামস আপ। মিঃ দস্তুর ফেলুদার পরিচয় আগেই পেয়েছেন, এবার গলাটা নামিয়ে বললেন, 'মিঃ মিটার, আমার ঘরে মূল্যবান জিনিস নেই ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। আমার প্রতিবেশীটি কিন্তু খুব সিধে লোক নন। তার ঘরে নানারকম গোপন কারবার চলে। গর্হিত ব্যাপার।'

'আপনি জানলেন কী করে ?'

'আমার স্নানের ঘর আর ওর স্নানের ঘর লাগোয়া। দুটোর মাঝখানে একটা বন্ধ দরজা আছে। সে দরজায় কান লাগালে মাঝে মাঝে ওর শোবার ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যায়।'

ফেলুদা গলা খাঁকরিয়ে বলল, 'এই ভাবে কান লাগানোও একটা গর্হিত ব্যাপার নয় কি ?'

মিঃ দস্তুর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, 'সেটা করতাম না। যখন দেখলাম যে আমার চিঠি ভুল করে ওর হাতে পড়লে ও জল দিয়ে খাম খুলে তারপর আবার আঠা দিয়ে সেঁটে ফেরত দেয়, তখন একটা পাল্টা দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। কিন্তু উনি যদি আমার পিছনে লাগেন তাহলে আমিও ওকে ছাড়ব না, এই বলে দিলাম।'

কোল্ড ড্রিঙ্কসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

গেটের কাছে এসে ফেলুদা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল গত আধ ঘণ্টার মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে কিনা। সে বলল সুখওয়ানি আর দস্তুরকে

ছাড়া কাউকে দেখেনি। এটা আশ্চর্য না। সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের কম্পাউন্ড ওয়াল রয়েছে বাড়ির চারদিক ঘিরে। পিছন দিকের একটা বাড়ি নাকি খালি পড়ে আছে আজ কয়েক মাস যাবৎ। জোয়ান চোর হলে পাঁচিল টপকে আসায় কোনো অসুবিধা নেই—যদিও আমাদের সকলেরই মন বলছে এ কাজ বাড়ির লোকেই করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলছে—ভেতরের লোকই যে বাইরের লোককে দিয়ে কাজটা কবায়নি তারই বা বিশ্বাস কী ?

আমাদের গাড়ি নেই। সুবীরবাবু বলেছিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা, কিন্তু ফেলুদা বলল হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।

'পুলিশে একটা খবর দিলে ভালো করতেন কিন্তু।'

ফেলুদার এ প্রস্তাবটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সুবীরবাবুও বেশ একটু অবাক হলেন। বললেন, 'কেন বলছেন বলুন তো !'

'পুলিশ সম্বন্ধে আপনার দাদার ধারণা যাই হোক না কেন পলাতক চোর ধবার যে সব উপায় পুলিশের আছে কোনো প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের তা নেই। বিশেষ করে যখন এতগুলো টাকা, তখন পুলিশকে বলাটা বুদ্ধিমানেব কাজ হবে। নোটের নম্বর লেখা আছে বলছেন। কাজটা এমনিতেই অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।'

সুবীরবাবু বললেন, 'আপনাকে যখন আসতে বলেছি, এবং দুর্ঘটনা যখন একটা ঘটেছে, তখন আপনাকে বাদ দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। পুলিশ আসুক, কিন্তু তার পাশে আপনিও থাকলে শুধু আমিই নিশ্চিন্ত হব না, দাদাও হবেন। অবিশ্যি, সত্যি বলতে কি, চোর যে কে সেটা কারুর সাহায্য ছাড়াই আমি বলতে পারি।'

'আপনার ছেলের কথা বলছেন কি ?'

সুবীরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।—'এ শঙ্কর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে জানে এ পাড়ায় ছ'টায় বাতি নিভে যায়। ডানপিটে ছেলে, পাঁচিল টপকানো তার কাছে কিছুই নয়। তার পর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে জ্যাঠার ঘরে ঢুকে আলমারি খোলা—এসবই তো তার কাছে নস্যি !'

'কিন্তু নীহারবাবুর গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে সে কী করবে ? বৈজ্ঞানিক মহলে কি তার খুব যাতায়াত আছে ?'

'সেটার দরকার কি বলুন ! সে তো সেই কাগজপত্রের বিনিময়ে তার জ্যাঠার কাছ থেকেই টাকা আদায় করতে পারে। এই কাগজপত্রের দাম যে দাদার কাছে কতখানি সেটা তো সে খুব ভালোভাবেই জানে !'

এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটার ফলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তার পরেও একই দিনে যে আরো কিছু ঘটতে পারে সেটা ভাবতেই পারিনি। অবিশ্যি সেটার কথা বলার আগে বাড়ি ফিরে এসে ফেলুদা আর আমার মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা বলা দরকার।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদার ঘরে গিয়ে দেখি সে খাটে চিত হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে পান চিবোচ্ছে আর চারমিনার ফুঁকছে। আমিও গিয়ে খাটে বসলাম। যে প্রশ্নটা গোলোকধাম থেকেই মনে খোঁচা দিচ্ছিল সেটা না বলে পারলাম না।

'তুমি কেসটা ছেড়ে দিতে চাইছিলে কেন ফেলুদা ?'

ফেলুদা পর পর দুটো মোক্ষম রিং ছেড়ে বলল, 'কারণ আছে রে, কারণ আছে।'

'কারণ তো বললেই তুমি—পালানো চোর ধরা পুলিশের পক্ষে আরো সহজ—বিশেষ করে যদি অনেক টাকা নিয়ে পালায়।'

'সুবীরবাবুর ছেলেই নিয়েছে বলে তোর মনে হয় ?'

'আর কে নেবে বল। বাড়ির লোক নিয়েছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দস্তুর তো ছিলেনই না। সুখওয়ানি চুরি করে দিব্যি ঘরে বসে থাকবেন সেটাও যেন কেমন কেমন লাগে। রণজিৎবাবুও এলেন চুরির পরে। আর আছে চাকরবাকর...'

'কিন্তু ধর যদি মক্কেল নিজেই কিছু করে থাকেন ?'

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ফেলুদার দিকে।

'সুবীরবাবু !'

'একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চুরি আবিষ্কারের ঠিক আগের ঘটনাগুলো ভেবে দেখ।'

আমি চোখ বুজে কল্পনা করলাম আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসে আছি। চা এল। আমরা চা খাচ্ছি। ফেলুদার হাতে কাপ। ঘরের বাতি নিভল। তারপর—ধাঁ করে একটা জিনিস মনে পড়ে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

'লোড শেডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে সুবীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফেলুদা—চাকরকে ডাকতে !'

'তবে !—ভেবে দেখ আমার পোজিশনটা কী হবে যদি বেরোয় যে সুবীরবাবুই আলমারি খুলেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় এই কারণেই যে ওই একটি লোক সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। চাকরের কথা যেটা বলেছেন সেটা অবিশ্যি অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ধর যদি শেয়ার বাজারে বা রেসের মাঠে বা জুয়োর আড্ডায় ভদ্রলোকের অনেক টাকা খোয়া গিয়ে থাকে,

বাজারে একগাদা ধারদেনা থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে টাকাটা নেওয়া খুব আশ্চর্য কী ?'

'কিন্তু উনি তো নিজেই এলেন তোমার কাছে ! উনিই তো তোমায় গোয়েন্দা অ্যাপয়েন্ট করলেন !'

'উনি যদি খুব উচ্চস্তরের ধূর্ত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে নিজের উপর যাতে সন্দেহ না পড়ে তার জন্যে ঠিক ওই কাজটাই করা কিছুই আশ্চর্য নয় ।'

এর পরে আর কোনো কথা বলা যায় না।

ফেলুদা কালী সিংহের মহাভারতটা হাতে নিয়ে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়েছে দেখে আমি খাট থেকে উঠে পড়লাম।

বসবার ঘরে আসতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ পেলাম। স্কুটার। একটা নয়, একটার বেশি।

নির্জন নিস্তব্ধ পাড়াটাকে কাঁপিয়ে যেন আমাদের বাড়ির সামনেই এসে থামল। আর তার পরেই আমাদের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

দিনকাল ভালো নয়, আর তাছাড়া আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বেটাইমে লোক এলেও স্কুটারে আসে না।

আমি দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফেলুদার ঘরের পর্দাটা ফাঁক করে একবার উঁকি দিলাম। ফেলুদা বই রেখে খাট থেকে উঠে পড়েছে। বলল—'দাঁড়া।' অর্থাৎ তুই খুলিস না, আমি খুলছি।

দরজা খুলতেই যিনি প্রবেশ করলেন তিনি যে শয়তানের অবতার সেটা বুঝতে পাঁচ সেকেণ্ডও লাগল না। বসবারও দরকার নেই ; ঘরে ঢুকে পিঠ দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফেলুদার দিকে ঘোলাটে চোখ করে তাকিয়ে কথার চাবুক আছড়াতে শুরু করলেন সুবীর দত্তর ছেলে শঙ্কর দত্ত।

'শুনুন মশাই, আমার বাবা আমার বিষয়ে কী বলেছেন জানি না, কিন্তু গেস করতে পারি। এইটুকু শুধু বলে দিচ্ছি আপনাকে—আমার পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে কারুর বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে। আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি ; আমি একা নই। আমাদের গ্যাং আছে। বেশি ওস্তাদী করলে পস্তাবেন। বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব এই বলে দিলাম।'

শঙ্কর দত্ত যেরকম নাটকীয় ভাবে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন স্পীচ ঝাড়া শেষ করে। তারপরই আওয়াজ পেলাম তিনটে স্কুটার স্টার্ট নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল। স্নায়ুর উপর অসাধারণ দখল আছে বলেই এত অপমানেও ও পাথর। ও বলে প্রচণ্ড রাগে যে ফেটে পড়ে তার চেয়ে সেই রাগ যে দমিয়ে রাখতে পারে তার মনের জোর বেশি।

স্কুটারের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই কিন্তু ফেলুদা ঝড়ের বেগে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে পকেটে তার মানিব্যাগটা নিয়ে নিয়েছে।

'চ তোপ্‌শে—ট্যাক্সি...'

তিন মিনিটের মধ্যে সাদার্ন এভিনিউতে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লাম দু'জনে। উত্তর দিকে গেছে স্কুটারগুলো এটা জানি।

'ল্যানসডাউন ধরুন,' বলল ফেলুদা। বড় রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি, তাই ল্যানসডাউন রোড ধরেই যাবে ওরা এটা আমারও মনে হয়েছিল।

পৌনে এগারোটা। সাদার্ন এভিনিউ প্রায় ফাঁকা। ট্যাক্সিচালক বাঙালী, আমাদের মুখ চেনা। বললেন, 'কাউকে ফলো করবেন, স্যার ?'

'তিনটে স্কুটার,' চাপা গলায় বলল ফেলুদা।

আন্দাজে ভুল নেই। এলগিন রোডের মোড়ের কাছে এসে স্কুটার তিনটের দেখা পাওয়া গেল। শঙ্কর একাই বসেছে একটায়, অন্য দুটোয় দু'জন করে লোক। এরা সব মার্কামারা মস্তান সেটা আর বলে দিতে হয় না। আমাদের ট্যাক্সি ওদের লেজ ধরে চলতে লাগল।

লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রীট পেরিয়ে স্কুটারগুলো পার্ক স্ট্রীটে পড়ে বাঁ দিকে ঘুরল। এঁকেবেঁকে সাপের মতো চালানোয় বোঝা যাচ্ছে এদের বেপরোয়া ফুর্তির ভাবটা। ফেলুদা রাস্তার আলো বাঁচিয়ে ভিতর দিকে চেপে বসেছে, তার মাথায় কী খেলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিরজা গালিব স্ট্রীট দিয়ে কিছুদূর গিয়ে স্কুটারগুলো আবার বাঁয়ে ঘুরল। মার্কুইস স্ট্রীট। রাস্তা সরু হয়ে আসছে, পাড়া অন্ধকার, বাতিগুলো টিমটিমে। যাতে ওরা সন্দেহ না করে তাই ফেলুদার আদেশে আমাদের ড্রাইভার ট্যাক্সির স্পীড কমিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা একটু বাড়িয়ে নিল।

আরো দুটো মোড় ঘুরে দেখলাম স্কুটারগুলো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে।

'চালিয়ে বেরিয়ে যান,' বলল ফেলুদা।

বাড়ি না। এক ধরনের হোটেল। নাম নিউ কোরিনথিয়ান লজ। নিউ ? বাড়ির বয়স কম করে একশো বছর।

ফেলুদার কাজ শেষ। বুঝলাম এদের ডেরাটা জানার দরকার ছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন এগারটা চল্লিশ। ভাড়া উঠেছে উনিশ পঁচাত্তর।

পরদিন ভোরে সিধু জ্যাঠার আবির্ভাবটা একেবারে আনএক্সপেকটেড। উনি সকালে হাঁটতে বেরোন জানি, কিন্তু সেটা লেকের দিকে। আমাদের বাড়িতে আসার মানেই কোনো একটা বিশেষ কারণ আছে।

'খাতার ওজন অনেক, তাই খবরটা কপি করে এনেছি,' বললেন সিধু জ্যাঠা। —'সুপ্রকাশ কিনা জানি না, তবে এস. চৌধুরী বলে লিখেছে, আর বায়োকেমিস্ট সেটাও লিখেছে।'

'কবেকার খবর ?'

'উনিশশো একাত্তর। মেক্সিকোতে একটা ড্রাগ কোম্পানির উপর পুলিশের

হামলায় একটি বাঙালী বায়োকেমিস্ট ধরা পড়ে, নাম এস. চৌধুরী। ভেজাল ড্রাগের ব্যবসা চালাচ্ছিল, তার ফলে সব মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। লোকটার জেল হয়। এইটুকুই খবর। আসলে মাথায় ঘুরছে সুপ্রকাশ, তাই এস. চৌধুরীর সঙ্গে নামটা ঠিক কানেক্ট করতে পারিনি। অবিশ্যি এ সেই একই এস. চৌধুরী কিনা—'

'একই,' গম্ভীর ভাবে বলল ফেলুদা।

সিধু জ্যাঠা উঠে পড়লেন। তাঁর আজ চুল কাটার দিন, নাপিত এসে বসে থাকবে। ফেলুদার পিঠ চাপড়ে, আমার কান ধরে একটা মোচড় দিয়ে, মালকোঁচাটা একটু ভালো করে গুঁজে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ফেলুদা খাতা খুলে হিজিবিজি লেখা শুরু করেছে দেখে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর পর তিনটে প্রশ্ন লেখা রয়েছে খাতায়—

১) চাবির গর্তের ধারে আঁচড়ের বাড়াবাড়ি কেন?

২) 'কে'-র অর্থ কী?

৩) অসমাপ্ত কাজটা কী?

প্রশ্নগুলো পড়ে সে সম্বন্ধে আমিও খানিকটা না ভেবে পারলাম না।

আলমারির চাবির গর্তের চারিধারে আঁচড় কালই ফেলুদার টর্চের আলোয় দেখেছিলাম। এটায় খটকা লাগার একটা কারণ থাকতে পারে। রীতিমতো জোরে ঘষা না লাগলে ইস্পাতের ওপর ওরকম দাগ পড়তে পারে না। নীহারবাবুর ঘুম কি এতই গভীর যে এত ঘষাঘষিতেও ঘুম ভাঙবে না?

'কে'-র ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর মনে পড়ল যে মিঃ দস্তুরের গলা শুনে দোতলার ল্যান্ডিং থেকে নীহারবাবু 'কে' বলে উঠেছিলেন। ফেলুদা এই 'কে' প্রশ্নে খটকা। কারণ কী দেখল সেটা বুঝলাম না।

অসমাপ্ত কাজের কথাটাও নীহারবাবুই বলেছেন। অন্তত রণজিৎবাবু তাই বলেন। সেটা যে উনি ওঁর গবেষণার বিষয় বলছিলেন সেটা কি ফেলুদা বিশ্বাস করে না?

ফেলুদা আরো কী সব লিখতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। ওর ঘরেই এক্সটেনশন ফোন—বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিল।

'হ্যালো।'

দু'চারবার হুঁ হুঁ করে এবং শেষে 'আমি এক্ষুনি আসছি' বলে ফোনটা রেখে ফেলুদা আলনা থেকে শার্ট ও ট্রাউজার সমেত হ্যাঙ্গারটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'তৈরি হয়ে নে। গোলোকধামে খুন।'

আমার বুক ধড়াস।

'কে খুন হল ?'

'মিঃ দস্তুর।'

বড় রাস্তা থেকে বালিগঞ্জ পার্কে ঢুকতেই দূরে সাতের একের সামনে দেখলাম পুলিশের ভ্যান আর লোকের জটলা। তাও সাহেবী পাড়া বলে রক্ষে, নইলে ভিড় আরো অনেক বেশি হত।

কলকাতার পুলিশ মহলে ফেলুদাকে চেনে না এমন লোক নেই। গোলোকধামে ঢুকতেই ওকে দেখে ইন্সপেক্টর বকশী হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'এসে পড়েছেন ? গন্ধে গন্ধে হাজির ?'

ফেলুদা ওর একপেশে হাসিটা হেসে বলল, 'সুবীরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি ; ফোন করেছিলেন, তাই চলে এলাম। আপনাদের কাজে কোনো ব্যাঘাত করব না গ্যারান্টি দিচ্ছি। খুনটা হল কী ভাবে ?'

'মাথায় বাড়ি। একটা নয়, তিনটে। ঘুমন্ত অবস্থায়। লাশ নিয়ে যাবে এইবার পোস্টমর্টেমের জন্য। ডাঃ সরকার একবার এসে দেখে গেছেন। আন্দাজ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে।'

'লোকটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন ?'

'খুব গণ্ডগোল। সুটকেস গুছোতে শুরু করেছিল। সটকাবার তালে ছিল।'

'টাকাকড়ি গেছে কিছু ?'

'মনে তো হয় না। খাটের পাশের টেবিলে ওয়লেটে শ'তিনেক টাকা রয়েছে। বাড়িতে ক্যাশ বেশি রাখত বলে মনে হয় না। অথচ ব্যাঙ্কের জমার খাতা, চেক বই এসব কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না। একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে বালিশের পাশে। এখনো ভালো করে সার্চ করা হয়নি ; এবার করবে। এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা থেকে লোকটার সঠিক পরিচয় কিচ্ছু পাওয়া যায়নি।'

সুবীরবাবু মিনিটখানেক হল এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। মিঃ বকশীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সুখওয়ানি বেজায় তম্বি করছে। বলছে তার নাকি একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ড্যালহাউসিতে। আমি বলেছি জেরা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাবে না।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন মিঃ বকশী। 'অবিশ্যি জেরাতে আপনিও বাদ যাবেন না।'

শেষের কথাটা হালকা হেসে বললেন মিঃ বকশী। সুবীরবাবু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা তিনি জানেন।

'তবে আমার দাদাকে যত অল্পের উপর দিয়ে সারতে পারেন ততই ভালো।'

'ন্যাচারেলি।'

'ঘরটা একবার দেখতে পারি কি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই !'

বকশীও ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, পিছনে আমি। ঘরে ঢোকার আগে ফেলুদা সুবীরবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'ভালো কথা, আপনার ছেলে কাল আমার বাড়িতে এসেছিল।'

'কখন !'—সুবীরবাবু অবাক।

ফেলুদা সংক্ষেপে কাল রাত্তিরের ঘটনাটা বলে বলল, 'সে কি কাল ফিরেছিল ?'

'ফিরে থাকলেও টের পাইনি,' বললেন সুবীরবাবু। 'সকালে উঠে তাকে দেখিনি।'

'যাক, তাহলে আপনার ছেলের ডেরার একটা সন্ধান পাওয়া গেল,' বললেন মিঃ বকশী, 'ওই হোটেলটা মোটেই সুবিধের নয়। বার দুয়েক রেড হয়ে গেছে ওখানে অলরেডি।'

কালকের দেখা ঘরের চেহারা আজ একেবারে পাল্টে গেছে। কাল ছিল অন্ধকার, আর আজ পুবের দুটো জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে সোফা আর মেঝের উপর পড়েছে। আশ্চর্য লাগল দেখে যে কালকের দেখা চারমিনারের টুকরোটা এখনো অ্যাশট্রেতে পড়ে আছে। ঘরে দু'জন পুলিশের লোক রয়েছে, আর পুলিশের ফোটোগ্রাফার তাঁর কাজ শেষ করে সরঞ্জাম ব্যাগে পুরছেন।

খুনটা অবিশ্যি হয়েছে পাশের শোবার ঘরে। ফেলুদা বকশীর সঙ্গে সেই ঘরেই গিয়ে ঢুকল। আমি চৌকাঠ অবধি গিয়ে একবার বিছানার দিকে চেয়ে চাদরে ঢাকা লাশটা দেখে নিলাম। একজন পুলিশের লোক খানাতল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে একটা খোলা সুটকেসের মধ্যে দেখলাম কিছু জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা রয়েছে। তার পাশে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে গতকাল দস্তুরের হাতে দেখা নতুন ব্রীফকেসটা।

আমি আরো মিনিট তিনেক বসবার ঘরে জিনিসপত্র দেখে কাটিয়ে দিলাম। কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া চলবে না এটা জানি, তার উপর দুটো পুলিশই আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে।

'চ তোপ্‌শে।'

ফেলুদা বেরিয়ে এসেছে শোবার ঘর থেকে। 'আপনি আছেন কিছুক্ষণ ?' বকশী প্রশ্ন করল।

'একবার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাব,' বলল ফেলুদা। 'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে বলবেন।'

সুবীরবাবু দোতলায় অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক তাঁর আরাম কেদারায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখে কালো চশমা, হাতের লাঠি পাশে খাটের উপর শোয়ানো। অ্যাদ্দিন লাঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দেখেছি, তাই সেটার মাথা যে রূপো দিয়ে বাঁধানো সেটা বুঝতে পারিনি। মাথার নকশার মধ্যে খোদাই করা জি বি ডি দেখে বুঝলাম লাঠিটা ছিল নীহারবাবুর ঠাকুরদা গোলোকবিহারী দত্তর।

আমরা এসেছি সে খবরটা দেওয়াতে নীহারবাবু কাত করা ঘাড়টাকে একটু সোজা করে বললেন, 'শব্দ পেয়েছি। পায়ের শব্দ। শব্দ আর স্পর্শ—এই দুই নিয়েই তো কাটিয়ে দিলাম বিশ বছর। আর স্মৃতি...কী হতে পারত, কী হল না। লোকে বলে দুর্ভাগ্য। আমি তো জানি এটা ভাগ্য-টাগ্য কিছু নয়। আপনি সেদিন জিজ্ঞেস করলেন বিস্ফোরণটা অসাবধানতার জন্য হয়েছিল কিনা ; আজ আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তির—সমস্ত ব্যাপারটা করা হয়েছিল আমার শ্রম পণ্ড করার জন্য। ঈর্ষা যে মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে সেটা আপনি গোয়েন্দা হয়ে নিশ্চয়ই বোঝেন।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, 'তার মানে আপনার ধারণা সুপ্রকাশ চৌধুরীই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী?'

'বাঙালী যে বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু সেটা আপনি মানেন কি?'

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমার দিকে। নীহারবাবুও যেন উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি এখন যে কথাটা যে ভাবে আমাদের বলছেন, সেটা এর আগে কাউকে বলেছেন কি?'

'না, বলিনি। কোনোদিন না। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর আমার এই কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু বলিনি। বলে কী করব? আমার সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। যে এটার জন্য দায়ী, তার শাস্তি হলে তো আর আমি দৃষ্টি ফিরে পাব না, বা আমার গবেষণাও শেষ করতে পারব না।'

'কিন্তু আপনাকে চিরকালের মতো অসহায় করে চৌধুরীরই বা কী লাভ হল বলুন। সে কি ভেবেছিল যে আপনার কাগজপত্রগুলো হাত করে সে-ই গবেষণা চালিয়ে নিজে নাম কিনবে?'

'নিশ্চয়ই তাই। তবে তার সে ধারণা ভুল। আমি তো বলেইছি আপনাকে। আমাকে ছাড়া এগোনোর পথ ছিল না তার।'

আমরা দু'জনেই খাটে বসেছি। ফেলুদাকে দেখে বুঝতে পারছি সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে। রণজিৎবাবু ইতিমধ্যে ঘরে এসে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সুবীরবাবু কোনো কাজে বাইরে গেছেন।

ফেলুদা বলল, 'টাকার কথা জানি না, সেটা হয়তো পুলিশের পক্ষে উদ্ধার

করা আরো সহজ, কিন্তু আপনার এত মূল্যবান কাগজপত্র আমি এ বাড়িতে উপস্থিত থাকতে চুরি হয়ে গেল, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওগুলো উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব।'

'আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।'

আমরা আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। পুলিশ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বকশী ফেলুদাকে বলে দিলেন যে তাদের জেরা আর খানাতল্লাসীর কী ফল হয় সেটা ফোনে জানিয়ে দেবেন।

'আর নিউ কোরিনথিয়ান লজের খবরটাও জানাতে ভুলবেন না,' বলে দিল ফেলুদা।

আমরা বাড়ি ফিরেছি সাড়ে দশটায়। তখন থেকে শুরু করে দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত ফেলুদা পায়চারি করে, থেমে, শুয়ে-বসে, চোখ খুলে, চোখ বুজে, ভ্রূকুটি করে, মাথা নেড়ে, বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে ছোট বড় মাঝারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তার মনের মধ্যে নানারকম প্রশ্ন সন্দেহ খট্‌কা দ্বন্দ্ব ইত্যাদির হুটোপাটি চলছিল। একবার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'গোলোকধামের একতলার প্ল্যানটা তোর মোটামুটি মনে পড়ছে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'মোটামুটি।'

'সুখওয়ানির ঘর থেকে দস্তুরের ঘরে কীভাবে যাওয়া যায় বল তো?'

আমি আবার একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'যদ্দূর মনে পড়ছে, দুটো ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যে বারান্দাটা গেছে, তার মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, আর সে দরজাটা বোধ হয় বন্ধ থাকে। সেটা খোলা থাকলে সেই বারান্দা দিয়েই সোজা এক ফ্ল্যাট থেকে আরেক ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া যেত।'

'ঠিক বলেছিস। তার মানে সুখওয়ানিকে যদি দস্তুরের ফ্ল্যাটে আসতে হয় তাহলে বাগান ঘুরে বাড়ি আর কম্পাউন্ড-ওয়ালের মধ্যের গলি দিয়ে একেবারে সামনে এসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।'

'কিন্তু সামনের কোল্যাপসিবল গেট কি মাঝরাত্তিরে খোলা থাকবে?'

'নিশ্চয়ই না।'

তারপর আবার পায়চারি শুরু করে বলতে লাগল—

'X, Y, Z...X, Y, Z...X হল গবেষণার কাগজ, Y হল টাকা, আর Z হল খুন। এখন কথা হচ্ছে—X, Y, Z, কি একই সূত্রে গাঁথা, না তিনটে আলাদা...'

আমি এক ফাঁকে বলে ফেললাম, 'ফেলুদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে সুপ্রকাশ চৌধুরী দস্তুর সেজে নীহারবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে যে ফেলুদা মোটেই আমার কথাটা উড়িয়ে দিল

না। বরং আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলল, 'যদিও এ ধারণাটা আমার মাথায় আগেই এসেছে, তবুও বলতেই হয় আজকাল তোর চিন্তায় মাঝে মাঝে বেশ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু দস্তুর যদি সুপ্রকাশ হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে সে গবেষণার নোট্‌সের লোভেই ওখানে আস্তানা নিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই যদি খামটা চুরি করে থাকে তাহলে সেটা গেল কোথায় ? আর তার পক্ষে নিজে চুরি করাটা সম্ভবই বা হয় কী করে ? সে তো দোতলায় কোনোদিন যায়ইনি।'

আমার সত্যিই মাথা খুলে গেছে। ব্যাপারটা তো জলের মতো সোজা ! বললাম, 'উনি যাবেন কেন ? ধর যদি ওঁর সঙ্গে শঙ্কর দত্তর ষড় হয়ে থাকে ? শঙ্করই কাগজটা চুরি করে ওঁকে এনে দিয়েছে, আর তার জন্য কিছু টাকাও পেয়ে গেছে।'

'এক্সেলেন্ট', বলল ফেলুদা। 'অ্যাদ্দিনে বলা যায় তুই আমার উপযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট হলি। কিন্তু এতে তো খুনের রহস্যের সমাধান হচ্ছে না।'

'ধর যদি রণজিৎবাবু বুঝে থাকেন যে দস্তুর আসলে সুপ্রকাশ। রণজিৎবাবু তো নীহারবাবুর সব ব্যাপারই জানেন, আর সেই সঙ্গে নীহারবাবুকে দারুণ ভক্তিও করেন। যে লোক নীহারবাবুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছিল, তার উপর প্রচণ্ড আক্রোশে খুন করতে পারেন না রণজিৎবাবু ?'

ফেলুদা মাথা নাড়ল।

'খুন জিনিসটা অত সহজ নয় রে তোপ্‌শে। রণজিতের মোটিভটাকে মোটেই জোরালো বলা চলে না। আসল আপসোসের ব্যাপার হচ্ছে যে দস্তুর লোকটার ঘরে সার্চ করে এখন অবধি কিছু পাওয়া গেল না। অত্যন্ত সাবধানী লোক ছিলেন এই দস্তুর।'

'আমার কী মনে হয় জান ফেলুদা ?'

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে চাইল। আমি বললাম, 'পলিশের বদলে তুমি যদি সার্চ করতে তাহলে অনেক রকম ক্লু পেতে।'

'বলছিস ?'

ফেলুদা নিজের ওপর কনফিডেন্স হারাচ্ছে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না ; কিন্তু ওর ওই 'বলছিস' কথাটাতে যেন ওটারই একটা আভাস পেলাম। আর তারপর যে কথাটা বলল তাতে মনটা আরো দমে গেল।

'এই গরম আর এই লোড শেডিং-এ আইনস্টাইনেরও মাথা খুলত কিনা সন্দেহ।'

দুটো নাগাদ ইনস্পেক্টর বকশীর ফোন এল। দস্তুরের একটা জুতোর গোড়ালির মধ্যে একটা চোরা খুপরিতে আমেরিকান ডলার আর জার্মান মার্ক

মিলে প্রায় সতের হাজার টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু এমন কোনো কাগজ বা দলিল পাওয়া যায়নি যা থেকে লোকটার বিষয় কিছু জানা যায়। ইলেক্‌ট্রনিক্স্-এর নতুন কোনো দোকানের হদিস মেলেনি, দস্তুরের কোনো বন্ধুরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। চিঠিপত্র প্রায় ছিল না বললেই চলে। একটি মাত্র ব্যক্তিগত চিঠি, আর্জেনটিনা থেকে লেখা, যা থেকে বোঝা যায় যে সে দক্ষিণ আমেরিকায় কিছুদিন কাটিয়েছিল।

বকশীর দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই যে, নিউ কোরিনথিয়ান লজের ম্যানেজারকে ছবি দেখাতে সে শঙ্করকে চিনেছে ; কাল সারারাত নাকি শঙ্কর কয়েকজন বন্ধু সমেত হোটেলের একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে নেশা করেছে আর জুয়া খেলেছে। সকাল হতে তারা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। বকশী বললেন এবার শঙ্করকে ধরা নাকি 'এ ম্যাটার অফ মিনিট্‌স'।

ফেলুদা সব শুনেটুনে ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'শঙ্করবাবু যদি হোটেলের পেমেন্টটা চুরির টাকায় করতেন তাহলে খুব সুবিধে হত। যাই হোক্, এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খুনটা সে করেনি, কারণ সেই সময়টা তার অ্যালিবাই ছিল।'

অ্যালিবাই কথাটার মানে অবিশ্যি আমি অনেকদিন থেকেই জানি, কিন্তু যারা জানে না তাদের বাঙলায় কীভাবে বোঝানো যায় জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, 'ডিকশনারিতে যা লেখা আছে তাই লিখে দে'। তাই বলছি, অ্যালিবাই মানে হল—'অপরাধের অনুষ্ঠানকালে অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাইবার দাবি।' তার মানে 'আমার বাড়িতে যখন খুন হয় তখন আমি কোরিনথিয়ান লজে বসে জুয়া খেলছিলাম'—এটাই হবে শঙ্করের অ্যালিবাই।

টেলিফোনটা পেয়েও ফেলুদার উসখুস ভাব গেল না। তিনটে নাগাদ দেখি ও পায়জামা ছেড়ে ট্রাউজারস পরেছে। বলল কতগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাই বেরোচ্ছে। ফিরল প্রায় সাড়ে চারটেয়। আমি এই দেড় ঘণ্টা একটানা মহাভারত পড়ে শেষ করে ফেলেছি।

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী নকুল সহদেব সবাই একে একে মরে গিয়ে ঠিক যখন অর্জুনের পতন হব-হব, তখন ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ফেলুদার ফোন, গোলোকধাম থেকে সুবীরবাবু কথা বলতে চাইছেন।

ফেলুদা তার ঘরেই ফোন ধরল ; আমি বসবার ঘরের ফোনে কান লাগিয়ে দু' তরফের কথাই শুনে নিলাম।

'হ্যালো।'

'কে মিঃ মিত্তির ?'

'বলুন মিঃ দত্ত।'

'দাদার গবেষণার নোট্‌স সমেত সীল করা খামটা পাওয়া গেছে।'

'দস্তুরের ঘরে ছিল কি ?'

'ঠিক বলেছেন। খাটের পাটাতনের তলায় সেলোটেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল। একদিকের সেলোটেপ খুলে গিয়ে খামটা ঝুলছিল। পেয়েছে আমাদের চাকর ভগীরথ।'

'আপনার দাদা জানেন খবরটা ?'

'তা জানেন। তবে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাব এসেছে। কোনো ব্যাপারেই যেন বিশেষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আজ সারাদিন চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি। আমি আমাদের ডাক্তারকে আসতে বলেছি।'

'আপনার ছেলের কোনো খবর আছে ?'

'আছে। জি টি রোডে ওদের পুরো দলটাই ধরা পড়েছে।'

'আর চোরাই টাকা ?'

'সেটা নিলেও অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি চুরির ব্যাপারটা শঙ্কর সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে।'

'খুনের ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে ?'

'ওরা সুখওয়ানিকেই সন্দেহ করছে। তাছাড়া একটা নতুন ক্লু-ও পাওয়া গেছে। দস্তুরের জানলার বাইরে পড়ে থাকা একটা দলা পাকানো কাগজ।'

'কী লেখা আছে তাতে ?'

'ইংরিজিতে এক লাইন হুম্‌কি—"অতিরিক্ত কৌতূহলের পরিণাম কী জান তো" ?'

'সুখওয়ানি কী বলে' ?'

'সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। তার ঘর থেকে যে দস্তুরের ঘরে যাবার কোনো উপায় নেই সেটা ঠিকই, কিন্তু একটা ভাড়াটে গুণ্ডা পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে অনায়াসেই সে কাজটা করতে পারে।'

'হুঁ...ঠিক আছে, আমি একবার আসছি।'

ফেলুদা ফোনটা রেখে দিয়ে প্রথমে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'X আর Y তাহলে একই লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে Z-কে নিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'ডেসটিনেশন গোলোকধাম। তৈরি হয়ে নে ত্রোপশে।'

॥ ৪ ॥

'আপনি চললেন নাকি ?'

গোলোকধামের গেট দিয়ে ঢুকে দেখি রণজিৎবাবু আসছেন। বাইরে পুলিশ

দেখে বুঝেছি বাড়িটার উপর নজর রাখা হয়েছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন রণজিৎবাবু, 'নীহারবাবু বললেন আজ আর আমাকে প্রয়োজন হবে না।'

'উনি আছেন কেমন?'

'ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটাতে শক্ পেয়েছেন। প্রেশারটা ওঠানামা করছে।'

'কথা বলছেন কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বলছেন,' আশ্বাসের সুরে বললেন রণজিৎবাবু।

'যে খামটা পাওয়া গেছে দস্তুরের ঘর থেকে সেটা একবার দেখব। আপনার খুব তাড়া না থাকলে আর একবারটি চলুন ওপরে। আলমারিতে আছে তো ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না কথা দিচ্ছি। এ বাড়িতে তো আর বিশেষ যাসা টাসা হবে না।'

'কিন্তু খাম তো সীল করা,' কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন রণজিৎবাবু।

'তাহলেও আমি জিনিসটা একবার শুধু হাতে নিয়ে দেখতে চাই।'

রণজিৎবাবু আর আপত্তি করলেন না।

আজও বাড়ি অন্ধকার, দশটার আগে আলো আসবে না, এখন বেজেছে মাত্র সোয়া ছ'টা। দোতলার বারান্দায় আর ল্যান্ডিং-এ কেরোসিন ল্যাম্প জ্বললেও আনাচে-কানাচে অন্ধকার।

রণজিৎবাবু আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে সুবীরবাবুকে খবর দিতে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে নীহারবাবু যদি খামটা আলমারি থেকে বার করার ব্যাপারে আপত্তি করেন, তাহলে কিন্তু সেটা দেখানো সম্ভব হবে না।

'সেটা বলাই বাহুল্য,' বলল ফেলুদা।

সুবীরবাবুকে দেখে বেশ ক্লান্ত বলে মনে হল। বললেন সারাদিন নাকি খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ঠেকিয়ে রাখতেই কেটে গেছে।—'তবে একটা ভালো এই যে, দাদার নামটা লোকে ভুলতে বসেছিল, এই সুবাদে আবার মনে পড়ছে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই রণজিৎবাবু এলেন, হাতে লম্বা সাদা খাম। বললেন, 'নীহারবাবু আপনার নাম শুনেই বোধ হয় আপত্তি করলেন না। এমনিতেই কাউকে দেখতে দিতেন না।'

'আশ্চর্য,' ফেলুদা খামটা হাতে নিয়ে ল্যাম্পের তলায় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে মন্তব্য করল। আমার চোখে মনে হচ্ছে সাধারণ লম্বা খাম, পিছনে লাল

গালার সীল, সামনের দিকে ওপরের বাঁ কোণে ছাপার হরফে লেখা "ডিপার্টমেন্ট অব বায়োকেমিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগ্যান, মিশিগ্যান, ইউ এস এ"। এতে যে আশ্চর্যের কী আছে জানি না। সুবীরবাবু আর রণজিৎবাবু বসে আছেন আবছা অন্ধকারে, তাঁদেরও মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আমারই মতো।

ফেলুদা সোফায় এসে বসল, তার দৃষ্টি তখনো খামটার দিকে। তারপর দুই ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, শুধু আমাকেই উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করল। ভাবটা স্কুলমাস্টারের। এই মেজাজে অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছে ফেলুদা আমাকে।

'বুঝেছিস তোপ্‌শে, আশ্চর্য জিনিস এই ইংরেজি হরফ। বাংলায় সব মিলিয়ে গোটা দশ বারো ধাঁচের হরফ আছে, আর ইংরিজিতে আছে কম পক্ষে হাজার দুয়েক। একটা তদন্তের ব্যাপারে আমাকে এই নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছিল। হরফের শ্রেণী আছে, জাত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর আলাদা নাম আছে। যেমন এই বিশেষ ডিজাইনের হরফের নাম হল গ্যারামন্ড।'—ফেলুদা খামের উপর ছাপা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের দিকে আঙুল দেখাল। তারপর বলে চলল—

'এই গ্যারামন্ড টাইপের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে, ফ্রান্সে। তারপর ক্রমে এই টাইপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইটজারল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে শুধু যে এই টাইপের প্রচলন হয় তা নয়, ক্রমে এই সব দেশের নিজস্ব কারখানায় এই টাইপের ছাঁচ তৈরি করা শুরু হয়। এমন-কি সম্প্রতি ভারতবর্ষেও এটা হচ্ছে। মজা এই যে, খুব ভালো করে দেখলে দেখা যায় যে এক দেশের গ্যারামন্ডের সঙ্গে অন্য দেশের গ্যারামন্ডের সূক্ষ্ম তফাত রয়েছে। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ অক্ষরের গড়নে এই তফাতটা ধরা পড়ে। যেমন এই খামের উপরের হরফটা হওয়া উচিত আমেরিকান গ্যারামন্ড, কিন্তু তা না হয়ে এটা হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান গ্যারামন্ড। এমন-কি ক্যালকাটা গ্যারামন্ডও বলতে পারিস।'

ঘরে থমথমে স্তব্ধতা। ফেলুদার দৃষ্টি খাম থেকে চলে গেছে রণজিৎবাবুর দিকে। লন্ডনে মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়ামে মোমের তৈরি বিখ্যাত লোকের মূর্তির ছবি দেখেছি ; তার সব কিছু অবিকল মানুষের মতো হলেও, শুধু কাচের চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটা জ্যান্ত নয়। রণজিৎবাবু জ্যান্ত হলেও, তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটো দেখাচ্ছে অনেকটা সেই মোমের মূর্তির চোখের মতো।

'কিছু মনে করবেন না রণজিৎবাবু, আমি এই খামটা খুলতে বাধ্য হচ্ছি।'

রণজিৎবাবু তাঁর ডান হাতটা তুলে একটা বাধা দেওয়ার ভঙ্গির মাঝপথে

থেমে গেলেন।

একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে ফেলুদার দু' আঙুলের এক টানে খামের পাশটা ছিঁড়ে গেল। তারপর সেই দু' আঙুলেরই আরেকটা টানে খামের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ।

রুল টানা ফুলস্ক্যাপ।

তাতে শুধু রুলই আছে, লেখা নেই। অর্থাৎ যাকে বলে ব্ল্যাঙ্ক পেপার।

কাচের চোখ এখন বন্ধ, মাথা হেঁট, দু' হাতের কনুই হাঁটুর উপর, হাতের তেলোয় মুখ ঢাকা।

'রণজিৎবাবু,'—ফেলুদার গলা গম্ভীর—'আপনি গতকাল সকালে এসে যে চোর আসার ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা একেবারে ধাপ্পা, তাই না?'

রণজিৎবাবুর মুখ দিয়ে উত্তরের বদলে বেরোল শুধু একটা গোঙানির শব্দ। ফেলুদা বলে চলল—

'আসলে রাত্তিরে চোর এসেছে এমন একটা ধারণা প্রচার করার দরকার ছিল আপনার। কারণ আপনি নিজেই চুরির জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, এবং সন্দেহটা যাতে আপনার উপর না পড়ে সেদিকটা দেখা দরকার ছিল। আমার বিশ্বাস সকালে চোর আসার ধাপ্পাটা দিয়ে দুপুরের দিকে সুযোগ বুঝে আপনিই আলমারি খোলেন এবং খুলে দুটি কাজ সারেন—তেত্রিশ হাজার টাকা এবং নীহারবাবুর গবেষণার নোটস হস্তগত করা। আমার বিশ্বাস এই জাল খামটা কাল তৈরি ছিল না; এটা আপনি রাতারাতি ছাপিয়ে নিয়েছেন। এটার হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন সেটা জানতে পারি কি?'

রণজিৎবাবু এবার ফেলুদার দিকে চোখ তুললেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'কাল বিকেলে দস্তুরের গলা শুনে নীহারবাবু ওকে সুপ্রকাশ চৌধুরী বলে চিনতে পেরেছিলেন! আমাকে বললেন, "বিশ বছর পরে লোকটার লোভ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার কাগজপত্র ওই সরিয়েছে।" তখন...'

'বুঝেছি। তখন আপনি ভাবলেন চুরিটা দস্তুরের ঘাড়ে চাপানোর এই সুযোগ। আপনিই তো পুলিশ চলে যাবার পর সেলোটেপ দিয়ে খামটাকে খাটের তলায় আটকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন—ঠিক এমন ভাবে যাতে নীচু হলেই সেটা চোখে পড়ে, তাই না?'

রণজিৎবাবু প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

'আমায় মাপ করবেন! আমি ফেরত দিয়ে দেব! টাকা আর কাগজপত্র আমি কালই ফেরত দিয়ে দেব, মিঃ মিত্তির! আমি, আমি লোভ সামলাতে পারিনি! সত্যি বলছি, আমি লোভ সামলাতে পারিনি!'

'ফেরত আপনাকে দিতেই হবে। না হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে

দেব সেটা বুঝতেই পারছেন।'

'আমি জানি,' বললেন রণজিৎবাবু।—'তবে একটা অনুরোধ। নীহারবাবু যেন জানতে না পারেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি এ শক্ সহ্য করতে পারবেন না।'

'বেশ। তিনি জানবেন না এটা কথা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি এত ভালো ছাত্র হয়ে এটা কী করলেন ?'

রণজিৎবাবু ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'আমি আপনার প্রোফেসর বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার উপর আমার সন্দেহ পড়ে চাবির গর্তের পাশের দাগ দেখে। চোর অত অসাবধানে কাজ করে না। বিশেষত যেখানে ঘরে লোক রয়েছে, দরজার বাইরে চাকর রয়েছে। যাই হোক, আপনার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল ছিল সেটা উনি বললেন। পরীক্ষা দিলে আপনি ফার্স্ট ক্লাস পেতেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। হঠাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে সেক্রেটারির চাকরিটা নেওয়া কি শর্ট কাটে নোবেল প্রাইজের লোভ ?'

রণজিৎবাবু ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় আর কথাই বলতে পারলেন না। ওঁর অবস্থা দেখে আমার মতো ফেলুদারও যে মায়া হচ্ছিল সেটা ওর পরের কথা থেকেই বুঝলাম।

'আপনি এবার বাড়ি যেতে চান যেতে পারেন। কালকৈর জন্য আর অপেক্ষা করব না আমরা। আপনি আজই আসল কাগজপত্র আর টাকা নিয়ে চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে যাতে পুলিশ থাকে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতগুলো টাকা নিয়ে যাতায়াত করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

সুবোধ বালকের মতো মাথা নাড়লেন রণজিৎ ব্যানার্জি।

সুবীরবাবু তাঁর ছেলে সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, সে যে চুরি করেনি, সেটা জেনে তাঁর নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। অন্তত তাঁর চেহারা দেখে আর গলার স্বরে তাই মনে হল। বললেন, 'একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কি ?'

'নিশ্চয়ই,' বলল ফেলুদা, 'সেটাই তো আসল কাজ।'

সুবীরবাবুর পিছন পিছন আমরা নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

'আপনারা এসেছেন ?' চেয়ারে শোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন নীহারবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা। 'আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলো ফেরত পেয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন ?'

'ওগুলোর আর বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে,' নিচু গলায় ক্লান্ত ভাবে বললেন নীহারবাবু। এক দিনে একজন মানুষ এত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। কালকেও দেখে মনে হয়েছে ভদ্রলোক রীতিমতো শক্ত।

'আপনার কাছে মূল্য না থাকলেও আমাদের কাছে আছে,' বলল ফেলুদা। 'বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে আছে।'

'সে আপনারা বুঝবেন।'

'আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি এর পরে আর বিরক্ত করব না।'

নীহারবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল। বললেন, 'বিরক্ত আর করবেন কী করে? বিরক্তির অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছি যে আমি!'

'তাহলে বলি শুনুন। কাল টেবিলের উপর দেখেছিলাম ঘুমের ট্যাবলেট দশটা। আজও দেখছি দশটা। আপনি কি কাল তাহলে ঘুমের ওষুধ খাননি?'

'না, খাইনি। আজ খাব।'

'তাহলে আসি আমরা!'

'দাঁড়ান।'

নীহারবাবু তাঁর ডান হাতটা ফেলুদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দু'জনের হাত মিলল। ভদ্রলোক ফেলুদার হাতটা বেশ ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন— 'আপনি বুঝবেন। আপনার দৃষ্টি আছে।'

বাড়িতে এসেও ফেলুদা গম্ভীর। কিন্তু 'ভ' বলে আমি অত রহস্য বরদাস্ত করব কেন? চেপে ধরে বললাম, 'ঢাক ঢাক গুড় গুড় চলবে না। সব খুলে বল।'

ফেলুদা উত্তরে রামায়ণে চলে গেল। ওর সাসপেন্স বাড়ানোর কিছু কায়দা আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না।

'রামকে বনবাসে পাঠানোর ছ'দিন পর দশরথের হঠাৎ মনে পড়েছিল যে তিনি যুবরাজ অবস্থায় একটা সাংঘাতিক কুকীর্তি করে ফেলেছিলেন, আর সেই কারণেই আজ তাঁকে পুত্রশোক ভোগ করতে হচ্ছে। তোর মনে আছে সে কুকীর্তিটা কী?'

রামায়ণটা টাটকা পড়া ছিল না, কিন্তু এ ঘটনাটা মনে ছিল। বললাম, 'অন্ধমুনির ছেলে রাত্রে নদীতে জল তুলছিল কলসীতে। দশরথ অন্ধকারে শব্দ শুনে ভাবলেন বুঝি হাতি জল খাচ্ছে। উনি শব্দভেদী বাণ মেরে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছিলেন।'

'গুড। অন্ধকারে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার এই ক্ষমতাটা ছিল দশরথের। নীহারবাবুরও ছিল।'

'নীহারবাবু !'—আমি প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

'ইয়েস স্যার,' বলল ফেলুদা।—'রাত জাগতে হবে বলে ঘুমের ওষুধ খাননি। সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যান দস্তুর সুপ্রকাশের ঘরে। এই ঘরে এক কালে ওঁর ভাইপো থাকত। ঘর ওঁর চেনা। হাতে ছিল অস্ত্র—রুপো দিয়ে বাঁধানো জাঁদরেল লাঠি। খাটের কাছে গিয়ে লাঠি দিয়ে মোক্ষম ঘা। একবার নয়, তিনবার।'

'কিন্তু...কিন্তু...'

আমার এখনো সাংঘাতিক গোলমাল লাগছে। এসব কী বলছে ফেলুদা ? লোকটা তো অন্ধ !

'একটা কথা কি মনে পড়ছে না তোর ?' অসহিষ্ণুভাবে বলল ফেলুদা। 'সুখওয়ানি কী বলেছে দস্তুর সম্পর্কে ?'

বিদ্যুতের ঝলকের মতো কথাটা মনে পড়ে গেল।

'দস্তুরের নাক ডাকত !!'

'এগজ্যাক্টলি !' বলল ফেলুদা।—'তার মানে বালিশের কোন্খানে মাথা, কোন্ পাশে ফিরে রয়েছে, এ সবই বুঝতে পেরেছিলেন নীহারবাবু। তার আর এর চেয়ে বেশি জানার কী দরকার ? এক ঘায়ে যদি না হয়, তিন ঘায়ে তো হবেই !'

আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এই অসমাপ্ত কাজটার কথাই কি বলেছিলেন নীহারবাবু ? প্রতিশোধ ?'

'প্রতিশোধ,' বলল ফেলুদা, 'জিঘাংসা। অন্ধেরও দেহমনে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করতে পারে এই প্রবৃত্তি। এই জিঘাংসাই তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। আর সেই কারণেই তিনি আইনের নাগালের বাইরে।'

আরো সতের দিন বেঁচে ছিলেন নীহাররঞ্জন দত্ত। মারা যাবার ঠিক আগে তিনি উইল করে তাঁর গবেষণার কাগজপত্র আর জমানো টাকা দিয়ে গেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত মেধাবী সেক্রেটারি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সমাদ্দারের চাবি

ফেলুদা বলল, 'এই যে গাছপালা মাঠবন দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কী জানিস ? কারণ, আদিম কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সঙ্গে মানুষের চোখের একটা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকাল গাছ জিনিসটা ক্রমে শহর থেকে লোপাট হতে চলেছে, তাই শহর ছেড়ে বেরোলেই চোখটা আরাম পায়, আর তার ফলে মনটাও হালকা হয়ে ওঠে। যত চোখের ব্যারাম দেখবি শহরে। পাড়াগাঁয়ে যা, কি পাহাড়ে যা, দেখবি চশমা খুঁজে পাওয়া ভার।'

আমি জানি ফেলুদার নিজের চোখ খুব ভাল, তার চশমা লাগে না, সে ঘড়ি ধরে তিন মিনিট পনের সেকেন্ড চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে, যদিও সে কোনোদিন গ্রামে-টামে থাকেনি। এটা ওকে বলতে পারতাম, কিন্তু যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তাই আর বললাম না। আমাদের সঙ্গে মণিবাবু রয়েছেন, মণিমোহন সমাদ্দার, তাঁর চোখে পুরু মাইনাস পাওয়ারের চশমা। তিনিও অবিশ্যি শহরের লোক। বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, বেশ ফরসা রঙ, নাকটা যাকে বলে টিকোলো, কানের কাছে চুলগুলো পাকা। মণিমোহনবাবুর ফিয়াট গাড়িতেই আমরা যশোর রোড দিয়ে চলেছি বামুনগাছি। কেন যাচ্ছি সেটা এই বেলা বলা দরকার।

গতকাল ছিল রবিবার। পুজোর ছুটি সবে আরম্ভ হয়েছে। আমরা দুজনে আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছি। আমি খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখছি, আর ফেলুদা একটা সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে বই খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। আমি লক্ষ করছি সে কখনো আপন মনে হেসে আর কখনো ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে ভালো লাগা আর অবাক হওয়াটা বোঝাচ্ছে। বইটা ডক্টর ম্যাট্রিক্স সম্বন্ধে। ফেলুদা বলছিল এই ডক্টর ম্যাট্রিক্সের মতে মানুষের জীবনে

সংখ্যা বা নম্বর জিনিসটা নাকি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে। অনেক সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনার পিছনেই নাকি খুঁজলে নানারকম নম্বরের খেলা আবিষ্কার করা যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হত না যদি না ফেলুদা বইটা থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিত। বলল, 'ডক্টর ম্যাট্রিক্সের একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শোন। আমেরিকার দুজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট খুন হয়েছিল জানিস তো ?'

'লিঙ্কন আর কেনেডি ?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা এই দুজনের নামে ক'টা করে অক্ষর ?'

'L-I-N-C-O-L-N — সাত। K-E-N-N-E-D-Y — সাত।'

'বেশ। এখন শোন — লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হন ১৮৬০ সালে, আর কেনেডি হন ১৯৬০ সালে — ঠিক একশো বছর পরে। দুজনেই খুন হয় শুক্রবার। খুনের সময় দুজনেরই স্ত্রী পাশে ছিল। লিঙ্কন খুন হন থিয়েটারে ; সে থিয়েটারের নাম ছিল ফোর্ড। কেনেডি খুন হন মোটর গাড়িতে। সেটা ফোর্ড কোম্পানির তৈরি গাড়ি ! গাড়িটার নাম ছিল লিঙ্কন। লিঙ্কনের পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হন তাঁর নাম ছিল জনসন, এ্যানড্রু জনসন। কেনেডির পরে প্রেসিডেন্ট হন লিন্ডন জনসন। প্রথম জনের জন্ম ১৮০৮, দ্বিতীয় জনের জন্ম ১৯০৮ — ঠিক একশো বছর পর। লিঙ্কনকে যে খুন করে তার নাম জানিস ?'

'জানতাম, ভুলে গেছি।'

'জন উইল্‌ক্‌স বুথ। তার জন্ম ১৮৩৯ সালে। আর কেনেডিকে খুন করে লী হারভি অসওয়াল্‌ড। তার জন্ম ঠিক একশো বছর পরে — ১৯৩৯। এইবারে নাম দুটো আরেকবার লক্ষ কর। John Wilkes Booth — Lee Harvey Oswald — ক'টা করে অক্ষর আছে নামে ?'

অক্ষর গুনে থ' হয়ে গেলাম। ঢোক গিলে বললাম, 'দুটোতেই পনের !'

ফেলুদা হয়তো ডক্টর ম্যাট্রিক্সের তাজ্জব আবিষ্কারের বিষয়ে আরো কিছু বলত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে হাজির হল মণিমোহন সমাদ্দার। ভদ্রলোক নিজের পরিচয়-টরিচয় দিয়ে সোফায় বসে বললেন, 'আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি — লেক প্লেসে।'

ফেলুদা 'ও' বলে চুপ করে গেল। আমি ভদ্রলোককে আড়চোখে দেখছি। গায়ে একটা হালকা রঙের বুশশার্ট আর ব্রাউন প্যান্ট, পায়ে বাটার স্যান্ডাক জুতো। ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে গলা খাঁক্‌রিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো আমার কাকার নাম শুনে থাকবেন, রাধারমণ সমাদ্দার।'

'এই সেদিন যিনি মারা গেলেন ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। 'যাঁর খুব গান বাজনার শখ ছিল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অনেক বয়স হয়েছিল না?'

'বিরাশি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে পড়ছিলাম। অবিশ্যি মৃত্যু সংবাদটা পড়ার আগে তাঁর নাম শুনেছিলাম বললে মিথ্যে বলা হবে।'

'সেটা কিছুই আশ্চর্য না। উনি যখন গান বাজনা ছেড়েছেন তখন আপনি নেহাতই ছেলেমানুষ। প্রায় পনের বছর হল রিটায়ার করে বামুনগাছিতে বাড়ি করে সেখানেই চুপচাপ বসবাস করছিলেন। আঠারোই সেপ্টেম্বর সকালে হার্ট অ্যাটাক হয়। সেইদিন রাত্রে মারা যান।'

'আই সী।'

ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপ। ফেলুদা তার বাঁ পা-টা ডান পায়ের উপর তুলে বসেছিল, এই ফাঁকে ডান পা-টা বাঁ পায়ের উপরে তুলে দিল। মিস্টার সমাদ্দার একটু কিন্তু কিন্তু ভাব করে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন লোকটা কী বলতে এল। আসলে ব্যাক-গ্রাউন্ডটা একটু না দিয়ে দিলে..।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' ফেলুদা বলে উঠল। 'আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। টেক ইওর টাইম।'

মণিমোহনবাবু বলতে লাগলেন, 'আমার কাকা ঠিক সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ওঁর পেশা ছিল ওকালতি, এবং তাতে রোজগারও করেছেন যথেষ্ট। বছর পঞ্চাশেক বয়সে সেটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুরোপুরি গান-বাজনার দিকে চলে যান। শুধু গাইতেন না, সাত-আট রকম দিশি বিলিতি যন্ত্র বাজাতে পারতেন। সেতার বেহালা পিয়ানো হারমোনিয়াম বাঁশি তবলা এবং এছাড়াও আরো কয়েকটা। তার উপরে সংগ্রহের বাতিক ছিল। ওঁর বাড়িতে বাদ্যযন্ত্রের একটা ছোটোখাটো মিউজিয়াম করে ফেলেছিলেন।'

'কোন্ বাড়িতে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকতেই শুরু হয়, তারপর সে সব যন্ত্র বামুনগাছির বাড়িতে নিয়ে যান। যন্ত্রের সন্ধানে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় গেছেন। বম্বেতে একবার এক ইতালিয়ান জাহাজীর কাছ থেকে একটা বেহালা কেনেন, সেটা কলকাতায় এনে কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রী করে দেন ত্রিশ হাজার টাকায়।'

ফেলুদা একবার আমাকে বলেছিল ইতালিতে প্রায় তিনশ বছর আগে দু'তিনজন লোক ছিল যাদের তৈরি বেহালার এমন কয়েকটা আশ্চর্য গুণ ছিল যে আজকের দিনে সেগুলোর দাম প্রায় লাখ টাকায় পৌঁছে গেছে।

সমাদ্দার মশাই বলে চললেন, 'এই সব গুণের পাশে কাকার একটা মস্ত দোষ ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। এই যে শেষ বয়সে আত্মীয়স্বজনের কাছ

থেকে দূরে সরে গেলেন, তার একটা প্রধান কারণ হল তাঁর কৃপণতা।

'আত্মীয় বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে ?'

'এখন আর বিশেষ কেউ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিছু এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। আমার কাকারা ছিলেন চার ভাই, দুই বোন। বোনেরা মারা গেছেন। ভাইয়ের মধ্যে কাকাকে নিয়ে তিনজন মারা গেছেন, আর একজন জীবিত কি মৃত জানা নেই। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর আগে সংসার ছেড়ে চলে যান। রাধারমণ নিজে বিপত্নীক ছিলেন। একটি ছেলে ছিল, মুরলীধর, তিনিও প্রায় পঁচিশ বছর হল মারা গেছেন। তাঁর ছেলে ধরণীধর হল কাকার একমাত্র নাতি। ছেলেবেলায় সে কাকার খুবই প্রিয় ছিল। শেষটায় পড়াশুনোয় জলাঞ্জলি দিয়ে যখন নাম বদলে থিয়েটারে ঢুকল, তখন থেকে কাকা আব তার মুখ দেখেননি। এই হল আত্মীয় ।'

'ধরণীধর বেঁচে আছেন ?'

'হ্যাঁ। সে এখন থিয়েটার ছেড়ে যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে। কাকাব মৃত্যুব পর তার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু সে কলকাতায় নেই। দলেব সঙ্গে কোনো অজ পাড়াগাঁয়ে টুরে বেরিয়েছে। ওর বেশ নামটাম হয়েছে। গান বাজনাতেও ট্যালেন্ট ছিল, যে কারণে কাকা ওকে ভালোবাসতেন।'

মণিমোহনবাবু হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করলেন। তারপর আবার বলে চললেন—

'আমার সঙ্গে কাকার যে খুব একটা যোগাযোগ ছিল তা নয়। বড়জোর দু'মাসে একবার দেখা হত। ইদানীং আরো কম। আসলে, আমার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে, ইউরেকা প্রেস, তাতে এই গত ক'মাস লোড শেডিং নিয়ে খুব ভুগতে হচ্ছে। কাকার হার্ট অ্যাটাকটা হওয়াতে ওঁর প্রতিবেশী অবনীবাবু আমাকে টেলিফোন করে খবর দেন, আমি তৎক্ষণাৎ চিন্তামণি বোসকে নিয়ে চলে যাই। যখন পৌঁছই তখন জ্ঞান ছিল না। মারা যাবার ঠিক আগে জ্ঞান হয়। আমাকে দেখে মনে হল চিনলেন। দু'একটা ভাঙা ভাঙা কথাও বললেন — ব্যস্ — তারপরেই শেষ।'

'কী বললেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। সে এখন আর পায়ের উপর পা তুলে নেই ; চেয়ারের সামনের দিকে এগিয়ে বসেছে।

'প্রথমে বললেন — "আমার...নামে"। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁট নড়ছে, কথা নেই। শেষে অনেক কষ্টে দু'বার বললেন—"চাবি...চাবি..."। ব্যস্।'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে মণিমোহনবাবুর দিকে। বলল, 'কী বলতে চাচ্ছিলেন সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি ?'

'প্রথম অংশ শুনে মনে হয় ওঁর নামে যে কৃপণ বলে অপবাদ রটেছিল সেটার

বিষয় কিছু বলতে চাইছেন। আমার ধারণা ওঁর মনে একটা অনুশোচনার ভাব জেগেছিল। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ওই চাবি। কিসের চাবির কথা বলছেন কিছুই বোঝা গেল না। ঘরে একটা আলমারি আর একটা সিন্দুক ছিল। তার চাবি ওঁর খাটের পাশের টেবিলের দেরাজে থাকত। বাড়িতে ঘর মাত্র তিনটে, আর একটা বাথরুম, সেটা শোবার ঘরের সঙ্গে লাগা। আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। অন্তত চাবি লাগে এমন জিনিস তো নেই বললেই চলে। দরজায় যে তালা ব্যবহার করতেন, সেটা একরকম জার্মান তালা, তাতে চাবির দরকার হয় না, নম্বরের কম্বিনেশনে খুলতে হয়।'

'সিন্দুক আর আলমারিতে কী ছিল?'

'আলমারির তাকে কিছু জামা কাপড় ছিল, আর দেরাজে কিছু কাগজপত্র। দরকারী কিছুই না। আর সিন্দুক ছিল একেবারে খাঁ খাঁ খালি।'

'টাকা পয়সা?'

'নাথিং। নট এ পাইস। টেবিলের দেরাজে কিছু খুচরো পয়সা ছিল, আর বালিশের নীচে একটা বটুয়াতে কিছু দু'টাকা পাঁচ টাকার নোট। ব্যস্। বটুয়া থেকে নাকি সংসারের জন্য টাকা বার করে দিতেন। অন্তত চাকর অনুকূল তাই বলে।'

'কিন্তু সেও তো বলছেন সামান্য টাকা। সেটা ফুরিয়ে গেলে অন্য কোথাও থেকে বার করতে হত নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি কি বলতে চান উনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না?'

মণিমোহনবাবু হেসে বললেন, 'তাই যদি রাখবেন তাহলে আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তফাতটা হবে কোথায়? এককালে রাখতেন, তবে বছর পঁচিশেক আগে একটা ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় উনি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারপর থেকে আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখেননি। অথচ — ' মণিবাবু গলার স্বর নামিয়ে নিলেন — 'আমি জানি ওঁর বিস্তর টাকা ছিল! এবং সেটা যে বাড়ি তৈরি করার পরেও ছিল সেটা তাঁর দুষ্প্রাপ্য বাজনার কালেকশন দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া উনি নিজের পিছনে বেশ ভালোই খরচ করতেন। ভালো খেতেন, বাড়িতে ভালো বাগান করেছিলেন, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অস্টিন গাড়িও কিনেছিলেন; মাঝে মাঝে বেরোতেন, শহরে আসতেন। কাজেই...'

ফেলুদা পকেট থেকে চারমিনার বার করেছে। মণিমোহনবাবুকে অফার করে দেশলাই ধরিয়ে দিল। ভদ্রলোক বেশ ভালো করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এতক্ষণে হয়তো আন্দাজ করেছেন কেন আপনার কাছে এসেছি। এতগুলো টাকা — সব গেল কোথায়? কোন্ চাবির কথা বলছিলেন কাকা?

সে চাবি দিয়ে কোন্ জিনিসটা খুললে কী পাওয়া যাবে ? সেটা কি টাকা, না অন্য কিছু ? যদি উইল থেকে থাকে তাহলে সেটা তো পাওয়া দরকার। উইল না থাকলে অবিশ্যি টাকা নাতিই পাবে, কিন্তু তার আগে টাকাটা তো পেতে হবে। আপনার বুদ্ধির অনেক তারিফ শুনেছি। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্প করতে পারেন !...'

মণিমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল যে পরদিনই সকালে আমরা বামুনগাছি যাব। ওঁর গাড়ি আছে, উনি নিজেই সকাল সাতটায় এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন। আমি বুঝেছি যে ফেলুদার কাছে এটা একটা নতুন ধরনের রহস্য। রহস্য না বলে হেঁয়ালিও বলা যেতে পারে।

অন্তত গোড়াতে তাই মনে হয়েছিল। শেষে দেখলাম হেঁয়ালির চেয়েও অনেক বেশি গোলমেলে প্যাঁচালো একটা কিছু।

২

বারাসত ছাড়িয়ে একটা রাস্তা যশোর রোড থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে বামুনগাছির দিকে গেছে। সেই মোড়ের মাথায় একটা খাবারের দোকান থেকে মণিমোহনবাবু আমাদের চা আর জিলিপি কিনে খাওয়ালেন। তাতে পনের মিনিট গেল, তা না হলে আমরা আটটার মধ্যেই বামুনগাছি পৌঁছে যেতাম।

গোলাপী রঙের পাঁচিল আর ইউক্যালিপটাস গাছে ঘেরা সাত বিঘে জমির উপর রাধারমণ সমাদ্দারের একতলা বাড়ি। যে লোকটা এসে গেট খুলে দিল সে বোধহয় মালী, কারণ তার হাতে একটা ঝুড়ি ছিল। গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের পাশ দিয়ে কাঁকর-বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা গ্যারেজের ভিতর একটা পুরানো কালো গাড়ি রয়েছে। সেটাই বুঝলাম রাধারমণ সমাদ্দারের অস্টিন।

গাড়ি থেকে নামতেই একটা ঠাঁই শব্দ শুনে বাগানের দিকে ফিরে দেখি নীল হাফপ্যান্ট পরা আট-দশ বছরের একটি ছেলে হাতে একটা এয়ারগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে। মণিমোহনবাবু তাকে বললেন, 'তোমার বাবা বাড়িতে আছেন ? তাঁকে গিয়ে বল তো যে মণিবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন, একবার ডাকছেন।'

ছেলেটি বন্দুকে ছর্‌রা ভরতে ভরতে চলে গেল। ফেলুদা বলল, 'প্রতিবেশীর ছেলে বুঝি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর বাবা অবনী সেনের একটা ফুলের দোকান আছে নিউ মার্কেটে। এখানে পাশেই ওঁর বাড়ি, তার সঙ্গে ওঁর নার্সারি। মাঝে মাঝে স্ত্রী

আর ছেলেকে নিয়ে এসে থাকেন।'

ইতিমধ্যে একজন বুড়ো চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। মণিবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ বাড়িটার যদ্দিন না একটা ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন অনুকূল এখানেই থাকছে। প্রায় ত্রিশ বছরের পুরানো চাকর। অনুকূল, এঁদের জন্য একটু সরবতের ব্যবস্থা কর তো।'

চাকর মাথা হেঁট করে 'হ্যাঁ' বলে চলে গেল, আমরা তিনজন বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা খোলা জায়গা। সেটাকে ঘর বলা মুশকিল, কারণ মাঝখানে একটা গোল টেবিল আর দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই। বাতিটাতিও নেই কারণ এদিকটায় ইলেকট্রিসিটিই নেই। আমাদের সামনেই একটা দরজা রয়েছে, মণিবাবু সেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখুন, এই হল সেই জার্মান তালা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা শহরেই কিনতে পাওয়া যেত। এর নাম হল এইট-টু-নাইন-ওয়ান।'

গোল তালা, তাতে চাবির গর্ত-টর্ত নেই, তার বদলে আছে চারটে খাঁজ। প্রত্যেকটা খাঁজের পাশে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত নম্বর লেখা আছে, আর প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট হুকের মতো জিনিস বেরিয়ে আছে। এই হুকগুলোকে খাঁজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ঠেলে সরানো যায়, আর দরকার হলে যে-কোনো একটা নম্বরের পাশে বসিয়ে দেওয়া যায়। কোন্‌টাকে কোন্ নম্বরে বসাতে হবে না জানলে তালা খোলা অসম্ভব।

মণিবাবু বাঁ দিকের খাঁজ থেকে শুরু করে হুকগুলোকে পর পর ৮, ২, ৯ আর ১ নম্বরে ঠেলে দিতেই খড়াৎ শব্দ করে ম্যাজিকের মতো তালাটা খুলে গেল। মণিবাবু বললেন, 'বন্ধ করাটা আরো সহজ। তালাটা লাগিয়ে যে-কোনো একটা হুক নম্বর থেকে একটু সরিয়ে দিলেই লক।'

আমরা তিনজন রাধারমণ সমাদ্দারের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা বেশ বড়। তাতে মণিবাবু যা যা বলেছিলেন সবই আছে, কিন্তু বাজনা যে এতরকম আছে সেটা ভাবতেই পারিনি। তার কিছু রয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের গায়ে একটা লম্বা শেল্‌ফের তিনটে তাকের উপর, কিছু পুবদিকের দেয়ালের সামনে একটা লম্বা বেঞ্চির উপর, কিছু ঝুলছে দেয়ালের হুক থেকে, আর কিছু রয়েছে ছোট ছোট টেবিলের উপর। এ ছাড়া ঘরে যা আছে তা হল খাট, খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল, উত্তর দিকের দেয়ালের সামনে একটা আলমারি। আর এক কোণে একটা ছোট সিন্দুক। খাটের তলায় একটা ছোট ট্রাঙ্কও চোখে পড়ল।

ফেলুদা প্রথমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকটা দেখে নিল।

তারপর আলমারি আর সিন্দুক খুলে তার ভিতরে বেশ ভালো করে হাত আর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর দেরাজ সমেত টেবিলটাকে পরীক্ষা করল, খাটের তোষকের নীচে দেখল, খাটের নীচে দেখল, ট্রাঙ্কের ভিতর দেখল (তাতে একজোড়া পুরানো জুতো আর একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছু নেই)। তারপর প্রত্যেকটা বাজনা আলাদা করে হাতে তুলে ওজন পরীক্ষা করে নেড়ে চেড়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তার ফাঁপা বা ফোলা অংশে চাবির গর্ত আছে কিনা দেখে আবার ঠিক যেমনভাবে রাখা ছিল তেমনিভাবে রেখে দিল। তারপর ঘরের মেঝে আর দেয়ালের প্রত্যেকটা জায়গা আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল। সমস্ত ব্যাপারটা করতে তার লাগল পনের মিনিট। তারপর আরো সাত মিনিট লাগল অন্য দুটো ঘর আর বাথরুম দেখতে। সবশেষে আবার রাধারমণবাবুর ঘরে ফিরে এসে বলল, 'মণিমোহনবাবু, আপনাদের মালীটিকে একবার ডাকুন তো।'

মালী এলে ফেলুদা তাকে দিয়ে ঘরের জানালায় রাখা দুটো ফুলেব টব থেকে মাটি বার করিয়ে তাতে কিছু নেই দেখে আবার মাটি ভবিয়ে ফুল সমেত টব জানালায় রাখলো।

এর মধ্যে অনুকূল বসবার ঘর থেকে চারটে চেয়ার এনে তার সামনে একটা গোল টেবিল পেতে তার উপর লেবুর সরবত রেখে গেছে। সরবতে চুমুক দিয়ে মণিবাবু বললেন, 'কিছু বুঝলেন ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'এতগুলো বাজনা এক সঙ্গে না থাকলে এঘরে যে কোনো অবস্থাপন্ন লোক-বাস করত সেটা বিশ্বাস করা কঠিন হত।'

'সেই তো বলছি', মণিবাবু বললেন, 'সাধে কি আপনাকে ডেকেছি! আমি তো একেবারে বোকা বনে গেছি মশাই।'

আমি বাজনাগুলোর দিকে দেখছিলাম। তার মধ্যে সেতার সরোদ তানপুরা এসরাজ তবলা বাঁশি—এগুলো আমি চিনি। অন্যগুলো আমি কখনো চোখেই দেখিনি। ফেলুদাও দেখেছে কিনা সন্দেহ। সে মণিবাবুকে প্রশ্ন করল, 'সব ক'টা বাজনার নাম জানেন ? ওই যে দেয়াল থেকে তারের যন্ত্রটা ঝুলছে, ওটার কী নাম ?'

মণিবাবু হেসে বললেন, 'আমি মশাই এক্কেবারে বেসুরো। আমাকে ওসব জিজ্ঞেস করলে কিন্তু ফাঁপরে পড়ব।'

একটা পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি সেই বন্দুকওয়ালা ছেলেটির সঙ্গে বছর চল্লিশের একজন ফরসা ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। মণিবাবু আলাপ করিয়ে দিতে জানলাম ইনিই হলেন ফুলের দোকানের মালিক অবনী সেন। ছেলেটির নাম হল সাধন। অবনীবাবু প্রদোষ মিত্তিরের নাম শুনেছেন

জেনে ফেলুদা একটা ছোট্ট একপেশে হাসির সঙ্গে একটা গলা খাঁক্‌রানি দিল। অবনীবাবু খালি চেয়ারটায় বসে মণিবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'ভালো কথা, আপনার কাকা কি কাউকে তাঁর কোনো বাজনা বিক্রি করার কথা বলেছিলেন ?'

'কই না তো !' মণিবাবু অবাক।

'কাল একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন। এখানে কাউকে না পেয়ে আমার বাড়িতে যান। আমি তাঁকে আজ আবার আসতে বলে দিয়েছি। আমি আন্দাজ করেছিলাম আপনি হয়তো আসতে পারেন। ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ দাশগুপ্ত। আপনার কাকার মতোই বাজনা সংগ্রহের বাতিক। রাধারমণবাবুর লেখা একটি চিঠি দেখালেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই লেখা। সেই চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক নাকি আগেই একবার দেখা করে গেছেন। আপনাদের চাকরও তাকে দেখেছে বলে বলল।'

'আমিও দেখেছি।'

কথাটা বলল সাধন। সে একটা টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো একটা বাজনার সামনে দাঁড়িয়ে তার পর্দার উপর আস্তে আস্তে আঙুল টিপে টুং টাং সুর বার করছে।

অবনীবাবু ছেলের কথা শুনে হেসে বললেন, 'সাধন প্রায় সারাটা দিনই এই বাড়ির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে। দাদুর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল।'

'দাদুকে কেমন লাগত তোমার ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'মাঝে মাঝে খারাপ।' সাধন আমাদের দিকে পিছন ফিরেই উত্তরটা দিল।

'খারাপ কেন ?' ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল।

'খালি খালি সারেগামা গাইতে বলতেন।'

'আর তুমি গাইতে না ?'

'না। কিন্তু আমি গাইতে পারি।'

'যত রাজ্যের হিন্দী ফিল্মের গান,' হেসে বলে উঠলেন অবনীবাবু।

'দাদু জানতেন তুমি গান গাইতে পার ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'তার মানে তোমার গান শুনেছিলেন তিনি ?'

'না।'

'তাহলে কী করে জানলেন ?'

'দাদু বলতেন যার নামে সু থাকে, তার গলায়ও সুর থাকে।'

কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না, তাই আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ফেলুদা বলল, 'তার মানে ?'

'জানি না।'

'তোমার দাদুর গান তুমি শুনেছ ?'

'না। বাজনা শুনেছি।'

এই কথাটায় মণিমোহনবাবু যেন বেশ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'সে কি, সাধনবাবু ! তুমি ঠিক বলছ ? আমি তো জানি উনি বাজনা বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমার সামনে বাজিয়েছেন কখনো ?'

'সামনে না। আমি বাইরে ছিলাম, বাগানে। বন্দুক দিয়ে নারকোল মারছিলাম। উনি তখন বাজালেন।'

'অন্য কোনো লোক বাজায়নি তো ?' মণিবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আর কেউ ছিল না।'

ফেলুদা বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে বাজনা শুনলে ?'

'না। বেশিক্ষণ না।'

ফেলুদা এবার মণিমোহনবাবুকে বলল, 'একবার আপনার অনুকূলকে ডাকুন তো।'

অনুকূল এসে হাত দুটোকে জড়ো করে দরজার মুখে দাঁড়ালো। ফেলুদা বলল, 'তোমার মনিবকে সম্প্রতি কখনো বাজনা বাজাতে শুনেছ ?'

অনুকূল ভীষণ কাঁচুমাচু ভাব করে বলল, 'এজ্ঞে বাবু তো ঘরের ভিতরেই থাকতেন সর্বক্ষণ, তা সে কখন কি করতেন না করতেন...'

'তোমার সামনে বাজনা বাজাননি কখনো ?'

'এজ্ঞে না।'

'বাজনার আওয়াজ শুনেছ ?'

'এজ্ঞে তা যেন কয়েকবার...তবে কানে তো ভালো শুনি না...'

'মারা যাবার আগে একজন অপরিচিত লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কি ? যিনি কাল সকালেও এসেছিলেন ?'

'তা এসেছিলেন বটে। এই ঘরে বসেই কথা বললেন।'

'প্রথম কবে এসেছিলেন মনে আছে ?'

'এজ্ঞে হ্যাঁ। যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সকালে।'

'যেদিন কাকা মারা গেলেন ?' মণিবাবু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন।

'এজ্ঞে হ্যাঁ।'

অনুকূলের চোখে জল এসে গেছে। সে গামছা দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'সে ভদ্দরলোক গেলেন চলে, আর তার কিছু পরেই আমি বাবুর চানের জল গরম করে নিয়ে তেনাকে বলতে গিয়ে দেখি কি তেনার যেন হুঁশ নেই। কয়েকবার "বাবু বাবু" করে ডেকে যখন সাড়া পেলাম না তখন এনার বাড়িতে

গেলাম খবর দিতে।' অনুকূল অবনীবাবুর দিকে দেখিয়ে দিল। অবনীবাবু বললেন, 'আমি ব্যাপার দেখেই মণিবাবুকে টেলিফোন করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে বলি। অবিশ্যি বিশেষ কিছু করার ছিল না।'

একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। অনুকূল বাইরে চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকলেন লম্বা ঝুলপি, ঝাঁকড়া চুল, লম্বা গোঁফ আর পুরু ফ্রেমের চশমা পরা এক ভদ্রলোক। জানা গেল ইনিই সুরজিৎ দাশগুপ্ত। অবনীবাবু মণিমোহনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি এঁর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি রাধারমণবাবুর ভাইপো।'

'ও, আই সী। আপনার কাকার সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ হয়। উনি আমাকে এসে দেখা করতে—'

মণিবাবু তাঁর কথার উপরেই বললেন, 'কাকার চিঠিটা সঙ্গে আছে কি ?'

ভদ্রলোক তাঁর কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বার করে মণিবাবুর হাতে দিলেন। মণিবাবুর পড়া হলে সে চিঠি ফেলুদার হাতে গেল। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে রাধারমণবাবু ভদ্রলোককে রবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন। কারণটাও বলা আছে — 'বাদ্যযন্ত্র আমার যাহা আছে তাহা আমার নিকটেই আছে। আপনি আসিলেই দেখিতে পাইবেন।' উল্টোদিকে ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও ফেলুদা দেখে নিল — মিনার্ভা হোটেল, সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলকাতা-১৩।

ফেলুদা চিঠিটা পড়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক কালিটার দিকে এক ঝলক দেখে নিল। চিঠিটা মনে হয় সেই কালিতেই লেখা।

সুরজিৎবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই খাটের একটা কোণে গিয়ে বসলেন। পরের প্রশ্নটাও মণিমোহনবাবুই করলেন।

'আঠারো তারিখে আপনার সঙ্গে কী কথা হয় ?'

সুরজিৎবাবু বললেন, 'কিছুদিন আগে একটা পুরানো গীতভারতী পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে ওঁর একটা লেখা পড়ে আমি রাধারমণবাবু সম্বন্ধে জানতে পারি। এখানে এসে ওঁর কালেকশন দেখে আমি তার থেকে দুটো যন্ত্র কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করি। দাম নিয়ে কথা হয়। আমি দুটোর জন্যে দু'হাজার টাকা অফার করি। উনি রাজী হন। আমি তখনই চেক লিখে দিচ্ছিলাম, উনি দু'দিন পরে ক্যাশ নিয়ে আসতে বললেন। তাই বুধবার আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। মঙ্গলবার কাগজে দেখি উনি মারা গেছেন। তারপর আমি দেরাদুন চলে যাই। পরশু ফিরেছি।'

মণিবাবু বললেন, 'আপনি যেদিন দেখা করতে আসেন সেদিন ওঁর শরীর কেমন ছিল ?'

'ভালোই তো। তবে ওঁর বোধহয় একটা ধারণা হয়েছিল উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। দু'-একটা কথায় সেরকম একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।'

'আপনার সঙ্গে কোনো কথা কাটাকাটি হয়নি তো ?'

প্রশ্নটা শুনে সুরজিৎবাবুর মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য বেশ কালো হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'আপনি কি ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাকের জন্য আমাকে দায়ী করছেন ?'

মণিবাবুও যথাসম্ভব ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করে কিছু করেছেন বলছি না। তবে আপনি যাবার কিছুক্ষণ পরেই তো উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই...'

'তা হতে পারে, তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। এনিওয়ে, আপনি আমার ব্যাপারে নিশ্চয় একটা ডিসিশন নিতে পারবেন। আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি — দু'হাজার —' ভদ্রলোক পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলেন — 'যন্ত্র দুটো আজ পেলে ভালো হত। আমি কাল দেরাদুন ফিরে যাচ্ছি। আমি থাকি ওখানেই। ওখানেই মিউজিক নিয়ে রিসার্চ করি।'

'কোন্ দুটো যন্ত্রের কথা বলছেন আপনি ?'

সুরজিৎবাবু খাট থেকে উঠে দেয়ালের দিকে গিয়ে হুকে ঝোলানো একটা বাজনার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'একটা হল এটা। এর নাম খামাঞ্চে — ইরানের যন্ত্র। এটার নাম জানতাম, কিন্তু দেখিনি কখনো। বেশ পুরানো যন্ত্র। আর অন্যটা হল —'

সুরজিৎবাবু ঘরের উল্টো দিকে একটা নীচু টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো দেখতে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এটাই কিছুক্ষণ আগে সাধন বাজাচ্ছিল। ভদ্রলোক সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এটার নাম মেলোকর্ড। এটা বিলিতি যন্ত্র ; আগে দেখিনি কখনো। আমার বিশ্বাস অল্প কয়েকদিনের জন্য ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। খুব সিম্প্‌ল যন্ত্র ; তবে আর পাওয়া যায় না বলে এক হাজার অফার করেছিলাম। উনি তখন রাজীই হয়েছিলেন —'

'ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না মিস্টার দাশগুপ্ত।'

সুরজিৎবাবু থমকে গেলেন। কথাটা বলেছে ফেলুদা, আর বলেছে বেশ জোরের সঙ্গে। 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হানা'র কথাটা কোন্ বইয়ে যেন পড়েছি। সুরজিৎবাবু মণিবাবুর দিক থেকে বাঁই করে ঘুরে ফেলুদার দিকে সেই রকম একটা

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হেনে শুক্‌নো ভারী গলায় বললেন, 'আপনি কে ?'

উত্তর দিলেন মণিবাবু।

'উনি আমার বন্ধু। তবে উনি ঠিকই বলেছেন। ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না। তার প্রধান কারণটা আপনার বোঝা উচিত। কাকা যে ওগুলো আপনাকে বিক্রী করতে রাজী ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই।'

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কিছু না বলে গট্‌গট্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদাও দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। সুরজিৎবাবুর ঘটনাটা যেন কিছুই না এই রকম একটা ভাব করে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে খামাঞ্চে যন্ত্রটাকে মন দিয়ে দেখল। রাস্তায় যে খেলার বেহালা বিক্রী হয়, অনেকটা সেই রকম দেখতে। যদিও তার চেয়ে অনেক বড়, আর গোল অংশটায় খুব সুন্দর কাজ করা।

এবার খামাঞ্চে ছেড়ে ফেলুদা গেল মেলোকর্ড যন্ত্রটার কাছে। সাদা-কালো পর্দায় চাপ দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সেতার মেশানো টুং টাং শব্দ।

'এই বাজনার আওয়াজ শুনেছিলে কি ?' ফেলুদা সাধনকে জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে।'

সাধনের মতো এত অল্প বয়সে এত গম্ভীর ছেলে আমি খুব কম দেখেছি।

এবার ফেলুদা আলমারির দেরাজ থেকে এক তাড়া পুরানো কাগজ বার করে মণিবাবুকে বলল, 'এগুলো আমি একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি কি ?'

মণিবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই ! আরো যদি কিছু...'

'না, আর কিছু দরকার নেই।'

আমরা যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তখন সাধন জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত সুর গুন গুন করছে।

সেটা কিন্তু কোনো ফিল্মের গানের সুর নয়।

৩

ফেলুদা মণিমোহনবাবুর কাছ থেকে দু'দিন সময় চেয়ে নিয়েছিল। চাইতেই হবে, কারণ রাধারমণবাবুর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো চাবি, বা চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন কোনো বাক্স বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি। তাই ফেলুদা বলল, এক নম্বর, ওকে চুপচাপ বসে চিন্তা করতে হবে ; দুই নম্বর, রাধারমণবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে লোকটা সম্বন্ধে আরো কিছু জানা যায় কিনা দেখতে হবে, আর তিন নম্বর, গান বাজনা সম্বন্ধে আরেকটু ওয়াকিবহাল হতে হবে।

বামুনগাছি থেকে ফেরার পথে মণিমোহনবাবু বললেন, 'কী রকম বুঝছেন মিস্টার মিত্তির ?'

ফেলুদা তার গম্ভীর ও অন্যমনস্ক ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনাকে কতগুলো সন তারিখের ব্যাপারে একটু হেল্‌প করতে হবে।'

'বলুন।'

'আপনার খুড়তুতো দাদা — অর্থাৎ রাধারমণবাবুর ছেলে মুরলীধর — কবে মারা গেছেন ?'

'ফর্টি ফাইভে। আটাশ বছর আগে।'

'তখন তাঁর ছেলের বয়স কত ছিল ?'

'ধরণীর ? ধরণীর বয়স ছিল সাত কিম্বা আট।'

'ওরা কলকাতাতেই থাকত ?'

'না। দাদা ভাগলপুরে ডাক্তারি করতেন। উনি মারা যাবার পর বৌদি ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় এসে শ্বশুরবাড়িতে ওঠেন। তখন বাবা ছিলেন অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটে। অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটেই বৌদি মারা যান। ধরণী তখন সিটি কলেজে পড়ছে। মা মারা যাবার পর থেকেই তার মতিগতি বদলে যায়। সে পড়াশুনো ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে। আব তার বছরখানেক পরে কাকাও চলে গেলেন বামুনগাছি। ওঁর বাড়িটা তৈরি হযেছিল —'

'ফিফটি-নাইনে। গেটের গায়ে ডেট লেখা রয়েছে।'

রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কিছু পুরানো চিঠি, কিছু ক্যাশ মেমো, দুটো ওষুধেব প্রেসক্রিপশন, স্পীগলার নামে একটা জার্মান কোম্পানির পুরানো ক্যাটালগ — তাতে নানারকম বাজনার ছবি ও দাম—খাতার কাগজে লেখা কয়েকটা বাংলা গানের স্বরলিপি, খবরের কাগজ থেকে নানান সময়ে কাটা পাঁচটা নাটকের সমালোচনা — সেগুলোতে সঞ্জয় লাহিড়ী বলে একজন অভিনেতার প্রশংসা নীল পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা।

এর মধ্যে তিনটি জিনিস নিয়ে ফেলুদা মন্তব্য করল। স্বরলিপিগুলো দেখে বলল, 'সুরজিৎবাবু যে পোস্টকার্ডটা দেখালেন, তার হাতেব লেখার সঙ্গে এ লেখা মিলে যাচ্ছে।' ক্যাটালগটা দেখে বলল, 'মেলোকর্ড বলে কোনো যন্ত্রের নাম এতে দেখছি না।' আর থিয়েটারের সমালোচনাগুলো দেখে বলল, 'যদ্দূর মনে হচ্ছে, এই সঞ্জয় লাহিড়ী আর ধরণীধর সমাদ্দার একই লোক। আর তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে নাতির মুখ না দেখলেও তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরটা রাখতেন রাধারমণবাবু।'

কাগজগুলো সযত্নে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে ফেলুদা থিয়েটারের

পত্রিকা 'মঞ্চলোক'-এ টেলিফোন করে সঞ্জয় লাহিড়ী কোন্ যাত্রার দলে আছে জিজ্ঞেস করল। জানা গেল দলের নাম মডার্ন অপেরা। সেখানে সঞ্জয় লাহিড়ী হিরোর পার্ট করে। তারপর মডার্ন অপেরার অফিসে ফোন করে জানা গেল যাত্রার দল তিন সপ্তাহ হল জলপাইগুড়ি টুরে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে আরো দিন সাতেক। এ খবরটা অবিশ্যি মণিবাবু আগেই দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা বেরোলাম। একদিনে একসঙ্গে এতরকম জায়গায় অনেকদিন যাইনি। প্রথমে জাদুঘর। কেন যাচ্ছি আগে থেকে জানি না, কারণ ফেলুদার এখন মৌনীপর্ব। তার উপরে মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে। বোঝাচ্ছে সে ভীষণ মন দিয়ে ভাবছে, তাই ডিসটার্ব করা চলবে না। জাদুঘরে যে এরকম একটা বাজনার সংগ্রহ আছে সেটা জানতাম না। অবিশ্যি সবই দিশি বাজনা — একেবারে মহাভারতের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত। শুধু বীণাই যে এতরকম হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

এর পরে বিলিতি বাজনার দোকান। ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের সালদানহা কোম্পানি বলল মেলোকর্ডের নাম কখনো শোনেনি। সেখান থেকে গেলাম লালবাজারে। লালবাজারের মণ্ডল কোম্পানির একটা ক্যাশমেমো রাধারমণবাবুর কাগজপত্তরের মধ্যে ছিল, তাই বোধহয় ফেলুদা সেখানে গেল। দোকানের মালিক একেবারে জহর রায়ের মতো দেখতে। বললেন, 'সমাদ্দার মশাই আমাদের অনেকদিনের খদ্দের। সেই আমার ফাদারের টাইম থেকে।'

'মেলোকর্ড বলে কোনো যন্ত্রের নাম শুনেছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'মেলোকর্ড? কই, না তো। ক্ল্যারিয়োনেট টাইপের কিছু? ফুঁ দেওয়া যন্ত্র? উইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট?'

ফেলুদা বলল, 'না। বলতে পারেন হারমোনিয়াম টাইপের। সাইজে অনেক ছোট। আওয়াজটা পিয়ানো আর সেতারের মাঝামাঝি।'

'ছোট সাইজের বাজনা? তাতে ক'টা অকটেভ পাচ্ছেন আপনি?'

আমি জানি যে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা — এই আটটা সুরে মিলে একটা অকটেভ হয়। মণ্ডলের দোকানেই একটা হারমোনিয়ামে দেখছি তিন অকটেভের বেশি পর্দা রয়েছে। মেলোকর্ডে মাত্র একটা অকটেভ রয়েছে শুনে মণ্ডল মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই। এ শুনে মনে হচ্ছে খেলনা-টেলনা ধরনের কিছু হবে। আপনি বরঞ্চ নিউ মার্কেটে দেখুন।'

এর পরে ফেলুদা কলেজ স্ট্রিটের দাশগুপ্তের দোকান থেকে উনিশ টাকা দিয়ে তিনটে সংগীতের বই কিনল। তারপর সেখান থেকে বিধান সরণিতে মঞ্চলোকের অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে সঞ্জয় লাহিড়ীর একটা দুমড়ানো ছবি চেয়ে নিল। দাম দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে সম্পাদক প্রতুল হাজরা জিভ

কেটে বলল, 'দামের কথা কী বলছেন। আপনি ফেলু মিত্তির না?'

রাস্তার মোড়ের একটা দোকান থেকে ঠাণ্ডা লস্যি খেয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে সাতটা। এসে দেখি পাড়া ঘুরঘুট্টি, লোড-শেডিং চলছে। ফেলুদা তার মধ্যেই মোমবাতি জ্বালিয়ে গানের বইগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল। ন'টায় আলো আসার পর বলল, 'তোপ্‌শে — তুই শ্রীনাথকে নিয়ে চট্‌ করে একবারটি পটুদের বাড়ি চলে যা তো—গিয়ে বল ফেলুদা একদিনের জন্যে হারমোনিয়ামটা চেয়েছে।'

ঘুমোবাব আগে পর্যন্ত শুনলাম ফেলুদা প্যাঁ প্যাঁ করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ঘবে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা, আর তাতে একটা প্রকাণ্ড ফুটো। ফুটোটা এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে উল্টো দিকে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু তা না করে আমি, ফেলুদা আর মণিমোহনবাবু তিনজনে একসঙ্গে একটা প্রকাণ্ড চাবিকে আঁকড়ে ধরে সেটাকে ফুটোটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করছি আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত একটা আলখাল্লা পরে তিড়িং-বিড়িং লাফাচ্ছেন আর সুর করে বলছেন, 'এইট টু নাইন ওয়ান — এইট টু নাইন ওয়ান — এইট টু নাইট ওয়ান!'

৪

পরদিন মঙ্গলবার। মণিমোহনবাবু বলেছিলেন বুধবার আবার খবর নেবেন. কিন্তু সকাল সাতটায় তাঁর টেলিফোন এসে হাজিব। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম, ফেলুদাকে ডেকে দিচ্ছি বলাতে বললেন, 'দরকাব নেই। তুমি ওঁকে বল আমি এক্ষুনি আসছি, জরুরী কথা আছে।'

পনের মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক এসে গেলেন। বললেন, 'অবনীবাবু এই একটুক্ষণ আগে বামুনগাছি থেকে ফোন করছিলেন। কাকাব শোবার ঘরে মাঝরাত্রে লোক ঢুকেছিল।'

'ওই জার্মান তালার সংকেত আর কে জানে?' ফেলুদা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল।

'আমার ভাইপো জানত। অবনীবাবু জানেন কিনা জানি না। বোধহয় না। তবে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকেনি সে লোক।'

'তবে?'

'বাথরুমে জমাদার ঢোকার দরজা দিয়ে।'

'কিন্তু কাল যখন বাথরুমে গেলাম তখন তো সে দরজা বন্ধ ছিল। আমি

নিজে দেখেছি।'

'পরে হয়তো কেউ খুলেছিল। যাই হোক — কিছু নিতে পারেনি। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল টের পেয়ে গেসল।...আপনি এখন ফ্রী আছেন ? একবার যেতে পারবেন ?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে। রাধারমণবাবুর নাতিকে — অর্থাৎ আপনার ভাইপো ধরণীধবকে — এখন দেখলে চিনতে পারবেন ?' মণিবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অনেক কাল দেখা নেই ঠিকই, তবু হাজার হোক ভাইপো তো !'

ফেলুদা তার ঘর থেকে একটা ছবি এনে মণিমোহনবাবুকে দিল। মঞ্চলোকের অফিস থেকে আনা সঞ্জয় লাহিড়ীর ছবি, তার উপর ফেলুদা কালি দিয়ে একজোড়া গোঁফ আর একটা মোটা ফ্রেমের চশমা এঁকে দিয়েছে। মণিবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আরে, এ যে দেখছি —'

'সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতো মনে হচ্ছে কি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেবল নাকের কাছটায় একটু.'

'যাই হোক, মিল একটা আছে। এটা আসলে আপনার ভাইপোরই ছবি, আমি কেবল একটু রং চড়িয়েছি।'

'আশ্চর্য।.. আমারও কথাটা মনে হয়নি তা নয়। ইন ফ্যাক্ট, কাল রাত্রে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করে বলি। কিন্তু প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, ফিরতে অনেক রাত হল, তাই আর বলা হয়নি। অবিশ্যি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভবও হত না। ধরণীকে গত পনের বছরে প্রায় দেখিনি বললেই চলে। থিয়েটারেও না, কারণ ও বাতিকটা আমার একদম নেই, আর যাত্রা তো ছেড়েই দিলাম। অথচ আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তো

'তাহলে দুটো ব্যাপার প্রমাণ করতে হয়। এক — সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে আসলে কেউ নেই, দুই — সঞ্জয় লাহিড়ী যাত্রার দল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে, এবং সেটা এসেছে আপনার কাকার মৃত্যুর আগেই। তোপ্‌শে — মিনার্ভা হোটেলের নম্বরটা বার কর তো।'

হোটেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে একজন সেখানে এসেছিলেন বটে, কিন্তু গতকাল সন্ধ্যাবেলা তিনি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

মডার্ন অপেরায় ফোন করে লাভ নেই, কারণ কালকেই তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আর তারা বলেছে যে সঞ্জয় লাহিড়ী টুরে গেছে।

বামুনগাছি পৌঁছিয়ে ফেলুদা প্রথমে পাঁচিলের বাইরেটা ঘুরে দেখল। যেই আসুক, তাকে গাড়ি বা ট্যাক্সি করে আসতে হয়েছে। আর সে গাড়ি বাড়ি থেকে দূরে রেখে বাকি পথটা হেঁটে এসে পাঁচিল টপকাতে হয়েছে। শেষের কাজটা

কঠিন নয়, কারণ তিন জায়গায় পাঁচিলের বাইরে গাছ রয়েছে, আর সে গাছের নীচু ডাল পাঁচিলের উপর দিয়ে কম্পাউন্ডের ভিতর ঢুকেছে। মুশকিল হচ্ছে কি, বর্ষার দিন হলে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত, কিন্তু এ মাটি একেবারে খটখটে শুকনো।

অনুকূলের শরীর ভালো নয়। সে তার ঘরে বিছানায় শুয়ে কুঁই-কুঁই করে যা বলল তাতে বোঝা গেল যে মাথার যন্ত্রণায় আর মশার কামড়ে রাত্রে তার ভালো ঘুম হচ্ছিল না। সে যেখানে শোয় সেখান থেকে তার খাটের পাশের জানালা দিয়ে সোজা রাধারমণবাবুর ঘরের জানালা দেখা যায়। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সেই ঘরে একটা আলো দেখে সে ধড়মড়িয়ে উঠে 'কে কে' বলে হাঁক দিয়ে ছুটে যায়। কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই দেখে একজন লোক রাধারমণবাবুর বাথরুমের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বাকি রাতটা নাকি অনুকূল রাধারমণবাবুর ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে।

'অন্ধকারের মধ্যে সে লোককে চিনতে পারনি বোধহয়?' মণিবাবু প্রশ্ন করলেন।

'না বাবু। আমি বুড়ো মানুষ, চোখে ভালো দেখি না, আর কাল আবার ছিল অমাবস্যা...'

রাধারমণবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম জিনিসপত্তর যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু তাও ফেলুদার গম্ভীর গলার স্বরে বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

'মণিবাবু, বারাসত থানায় খবর দিতে হবে। এ বাড়িতে আজ রাত থেকে পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে। সে লোক আবার আসতে পারে। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি সঞ্জয় লাহিড়ী নাও হন, তাহলেও তাকে সন্দেহ করতে হবে, কারণ ওই দুটো যন্ত্রের উপর তার যথেষ্ট লোভ। পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব না হলে অন্য উপায়ে ওগুলো হাত করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। এই সব কালেক্টরদের গোঁ বড় সাংঘাতিক।'

মণিবাবু বললেন, 'আমি অবনীবাবুর বাড়ি থেকে এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিচ্ছি। ও-সির সঙ্গে আমার আলাপ আছে।'

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা মেলোকর্ডটাকে নিয়ে খাটের ওপর বসে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। দারুণ মজবুত তৈরি, দু'পাশের কাঠে সুন্দর কাজ করা। জিনিসটাকে চিৎ করে আলোতে ধরতে একটা রং চটে যাওয়া লেবেল দেখা গেল। ফেলুদা চোখ কুঁচকে লেখাটা পড়ে বলল, 'স্পীগলার কোম্পানির তৈরি। মেড ইন জার্মানি।'

ফেলুদা হারমোনিয়াম বাজাতে জানে না ঠিকই, কিন্তু কাঁচা হাতে একটা একটা করে পর্দা টিপে যখন জনগণমন-র খানিকটা মেলোকর্ডে বাজাল, তখন যন্ত্রটার

গুণে সেটা শুনতে বেশ ভালোই লাগছিল। তারপর সেটাকে আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, 'একবার ইচ্ছে করে জিনিসটাকে ভেঙে ভেতরে কী আছে দেখি ; কিন্তু যদি দেখি কিছু নেই তাহলে বাজনাটার জন্য আপসোস হবে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত এক হাজার টাকা অফার করছিল এটার জন্যে।'

অনুকূল এই শরীর নিয়েও সরবত করে এনেছিল, সেটায় চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিমোহনবাবু ফিরে এসে বললেন, 'থানায় বলে দিয়েছি। দু'জন লোক থাকবে সন্ধ্যা থেকে। অবনীবাবু বাড়ি ছিলেন না, সাধনকে নিয়ে কলকাতা গেছেন। ফিরবেন বিকেলে।'

ফেলুদা বলল, 'রাধারমণবাবুর টাকা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে ?'

মণিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি নিজে জেনেছি কাকার মৃত্যুর পরে। টাকা যে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে সেটা অবিশ্যি অবনীবাবু জানেন, কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা কত হতে পারে সেটা জানার কথা নয়। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি আসলে ধরণীধর হয়ে থাকে, তাহলে সে যেদিন কাকার সঙ্গে এসে কথা বলেছিল সেদিন কিছু জেনে থাকতে পারে। আমার তো বিশ্বাস সে কাকার কাছে টাকাই চাইতে এসেছিল। তারপর কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়, তার ফলে...'

মণিবাবু কথাটা শেষ করলেন না।

ফেলুদা তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'তার ফলে আপনার কাকার হার্ট অ্যাটাক হয়। আর সেই অবস্থাতেই ধরণীধর ঘরের মধ্যে টাকার অনুসন্ধান করে। আপনি এই ভাবছেন তো ?'

'হুঁ...কিন্তু আমি এটাও জানি যে সে টাকা খুঁজে পায়নি।'

'যদি পেত তাহলে সে বাজনা কেনার অজুহাতে আবার ফিরে আসত না — এই তো ?'

'ঠিক তাই। তার ধারণা ওই দুটো বাজনার একটার মধ্যে টাকাটা রয়েছে।'

'মেলোকর্ড।'

মণিবাবু ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন।

'আপনি তাই বলছেন ?'

'আমার মন তাই বলছে,' ফেলুদা বলল। 'তবে আমি আন্দাজে ঢিল মারা পছন্দ করি না। আর আপনার কাকার শেষ কথাগুলোও আমি ভুলতে পারছি না। আপনার শুনতে কোনো ভুল হয়নি তো ? উনি "চাবি" কথাটাই বলেছিলেন তো ?'

মণিবাবু হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'কী জানি মশাই, চাবি বলেই তো মনে হল। অবিশ্যি...এমন হতে পারে

যে কাকা আসলে প্রলাপ বকছিলেন। চাবি কথাটার হয়তো কোনো অর্থ নেই।'

কথাটা শুনে আমার মনটা বেশ্ দমে গিয়েছিল। কিন্তু ফেলুদার মধ্যে দমবার কোনো লক্ষণ দেখলাম না। ও বলল, 'প্রলাপই হোক আর যাই হোক, এ ঘরে টাকা আছে। আমি যেন সে টাকার গন্ধ পাচ্ছি। চাবিটা আসল কথা নয়। আসল কথা টাকা।'

'তাহলে আপাতত কী করবেন সেটা ঠিক করুন।'

'করেছি। আপাতত বাড়ি ফিরব। দিনের বেলা কোনো ভয় নেই। অনুকূলকে বলে দেবেন চোখ রাখতে আর বাইরের কোনো লোককে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। রাত্রে তো পাহারাই থাকবে। আমি বাড়ি গিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার ঘরে আমার খাটের উপর বালিশে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে চিন্তা করব। একটা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি, সেটা আরো উজ্জ্বল হওয়া দরকার। তবে একটা কথা, তেমন বুঝলে আজ রাতটা আমি এখানে কাটাতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। আটটা নাগাদ আপনাকে তুলে নিতে পারি।'

'ভালো কথা — আপনি সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করেন!'

'সংখ্যাতত্ত্ব?' মণিমোহন ভ্যাবাচ্যাকা।

ফেলুদা তার একপেশে হাসি হেসে বলল, 'আপনাদেব সবাইয়ের নাম দেখছি পাঁচ অক্ষরের — রাধারমণ, মুরলীধর, ধরণীধর, মণিমোহন — তাই প্রশ্নটা মনে এল।'

৫

'আগে লেখ — মৃতব্যক্তির নাম কী ছিল।'

ফেলুদা তার খাটে বসে আছে, আমি তার পাশের চেয়ারে। আমার হাতে সে খাতা পেনসিল ধরিয়ে দিয়েছে। আমি লিখলাম —

'রাধারমণ সমাদ্দার।'

'তার নাতির নাম?'

'ধরণীধর সমাদ্দার।'

'নাতির থিয়েটারী নাম?'

'সঞ্জয় লাহিড়ী।'

'দেরাদুনের বাজনা সংগ্রাহকের নাম?'

'সুরজিৎ দাশগুপ্ত।'

'রাধারমণের প্রতিবেশীর নাম?'

'অবনী সেন।'

'তার ছেলের নাম ?'

'সাধন সেন।'

'রাধারমণের শেষ কথা কী ছিল ?'

'আমার নামে...চাবি...চাবি...'

'গানে একটা সা থেকে তার পরের সা পর্যন্ত ক'টা সুর থাকে ?'

এর মধ্যে ফেলুদা তার কেনা সংগীত প্রবেশিকার প্রথম চ্যাপ্টারটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। গান নিয়ে সে কেন এত মেতে উঠেছে জানি না। যাই হোক্, আমি লিখলাম—

'বারোটা।'

'কী কী ?'

'সাতটা শুদ্ধ, চারটে কোমল, একটা কড়ি।'

'শুদ্ধ সুর কী কী ? কীভাবে লেখে ?'

'স র গ ম প ধ ন।'

'কোন্-কোন্টা কোমল হয় ?'

'র গ ধ ন।'

'কীভাবে লেখে ?'

'ঋ জ্ঞ দ ণ।'

'আর কড়ি ?'

'ম।'

'কীভাবে লেখে ?'

'হ্ম।'

'এবার দে কাগজটা।'

দিলাম।

'এবার বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বোস। দরজাটা ভেজিয়ে দে। আমি কাজ করব।'

গেলাম বৈঠকখানায়। দরজা ভেজালাম। সোফায় বসলাম। চাঁদের পাহাড় বইটা তিনবার পড়েছি, আবার পড়তে শুরু করলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফেলুদার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনে ডায়াল করার আওয়াজ পেলাম। কৌতূহল সামলাতে না পেরে দরজার কাছে গিয়ে কান লাগালাম। ফেলুদার গলা পেলাম, 'ডাক্তার বোস আছেন, চিন্তামণি বোস ?'

ফেলুদা সেই হার্ট স্পেশালিস্টকে ফোন করছে, যাকে মণিবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাকাকে দেখাতে।

ফোনটা কাকে করছে সেটাই জানতে চাইছিলাম, বাকি কথা শোনার দরকার নেই। আমি আবার জায়গায় এসে বসলাম।

দশ মিনিট পরে আবার কটর কটর শব্দ। ডায়ালিং-এর।

উঠে দরজায় গেলাম। কান লাগালাম।

'ইউরেকা প্রেস ? কে কথা বলছেন ?'

মণিমোহনবাবুর প্রেস। ব্যস — এইটুকুই যথেষ্ট। আমি আবার চাঁদের পাহাড় নিয়ে বসলাম।

চারটের সময় যখন শ্রীনাথ চা আনল, তখনো ফেলুদা ঘর থেকে বেরোল না। শেষে যখন দেয়াল ঘড়িতে দেখি চারটে পঁয়ত্রিশ, আর আমি ভাবছি আমার ওই ক'টা লেখা নিয়ে ফেলুদা অত কী ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে ও দরজা খুলে হাতে একটা আধপোড়া চারমিনার নিয়ে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'মাথা ভোঁ ভোঁ করছে রে তোপ্‌শে, একটা বিরাশি বছরের বুড়োর মরার মুখে বলা সামান্য তিনটে কথার মানে নিয়ে এত কেন ভাবতে হল সেটা ভেবে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এর জন্যে অবিশ্যি দায়ী আমাদের বাংলা ভাষা..'

আমি অবিশ্যি ফেলুদার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। দেখতে পাচ্ছি ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে, আর বুঝতে পারছি যে, যে অবস্থা আলোটার কথা ও বলছিল সেটা ওর কাছে আর অবস্থা নেই।

'সা ধা নি সা নি...সব ক'টা শুদ্ধ সুর। শুনে কিছু মনে পড়ছে ? কোনো মানে বুঝতে পারছিস ?'

আমার মাথা আরো গুলিয়ে গেল। ফেলুদা বলল, 'তোর বুঝতে পারার কথা নয়। পারলে তোতে আর ফেলু মিত্তিরে কোনো তফাত থাকত না।

ভাগ্যিস তফাতটা আছে ! আমি ফেলুদার স্যাটিলাইটের বেশি আর কিছু হতে চাই না।

ফেলুদা এই প্রথম সিগারেটটা ছাইদানে না ফেলে ক্যারামের স্ট্রাইকার মারার মতো করে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে বৈঠকখানার টেলিফোনে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল। দশ সেকেন্ড পরেই কথা।

'কে — মিস্টার সমাদ্দার ? চলে আসুন — এক্ষুনি — বামুনগাছি যেতে হবে — হ্যাঁ, হয়ে গেছে — সব পরিষ্কার...মেলোকর্ড...হ্যাঁ, মেলোকর্ডই আমাদের রহস্যের চাবিকাঠি।'

তারপর টেলিফোনটা রেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা রিস্ক আছে তো তোপ্‌শে, কিন্তু সেটা না নিলেই নয়।'

মণিবাবুর ড্রাইভার গুরুচরণ দেখতে বুড়ো হলেও ভি আই পি রোডে পঁচাশি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পীড তুলল। ফেলুদার ভাব দেখে মনে হল হ্যান্ড্রেড-টান্ড্রেড হলে সে আরো খুশি হত। এয়ারপোর্টের পর খানিকটা রাস্তা লোকজনের ভিড়ে স্পীড অনেক কমল, কিন্তু পরের দিকে আবার ষাটে উঠল — যদিও রাস্তা তত চওড়া নয়, আর সন্ধেও হয়ে আসছে।

রাধারমণবাবুর গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, 'পাহারার লোক আসার সময় হয়নি বোধহয় এখনো।'

গেট দিয়ে ঢুকতেই বাগানে দেখলাম বন্দুক হাতে সাধন দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা বলল, 'কী সাধনবাবু, এই সন্ধের আলোতে কী শিকার হচ্ছে?'

সাধন বলল, 'বাদুড়।'

রাধারমণবাবুর কম্পাউন্ডের ঠিক বাইরে একটা অশ্বত্থ গাছ থেকে কয়েকটা বাদুড় ঝুলছে সেটা গাড়ি থেকে নেমেই আমার চোখে পড়েছিল।

অনুকূল গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ; মণিবাবু তাকে লণ্ঠন জ্বালতে বলে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন, আর আমরাও ঢুকলাম তাঁর পিছন পিছন। এইট-টু-নাইন-ওয়ান তালাটা খুলতে খুলতে মণিবাবু বললেন, 'রহস্যের কীভাবে সমাধান হল সেটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে।' আসলে ফেলুদা সারা রাস্তা কোনো কথা বলেনি, কাজেই মণিবাবুর যা অবস্থা, আমারও তাই।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে ফেলুদা তার ভীষণ জোরালো টর্চটা ঘরে পশ্চিমের দেয়ালের নীচের দিকে ফেলল। আমার বুক টিপ টিপ করছে। আলোটা সোজা গিয়ে টেবিলে রাখা মেলোকর্ডের উপর পড়েছে। ঝকঝকে সাদা পর্দাগুলো দেখে মনে হচ্ছে বাজনাটা দাঁত বের করে হাসছে। ফেলুদা টর্চটা সেইভাবেই ধরে রেখে বলল —

'চাবি। ইংরিজিতে Key, বাংলায় চাবি। এই যে সাদা-কালো পর্দাগুলো দেখছিস, ওর আর একটা নাম হল চাবি, আর সেই চাবির কথাই। —'

চোখের পলকে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যেটা ভাবতে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মণিবাবু হঠাৎ বাঘের মতো লাফিয়ে মেলোকর্ডটাকে তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ফেলুদার মাথায় একটা প্রকাণ্ড বাড়ি মেরে আমাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদা মার খাবার ঠিক আগেই নিজেকে বাঁচানোর জন্য টর্চ সমেত হাত দুটো মাথার উপর তুলেছিল। তাই হয়তো তার মাথায় চোট লাগেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতের যন্ত্রণাতেই সে দেখি খাটে বসে পড়েছে। আমি নিজে মেঝে থেকে উঠতে না উঠতেই বুঝলাম মণিবাবু বাইরে থেকে এইট-টু-নাইন-ওয়ান বন্ধ

করে দিয়েছেন।

আমি তাও দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে দরজায় একটা ধাক্কা মেরেছি, এমন সময় ফেলুদার গলা পেলাম — 'বাথরুম!'

বাইরে থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ, আর তারপরই ঠাঁই করে একটা আওয়াজ।

আমরা দু'জনে ঝড়ের মতো বাথরুমে ঢুকে জমাদারের দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। বাগানের দিক থেকে গোলমাল, অনুকূলের গলা, অবনীবাবুর গলা। মণিবাবুর গাড়িটা বাঁই করে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা সামনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছি।

ওটা কে বসে আছে কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর? অবনীবাবু চেঁচাচ্ছেন — 'তুমি কি করলে সাধন! এটা কী করলে তুমি! ছি-ছি-ছি!'

সাধন তার সরু অথচ গম্ভীর গলায় বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'ও যে দাদুর বাজনা নিয়ে পালাচ্ছিল!'

এবার ফেলুদা বলল, 'ও ঠিকই করেছে অবনীবাবু! অপরাধীকে এয়ারগান দিয়ে পঙ্গু করে ও আমাদের সাহায্যই করেছে — যদিও ভবিষ্যতে ওকে একটু সাবধানে বন্দুক চালাতে হবে।...আপনি এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিন। গাড়িটাকেও যেন পালাতে না দেয় — ওর নম্বর হল ডব্লু এম এ সিক্স ওয়ান সিক্স ফোর।'

অনুকূল আর ফেলুদা দু'জনে মিলে মণিবাবুকে ধরে তুলল। তাঁর কপালের বাঁ দিক থেকে ছর্‌রার গুলি লেগে রক্ত পড়ছে। ভদ্রলোক একেবারে থুম মেরে গেছেন।

মেলোকর্ডটা মণিবাবুর পাশেই কাঁকরের উপর পড়ে ছিল, আমি সেটাকে খুব সাবধানে তুলে নিলাম।

আমরা চারজন রাধারমণবাবুর খাটের পাশে গোল হয়ে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি। চারজন মানে আমি, ফেলুদা, অবনীবাবু, আর বারাসত থানার দীনেশ গুঁই, ইনি বোধহয় ইনস্পেক্টর-টিনস্পেক্টর হবেন। ঘরের এক কোণে সিন্দুকটার সামনে আরো দু'জন লোক রয়েছে। একজন দাঁড়িয়ে, সে বোধহয় কন্‌স্টেব্‌ল, আর আরেকজন চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসে। ইনি হলেন অপরাধী মণিমোহন সমাদ্দার, যার কপালে এখন ব্যান্ডেজ বাঁধা। এছাড়া সাধনও রয়েছে। সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে দেখছে। আমাদের পাঁচজনের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখা রয়েছে মেলোকর্ড। এইবার বোধহয় ফেলুদা একটা রহস্য উদঘাটন করবে। ফেলুদার ঘড়ির কাঁচ ভেঙে গেছে, আর বাঁ হাতের কবজির খানিকটা ছাল উঠে গেছে। রাধারমণবাবুর বাথরুম থেকে

ডেটল নিয়ে লাগিয়ে সেখানে সে রুমাল বেঁধে রেখেছে।

হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলতে আরম্ভ করল — 'মণিমোহন সমাদ্দারকে আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করি আজ দুপুর থেকে। কিন্তু তিনি কোনো একটা বেচাল না চাললে তাঁকে বাগে আনা যাচ্ছিল না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব। আমি তাই খানিকটা রিস্ক নিয়েই তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম। আমাকে আচমকা আক্রমণ করে বাজনা নিয়ে পালানোটাই হল তাঁর ভুল চাল। শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি সায়েস্তা হলেন তার জন্য অবিশ্যি দায়ী সাধনের এয়ারগান।

'মণিমোহনবাবুর একটা কথায় প্রথম খট্‌কা লাগে। কথাটা যখন বলেছিলেন তখন লাগেনি, পরে লাগে। উনি বলেছিলেন পরশু ওঁর প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, তাই ওঁর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। পরশু ছিল সোমবার। আমি জানি যে-পাড়ায় মণিবাবুর প্রেস, সে-পাড়ায় সন্ধ্যায় নিয়মিত লোড-শেডিং হয় ; আমার এক প্রোফেসর বন্ধু সেই একই পাড়ায় থাকে। আজ ইউরেকা প্রেসে ফোন করে জানতে পারি যে প্রথমত, সোমবার বিকেল থেকে লোড-শেডিং-এর জন্য কাজ বন্ধ ছিল, আর দ্বিতীয়ত, মণিমোহনবাবু দুপুরের পর আর সেদিন প্রেসেই যাননি। এই মিথ্যে কথাটাতেই আমার মনে ভীষণ খট্‌কা লাগে। আর তার পরেই সন্দেহ হয় — উনি রাধারমণবাবুর শেষ কথা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটা সত্যি তো ? রাধারমণের মৃত্যুর সময় মণিবাবু ছাড়াও একজন লোক সেখানে ছিলেন। তিনি হলেন ডাক্তার চিন্তামণি বোস। তাঁকে ফোন করে জানতে পারি যে মণিবাবু পুরোপুরি সত্যি কথা বলেন নি — রাধারমণের একটা কথা তিনি গোপন করেছিলেন। রাধারমণ আসলে বলেছিলেন — "ধরণী...আমার নামে...চাবি...চাবি..."। ধরণী হল রাধারমণবাবুর নাতি। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাঁর নাতিকেই কিছু বলার কথা মনে এসেছিল, ভাইপোকে নয়। ভাইপোকে হয়তো সেই অবস্থায় তিনি চিনতেই পারেননি। আসলে নাতির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার উপর থেকে রাধারমণবাবুর স্নেহ যায়নি। তার অভিনয়ের প্রশংসা কাগজে বেরোলে তিনি তা কেটে রাখতেন। কিন্তু যে কথাটা তিনি নাতিকে বলতে চেয়েছিলেন সেটা শুনে ফেলল তাঁর ভাইপো। 'চাবি' কথাটা শুনে মণিমোহন বুঝলেন যে টাকা পয়সার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শেষটায় চাবি দিয়ে কিছুই বেরোল না। তখন মণিবাবুকে গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের কাছে আসতে হল। মতলব এই যে আমি টাকার সন্ধান দেব, আর উনি সুযোগ বুঝে সেটি আত্মসাৎ করবেন। উইল আছে কিনা জানা নেই। না থাকলে টাকা নাতি পাবে। আর থাকলেও মণিবাবুর পাবার সম্ভাবনা কম, কারণ আমার বিশ্বাস রাধারমণবাবু তাঁর ভাইপোকে পছন্দ করতেন না।

'এখন কথা হচ্ছে, আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোবার জন্যই নিশ্চয়ই মণিবাবুর মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়েছিল। তাঁর মাথায় কি সেদিন কোনো ক্রুর অভিসন্ধি খেলছিল, যে কারণে তাঁর পক্ষে প্রেসে যাওয়া সম্ভব হয়নি? সেইদিনই মাঝরাত্রে যে-লোক রাধারমণবাবুর ঘরে হানা দিয়েছিল সে কি তাহলে মণিমোহন সমাদ্দার? এটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ সেদিনই সকালে আমি যখন রাধারমণবাবুর বাথরুম পরীক্ষা করে দেখি, তখন জমাদারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। সে দরজা খুলবে কে, এবং কেন? বাথরুমটা তো আর ব্যবহারই হচ্ছে না! আসলে যে লোক ঢুকেছে সে সামনের দরজা দিয়ে জার্মান তালা খুলে ঢুকেছে, সে তালার সংকেত তার জানা, ঘরে ঢুকে সে লোক জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জার্মান তালা বন্ধ করে, আবার বাথরুম দিয়ে ঢুকেছে। এই লোক যে মণিমোহন সমাদ্দার তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বোধহয় বাকি কথাটার মানে বুঝে ফেলে মেলোকর্ড নামক চাবিওয়ালা যন্ত্রটা নিতে এসেছিলেন, তাই না?'

আমাদের সকলের দৃষ্টি মণিবাবুর দিকে গেল। মাথা হেঁট অবস্থাতেই তিনি আবছা অন্ধকারে দু'বার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

ফেলুদা বলল, 'চাবি যে বাজনার চাবি সেটা বুঝলেও মণিবাবু বোধহয় রাধারমণের বাকি সংকেতটা ধরতে পারেনি। কারণ অতটা বুদ্ধি ওঁর নেই। এই বাকি সংকেতটা আমি বুঝতে পারি আজ বিকেলে, আর সেটার জন্যেও দায়ী শ্রীমান সাধন।'

এবার আমরা সকলে অবাক হয়ে সাধনের দিকে চাইলাম। সেও দেখি বড় বড় চোখ করে ফেলুদার দিকে দেখছে। ফেলুদা বলল, 'তোমার দাদু সুরের বিষয় কী বলেছিলেন সেটা আরেকবার বলে দাও তো সাধন।'

সাধন প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'যার নামে সুর থাকে, তার গলাতেও সুর থাকে।'

ফেলুদা বলল, 'ভেরি গুড। এবার রাধারমণবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির দিকটা ক্রমে বোঝা যাবে। যার নামে সুর থাকে। বেশ। সাধনের নামটাই ধরা যাক। সাধন সেন। এবার অ-কার এ-কার বাদ দিয়ে কি দাঁড়ায় দেখা যাক্। স, ধ, ন, স, ন। অর্থাৎ গানের সুরের ভাষায় সা ধা নি সা নি। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নতুন দিক খুলে গেল। "আমার নামে...চাবি।" রাধারমণবাবু কি এখানে নিজের নামের কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছেন? রাধারমণ সমাদ্দার রে ধা রে মা নি সা মা দা দা রে! কী সহজ, অথচ কী ক্লেভার, কী চতুর! ধরণীধরও কিন্তু গাইতে পারত, আর তার নামেও দেখছি সুর — ধা রে ণি ধা রে সা মা দা দা রে!

'এইটে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম যে ওই মেলোকর্ডেই রাধারমণের ব্যাঙ্ক। যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে রাধারমণবাবুর যে একটা ঝোঁক ছিল সেটা ওই জার্মান তালা থেকে বোঝা যায়। এই মেলোকর্ডও জার্মানিতেই তৈরি। স্পীগলার কোম্পানি নামে একটি বিখ্যাত বাজনা প্রস্তুতকারক রাধারমণবাবুর বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী এই মেলোকর্ড তৈরি করে। কী ভাগ্যিস এটি সুরজিৎ দাশগুপ্তের হাতে চলে যায়নি। অবিশ্যি যন্ত্র দেবার আগে রাধারমণ তার ভিতরের জিনিস নিশ্চয়ই বার করে নিতেন। বোধহয় ব্যাঙ্কের আর প্রয়োজন বোধ করছিলেন না তিনি। হয়তো তাঁর আর বেশিদিন বাঁচা হবে না এটা তিনি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন। সুরজিৎ ভদ্রলোকটিকে আমরা মিছিমিছি সন্দেহ করছিলাম, ভাবছিলাম উনি ছদ্মবেশী ধরণীধর। আসলে সুরজিৎবাবু সত্যিই একজন বাজনা পাগল সংগীতজ্ঞ লোক। তার উল্লেখ আমি গানের বইয়েতে পেয়েছি। আর ধরণীধর সত্যিই তার যাত্রার দলের সঙ্গে টুরে বেরিয়েছে। এখন জানা দরকার যে তার ভাগ্যে সত্যিই কোনো অর্থপ্রাপ্তি আছে কিনা। তার অনেক দিন থেকেই একটা নিজের যাত্রা দল করবার ইচ্ছে; মঞ্চলোকের একটা ইন্টারভিউতে সে তাই বলেছে। তোপশে — লণ্ঠনটা কাছে এনে ধর তো।'

আমি লণ্ঠনটা খাটের পাশের টেবিল থেকে তুলে মেলোকর্ডের পাশে এনে ধরলাম।

ফেলুদা বলল, 'অনেক ধকল গেছে এটার উপর দিয়ে। তবে জার্মান জিনিস তো — দেখা যাক রাধারমণের বুদ্ধি আর স্পীগলার কোম্পানির কারিগরি মিলে কী জিনিস দাঁড়িয়েছে।'

রাধারমণ সমাদ্দারের নামের অক্ষর ধরে ধরে ফেলুদা চাবি টিপতে আরম্ভ করে দিল। টুং টাং টুং টাং করে একটা অদ্ভুত সুর বেরোচ্ছে মেলোকর্ড থেকে। শেষ সুরটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাবুকের মতো শব্দ করে সকলকে চমকে দিয়ে মেলোকর্ডের ডান পাশের কাঠটা দরজার মতো খুলে গেল। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেই দরজাটার পিছনে রয়েছে লাল মখমলের লাইনিং দেওয়া একটা খুপরি, আর সেই খুপরিতে ঠাসা রয়েছে তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট!

নোটগুলো টেনে বার করে ফেলুদা বলল, 'কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার। আসুন অবনীবাবু, গোনা যাক।'

ফেলুদার চোখ লণ্ঠনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। আমি জানি সেটা লোভ নয়। সেটা তার শান দেওয়া বুদ্ধির খানিকটা অংশ খাটিয়ে মনধাঁধানো জটিল রহস্য সমাধান করার আনন্দ।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে

১

লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু-র হাতে মিষ্টির বাক্স দেখে বেশ অবাক হলাম। সাধারণত ভদ্রলোক যখন আমাদের বাড়িতে আসেন তখন হাতে ছাতা ছাড়া আর কিছু থাকে না। নতুন বই বেরোলে একটা প্যাকেট থাকে অবিশ্যি, কিন্তু সে তো বছরে দু'বার। আজ একেবারে মির্জাপুর স্ট্রীটের গালের দোকান কল্লোল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পঁচিশ টাকা দামের সাদা কার্ডবোর্ডের বাক্স, সেটা আবার সোনালী ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাক্সের দু'পাশে নীল অক্ষরে লেখা 'কল্লোলস্ ফাইভ মিক্স সুইটমিটস'—মানে পাঁচ-মেশালী মিষ্টি। বাক্স খুললে দেখা যাবে পাঁচটা খোপ করা আছে, তার একেকটাতে একেকরকমের মিষ্টি। মাঝেরটায় থাকতেই হবে কল্লোলের আবিষ্কার 'ডায়মণ্ড'-হীরের মতো পলকাটা রূপোর তবক দেওয়া রস ভরা কড়া পাকের সন্দেশ।

এমন বাক্স লালমোহনবাবুর হাতে কেন ? আর ওঁর মুখে এমন কেল্লাফতে হাসি হাসি ভাবই বা কেন ?

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বাক্স টেবিলে রেখে চেয়ারে বসতেই ফেলুদা বলল, 'বোম্বায়ের সুখবরটা বুঝি আজই পেলেন ?'

লালমোহনবাবু প্রশ্নটা শুনে অবাক হলেও তাঁর মুখ থেকে হাসিটা গেল না, কেবল ভুরু দুটো ওপরে উঠল।

'কী করে বুঝলেন, হে হে ?'

'সাইরেন বাজার এক ঘন্টা পরে যখন দেখছি আপনার হাতঘড়ি বলছে সোয়া তিনটে, তার মানেই টাটকা আনন্দের আতিশয্যে ঘড়িটা পরার সময় আর ওটার দিকে চাইতেই পারেননি।—স্প্রিং গেছে, না দম গেছে ?'

লালমোহনবাবু তাঁর নীল র‍্যাপারের খসে পড়া দিকটা রোম্যান কায়দায় বাঁ কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'পঁচিশ চেয়েছিলুম ; তা আজ ভোরে ঘুম

ভাঙতেই চাকর এসে টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলে। এই যে।'

লালমোহনবাবু পকেট থেকে একটা গোলাপী টেলিগ্রাম বার করে পড়ে শোনালেন—

'প্রোডিউসার উইলিং অফার টেন ফর বোম্বেটে প্লীজ কেবল কনসেন্ট।' আমি রিপ্লাই পাঠিয়ে দিয়ে এলুম—'হ্যাপিলি সেলিং বোম্বেটে ফর টেন টেক ব্লেসিংস।'

'দশ হজার!' ফেলুদার মতো মাথাঠাণ্ডা মানুষের পর্যন্ত চোখ গোলগোল হয়ে গেল। 'দশ হাজারে গপ্প বিক্রি হয়েছে আপনার?'

জটায়ু একটা হালকা মসলিনি হাসি হাসলেন।

'টাকাটা হাতে আসেনি এখনো। ওটা বম্বে গেলেই পাব।'

'আপনি বম্বে যাচ্ছেন?' ফেলুদার চোখ আবার গোল।

'শুধু আমি কেন? আপনারাও। অ্যাট মাই এক্সপেনস। আপনি ছাড়া তো এ গপ্প দাঁড়াতোই না মশাই।'

কথাটা যে সত্যি সেটা ব্যাপারটা খুলে বললেই বোঝা যাবে।

জটায়ুর অনেক দিনের স্বপ্ন যে তার একটা গল্প থেকে সিনেমা হয়। বাঙলা ছবিতে পয়সা নেই, তাই হিন্দীর দিকেই ওঁর ঝোঁক বেশি। এবারে তাই কোমর বেঁধে হিন্দী সিনেমার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন। বম্বের ফিলম লাইনে লালমোহনবাবুর একজন চেনা লোক আছে, নাম পুলক ঘোষাল। আগে গড়পারেই থাকত, লালমোহনবাবুর দুটো বাড়ি পরে। কলকাতায় টালিগঞ্জে তিনটে ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করে রোখের মাথায় বম্বে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে এখন সে নিজেই একজন হিট ডিরেক্টর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ অবধি গিয়ে গল্প আর এগোচ্ছে না দেখে জটায়ু ফেলুদার কাছে আসেন। ফেলুদা তখন-তখনই লেখাটা পড়ে মন্তব্য করে—'মাঝপথে আটকে ভালোই হয়েছে মশাই। এ আপনার পণ্ডশ্রম হত। বোম্বাই নিত না।'

লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'কী হলে নেবে মশাই বলুন তো। আমি তো ভেবেছিলুম খানকতক কারেন্ট হিট ছবি দেখে নিয়ে তারপর লিখব। দু'দিন কিউয়ে দাঁড়ালুম; একদিন পকেটমার হল, একদিন সোয়া ঘন্টা দাঁড়িয়ে জানলা অবধি পৌঁছে শুনলাম হাউস ফুল। বাইরে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছিল, কিন্তু বারো টাকা খরচ করে শেষটায় কোডোপাইরিন খেতে হবে সেই ভয়ে পিছিয়ে গেলুম।'

শেষে ফেলুদাই একটা ছক কেটে দেবে বলল লালমোহনবাবুর জন্য। বলল, 'আজকাল ডবল রোলের খুব চল হয়েছে সেটা জানেন তো?'

লালমোহনবাবু ডবল রোল কী সেটাই জানেন না।

'একই চেহারার দু'জন নায়ক হয় ছবিতে সেটা জানেন না ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'যমজ ভাই ?'

'তাও হতে পারে, আবার আত্মীয় নয় অথচ চেহারায় মিল সেটাও হতে পারে। একই চেহারা, অথচ একজন ভালো লোক, একজন খারাপ লোক ; অথবা একজন শক্ত-সমর্থ, আর একজন গোবেচারা। সাধারণত এটাই হয়। আপনি একটু নতুনভাবে এক কাঠি বাড়িয়ে করতে পারেন ;—একটা ডবল রোলের বদলে এক জোড়া ডবল রোল। এক নম্বর হিরো আর এক নম্বর ভিলেন হল জোড়া, আর দুই নম্বর হিরো আর দুই নম্বর ভিলেন হল আরেক জোড়া। এই দুই নম্বর জোড়া যে আছে সেটা গোড়ায় ফাঁস করা হবে না। তারপর—'

এখানে লালমোহনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'একটু বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে না ?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'তিন ঘন্টার মালমশলা চাই। আজকাল নতুন নিয়মে খুব বেশি ফাইটিং চলবে না। কাজেই গপ্প অন্যভাবে ফাঁদতে হবে। দেড় ঘন্টা লাগবে জট পাকাতে, দেড় ঘন্টা ছাড়াতে।'

'তাহলে ডবল-রোলেই কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে বলছেন ?'

'তা কেন ? আরো আছে। নোট করে নিন।'

লালমোহনবাবু সুড়ুৎ করে বুক পকেট থেকে লাল খাতা আর সোনালী পেনসিল বার করলেন।

'লিখুন—স্মাগলিং চাই—সোনা হীরে গাঁজা চরস, যা হোক ; পাঁচটি গানের সিচুয়েশন চাই, তার মধ্যে একটি ভক্তিমূলক হলে ভালো ; দুটি নাচ চাই ; খান দু'তিন পশ্চাদ্ধাবন দৃশ্য বা চেজ-সিকুয়েন্স চাই—তাতে অন্তত একটি দামী মোটরগাড়ি পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে ফেলতে পারলে ভালো হয় ; অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য চাই ; নায়কের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে নায়িকা এবং ভিলেনের গার্লফ্রেন্ড হিসেবে ভ্যাম্প বা খলনায়িকা চাই ; একটি কর্তব্যবোধসম্পন্ন পুলিশ অফিসার চাই ; নায়কের ফ্ল্যাশব্যাক চাই ; কমিক রিলিফ চাই ; গপ্প যাতে ঝুলে না পড়ে তার জন্য দ্রুত ঘটনা পরিবর্তন ও দৃশ্যপট পরিবর্তন চাই ; বাহ্ন করেক পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারে গল্পকে নিয়ে ফেলতে পারলে ভালো, কারণ এক নাগাড়ে স্টুডিওর বদ্ধ পরিবেশে শুটিং চিত্রতারকাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।—বুঝেছেন তো ?'

লালমোহনবাবু ঝড়ের মতো লিখতে লিখতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিলেন।

'আর সব শেষে—এটা একেবারে মাস্ট—চাই হ্যাপি এন্ডিং। তার আগে

অবিশ্যি বার কয়েক কান্নার স্রোত বইয়ে দিতে পারলে শেষটা জমে ভালো।'

লালমোহনবাবুর সেদিনই হাত ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তারপর গল্প নিয়ে ঝাড়া দু' মাসের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ডান হাতের দুটো আঙুলে কড়া পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস সে সময়টা ফেলুদার কলকাতার বাইরে কোনো কাজ ছিল না—কেদার সরকারের রহস্যজনক খুনের তদন্তের ব্যাপারে ওকে সবচেয়ে বেশি দূর যেতে হয়েছিল ব্যারাকপুর—কারণ লালমোহনবাবু সপ্তাহে দু'বার করে ফেলুদার কাছে এসে ধর্না দিচ্ছিলেন। তা সত্ত্বেও জটায়ুর বত্রিশ নম্বর উপন্যাস 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' মহালয়ার ঠিক পরেই বেরিয়ে যায়। আর গল্পটা যেরকম দাঁড়িয়েছিল, তা থেকে ছবি করলে আর যাই হোক, সে ছবি দেখে কোডোপাইরিন খেতে হবে না। হিন্দী ছবির মালমশলা থাকলেও তাতে হিন্দী ছবির ছেড়ে-দে-মা-কেঁদে বাঁচি বাড়াবাড়িটা নেই।

পাণ্ডুলিপির একটা কপি পুলক ঘোষালকে আগেই পাঠিয়েছিলেন লালমোহনবাবু। দিন দশেক আগে চিঠি আসে যে গল্প পছন্দ হয়েছে, আর খুব শিগগিরই কাজ আরম্ভ করে দিতে চান পুলকবাবু। চিত্রনাট্য তিনি নিজেই করেছেন, আর হিন্দী সংলাপ লিখেছেন ত্রিভুবন গুপ্তে, যার এক একটা কথা নাকি এক-একটা ধারালো চাকু, সোজা গিয়ে দর্শকের বুকে বিঁধে হলে পায়রা উড়িয়ে দেয়। এই চিঠির উত্তরে লালমোহনবাবু ফেলুদাকে কিছু না বলেই তাঁর গল্পের দাম হিসেবে পঁচিশ হাজার হাঁকেন, আর তার উত্তরেই প্রডিউসারের টেলিগ্রাম। আমার মনে হল পঁচিশ চেয়ে লালমোহনবাবু যে একটু বাড়াবাড়ি করেছিলেন সেটা উনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আধবোজা চোখে একটা আঃ শব্দ করে লালমোহনবাবু বললেন, 'পুলক ছোকরা লিখেছিল যে, গল্পটা বিশেষ চেঞ্জ করেনি ; মোটামুটি আমি—থুড়ি, আমরা, যা লিখেছিলাম—'

ফেলুদা হাত তুলে লালমোহনবাবুকে থামিয়ে বলল, 'আপনি বহুবচনটা না ব্যবহার করলেই খুশি হব।'

'কিন্তু--'

'আহাঃ—শেকসপিয়রও তো অন্যের গল্পের সাহায্য নিয়ে নাটক লিখেছে, তা বলে তাকে কি কেউ কখনো "আমাদের হ্যামলেট" বলতে শুনেছে ? কখখনো না। উপাদানে আমার কিছুটা কন্ট্রিবিউশন থাকলেও, পাচক তো আপনি। আপনার মতো হাতের তার কি ‍ ‍র আমার আছে ?'

লালমোহনবাবু কৃতজ্ঞতায় কান অবধি হেসে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।—যাই হোক, যা বলছিলাম। কেবল একটি মাত্র মাইনর চেঞ্জ করেছে গল্পে।'

'কীরকম ?'

'সে আর বলবেন না মশাই। তাজ্জব ব্যাপার। আপনি শুনলেই বলবেন টেলিপ্যাথি। হয়েছে কি, আমার গপ্পের স্মাগলার ঢুনঢিরাম ধুরন্ধরের বাসস্থান হিসেবে একটা তেতাল্লিশতলা বাড়ির একটা ফ্ল্যাটের উল্লেখ করেছিলুম। আপনি খুঁটিনাটির ওপর নজর দিতে বলেন, তাই বাড়িটার একটা নামও দিয়ে-ছিলুম—শিবাজী কাস্‌ল। বোম্বাই তো—তাই মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীরপুরুষের নামে বাড়ির নামটা বেশ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয়েছিল। ওমা, পুলক লিখলে ওই নামে নাকি সত্যিই একটা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি আছে, আর তাতে নাকি ওর ছবির প্রোডিউসার নিজেই থাকেন। বলুন, একে টেলিপ্যাথি ছাড়া আর কী বলবেন ?'

'কুং-ফু থাকছে, না বাদ ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে এনটার দ্য ড্র্যাগন দেখার পর থেকেই লালমোহনবাবুর মাথায় ঢুকেছিল যে গপ্পে কুং-ফু ঢোকাবেন। ফেলুদার প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বললেন, 'আলবৎ থাকছে। সেটার কথা আমি আলাদা করে জিজ্ঞেস করেছিলুম : তাতে লিখেছে ম্যাড্রাস থেকে স্পেশালিস্ট কুং-ফু-র জন্য ফাইট মাস্টার আসছে। বলে নাকি হংকং-ট্রেনড।'

'শুটিং শুরু কবে ?'

'সেইটে জিজ্ঞেস করে আজ একটা চিঠি লিখছি। জানার পর আমাদের যাবার তারিখটা ফিক্স করব। আমাদের—থুড়ি, আমার গল্পের শুটিং শুরু হবে, আর আমরা সেখানে থাকব না সে কী করে হয় মশাই ?'

ডায়মন্ডা এর আগেও খেয়েছি, কিন্তু আজকে যতটা ভালো লাগল তেমন আর কোনোদিন লাগেনি।

॥ ২ ॥

পরের রবিবার আবার লালমোহনবাবুর আবির্ভাব। ফেলুদা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল ভদ্রলোককে অর্ধেক খরচ অফার করবে, কারণ ওর নিজের হাতেও সম্প্রতি কিছু টাকা এসেছে। শুধু কেস থেকে নয় ; গত তিন মাসে ও দুটো ইংরেজি বই অনুবাদ করেছে—উনবিংশ শতাব্দীর দু'জন বিখ্যাত পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী—দুটোই ছাপা হচ্ছে, আর দুটো থেকেই কিছু আগাম টাকা পেয়েছে ও। এর আগেও অবসর সময়ে ফেলুদাকে মাঝে মাঝে লিখতে দেখেছি—কিন্তু আদা-নুন খেয়ে লিখতে লাগা এই প্রথম।

লালমোহনবাবু অবশ্যি ফেলুদার প্রস্তাব এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'খেপেছেন ? লেখার ব্যাপারে আপনি এখন আমার গাইড অ্যান্ড

গড়ফাদার। এটা হল আপনাকে আমার সামান্য দক্ষিণা।'

এই বলে পকেট থেকে দুটো প্লেনের টিকিট বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, 'মঙ্গলবার সকাল দশটা পঁয়ত্রিশে ফ্লাইট। এক ঘন্টা আগে রিপোর্টিং টাইম। আমি সোজা দমদমে গিয়ে আপনাদের জন্য ওয়েট করব।'

'শুটিং আরম্ভ হচ্ছে কবে?'

'বিষ্যুদবার। একেবারে ক্লাইম্যাক্সের সীন। সেই ট্রেন, মোটর আর ঘোড়ার ব্যাপারটা।'

এ ছাড়াও আরেকটা খবর দেবার ছিল লালমোহনবাবুর।

'কাল সন্ধেবেলা আরেক ব্যাপার মশাই। এখানকার এক ফিলিম প্রোডিউসার—ধরমতলায় আপিস—আমার পাবলিশারের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সোজা আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। সেও "বোম্বাইয়ের বোম্বেটে" ছবি করতে চায়। বলে বাঙলায় হিন্দী টাইপের ছবি না করলে আর চলছে না। গল্প বিক্রি হয়ে গেছে শুনে বেশ হতাশ হল। বইটা অবিশ্যি উনি নিজে পড়েননি, ওঁর এক ভাগনে পড়ে ওকে বলেছে। আমি বোম্বাই না গিয়েই বইটা লিখেছি শুনে বেশ অবাক হলেন। আমি আর ভাঙলুম না যে মারে-র গাইড টু ইন্ডিয়া আর ফেলু মিত্তিরের গাইডেন্স ছাড়া এ কাজ হত না।'

'ভদ্রলোক বাঙালী?'

'ইয়েস স্যার। বারেন্দ্র। সান্যাল। কথায় পশ্চিমা টান আছে। বললেন জব্বলপুরে মানুষ। গায়ে উগ্র পারফিউমের গন্ধ। নাক জ্বলে যায় মশাই। পুরুষ মানুষ এভাবে সেন্ট মাখে এই প্রথম এক্সপেরিয়েন্স করলুম। যাই হোক, আমি চলে যাচ্ছি শুনে একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন। বললেন, "কোনো অসুবিধে হলে একে ফোন করতে পারেন। আমার এ বন্ধুটি খুব হেলপফুল"।'

কলকাতায় ডিসেম্বরে বেশ শীত পড়লেও বম্বেতে নাকি তেমন ঠাণ্ডা পড়ে না। আমাদের ছোট দুটো সুটকেসেই সব ম্যানেজ হয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে উঠে দেখি কুয়াশায় রাস্তার ওপারে পল্টুদের বাড়িটা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। প্লেন ছাড়বে তো? আশ্চর্য. ন'টার মধ্যে সব সাফ হয়ে গিয়ে ঝক্‌ঝকে রোদ উঠে গেল। ভি আই পি রোডে এমনিতেই শহরের চেয়ে বেশি কুয়াশা হয়, কিন্তু আজ দেখলাম তেমন কিছু নয়।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলাম তখন প্লেন ছাড়তে পঞ্চাশ মিনিট বাকি। লালমোহনবাবু আগেই হাজির। এমন-কি বোর্ডিং কার্ডও দেখলাম উঁকি মারছে পকেট থেকে। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, ফেলুবাবু—লম্বা কিউ দেখে ভাবলুম যদি জানলার ধারে সীট না পাই, তাই আগেভাগেই সেরে রাখলুম।

এইচ রো--দেখুন হয়তো দেখবেন কাছাকাছি সীট পেয়ে গেছেন।'

'আপনার হাতে ওটা কী? কী বই কিনলেন?'

লালমোহনবাবুর বগলে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট দেখে আমার মনে হয়েছিল উনি নিজের বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন ওখানে কাউকে দেবেন বলে।

ফেলুদার প্রশ্নের জবাবে ভদ্রলোক বললেন, 'কিনব কি মশাই, সেই সান্যাল—সেদিন যার কথা বলেছিলাম--সে দিয়ে গেল এই মিনিট দশেক আগে।'

'উপহার?'

'নো স্যার। বম্বে এয়ারপোর্টে লোক এসে নিয়ে যাবে। আমার নাম-ধাম তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কোন এক আত্মীয়ের কাছে যাবে এ বই।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'ইয়ে—একটা বেশ অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন না?'

'পাওয়া মুশকিল', বলল ফেলুদা, 'কারণ ভারত কেমিক্যালস এর গুলবাহার সেন্টের গন্ধ আর সব গন্ধকে ম্লান করে দিয়েছে।'

গন্ধটা আমিও পেয়েছিলাম। সান্যাল মশাই এমনই সেন্ট মাখেন যে তার সুবাস এই প্যাকেটে পর্যন্ত লেগে রয়েছে।

'যা বলেছেন স্যার, হ্যাঃ হ্যাঃ', সায় দিলেন জটায়ু। 'তবে অনেক সময় শুনেছি এইভাবে লোকে উল্টোপাল্টা জিনিসও চালান দেয়।'

'সে তো বটেই। বুকিং কাউন্টারে তো নোটিসই লাগানো আছে যে অচেনা লোকের হাত থেকে চালান দেওয়ার জন্য কোনো জিনিস নেওয়াটা বিপজ্জনক। অবিশ্যি এ ভদ্রলোককে টেকনিক্যালি ঠিক অচেনা বলা চলে না, আর প্যাকেটটাও যে বইয়ের সেটা সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখছি না।'

প্লেনে তিনজনে পাশাপাশি জায়গা পেলাম না; লালমোহনবাবু আমাদের তিনটে সারি পিছনে জানালার ধারে বসলেন। ফ্লাইটে বলবার মতো তেমন কিছু ঘটেনি। কেবল লাউডস্পীকারে ক্যাপ্টেন দত্ত যখন বলছেন আমরা নাগপুরের উপর দিয়ে যাচ্ছি, তখন পিছন ফিরে দেখি লালমোহনবাবু সীট ছেড়ে উঠে প্লেনের ল্যাজের দিকটায় চলেছেন। শেষটায় একজন এয়ার হোসটেস ওঁকে থামিয়ে উল্টো দিকে দেখিয়ে দিতে ভদ্রলোক আবার সারা পথ হেঁটে সোজা পাইলটের দরজা খুলে ককপিটে ঢুকে তক্ষুনি বেরিয়ে এসে জিভ কেটে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। নিজের সীটে ফেরার পথে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে কানে ফিস ফিস্ করে বলে গেলেন, 'আমার পাশের লোকটিকে এক ঝলক দেখে নাও। হাই-জ্যাকার হলে আশ্চর্য হব না।'

মাথা ঘুরিয়ে দেখে বুঝলাম জটায়ু অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে

না থাকলে ওরকম নিরীহ, নেই-থুতনি মানুষটাকে কক্ষনো হাই-জ্যাকার ভাবতেন না।

স্যান্টা ক্রুজে প্লেন ল্যান্ড করার ঠিক আগেই লালমোহনবাবু ব্যাগ থেকে বইটা বার করে রেখেছিলেন। ডোমেসটিক লাউঞ্জে ঢুকে আমরা তিনজনেই এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় 'মিস্টার গাঙ্গুলী ?' শুনে ডাইনে ঘুরে দেখি গাঢ় লাল রঙের টেরিলিনের শার্ট পরা একজন লোক মাদ্রাজী টাইপের এক ভদ্রলোককে প্রশ্নটা করে তার দিকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছে। ভদ্রলোক একটু যেন বিরক্ত ভাবেই মাথা নেড়ে না বলে লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও বই হাতে লাল শার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আই অ্যাম মিস্টার গাঙ্গুলী অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম মিস্টার সান্যাল', এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন জটায়ু।

লাল শার্ট বইটা নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেলেন, আর লালমোহনবাবুও কর্তব্য সেরে নিশ্চিন্তে হাত ঝাড়লেন।

আমাদের মাল বেরোতে লাগল আধ ঘন্টা। এখন একটা বেজে কুড়ি, শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে যাবে প্রায় দুটো। পুলক ঘোষাল গাড়ির নম্বরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই, দেখলাম সেটা একটা গেরুয়া রঙের স্ট্যান্ডার্ড। ড্রাইভারটি বেশ শৌখিন ও ফিটফাট, হিন্দী ছাড়া ইংরেজিটাও মোটামুটি জানে। কলকাতার তিনজন অচেনা লোকের জন্য ভাড়া খাটতে হচ্ছে বলে কোনোরকম বিরক্তির ভাব দেখলাম না। বরং লালমোহনবাবুকে যেরকম একটা সেলাম ঠুকল তাতে মনে হল কাজটা পেয়ে সে কৃতার্থ। ড্রাইভারই খবর দিল যে শহরের ভিতরেই শালিমার হোটেলে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে, আর পুলকবাবু বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। গাড়ি আমাদের জন্য রাখা থাকবে, আমরা যখন খুশি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি।

ফেলুদা অবিশ্যি এখানে আসবার আগে ওর অভ্যাস মতো বম্বে সম্বন্ধে পড়াশুনা করে নিয়েছে। ও বলে কোনো নতুন জায়গায় আসার আগে এ জিনিসটা করে না নিলে নাকি সে জায়গা দূরেই থেকে যায়। মানুষের যেমন একটা পরিচয় তার নামে, একটা চেহারায়, একটা চরিত্রে আর একটা তার অতীত ইতিহাসে, ঠিক তেমনি নাকি শহরেরও। বম্বে শহরের চেহারা আর চরিত্র এখনো ফেলুদার জানা নেই, তবে এটা জানে যে শালিমার হোটেল হল কেম্পস কর্নারের কাছে।

আমাদের গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে গিয়ে একটা বড় রাস্তায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদা ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল—'উয়ো যো ট্যাক্সি হ্যায় না—এম আর পি থ্রি ফাইভ থ্রি এইট—উস্কো পিছে পিছে চল্‌না।'

'কী ব্যাপার মশাই ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'একটা সামান্য কৌতূহল', বলল ফেলুদা।

আমাদের গাড়ি একটা স্কুটার আর দুটো অ্যাম্বাসাডারকে ছাড়িয়ে ফিয়াট ট্যাক্সিটার ঠিক পিছনে এসে পড়ল। এবার ট্যাক্সিটার পিছনের কাঁচ দিয়ে দেখলাম ভিতরে বসা লাল টেরিলিনের শার্ট।

একটু যেন বুকটা কেঁপে উঠল। কিছুই হয়নি, কেন ফেলুদা ট্যাক্সিটাকে ধাওয়া করছে তাও জানি না, তবু ব্যাপারটা আমার হিসেবের বাইরে বলেই যেন একটা রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চারের ছোঁয়া লাগল। লালমোহনবাবু অবিশ্যি আজকাল ধরেই নিয়েছেন যে ফেলুদার সব কাজের মানে জিজ্ঞেস করে সব সময়ে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না, যথাসময়ে আপনা থেকেই সেটা জানা যাবে।

আমাদের গাড়ি দিব্যি ট্যাক্সিটাকে চোখে রেখে চলেছে, আমরাও নতুন শহরের রাস্তাঘাট লোকজন দেখতে দেখতে চলেছি। একটা জিনিস বলতেই হবে—হিন্দী ছবির এত বেশি আর এত বড় বড় বিজ্ঞাপন আর কোনো শহরের রাস্তায় দেখিনি। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো দেখে বললেন, 'সবাইয়ের নামই তো দেখছি, অথচ কাহিনীকারের নামটা যেন চোখে পড়ছে না। এরা কি গপ্প লেখায় না কাউকে দিয়ে ?'

ফেলুদা বলল, 'গপ্প লেখক হিসেবে নাম যদি আশা করেন তাহলে বম্বে আপনার জায়গা নয়। এখানে গপ্প লেখা হয় না, গপ্প তৈরি হয়, ম্যানুফ্যাকচার হয়—যেমন বাজারের আর পাঁচটা জিনিস ম্যানুফ্যাকচার হয়। লাক্স সাবান কে তৈরি করেছে তার নাম কি কেউ জানে ?—কোম্পানির নামটা হয়তো জানে। টাকা পাচ্ছেন, ব্যস ; মুখটি বন্ধ করে বসে থাকুন। সম্মানের কথা ভুলে যান।'

'হুঁ...।' লালমোহনবাবু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। 'তাহলে মান হল গিয়ে আপনার বেঙ্গলে, আর বম্বেতে হচ্ছে মানি ?'

'হক্ কথা', বলল ফেলুদা।

ফেলুদা যে-এলাকাটাকে মহালক্ষ্মী বলে বলল, সেটা ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়ে আমাদের মার্কামারা ট্যাক্সিটা একটা ডান দিকের রাস্তা ধরল। আমাদের ড্রাইভার বলল যে শালিমার হোটেল যেতে হলে আমাদের সোজাই যাওয়া উচিত।

ফেলুদা বলল, 'আপ দাঁয়া চলিয়ে।'

ডান দিকে ঘুরে মিনিট দু'এক যেতেই দেখলাম ট্যাক্সিটা বাঁ দিকে একটা গেটের ভিতর ঢুকে গেল। ফেলুদার নির্দেশে আমাদের গাড়ি গেটের বাইরেই থামল। আমরা তিনজনেই গাড়ি থেকে নামলাম, আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই লালমোহনবাবু হিঁক করে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন।

কারণটা পরিষ্কার। আমরা একটা বিরাট ঢ্যাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছি, তার তিনতলার হাইটে বড় বড় উঁচু কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা—শিবাজী কাসল।

॥ ৩ ॥

নামটা দেখে আমার এত অবাক লাগল যে, কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। 'এ যে টেলিপ্যাথির ঠাকুরদাদা!'—বললেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা চুপ। দেখলাম ও শুধু বাড়িটাই দেখছে না, তার আশপাশটাও দেখছে। বাঁ দিকে পর পর অনেকগুলো বাড়ি, তার কোনোটাই বিশতলার কম না। ডানদিকের বাড়িগুলো নিচু আর পুরানো, আর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে পিছনে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

ড্রাইভার একটু যেন অবাক হয়েই আমাদের হাবভাব লক্ষ করছিল। ফেলুদা তাকে অপেক্ষা করতে বলে সোজা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। আমি আর লালমোহনবাবু বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট তিনেক পরেই ফেলুদা বেরিয়ে এল।

'চলিয়ে শালিমার হোটেল।'

আমরা আবার রওনা দিলাম। ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'খুব সম্ভবত সেভেনটিনথ ফ্লোরে, অর্থাৎ আঠারোতলায় গেছে আপনার বইয়ের প্যাকেট।'

'আপনি যে ভেলকি দেখালেন মশাই', বললেন লালমোহনবাবু, 'এই তিন মিনিটের মধ্যে অত বড় বাড়ির কোন তলায় গেছে লোকটা সেটা জেনে ফেলে দিলেন?'

'আঠারোতলায় গেছে কিনা জানবার জন্য আঠারোতলায় ওঠার দরকার হয় না। একতলার লিফটের মাথার উপরেই বোর্ডে নম্বর লেখা থাকে। যখন পৌঁছলাম তখন লিফট উঠতে শুরু করে দিয়েছে। শেষ যে নম্বরটার বাতি জ্বলে উঠল, সেটা হল সতেরো। এবার বুঝেছেন তো?'

লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝলুম তো। এত সহজ ব্যাপারটা আমাদের মাথায় কেন আসে না সেটাই তো বুঝি না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শালিমার হোটেলে পৌঁছে গেলাম। ফেলুদা আর আমার জন্য পাঁচতলায় একটা ডাবল রুম, আর লালমোহনবাবুর জন্য ওই একই তলায় আমাদের উল্টো দিকে একটা সিঙ্গল। আমাদের ঘরটা রাস্তার দিকে, জানালা দিয়ে নীচে চাইলেই অবিরাম গাড়ির স্রোত, আর সামনের দিকে চাইলে

দুটো ঢ্যাঙা বাড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে সমুদ্র। বম্বে যে একটা গমগমে শহর সেটা এই ঘরে বসেই বেশ বোঝা যায়। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড ; হাত মুখ ধুয়ে তিনজনে গেলাম হোটেলেরই দোতলায় গুলমার্গ রেস্টোর‍্যান্টে। লালমোহনবাবুর ঠোঁটের ডগায় যে প্রশ্নটা এসে আটকে ছিল, সেটা খাবারের অর্ডার দিয়েই করে ফেললেন।

'আপনিও তাহলে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন, ফেলুবাবু ?'

ফেলুদা সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটা পাল্টা প্রশ্ন করল।

'লোকটা আপনার হাত থেকে বইটা নিয়ে কী করল সেটা লক্ষ করেছিলেন ?'

'কেন ?—চলে গেল !' বললেন লালমোহনবাবু।

'ওই তো ! কেবল মোটা জিনিসটাই দেখেছেন, সূক্ষ্ম জিনিসটা চোখে পড়েনি। লোকটা খানিক দূর গিয়েই পকেট থেকে খুচরো পয়সা বার করেছিল।'

'টেলিফোন !' আমি বলে উঠলাম।

'ভেরি গুড, তোপশে। আমার বিশ্বাস লোকটা এয়ারপোর্টের পাবলিক টেলিফোন থেকে শহরে ফোন করে। তারপর আমরা যখন আমাদের মালের জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখন লোকটাকে আবার দেখতে পাই।'

'কোথায় ?'

'আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তার ঠিক বাইরেই প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়াবার জায়গা। মনে পড়ছে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ', আমি বলে উঠলাম। লালমোহনবাবু চুপ।

'লোকটা একটা নীল অ্যাম্বাসাডারে ওঠে। ড্রাইভার ছিল। পাঁচ-সাত মিনিট চেষ্টা করেও গাড়ি স্টার্ট নেয় না। লোকটা গাড়ি থেকে নেমে এসে ড্রাইভারের উপর তম্বি করে। কথা না শুনলেও, ভাবভঙ্গিতে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। তারপর লোকটা গাড়ির আশা ছেড়ে চলে যায়।'

'ট্যাক্সি নিতে !'—এবার লালমোহনবাবু।

'এগজাক্টলি—তাতে কী বোঝা যায় ?'

'লোকটা ব্যস্ত—ইয়ে, ব্যতিব্যস্ত—ইয়ে, মানে, লোকটার তাড়া ছিল।'

'গুড। দৃষ্টি আর মস্তিষ্ক—এই দুটোকে সজাগ রাখলে অনেক কিছুই অনুমান করা যায়, লালমোহনবাবু। কাজেই আমি যে ট্যাক্সিটাকে ফলো করেছিলাম তার পিছনে একটা কারণ ছিল।'

'কী মনে হচ্ছে বলুন তো আপনার ?' লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসে কনুই দুটো টেবিলের উপর রেখে প্রশ্নটা করলেন।

'এখনো কিছুই মনে হচ্ছে না', বলল ফেলুদা, 'শুধু একটা খট্‌কা।'

এর পরে আমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো কথা বলিনি।

পাঁচটা নাগাদ বিশ্রাম-টিশ্রাম করে লালমোহনবাবু আমাদের ঘরে এলেন। তিনজনে বসে চা আনিয়ে খাচ্ছি, এমন সময় দরজায় টোকা। যিনি ঢুকলেন তার বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি কিছুতেই নয়, কিন্তু মাথা ভরতি ঢেউ খেলানো চুলে আশ্চর্য বেশি রকম পাক ধরে গেছে।

'এই যে লালুদা—কেমন, এভরিথিং অলরাইট ?'

লালুদা !—লালমোহনবাবুকে যে কেউ লালুদা ডাকতে পারে সেটা কেন জানি মাথাতেই আসেনি। বুঝলাম ইনিই হচ্ছেন পুলক ঘোষাল। ফেলুদা আগেই লালমোহনবাবুকে শাসিয়ে রেখেছিল যে ওর আসল পরিচয়টা যেন চেপে রাখা হয়। তাই পুলকবাবুর কাছে ও হয়ে গেল লালমোহনবাবুর বন্ধু। পুলকবাবু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'দেখুন তো, আপনি লালুদার বন্ধু, এত কাছের মানুষ, আর আমরা হিরোর অভাবে হিমসিম খাচ্ছি। আপনার হিন্দী আসে ?'

ফেলুদা একটা খোলা হাসি হেসে বলল, 'হিন্দী তো আসেই না, অভিনয়টা আরোই আসে না। ...কিন্তু হিরোর অভাব কী রকম ? আপনাদের তো শুটিং আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে শুনলাম। অর্জুন মেরহোত্রা করছে না ?'

'তা তো করছে, কিন্তু অর্জুন কি আর সে-অর্জুন আছে ? এখন তার হাজার বায়নাক্কা। এদের আমি হিরো বলি না মশাই। আসলে এরা চোরা ভিলেন, পর্দায় যাই হন না কেন। নাই দিয়ে দিয়ে এদের মাথাটি খেয়ে ফেলেছে এখানকার প্রোডিউসাররা।—যাক গে, পরশু আপনাদের ইনভাইট করে যাচ্ছি। এখান থেকে মাইল সত্তর দূরে শুটিং। ড্রাইভার জায়গা চেনে। সক্কাল সক্কাল বেরিয়ে সোজা চলে আসবেন। মিস্টার গোরে—মানে আমার প্রোডিউসার—এখানে নেই ; ছবি বিক্রির ব্যাপারে দিন সাতেকের জন্য দিল্লি মাদ্রাজ কলকাতা ঘুরতে গেছেন। তবে উনি বলে গেছেন আপনাদের আতিথেয়তার যেন কোনো ত্রুটি না হয়।'

'কোথায় শুটিং ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'বিটউইন খাণ্ডালা অ্যান্ড লোনাউলি। ট্রেনের সীন। প্যাসেঞ্জারের অভাব হলে আপনাদের বসিয়ে দেবো কিন্তু।'

'ভালো কথা', লালমোহনবাবু বললেন, 'আমরা শিবাজী কাস্‌ল দেখে এলুম।'

কথাটা শুনে পুলকবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল।

'সে কী, কখন ?'

'এই তো, আসার পথে। ধরুন, এই দুটো নাগাদ।'

'ও। তাহলে ব্যাপারটা আরো পরে হয়েছে।'

'কী ব্যাপার মশাই ?'

'খুন।'

'সে কী !'—আমরা তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম। খ-য়ে হ্রস্ব উ আর ন—এই দুটো পর পর জুড়লে আপনা থেকেই যেন শিউরে উঠতে হয়।

'আমি খবর পাই এই আধঘন্টা আগে', বললেন পুলকবাবু। 'ও বাড়িতে তো আমার রেগুলার যাতায়াত মশাই! মিস্টার গোরেও শিবাজী কাসলেই থাকেন—বারো নম্বর ফ্লোরে। সাধে কি আপনার গপ্পে বাড়ির নাম চেঞ্জ করতে হয়েছে! অবিশ্যি উনি নিজে খুব মাইডিয়ার লোক।—আপনারা বাড়ির ভিতরে গেসলেন নাকি ?'

'আমি গিয়েছিলাম', বলল ফেলুদা, 'লিফটের দরজা অবধি।'

'ওরেব্বাবা! লিফ্‌টের ভেতরেই তো খুন। লাশ সনাক্ত হয়নি এখনো। দেখতে গুণ্ডা টাইপ। তিনটে নাগাদ ত্যাগরাজন বলে ওখানকারই এক বাসিন্দা তিনতলা থেকে লিফ্‌টের জন্য বেল টেপে। লিফট ওপর থেকে নীচে নেমে আসে। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে গিযেই দেখেন এই কাণ্ড। পেটে ছোরা মেরেছে মশাই। হরিবল ব্যাপার।'

'ওই সময়টায় লিফ্‌টে কাউকে উঠতে-টুঠতে দেখেনি কেউ ?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'লিফ্‌টের আশেপাশে কেউ ছিল না। তবে বিল্ডিং-এর বাইরে দু'জন ড্রাইভার ছিল, তারা ওই সময়টায় পাঁচ-ছ'জনকে ঢুকতে দেখেছে। তার মধ্যে একজনের গায়ে লাল শার্ট, একজনের কাঁধে ব্যাগ আর গায়ে খয়েরি রঙের—'

ফেলুদা হাত তুলে পুলকবাবুকে থামিয়ে বলল, 'ওই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি স্বয়ং আমি, কাজেই আর বেশি বলার দরকার নেই।'

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠেছে। সর্বনাশ!—ফেলুদা কি খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বে নাকি ?

'এনিওয়ে', আশ্বাসের সুরে বললেন পুলক ঘোষাল, 'ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আপনিও না, লালুদা। আপনার গপ্পে শিবাজী কাস্‌লে স্মাগলার থাকে লিখেছেন, তাতে আর ভয়ের কী আছে বলুন। বম্বের কোন্ অ্যাপার্টমেন্টে স্মাগলার থাকে না ? মিসায় আর ক'টাকে ধরেছে ? এ তো সবে খোসা ছাড়ানো চলছে এখন, শাঁসে পৌঁছুতে অনেক দেরি। সারা শহরটাই তো স্মাগলিং-এর উপর দাঁড়িয়ে আছে।'

ফেলুদাকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তবে সে ভাবটা কেটে গেল আরেকজন লোকের আবির্ভাবে। দ্বিতীয় টোকার শব্দ হতে পুলকবাবুই চেয়ার

ছেড়ে 'এই বোধহয় ভিক্টর' বলে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। চাবুকের মতো শরীরওয়ালা মাঝারি হাইটের একজন লোক ঘরে ঢুকল।

'পরিচয় করিয়ে দিই, লালুদা। ইনি হলেন ভিক্টর পেরুমল- হংকং-ট্রেনড কুং-ফু এক্সপার্ট।'

ভদ্রলোক দিব্যি খোলতাই হেসে আমাদের সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

'ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলেন,' পুলকবাবু বললেন, 'আর হিন্দি তো বটেই, যদিও ইনি দক্ষিণ ভারতের লোক। আর ইনি শুধু কুং ফু শেখান না এর স্টান্টেরও জবাব নেই। ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনের উপর লাফিয়ে পড়ার

ব্যাপারটা হিরোর ভাইয়ের মেক আপ নিয়ে ইনিই করবেন।'

আমার ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি বেশ ভালো লেগে গিয়েছিল। হাসিটার মধ্যে সত্যিই একটা খোলসা ভাব আছে। তার উপরে স্টান্টম্যান শুনে ভদ্রলোকের উপর একটা ভক্তি-ভাবও জেগে উঠল। যারা সামান্য ক'টা টাকার জন্য দিনের পর দিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, আর তার জন্য বাহবা নিয়ে যায় প্রক্সি-দেওয়া হিরোগুলো, তাদের সাবাস বলতেই হয়।

ভিক্টর পেরুমল বললেন তিনি শুধু কুং-ফু ই জানেন না—'আই নো মোক্কাইবি অলসো।'

মোক্কাইরি ? সে আবার কী ? ফেলুদার যে এত জ্ঞান, ও-ও বলল জানে না ; আর লালমোহনবাবুর কথা তো ছেড়েই দিলাম, কারণ উনি নিজের লেখা ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েন-টড়েন না।

পেরুমল বলল, মোক্কাইরি হচ্ছে নাকি এক-রকম ফাইটিং যেটা করার জন্য পা শূন্যে তুলে হাঁটতে হয়। এটা নাকি হংকং-এ চালু হয়েছে মাত্র মাস ছয়েক হল, যদিও জন্মস্থান জাপান।

'এটাও রয়েছে নাকি ছবিতে ?' লালমোহনবাবু যেন কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন। পুলক ঘোষাল হেসে মাথা নাড়লেন। 'এক কুং-ফু-র ঠেলাই আগে সামলাই। এগারোজন লোককে সকাল-বিকেল ট্রেনিং দিতে হচ্ছে সেই নভেম্বরের গোড়া থেকে। আপনি তো লিখে খালাস, ঝক্কি তো পোয়াতে হচ্ছে আমাদের। অবিশ্যি আপনারা যে শুটিংটা দেখবেন তাতে কুং ফু নেই। এতে দেখবেন স্টান্টম্যানের খেলা। ক্লাস ছবি হবে আপনার গপ্পো থেকে লালুদা—কুছ পরোয়া নেহি।'

পুলক ঘোষাল আর ভিক্টর চলে যাবার পর ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ট্র্যাফিকের শব্দে ঘর ভরে গেল। অবিশ্যি পাঁচতলা হওয়াতে তার জন্য কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। আসলে আমাদের কারুরই এয়ারকন্ডিশনিং-এর অভ্যেসও নেই, ভালোও লাগে না। বাইরের শব্দ আসুক ; তার সঙ্গে খাটি বাতাসটাও তো ঢুকছে।

জানালা থেকে ফিরে এসে সোফায় বসে ফেলুদা একটু যেন গম্ভীরভাবেই বলল, 'লালমোহনবাবু, অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা যেরকম উগ্র হয়ে উঠছে সেটা বেশ অস্বস্তিকর। আপনি ওই প্যাকেটটা চালানের ভার না নিলেই পারতেন। আমি যদি তখন থাকতাম, তাহলে আপনাকে বারণ করতাম।'

'কী করি বলুন', লালমোহনবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, 'ভদ্রলোক বললেন, আমি এর পর যে গল্পটা লিখব সেটা যেন ওঁর জন্য রিজার্ভ করে রাখি। তারপরে আর কী করে না বলি বলুন।'

'ব্যাপারটা কী জানেন ? এয়ারপোর্টে যখন সিকিউরিটি চেক হয়, তখন নিয়ম হচ্ছে প্যাসেঞ্জারের কাছে মোড়ক জাতীয় কিছু থাকলে সেটা খুলে দেখা। আপনাকে নিরীহ মনে করে আপনার বেলা সেটা আর করেনি। খুললে কী বেরোত কে জানে ? ওই প্যাকেটের সঙ্গে যে ওই খুনের সম্বন্ধ নেই তা কে বলতে পারে ?'

লালমোহনবাবু গলা খাঁকরে মিনমিন করে বললেন, 'কিন্তু একটা বইয়ের প্যাকেটে আর...'

'বই মানেই যে বই তা তো নাও হতে পারে। আংটির মধ্যে বিষ রাখার

ব্যবস্থা থাকত রাজাবাদশাদের আমলে সেটা জানেন ? সে আংটিকে শুধু আংটি বললে কি ঠিক হবে ? আংটিও বটে, বিষাধারও বটে। ...যাক, আপনার কর্তব্য যখন নির্বিঘ্নে সারা হয়ে গেছে, তখন আপনার নিজের কোনো বিপদ নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

'বলছেন ?' লালমোহনবাবুর মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

'বলছি, বৈকি', ফেলুদা বলল। 'আর আপনার বিপদ মানে তো আমাদেরও বিপদ। এক সূত্রে বাঁধা আছি মোরা তিনজনায়। সুতোয় টান পড়লে তিনজনেই কাত।'

লালমোহনবাবু এক ঝটকায় খাট থেকে উঠে বাঁ পা-টাকে কুং-ফুর মতো করে শূন্যে একটি লাথি মেরে বললেন, 'থ্রী চিয়ারস ফর দ্য থ্রী মাসকেটিয়াবস। --হিপ হিপ-- '

ফেলুদা আর আমি লালমোহনবাবুর সঙ্গে গলা মেলালাম---

'হুররে '

:: ৪ ::

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে হেঁটে ঘুরে না দেখলে নতুন শহর দেখা হয় না এটা আমরা তিনজনেই বিশ্বাস করি। যোধপুর, কাশী, দিল্লি, গ্যাংটক---সব জায়গাতেই আমরা এ জিনিসটা করেছি। বম্বেতেই বা করব না কেন ?

হোটেল থেকে বেরিয়ে ডানদিকে কিছু দূর গেলেই যাকে কেম্পস কর্নার বলে সেখানে একটা দুর্দান্ত ফ্লাই-ওভার পড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাগড়াই থামের উপর দিয়ে ব্রিজের মতো রাস্তা, তার উপরেও ট্র্যাফিক, নীচেও ট্র্যাফিক। আমরা ব্রিজের তলা দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গিবস রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলেছি। ফেলুদা ডানদিকে দেখিয়ে দিল পাহাড়ের গা দিয়ে হ্যাঙ্গিং গার্ডেনস যাবার রাস্তা। এই পাহাড়ের নামই মালাবার হিলস।

মাইলখানেক এগিয়ে যেতে সামনে সমুদ্র পড়ল। আপিস ফেরত গাড়ির স্রোত এড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে এক কোমর উঁচু পাথরের পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাঁচিলের পিছন দিকে সমুদ্রের জল এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

রাস্তাটা বাঁদিক দিয়ে সোজা পুবে চলে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরে শেষ হয়েছে সেই একেবারে দক্ষিণে, যেখানের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো ঝাপসা হয়ে আছে বিকেলের পড়ন্ত রোদে। ওই ধনুকের মতো রাস্তাটা নাকি ম্যারিন ড্রাইভ।

লালমোহনবাবু বললেন, 'স্মাগলারই বলুন আর যাই বলুন---পাহাড় আর সমুদ্র

মিলিয়ে বম্বে একেবারে চ্যাম্পিয়ন শহর মশাই।'

পাঁচিলের ধার দিয়ে আমরা ম্যারিন ড্রাইভের দিকে এগোতে লাগলাম। বাঁ দিক দিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো গাড়ি চলেছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর লালমোহনবাবু আরেকটা মন্তব্য করলেন।

'এখানে বোধহয় সি এম ডি এ নেই ; আছে কি ?'

'রাস্তায় খানাখন্দ নেই বলে বলছেন তো ?'

'এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময়ই লক্ষ করছিলুম যে গাড়িতে চলেছি, অথচ লাফাচ্ছি না। অবিশ্বাস্য।'

কিছুক্ষণ থেকেই সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় ভিড় লক্ষ কবছিলাম। যেমন রবিবার আমাদের শহীদ মিনারের নীচে হয়, অনেকটা সেই রকম। আরো কাছে যেতে ফেলুদা বলল জায়গাটার নাম চৌপট্টি। এখানে রোজই নাকি রথের মেলার মতো ভিড় হয়। সারবাঁধা দোকান, দেখেই মনে হয় ফুচকা বা ভেলপুরী বা আইসক্রীম বা ওই জাতীয় কিছু বিক্রি হচ্ছে।

ক্রমে কাছে এসে বুঝলাম আন্দাজে ভুল করিনি। মেলার মতো মেলা বটে। অর্ধেক বম্বে শহর ভেঙে পড়েছে এখানে। লালমোহনবাবু শিগ্গিরই বিচ ম্যান হচ্ছেন, তাই ওঁর ঘাড় ভাঙতে দোষ নেই। তিনজনে হাতে ভেলপুরীর ঠোঙা নিয়ে ভিড় আর হৈহুল্লোড় ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে বালির উপর বসলাম। ঘড়িতে পৌনে সাতটা, কিন্তু এখনো আকাশে গোলাপী রঙ। আমাদের মতো অনেকেই বালির উপর বসে আরাম করছে। লালমোহনবাবু খাওয়া শেষ করে হাত নেড়ে একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাঁ দিকে বসে থাকা লোকজনের মধ্যে কারুর হাত থেকে একটা খবরের কাগজ উড়ে এসে ভদ্রলোকের মুখের উপর লেপটে গিয়ে কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

কাগজটা হাতে নিয়ে নামটা দেখে লালমোহনবাবু সবে 'ইভনিং নিউজ' কথাটা বলেছেন, এমন সময় ফেলুদা তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল।

'নামটা পড়লেন, আর তার নীচে হেড-লাইনটা চোখে পড়ল না ?'

আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাগজটার উপর ঝুঁকে পড়লাম। হেডলাইন হচ্ছে—'মার্ডার ইন অ্যাপার্টমেন্ট লিফ্ট', আর তার নীচেই যে খুন হয়েছে তার ছবি। যাক্—এ তাহলে আমাদের লালশার্ট নয়।

খবরে বলছে খুনটা হয়েছে দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে। খুনি এখনো ধরা পড়েনি, তবে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। যে খুন হয়েছে তার নাম মঙ্গলরাম শেঠী। চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বেশ কিছুদিন থেকেই পুলিশ খুঁজছে। লিফ্টে বেশ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল তারও নাকি প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ক্লুয়ের মধ্যে নাকি এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে মৃতদেহের পাশে। কাগজে একজনের নাম ছিল। নামটা হচ্ছে—

'ও আঁ আঁ আঁ আঁ আঁ...'

একটা অদ্ভুত গোঙানি-টাইপের শব্দ লালমোহনবাবুর গলা দিয়ে বেরোল। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন মনে করে আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে জাপটে ধরলাম। অবিশ্যি এরকম করার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইভনিং নিউজ লিখছে চিরকুটে লেখা ছিল—'মিস্টার গাঙ্গুলী, ডার্ক, শর্ট, বল্ড, মুসটাশ।'

খবরটা পড়া শেষ হওয়া মাত্র লালমোহনবাবু ফেলুদার হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'এমন পরিষ্কার সমুদ্রতটটিকে আবর্জনায় ভরিয়ে দিলেন?'

ভদ্রলোক এখনো ভালো করে কথা বলতে পারছেন না দেখে ফেলুদা এবার ধমকের সুরে বলল, 'আপনার কি ধারণা গোটা শহরের লোক আপনাকে দেখেই বুঝে ফেলবে যে আপনিই হচ্ছেন এই ব্যক্তি?'

লালমোহনবাবু এতেও সান্ত্বনা পেলেন না। কোনোরকমে ঢোক গিলে বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু—এর মানেটা বুঝছেন তো? কে খুন করেছে বুঝছেন তো?'

ফেলুদা বেশ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে একদৃষ্টে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, 'লালুদা, চার বছর আমার সংসর্গ-লাভ করেও মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে শিখলেন না।'

'কেন, কেন—লালশার্ট—?'

'লালশার্ট কী? কাগজটা লালশার্টেরই হাত থেকে লিফটে পড়েছে সেটা ধরে নিলেও তাতে কী প্রমাণ হচ্ছে? তার মানেই যে সে খুন করেছে তার কী প্রমাণ? আপনার কাছ থেকে প্যাকেট পাবার পর তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ—এটা তো ঠিক? তাহলে কাগজটারও তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। লিফ্‌টে ওঠার সময় সেটা পকেটে রয়ে গেছে দেখে সে সেটা লিফ্‌টেই ফেলে দিল—এমন ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে কি?'

লালমোহনবাবু তবুও ঠাণ্ডা হলেন না। 'আপনি যাই বলুন, লাশের পাশে যখন আমার নাম আর ডেসক্রিপশন লেখা কাগজ পেয়েছে, তখন আমার চরম ভোগান্তি আছে—এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা একটাই। টাকে তো আর চুল গজাবে না, হাইটও বাড়বে না, আর কমপ্লেকশনও চেঞ্জ হবে না। আছে এক গোঁফ। আপনি যাই বলুন, এ গোঁফ আমি কালই হাওয়া করে দেব।'

'আর হোটেলের লোকেরা কী ভাববে? তারা কি আর ইভনিং নিউজ পড়েনি

ভেবেছেন ? খুনের খবর শতকরা নব্বুই ভাগ লোকে পড়বে, মানুষের স্বভাবই ওই। আমার ধারণা আপনি গোঁফ ছাঁটলে দৃষ্টিটা, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা, আরো বেশি করে আপনার উপর পড়বে।'

আকাশের লালটা যখন বেগুনী হয়ে শেষে পাংশুটের দিকে যেতে শুরু করেছে, পশ্চিমের চেরা মেঘের ফাঁকে শুকতারাটা পুবের ম্যারিন ড্রাইভের হাজার আলোর মালার সঙ্গে একা পাল্লা দিতে গিয়ে ধুকপুক করছে, তখন আমরা উঠে পড়ে গা থেকে বালি ঝেড়ে আবার মানুষ আর দোকানের ভিড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলমুখো হলাম।

রিসেপশন কাউন্টারে চাবি চাইবার সময় দেখলাম লালমোহনবাবু হাতটা যেদিকে বাড়ালেন, মুখটা তার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে রাখলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, উল্টোদিকে লবিতে বসা সাতজন দেশী-বিদেশী লোকের তিনজনের হাতে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ডের সামনের পাতাতেও খুনের খবর আর মৃতদেহের ছবি। খবরের মধ্যে টেকো বেঁটে গুঁফো রঙ-ময়লা মিস্টার গাঙ্গুলীর উল্লেখ নেই এ হতেই পারে না।

॥ ৫ ॥

লালমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত আর গোঁফটা কামাননি। রাত্রে ঘুম হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করাতে বললেন যতবারই চোখ ঢুলে এসেছে ততবারই মনে হয়েছে ওঁর ঘরটা লিফটের মতো ওঠানামা করছে, আর তার ফলে তন্দ্রা ছুটে গেছে।

পুলকবাবু কাল রাত্রেই ফোন করে বলেছিলেন আজ সকাল দশটায় এসে আমাদের স্টুডিওতে নিয়ে যাবেন। আমরা আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পেডার রোড দিয়ে খানিকদূরে হেঁটে একটা পানের দোকান থেকে দিব্যি মিঠে পান কিনে পৌনে ন'টায় হোটেলে ঢুকতেই কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ করলাম।

কারণ আর কিছুই নয়, পুলিশ এসেছে। একজন ইনস্পেক্টর গোছের লোক কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, হোটেলের কর্মচারী একটা ইঙ্গিত করতেই তিনি ঘুরে লালমোহনবাবুর দিকে চাইলেন। ইনস্পেক্টরের চাহনিতে যদিও কোনো হুমকির ভাব ছিল না, পাশে একটা খট শব্দ শুনে বুঝলাম লালমোহনবাবুর দুটো হাঁটুতে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে।

ইনস্পেক্টর হাসিমুখে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। ফেলুদা শান্তভাবে লালমোহনবাবুর পিঠে একটা মৃদু চাপ দিয়ে বুঝিয়ে দিল—নার্ভাস হবেন না, ঘাবড়াবার কিছু নেই।

'ইনস্পেক্টর পটবর্ধন। সি আই ডি থেকে আসছি। আপনি মিস্টার গাঙ্গুলী ?'

'হাঁয়েস।'

এই রে, লালমোহনবাবু ইংরিজি-বাংলা গুলিয়ে ফেলেছেন।

পটবর্ধন ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'আপনারা—?'

ফেলুদা পকেট থেকে ওর প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর লেখা কার্ডটা বার করে দিল। পটবর্ধন সেটা পড়ে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

'মিটার ? আপনিই কি এলোরার সেই মূর্তি চুরির—?'

ফেলুদা তার একপেশে হাসিটা হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'গ্ল্যাড টু মীট ইউ স্যার', হাত বাড়িয়ে বললেন পটবর্ধন। 'ইউ ডিড এ ভেরি গুড জব দেয়ার।'

ফেলুদার বন্ধু বলে লালমোহনবাবুর খাতির বেড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু জেরার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। কথা হল হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে বসে।

পটবর্ধন যা বললেন তাতে জানলাম যে মৃতদেহের গায়ে নাকি অনেক আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তবে খুনী এখনো ধরা পড়েনি। কিন্তু একজন লালশার্ট পরা লোক যে এয়ারপোর্ট থেকে শিবাজী কাসল-এ এসেছিল সেটা পুলিশ বার করেছে ট্যাক্সিওয়ালাটার সন্ধান বার করে। পুলিশের ধারণা এই লালশার্টই খুনী এবং তার পকেট থেকেই চিরকুটটা বেরিয়েছে। লালমোহনবাবুর কথা শুনে অবিশ্যি পটবর্ধনের ধারণা আরো বদ্ধমূল হল। বললেন, 'এটা বুঝতেই পারছিলাম যে লোকটা গাঙ্গুলী নামে কাউকে মীট করতে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। আমরা গতকাল সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে যত প্লেন স্যান্টাক্রুজে নেমেছে তার প্রত্যেকটার প্যাসেঞ্জারের লিস্ট দেখে ক্যালকাটা ফ্লাইটে গাঙ্গুলী নামটা পাই। তারপর এখানের প্রত্যেক হোটেলে খোঁজ করি। দেখলাম শালিমার হোটেলে দুপুরে এসেছেন মিস্টার এল গাঙ্গুলী।'

পটবর্ধনের আসল যেটা জানার ছিল সেটা হচ্ছে এই ব্যাপারে লালমোহনবাবুর ভূমিকাটা কী ; অর্থাৎ ওই কাগজে তার নাম আর চেহারার বর্ণনা থাকবে কেন। লালমোহনবাবু মিস্টার সান্যালের ব্যাপারটা বলাতে পটবর্ধন বললেন, 'হু ইজ দিস সানিয়াল ? হাউ ওয়েল ডু ইউ নো হিম ?'

লালমোহনবাবু যা বলবার বললেন। সান্যালের ঠিকানা জিজ্ঞেস করাতে বাধ্য হয়েই বলতে হল উনি জানেন না।

সবশেষে ইনস্পেক্টর পটবর্ধন ঠিক ফেলুদার মতো করেই সাবধান করে দিলেন

লালমোহনবাবুকে। বললেন, 'ঠিক এইভাবেই নিরীহ নির্দোষ লোকের হাত দিয়ে আজকাল চোরাই মাল পাচার হচ্ছে। কাঠমাণ্ডু থেকে কিছু দামী মণিমুক্তো এদেশে এসেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। শুনেছি তার মধ্যে নাকি নানাসাহেবের বিখ্যাত নওলাখা হারও আছে।'

সিপাহী বিদ্রোহের সময় একজন নানাসাহেব ব্রিটিশদেব বিরুদ্ধে লড়েছিল বলে ইতিহাসে পড়েছি। পটবর্ধন সেই নানাসাহেবের কথা বলছেন কিনা জানি না।

'আমার বিশ্বাস এই প্যাকেটটাতেও কোনো চোবাই মাল ছিল', বললেন পটবর্ধন। 'যে গ্যাঙ এটা কলকাতা থেকে পাঠিয়েছে, তারই বিরুদ্ধ গ্যাঙেব কেউ খবর পেয়ে শিবাজী কাস্লের আশেপাশে ঘুবঘুব কবছিল। সেই লোকই লালশার্টকে আক্রমণ করে, ফলে লালশার্টেব হাতে তার মৃত্যু হয।'

লালমোহনবাবু ধরেই নিয়েছিলেন যে তাঁর নাম লেখা কাগজ পুলিশেব হাতে পড়াতে ওঁর ফাঁসি না-হয় যাবজ্জীপন দ্বীপান্তর হবেই। কেবল কযেকটা উপদেশ-বাক্য শুনে ছাড়া পেয়ে যাওযাতে ভদ্রলোকেব চেহাবায নতুন জেল্লা এসে গেল।

পুলকবাবু দশটা বলে এলেন প্রায় এগাবোটায। পুলিশেব ব্যাপাবটা শুনে বললেন, 'আব বলবেন না—কাল কাগজ দেখেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। লালুদার সঙ্গে নাম ডেসক্রিপশন সব মিলে যাচ্ছে, অথচ পুরো ব্যাপাবটাই আমার কাছে রহস্য।'

সান্যালের ঘটনাটা শুনে বললেন, 'কোন সান্যাল বলুন তো? অহী সান্যাল? মাঝারি হাইট, চোখদুটো একটু বসা, থুতনিতে খাঁজ কাটা?'

'থুতনি তো দেখিনি ভাই। দাড়ি আছে। বোধহয আগে বাখতেন না।'

'আমি দু' বছব আগের কথা বলছি। একই লোক কিনা জানি না। বোম্বেতে ছিল কিছুদিন। ছবিও প্রোডিউস করেছিল খান দু'এক। মার খেযেছিল—যদ্দূর মনে পড়ে।'

'লোক কীরকম?'

'সে খবর জানি না লালুদা, তবে বদনাম শুনিনি কখনো।'

'তাহলে বোধহয় কাগজের প্যাকেটে কোনো গোলমাল নেই।'

'দেখুন লালুদা, আজকাল নেহাত স্মাগলিং-টাগলিং হচ্ছে বলে, নইলে আমরাও তো এককালে অনেক অচেনা লোকের হাত থেকে জিনিস নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। কই, কোনোদিন তো কোনো গোলমাল হয়নি।'

যে গাড়িটা কাল ব্যবহার করেছিলাম, সেটাতেই আমরা চারজনে মহালক্ষ্মীর

ফেমাস স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলাম। গাড়ি থেকে নামবার সময় পুলকবাবু বললেন, 'আগামী কালের শুটিং-এ ট্রেনের ব্যাপারটায় রেল কোম্পানির লোকদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। খবরটা পেয়েই প্রোডিউসার রাত্তিরের প্লেন ধরে কলকাতা থেকে চলে এসেছেন। চলুন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

'কালকের শুটিংটা হবে তো?' লালমোহনবাবুর গলায় আশঙ্কার সুর।

'শুটিং-এর ফাদার হবে লালুদা, ঘাবড়াইয়ে মৎ।'

আমরা একটা টিনের ছাতওয়ালা কারখানার ঘরের মতো বিরাট ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। এখানেই শুটিং হয়, আর আজ এখানেই চলেছে কুং-ফুর ট্রেনিং। একটা প্রকাণ্ড গদির উপর ভিক্টর পেরুমলের নির্দেশে একদল লোক লাফাচ্ছে, পা ছুঁড়ছে, আছাড় খাচ্ছে। গদি থেকে হাত দশেক দূরে একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন একজন বছর পঁয়ত্রিশের ভদ্রলোক।

'আলাপ করিয়ে দিই', বললেন পুলকবাবু, 'ইনি হচ্ছেন আমাদের ছবির প্রযোজক মিঃ গোরে..মিস্টার গাঙ্গুলী, স্টোরি রাইটার—মিস্টার মিত্র, আর—তোমার নামটা কী ভাই?'

'তপেশরঞ্জন মিত্র।'

মিঃ গোরের গাল দুটো আপেলের মতো, মাথার ঠিক মাঝখানে একটা চকচকে টাক, আর চোখদুটো সামান্য কটা। ভুঁড়িটা নিশ্চয়ই ইদানীং হয়েছে, কারণ শখ করে এত টাইট জামা কেউ পরে না। পুলকবাবু আলাপ করিয়ে দিয়ে হাওয়া, কারণ কালকের শুটিং-এর নাকি অনেক তোড়জোড় আছে। বলে গেলেন, 'দেড়টায় ফিরছি লালুদা; আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছেন আপনারা।'

গোরে আমাদের খুব খাতিরটাতির করে চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন। নিজে লালমোহনবাবুর পাশে বসে বললেন, আপনি এলেন বলে আমি খুব খুশি হলাম।'

'সেকি, আপনি তো দিব্যি বাঙলা বলেন।'

লালমোহনবাবু বোধহয় তাঁর দশ হাজার পাওনার কথাটা ভেবেই একটু বেশি খুলে তারিফ করলেন।

'আমার ফাদারের বিজনেস ছিল ক্যানিং স্ট্রীটে। থ্রি ইয়ারস আই ওয়জ এ স্টুডেন্ট ইন ডন বস্কো। দেন ফাদারের ডেথ হল, আমি আঙ্কেলের কাছে চলে এলাম বুম্বই। সে তখুন থেকেই আই আম হিয়ার। লেকিন ফিলিম লাইনে দিস ইজ মাই ফার্স্ট ভেনচার।'

গোরে বাঙলা জানেন দেখেই বোধহয় লালমোহনবাবু বেশ উৎসাহের সঙ্গে সান্যাল থেকে শুরু করে আজকের পুলিশের জেরা অবধি সব ঘটনা ভদ্রলোককে

বলে ফেললেন। তাতে মিঃ গোরে চুকচুক শব্দ করে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন, 'আজকাল কাউকে বিসোয়াস করা যায় না, মিস্টার গাঙ্গুলী। আপনি এমিনেন্ট রাইটার, আপনার হাতে চোরাই মাল পাচার হবে ভাবতে শরম লাগে।'

এবার ফেলুদাও যোগ দিল কথায়।

'আপনি তো শিবাজী কাসলে থাকেন বলে শুনলাম।'

'হাঁ। দু'মাস হল আছি। হরিবল মার্ডার। ইভনিং ফ্লাইটে এসেছি আমি। বাড়ি ফিরেছি রাত ইগারটা। অ্যাট দ্যাট টাইম অলসো দেয়ার ওয়জ এ বিগ ক্রাউড ইন দ্য স্ট্রীট। হাই-রাইজ বিল্ডিংমে খুনখারাবি হোনেসে বহুৎ মুস্কিল।'

'ইয়ে—সেভেনটিনথ ফ্লোরে কে থাকে জানেন?'

'সেভেনটিনথ...সেভেনটিনথ...' ভদ্রলোক মনে করতে পারলেন না। 'আমার চিনা আদমি এক হ্যায় এইটথ মে—এন সি মেহতা, আউর দো মে ডক্টর ভাজিফদার। মাই ফ্ল্যাট ইজ অন টুয়েলফথ ফ্লোর।'

ফেলুদা আর কোনো প্রশ্ন করল না। মিঃ গোরেরও দেখলাম উঠি উঠি ভাব। বললেন বহুৎ ঝামেলার প্রোডাকশন, সব সময় কিছু না কিছু কাজ লেগেই থাকে। তাছাড়া কালকের শুটিংটা সত্যিই এলাহি ব্যাপার। মাথেরান স্টেশন থেকে ভাড়া করা ট্রেন খাণ্ডালা আর লোনাউলির মাঝামাঝি লেভেলক্রসিং-এ আসবে। মিঃ গোরে মাথেরানেই থাকবেন, কারণ রেল কোম্পানিকে পয়সাকড়ি দেওয়ার ব্যাপার আছে। একটা পুরোনো আমলের ফার্স্ট-ক্লাস কামরা থাকবে ট্রেনে, মিঃ গোরে সেই কামরায় চেপেই শুটিং-এর জায়গায় আসবেন। 'আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা আমার সঙ্গে এসে লাঞ্চ করেন। আপনারা ভেজিটেরিয়ান কি?'

'নো নো, নন নন', বললেন লালমোহনবাবু।

'হোয়াট উইল উই হ্যাভ? চিকেন অর মটন?'

'চিকেন হ্যাড ইয়েসটারডে। মটনই হোক টুমরো, কী বলেন, ফেলুবাবু?'

'তথাস্তু', বলল ফেলুদা।

ফেলুদা মিস্টার গোরের সব কথাই শুনছিল, কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে ওর চোখটা যে বারবার কুং-ফুর দিকে চলে যাচ্ছিল সেটা আমি লক্ষ করছিলাম। ভিক্টর পেরুমলের ধৈর্য আর অধ্যবসায় দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা নিখুঁত না করে সে ছাড়বে না। যারা শিখছে তাদের মধ্যে দু'-একজন দেখলাম রীতিমতো তৈরি হয়ে গেছে।

পেরুমলকেও দেখছিলাম কাজের ফাঁকে ফাঁকে ফেলুদার দিকে দেখছে। ফেলুদার চাহনিতে তারিফের ভাবটা বোধহয় তাকে উৎসাহিত করছিল। গোরে চলে যাবার পর পেরুমল ফেলুদাকে ইশারা করে কাছে আসতে বলল। ফেলুদা

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে এগিয়ে গেল।

'আইয়ে মিস্টার মিত্র—ট্রাই কিজিয়ে—ইটস নট সো ডিফিকাল্ট।'

বাকি যারা ট্রেনিং নিচ্ছিল তারা গদি ছেড়ে সরে গেল। পেস্তমল একটা ছোট্ট লাফের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে ডান পা-টা মাথা অবধি তুলে সোজা সামনের দিকে ছিটকে দিল। পায়ের সামনে কেউ থাকলে নির্ঘাত ধরাশায়ী হত। ফেলুদা গদির উপর উঠে পাঁচ ছ বার ছোট্ট ছোট্ট লাফ দিয়ে শরীরটাকে তৈরি করে

নিল। পেরুমল ফেলুদার থেকে হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার দিকে ছোঁড় পা।'

পেরুমলের জানার কথা নয় যে এনটার দ্য ড্র্যাগন দেখার পর থেকে মাস কয়েক ধরে প্রায়ই সকালে ফেলুদা আমাদের বৈঠকখানায় কুং-ফুর ঢঙে হাত পা ছোঁড়া অভ্যেস করেছে। ফুর্তি ছাড়া এর পিছনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না ঠিকই, কিন্তু পা ছোঁড়ার কায়দাটা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

ওয়ান-টু-থ্রি বলার সঙ্গে সঙ্গে ফেলুদার ডান পা-টা হোরাইজন্টালভাবে বিদ্যুদ্বেগে সামনের দিকে ছিটকে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পেরুমলের শরীরটা পিছনে ছিটকে গিয়ে আছাড় খেলো গদির উপর—যদিও আমি জানি যে ফেলুদার পা তার গায়ে লাগেনি।

তারপর এইভাবে পাঁচ মিনিট ধরে চলল ভিক্টর পেরুমল আর প্রদোষ মিত্তিরের কুং-ফুর ডেমনস্ট্রেশন। আমার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল পেরুমলের সাকরেদদের দিকে—দেড় মাস ধরে লাফ ঝাঁপ করে যাদের জিভ বেরিয়ে এসেছে। এটা দেখে ভালো লাগল যে হিংসার চেয়ে প্রশংসার ভাবটাই তাদের মুখে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। পাঁচ মিনিটের শেষে যখন দু'জনে হ্যাণ্ডশেক করে পরস্পরের পিঠ চাপড়াচ্ছে, তখন সকলে হাততালি দিয়ে উঠল।

॥ ৬ ॥

দুটো নাগাদ পুলকবাবু আর সংলাপ-লেখক ত্রিভুবন গুপ্তের সঙ্গে আমরা ওয়রলির কপার চিমনি রেস্ট্যোর‍্যান্টে লাঞ্চ খেতে ঢুকলাম। দেখে মনে হয় তিলধরার জায়গা নেই, কিন্তু পুলকবাবু আমাদের জন্য একটা টেবিল আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছেন।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমাদের ছবির নামটা কী হচ্ছে ভাই পুলক ?'

নামের কথাটা অবিশ্যি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সুযোগটা আসেনি। 'বোম্বায়ের বোম্বেটে' নাম যে থাকবে না সেটা আমিও আন্দাজ করেছিলাম।

'আর বলবেন না, লালুদা', বললেন পুলকবাবু। 'নাম নিয়ে কি কম হুজ্জত গেছে ? যা ভাবি তাই দেখি হয়ে গেছে, না হয় অন্য কোনো পার্টি রেজিস্ট্রি করে বসে আছে। গুপ্তেজিকে জিজ্ঞেস করুন না কত বিনিদ্র রজনী গেছে ওঁর নাম ভেবে বার করতে। শেষটায় এই তিনদিন আগে—যা হয় আর কি—হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক।'

'হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক ? ছবির নাম হাই-ভোল্টেজ স্পার্ক ?' লো-ভোল্টেজ

গলার স্বরে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

পুলকবাবু হো-হো করে হেসে চারিদিকের টেবিলের লোকদের মাথা আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মাথা খারাপ, লালুদা ? ও নামে ছবি চলে ? আমি ইনস্পিরেশনের কথা বলছি। জেট বাহাদুর।'

'অ্যাঁ ?'

'জেট বাহাদুর। রাস্তার হোর্ডিং পড়ে যাবে আপনারা থাকতে থাকতেই। ভেবে দেখুন—আপনার গপ্পের এর চেয়ে ভালো নাম আর খুঁজে পাবেন না। অ্যাকশন, স্পীড, থ্রিল—জেট কথাটার মধ্যে আপনি সব পাবেন। প্লাস বাহাদুর। নাম আর কাস্টিং-এর জোরেই অল সার্কিটস সোল্ড।'

লালমোহনবাবুর হাসির ভোল্টেজটা যেন বাড়তে গিয়ে কমে গেল। বোধহয় ভাবছেন—শুধুই নাম আর কাস্টিং ? গপ্পের কি তাহলে কোনো দামই নেই ?

'আমার কোনো ছবি আপনারা দেখেছেন, লালুদা ?' বললেন পুলকবাবু। 'তীরন্দাজটা হচ্ছে লোটাসে। আজ ইভনিং শো-এ দেখে আসুন। আমি ম্যানেজারকে বলে দেবো—তিনখানা সার্কলের টিকিট রেখে দেবে। ভালো ছবি—জুবিলি করেছিল।'

আমরা পুলকবাবুর কোনো ছবি দেখিনি। লালমোহনবাবুর স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহল ছিল, তাই যাব বলেই বলে দিলাম। বম্বেতে চেনাশোনা না থাকলে সন্ধে কাটানো ভারী মুশকিল। গাড়িটা আমাদের কাছেই থাকবে—তাকে বললেই লোটাসে নিয়ে যাবে।

খাবার মাঝখানে রেস্টোর‍্যান্টের একজন লোক পুলকবাবুকে এসে কী জানি বলল। পুলকবাবুর যে এখানে যাতায়াত আছে সেটা ঢোকার সময় ওয়েটারদের মুখে হাসি দেখেই বুঝেছি। হিট ডিরেক্টরের এ শহরে খুব খাতির।

পুলকবাবু কথাটা শুনেই লালমোহনবাবুর দিকে ফিরলেন।

'আপনার টেলিফোন, লালুদা।'

লালমোহনবাবু ভাগ্যিস পোলাওয়ের চামচটা মুখে পোরেননি, তাহলে নির্ঘাত বিষম খেতেন। এ অবস্থায় চমকানোটা কেবল খানিকটা পোলাও চামচ থেকে ছিটকে টেবিলের চাদরে পড়ার উপর দিয়ে গেল।

'মিস্টার গোরে ডাকছেন', বললেন পুলকবাবু। 'হয়তো কিছু গুড নিউজ থাকতে পারে।'

মিনিট দুয়েকের মধ্যে টেলিফোন সেরে এসে লালমোহনবাবু আবার কাঁটাচামচ হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'চারটের সময় ভদ্রলোকের বাড়িতে যেতে বললেন। কিছু অর্থপ্রাপ্তি আছে বলে মনে হচ্ছে—হে হে।'

তার মানে আজ বিকেলের মধ্যে লালমোহনবাবুর পকেটে দশ হাজার টাকা

এসে যাবে। ফেলুদা বলল, 'এর পরের দিন লাঞ্চটা আপনার ঘাড়ে। আর কপার-টপার নয়, একেবারে গোল্ডেন চিমনি।'

রুমালি রুটি, পোলাও, নারগিসি কোফ্‌তা আর কুলপী খেয়ে যখন রেস্টোর‍্যান্ট থেকে বেরোলাম তখন প্রায় পৌনে তিনটে। পুলকবাবু আর মিস্টার গুপ্তে স্টুডিও চলে গেলেন। সংলাপ এখনো কিছু লিখতে বাকি আছে। প্রত্যেকটা সংলাপ শানিয়ে লিখতে হয় তো, তাই নাকি সময় লাগে, বললেন পুলকবাবু। গুপ্তেজী চুরুটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলেন। ভদ্রলোক সংলাপ লিখলেও নিজে সংলাপ খুবই কম বলেন সেটা লক্ষ করলাম।

আমরা পান কিনে গাড়িতে উঠলাম। 'শালিমার?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

ফেলুদা বলল, 'বম্বে এসে গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া না দেখে যাওয়া যায় না।—চলিয়ে তাজমহল হোটেলকা পাস।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

ড্রাইভার বুঝেছিল আমাদের কোনো কাজ নেই, কেবল শহর দেখার ইচ্ছে, তাই সে দিব্যি ঘুরিযে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস, ফ্লোরা ফাউনটেন, টেলিভিশন স্টেশন, প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে পৌঁছল। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

পিছনে আরব সাগর, তাতে গুনে দেখলাম এগারোটা ছোট বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে রাস্তাটা পেল্লায় চওড়া। বাঁদিকে গেটওয়ের দিকে মুখ করে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ছত্রপতি শিবাজী। ডানপাশে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী-বিখ্যাত তাজমহল হোটেল, যার ভিতরটা একবার দেখে না যাওয়ার কোনো মানে হয় না, কারণ বাইরেটা দেখেই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ।

ঠাণ্ডা লবিতে ঢুকে চোখ একেবারে টেরিয়ে গেল। এ কোন্ দেশে এলাম রে বাবা! এত রকম জাতের এত লোক একসঙ্গে কখনো দেখিনি। সাহেবেদের চেয়েও দেখলাম আরবদের সংখ্যা বেশি। এটা কেন হল? ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে বলল, এবার বেরুট যাওয়া নিষেধ বলে আরবরা সব বোম্বাই এসেছে ছুটি ভোগ করতে। পেট্রোলের দৌলতে এদের তো আর পয়সার অভাব নেই।

মিনিট পাঁচেক পায়চারি করে আমরা আবার গাড়িতে এসে উঠলাম। যখন শিবাজী কাস্‌লের লিফ্‌টের বেল টিপছি তখন ঘড়িতে চারটে বেজে দু' মিনিট।

টুয়েল্‌ফথ ফ্লোর বা তেরোতলায় পৌঁছে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে দেখি তিন দিকে তিনটে দরজা। মাঝেরটার উপর লেখা জি গোরে। বেল টিপতে উর্দি-পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

'অন্দর আইয়ে।'

বুঝলাম গোরে সাহেব চাকরকে আগেই বলে রেখেছিলেন আমাদের কথা।

ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোককে চোখে দেখার আগে তার গলা পেলাম—'আসুন, আসুন!'

এই বার দেখা গেল একটা সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে তিনি হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।

'হাউ ওয়জ দি লাঞ্চ?'

'ভেরি ভেরি গুড', বললেন জটায়ু।
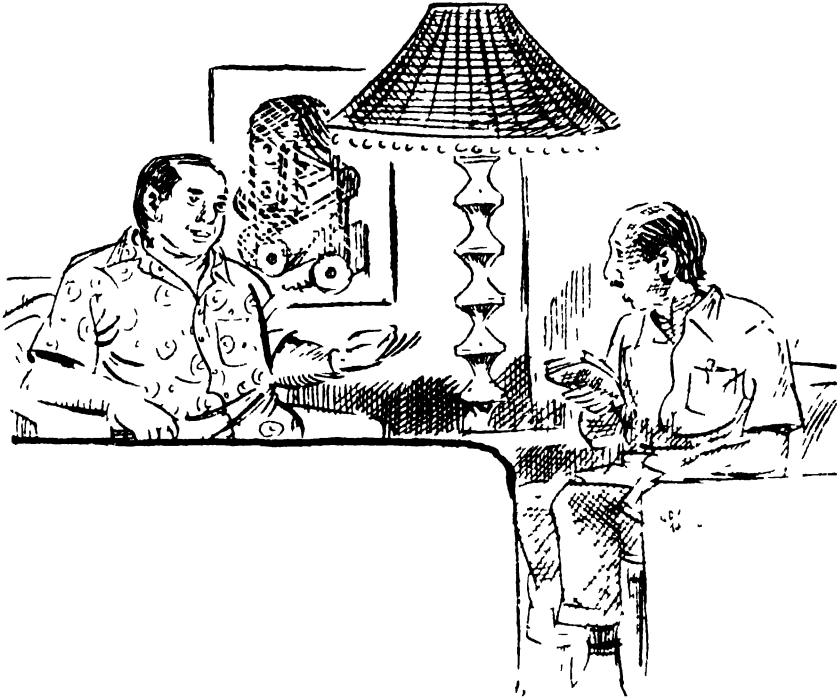
ভদ্রলোকের বৈঠকখানা দেখে তাক লেগে গেল। আমাদের কলকাতার বাড়ির প্রায় পুরো একতলাটাই এই ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। পশ্চিম দিকটায় সারবাঁধা কাঁচের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। ঘরের আসবাবপত্রের এক একটারই দাম হয়তো দু' তিন হাজার টাকা, তাছাড়া মেঝে-জোড়া কার্পেট, দেয়ালে পেন্টিং, সিলিং-এ ঝাড়-লণ্ঠন—এসব তো আছেই। একদিকে দেয়ালজোড়া বুকশেলফে দামী দামী বইগুলো এত ঝকঝকে যে দেখলে মনে হয়

বুঝি এইমাত্র কেনা।

আমি আর ফেলুদা একটা পুরু গদিওয়ালা সোফাতে পাশাপাশি বসলাম, আর আমাদের ডানপাশে আরেকটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসলেন লালমোহনবাবু। বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশাল কুকুর এসে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তিনজনের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। লালমোহনবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। ফেলুদা হাত বাড়িয়ে তুড়ি দিতে কুকুরটা ওর দিকে এগিয়ে এল। ও পরে বলেছিল যে কুকুরটা জাতে হল গ্রেট ডেন।

'ডিউক, ডিউক!'

কুকুরটা এবার ফেলুদাকে ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মিঃ গোরে আমাদের বসিয়ে দিয়ে একটু ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, এবার হাতে একটা খাম নিয়ে ঢুকে লালমোহনবাবুর অন্য পাশের চেয়ারে বসলেন।

'আমি আপনার বেপারটা রেডি করে রাখব ভেবেছিলাম', বললেন মিঃ গোরে, 'কিন্তু তিনটা ট্রাঙ্ক কল এসে গেল।'

ভদ্রলোক খামটা লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন। মনের জোরে হাত কাঁপা বন্ধ করে লালমোহনবাবু সেটা নিয়ে তার ভিতর থেকে টেনে বার করলেন একতাড়া একশো টাকার নোট।

'গিনতি করিয়ে লিন', বললেন মিঃ গোরে।

'গিনব ?'

আবার ভাষার গণ্ডগোল।

'গিনবেন আলবৎ। দেয়ার শুড বি ওয়ান হান্ড্রেড নোটস দেয়ার।'

যে সময়ে লালমোহনবাবু গোনা শেষ করলেন, তার মধ্যে রূপোর টি-সেটে আমাদের জন্য চা এসে গেছে। খেয়ে বুঝলাম একেবারে সেরা দার্জিলিং টি।

'আপনার পরিচয় আভিতক মিলল না', গোরে বললেন ফেলুদার দিকে চেয়ে।

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার গাঙ্গুলীর ফ্রেন্ড—এই আমার পরিচয়।'

'নো স্যার', বললেন গোরে, 'দ্যাট ইজ নট এনাফ। ইউ আর নো অর্ডিনারি পারসন—আপনার চোখ, আপনার ভয়েস, আপনার হাইট, ওয়ক, বডি—নাথিং ইজ অর্ডিনারি। আপনি হামাকে যদি নাই বলবেন তো ঠিক আছে। লেকিন শ্রিফ মিস্টার গাঙ্গুলীর দোস্ত যদি বলেন, উতো হামি বিসোয়াস করব না।'

ফেলুদা অল্প হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে প্রসঙ্গটা চেঞ্জ করে ফেলল।

'আপনার অনেক বই আছে দেখছি।'

'হাঁ—বাট আই ডোন্ট রীড দেম! উসব কিতাব ওনলি ফর শো। তারাপোরওয়ালা দুকানে রেগুলার অর্ডার—এনি গুড বুক দ্যাট কামস

আউট—এক কপি হামাকে পাঠিয়ে দেয়।'

'একটা বাংলা বইও চলে এসেছে দেখছি।'

ফেলুদার চোখ বটে। ওই সারি সারি বিলিতি বইয়ের মধ্যে পনের হাত দূর থেকে ধরে ফেলেছে যে, একটা বই বাংলা।

মিঃ গোরে হেসে উঠলেন। 'শুধু বাংলা কেন মিঃ মিটার, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি, সব আছে। আমার এক আদমি আছে—বাংলা হিন্দী গুজরাটি তিন ভাষা জানে ; ওই তিন ভাষায় নভেল পড়ে হামাকে সিনপসিস করে দেয়। মিঃ গাঙ্গুলীর কিতাব কে-ভি আউটলাইন পড়িয়েছি আমি। ইউ সি, মিস্টার মিটার, ফিল্ম বানানেকে লিয়ে তো—'

ঘরে টেলিফোন বেজে উঠেছে। মিঃ গোরে উঠে গেলেন। দরজার পাশে একটা তেপায়া টেবিলে রাখা সাদা টেলিফোন।

'হ্যালো...হাঁ...হোল্ড অন।—আপনার টেলিফোন, মিস্টার গাঙ্গুলী।'

লালমোহনবাবুকে বার বার এভাবে চমকাতে হচ্ছে—আশা করি তাতে ওঁর হাট-টার্টের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

'পুলকবাবু কি ?' টেলিফোনের দিকে যাবার পথে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'নো স্যার', বললেন মিঃ গোরে। 'আই ডোন্ট নো দিস পারসন।'

'হ্যালো।'

ফেলুদা আড়চোখে দেখছে লালমোহনবাবুর দিকে।

'হ্যালো. .হ্যালো...'

লালমোহনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা ভাব করে আমাদের দিকে চাইলেন।

'কেউ বলছে না কিছু।'

'লাইন কাট গিয়া হোগা', বললেন মিস্টার গোরে।

লালমোহনবাবু মাথা নাড়লেন। 'অন্য সব শব্দ পাচ্ছি টেলিফোনে।'

এবার ফেলুদা উঠে গিয়ে লালমোহনবাবুর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে নিল।

'হ্যালো, হ্যালো...'

ফেলুদা মাথা নেড়ে ফোন রেখে বলল, 'ছেড়ে দিয়েছে।'

'আশ্চর্য', বললেন লালমোহনবাবু, 'কে হতে পারে বলুন তো ?'

'ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, মিস্টার গাঙ্গুলী', বললেন মিঃ গোরে। 'বোম্বাই শহরে এইরকম হামেশা হয়।'

ফেলুদার দেখাদেখি আমরাও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহনবাবুর পকেটে এত টাকা বলেই বোধ হয় রহস্যজনক ফোনের ব্যাপারটা ওঁকে ততটা ভাবাল না। বেশি নিশ্চিন্তভাবেই ভদ্রলোক পরের কথাটা বললেন মিঃ

গোরেকে।

'আমরা আজ পুলকবাবুর ফিলিম দেখতে যাচ্ছি লোটাসে।'

'হাঁ, হাঁ যাবেন বৈকি। ভেরি গুড ডিরেক্টার পুলকবাবু। জেট বাহাদুর ভি বকস অফিস হিট হোগা জরুর।'

দরজার মুখ পর্যন্ত এলেন মিঃ গোরে। 'ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট লাঞ্চ টুমরো। ট্রানসপোর্ট আছে তো আপনাদের সঙ্গে?'

আমরা আশ্বাস দিলাম যে সকাল থেকে রাত অবধি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পুলকবাবু।

বাইরে বেরিয়ে এসে লিফ্‌টের বোতাম টিপে ফেলুদা বলল, 'মানি কাকে বলে দেখলেন তো, লালমোহনবাবু?'

'দেখলাম কি মশাই, তার খানিকটা তো আমার পকেটেই রয়েছে।'

'নস্যি, নস্যি। লাখ টাকাও এদের কাছে নস্যি। টাকাটা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিল না সেটা দেখলেন তো? তার মানে আপনার পকেটটা কালো হয়ে গেছে কিন্তু। অর্থাৎ এই আপনার অন্ধকারে পদার্পণ শুরু।'

ঘড়াং শব্দে লিফটটা উপরের কোনো ফ্লোর থেকে নেমে এসে আমাদের সামনে থামল।

'সে আপনি যাই বলুন ফেলুবাবু, পকেটে টাকা এলে তা সে কালোই হোক, আর—'

ফেলুদা লিফটে ঢোকার জন্য দরজা খুলেছিল, আর তার ফলেই জটায়ুর কথা বন্ধ।

লিফটের ভিতর থেকে এক ঝলক উগ্র গন্ধ। গুলবাহার সেন্ট। এ গন্ধ আমরা তিনজনেই চিনি, বিশেষ করে লালমোহনবাবু।

ঢিপ্ ঢিপ বুকে ফেলুদার পিছন পিছন লিফটে ঢুকে গেলাম।

আমি একটা কথা বলতে পারলাম না।

'গুলবাহার সেন্ট মিঃ সান্যাল ছাড়াও ভারতবর্ষের অনেকেই নিশ্চয়ই ব্যবহার করে।'

ফেলুদা কথাটার জবাবের বদলে গম্ভীরভাবে সতের নম্বর বোতাম টিপল। আমরা আরো পাঁচতলা ওপরে উঠে গেলাম।

অন্যান্য তলার মতোই সতেরো নম্বরেও তিনখানা ঘর। বাঁ দিকের দরজায় লেখা এইচ হেকরথ। ফেলুদা বলল, জার্মান নাম। ডান দিকের দরজায় লেখা এন সি মানসুখানি। নির্ঘাত সিন্ধি নাম। মাঝখানের দরজায় কোনো নাম নেই।

'ফ্ল্যাট খালি', বললেন লালমোহনবাবু।

'নাও হতে পারে', বলল ফেলুদা। 'সবাই দরজায় নাম লাগায় না। ইন

ফ্যাক্ট, আমার বিশ্বাস এ ফ্ল্যাটে লোক রয়েছে।'

আমরা দু'জনেই ফেলুদার দিকে চাইলাম।

'যে কলিং বেলের বোতাম ব্যবহার হয় না, তাতে ধুলো জমে থাকা উচিত। অথচ এটা ভালো করে কাছ থেকে দেখুন, আর অন্য দুটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।'

কাছে গিয়ে দেখেই বুঝলাম, ফেলুদা ঠিক বলেছে। দিব্যি চকচক করছে বোতাম, ধুলোর লেশমাত্র নেই।

'টিপবেন নাকি ?' কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা অবিশ্যি বোতাম টিপল না। তার বদলে যেটা করল, সেটা আরো অনেক বেশি তাজ্জব ব্যাপার।—মাটিতে উপুড় হয়ে সটান শুয়ে নাকটা লাগিয়ে দিল দরজার নীচে আধ ইঞ্চি ফাঁকটাতে। তারপর বার দুয়েক জোরে নিশ্বাস টেনে উঠে পড়ে বলল, 'কড়া কফির গন্ধ।'

তারপর যেটা করল, সেটাও অদ্ভুত। লিফট ব্যবহার না করে আঠারোতলা থেকে সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করল। প্রত্যেক তলাতেই থেমে প্রায় আধ মিনিট ধরে ঘুরে ঘুরে কী যে দেখল তা ওই জানে।

সব সেরে নীচে যখন নামলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ।

বেশ বুঝতে পারছি যে বম্বে এসে আমরা একটা প্যাঁচালো রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি।

॥ ৭ ॥

'আপনাকে একটু জেরা করলে আপনার আপত্তি হবে না আশা করি।'

কথাটা বলল ফেলুদা, লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করে। মিনিট দশেক হল শিবাজী কাস্‌ল থেকে ফিরেছি—রিসেপশনে খবর পেয়েছি যে এই আধ ঘন্টা আগে—তার মানে যখন আমরা শিবাজী কাসলের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তখন—লালমোহনবাবুর একটা ফোন এসেছিল ; কে করেছিল তা জানা নেই।

'আসলে পুলকই বারবার করছে', বললেন লালমোহনবাবু। 'পুলক ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।'

এখন আমাদের ঘরে বসে ফেলুদার প্রশ্নটা শুনে লালমোহনবাবু বললেন, 'পুলিশের জেরাতেই যখন ফ্লাইং কালারসে বেরিয়ে এলুম, তখন আর আপনার জেরায় কী আপত্তি থাকতে পারে ?'

'আচ্ছা, মিঃ সান্যালের প্রথম নামটা তো আপনার জানা নেই।'

'না মশাই, ওটা জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

'লোকটার একটা পরিষ্কার বর্ণনা দিন তো। আপনার বইয়ে যেরকম আধাখেঁচড়া বর্ণনা থাকে সেরকম নয়।'

লালমোহনবাবু গলা খাঁকরিয়ে ভুরু কুঁচকোলেন।

'হাইট...এই ধরুন গিয়ে—'

'আপনি কি একটা মানুষের হাইটটাই প্রথম দেখেন?'

'তা তেমন তেমন লম্বা বা বেঁটে হলে—'

'ইনি কি খুব লম্বা?'

'তা অবিশ্যি না।'

'খুব বেঁটে?'

'না, তাও অবিশ্যি না।'

'তাহলে হাইট পরে। আগে মুখ বলুন।'

'সন্ধ্যাবেলায় দেখেছি; আমার বাইরের ঘরের বাল্‌বটা আবার চল্লিশ পাওয়ারের।'

'তাও বলুন।'

'চওড়া মুখ। চোখ, আপনার—ইয়ে, চোখে চশমা; দাড়ি আছে, চাপ দাড়ি, গোঁফ আছে—দাড়ির সঙ্গে জোড়া—'

'ফ্রেঞ্চকাট?'

'এই সেরেছে। না, তা বোধহয় না। ঝুলপির সঙ্গেও জোড়া।'

'তারপর?'

'কাঁচাপাকা মেশানো চুল। ডান দিকে—না না, বাঁ দিকে সিঁথি।'

'দাঁত?'

'পরিষ্কার। ফল্‌স-টীথ বলে তো মনে হল না।'

'গলার স্বর?'

'মাঝারি। মানে, মোটাও না সরুও না।'

'হাইট?'

'মাঝারি।'

'ভদ্রলোক আপনাকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন না? বন্ধের? বলেছিলেন অসুবিধা হলে একে ফোন করবেন—বেশ হেল্‌পফুল?'

'দেখেছেন! বেমালুম ভুলে গেসলুম! আজ যখন পুলিশ জেরা করল তখনো বলতে ভুলে গেলুম।'

'আমাকে বললেই চলবে।'

'দাঁড়ান, দেখি।'

লালমোহনবাবু মানিব্যাগ থেকে একটা ভাঁজকরা নীল কাগজ বার করে

ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা সেটা খুব মন দিয়ে দেখল, কারণ লেখাটা মিঃ সান্যালের নিজের। তারপর কাগজটা আবার ভাঁজ করে নিজের ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বলল।

'তোপশে, নম্বরটা চা তো—টু ফাইভ থ্রি ফোর ওয়ান এইট।'

আমি অপারেটরকে নম্বর দিয়ে দিলাম। ফেলুদা ইংরাজিতেই কথা বলল।

'হ্যালো, মিস্টার দেশাই আছেন ?'

আচ্ছা ফ্যাসাদ। এই নম্বরে মিঃ দেশাই বলে কেউ নাকি থাকেই না। যিনি থাকেন তাঁর পদবী পারেখ, আর গত দশ বছর তিনি এই নম্বরেই আছেন।

'লালমোহনবাবু', ফেলুদা ফোনটা রেখে বলল, 'সান্যালকে আপনাব নেকসট গল্প বিক্রি করার আশা ছাড়ুন। লোকটি অত্যন্ত গোলমেলে এবং আমার বিশ্বাস আপনি যে প্যাকেটটি বয়ে আনলেন সেটিও অত্যন্ত গোলমেলে।'

লালমোহনবাবু মাথা চুলকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সত্যি বলতে কি মশাই, লোকটিকে আমারও কেন জানি বিশেষ সুবিধের বলে মনে হয়নি।'

ফেলুদা হুমকি দিয়ে উঠল।

'আপনার ওই কেন জানি কথাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। কেন সেটা জানতে হবে, বলতে হবে। চেষ্টা করে দেখুন তো পারেন কিনা।'

লালমোহনবাবুর অবিশ্যি ফেলুদার কাছে ধমক খাওয়াব অভ্যেস আছে। এটাও জানি যে উনি সেটা মাইন্ড করেন না, কারণ ধমক খেয়ে খেয়ে ওঁর লেখা যে অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে, সেটা উনি নিজেই স্বীকার করেন।

লালমোহনবাবু সোজা হয়ে বসলেন। 'এক নম্বর, লোকটা সোজাসুজি মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। দুই নম্বর, সব কথা অত গলা নামিয়ে বলার কী দরকার তাও জানি না। যেন কোনো গোপন পরামর্শ করতে এসেছেন। তিন নম্বর...'

দুঃখের বিষয়, তিন নম্বরটা যে কী সেটা লালমোহনবাবু অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না।

সাড়ে ছ'টায় লোটাসে ইভনিং শো, তাই আমরা ছ'টা নাগাদ উঠে পড়লাম। আমরা মানে আমি আব লালমোহনবাবু। ফেলুদা বলল যাবে না, কাজ আছে। ব্যাগের ভিতর থেকে ওর সবুজ নোটবইটা বেরিয়ে এসেছে, তাই কাজটা যে কী সেটা বুঝতে বাকি রইল না।

ওয়রলিতে ফিরে যেতে হল আমাদের, কেননা সেখানেই লোটাস সিনেমা। লালমোহনবাবুর বেশ নার্ভাস অবস্থা ; পুলকবাবু কেমন পরিচালক সেটা 'তীরন্দাজ' ছবি দেখেই মালুম হবে। বললেন, 'তিনটে ছবি যখন পর পর হিট করেছে, তখন একেবারে কি আর ওয়্যাক-থু হবে ? কী বল, তপেশ ?'

আমি আর কী বলব ? আমি নিজেও তো ঠিক ওই কথাটা ভেবেই মনে জোর আনছি।

পুলকবাবু ম্যানেজারকে বলতে ভোলেননি ; রয়েল সার্কলে তিনটে সীট আমাদের জন্য রাখা ছিল। এটা ছবির রিপিট শো, তাই হলে এমনিতেই অনেক সীট খালি ছিল।

ইন্টারভ্যালের আগেই বুঝতে পারলাম যে 'তীরন্দাজ' হচ্ছে একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট কোডোপাইবিন-মার্কা ছবি। এর মধ্যেই অন্ধকারে বেশ কয়েকবার আমরা দু'জনে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি। হাসি পাচ্ছিল, আবার সেই সঙ্গে জেট বাহাদুরের কী অবস্থা হবে আর তার ফলে জটায়ুর কী অবস্থা হবে সেটা ভেবে কষ্টও হচ্ছিল। ইন্টারভ্যালে বাতি জ্বললে পর লালমোহনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'গড়পারের ছেলে—তুই অ্যাদ্দিন এই করে চুল পাকালি ?' তাবপর একটা গ্যাপ দিয়ে আমার দিকে ফিবে বললেন, 'ফি পুজোয় পাড়ায় একটা করে থিয়েটার করত ; যদ্দূর মনে পড়ছে বি কম ফেল ;—তার কাছ থেকে আর কী আশা করা যায় বল তো ?'

ইন্টারভ্যালের শেষে বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ভয় ছিল, পুলকবাবু বা তার দলের কেউ যদি বাইরে থাকে ; কিন্তু সেরকম কাউকে দেখলাম না।

'যদি জিজ্ঞেস করে তো বলে দেব ফার্স্ট ক্লাস। পকেটে করকরে নোটগুলো না থাকলে মনটা সত্যিই ভেঙে যেত, তপেশ।'

গাড়িটা হাউসের সামনেই উল্টোদিকের ফুটপাতে পার্ক করা ছিল। লালমোহনবাবু সেদিকে না গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে এক ঠোঙা ডালমোট, দু' প্যাকেট মাংঘারামের বিস্কুট, ছ'টা কমলালেবু আর এক প্যাকেট প্যারির লজঞ্চুস কিনে নিলেন। বললেন, হোটেলের ঘরে বসে বসে হঠাৎ হঠাৎ খিদে পায়, তখন এগুলো কাজে দেবে।

দু'জনে দুহাত বোঝাই প্যাকেট নিয়ে গাড়িতে উঠলাম, আর উঠেই বাঁই করে মাথাটা ঘুরে গেল।

গাড়ির ভিতর গুলবাহার সেন্টের গন্ধ।

আসার সময় ছিল না ; এই দেড় ঘন্টার মধ্যে হয়েছে।

'মাথা ঝিম ঝিম করছে, তপেশ', বললেন লালমোহনবাবু। 'এ ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই না। সান্যাল খুন হয়েছে, আর তার সেন্টমাখা ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপেছে।'

আমার মনে হল—ঘাড়ে নয়, গাড়িতে চেপেছে ; কিন্তু সেটা আর বললাম না।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, সে বেশিরভাগ সময় গাড়িতেই ছিল, কেবল মিনিট পাঁচেকের জন্য কাছেই একটা রেডিও-টেলিভিশনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল খিলে হ্যয় গুলশন গুলশন দেখেছে। হ্যাঁ, গন্ধ সেও পাচ্ছে বৈকি, কিন্তু গাড়ির ভিতরে কী করে এমন গন্ধ হয় সেটা কিছুতেই তার মগজে ঢুকছে না। ব্যাপারটা তার কাছেও একেবারেই আজব।

হোটেলে ফিরে এসে কথাটা ফেলুদাকে বলতে ও বলল, 'রহস্য যখন জাল বিস্তার করে, তখন এইভাবেই করে, লালমোহনবাবু। এ না হলে জাত-রহস্য হয় না, আর তা না হলে ফেলু মিত্তিরের মস্তিষ্কপুষ্টি হয় না।'

'কিন্তু—'

'আমি জানি আপনি কী প্রশ্ন করবেন, লালমোহনবাবু। না, কিনারা এখনো হয়নি। এখন শুধু জালের ক্যারেকটারটা বোঝার চেষ্টা করছি।'

'তুমি বেরিয়েছিলে বলে মনে হচ্ছে?'—আমি ধাঁ করে একটা গোয়েন্দা-মার্কা প্রশ্ন করে বসলাম।

'সাবাস, তোপশে। তবে হোটেল থেকে বেরোইনি। এটা নীচে রিসেপশনেই দিল।'

ফেলুদার পাশে একটা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের টাইমটেবল ছিল, সেটা দেখেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম।

'দেখেছিলাম কাঠমাণ্ডু থেকে ক'টা ফ্লাইট কলকাতায় আসে, আর কখন আসে।'

কাঠমাণ্ডু বলতেই একটা জিনিস ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করার কথা মনে পড়ে গেল।

'আচ্ছা, ইনস্পেক্টর পটবর্ধন যে নানাসাহেবের কথা বলেছিলেন, সেটা কোন্ নানাসাহেব?'

'ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নানাসাহেবই বিখ্যাত।'

'যিনি সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়েছিলেন?'

'লড়েওছিলেন, আবার তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েও ছিলেন। হাজির হয়েছিলেন গিয়ে একেবারে কাঠমাণ্ডু। সঙ্গে ছিল মহামূল্য ধনরত্ন—ইনক্লুডিং হীরে আর মুক্তোয় গাঁথা একটি হার—যার নাম নওলাখা। সেই হার শেষ পর্যন্ত চলে যায় নেপালের জং বাহাদুরের কাছে। তার পরিবর্তে জং বাহাদুর দুটি গ্রাম দিয়েছিলেন নানাসাহেবের স্ত্রী কাশীবাঈকে।'

'এই হার কি নেপাল থেকে চুরি হয়ে গেছে নাকি?'

'পটবর্ধনের কথা শুনে তো তাই মনে হয়।'

'আমি কি ওই হারই পাচার করে বসলুম নকি মশাই ?' লালমোহনবাবু তারস্বরে চেঁচিয়ে প্রশ্নটা করলেন। 'ফেলুদা বলল, 'ভেবে দেখুন। ইতিহাসে হীরের অক্ষরে লেখা থাকবে আপনার নাম।'

'কিন্তু...কিন্তু... সে তো তাহলে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। সে জিনিস দেশ থেকে বাইরে যায় কি না যায় সে তো দেখবে পুলিশ। আপনি কী নিয়ে এত ভাবছেন ? আপনি নিজেই কি এই স্মাগলারদের—'

ঠিক এই সময়ই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আর লালমোহনবাবুর দিকেই ওটা ছিল বলে উনি তুলে নিলেন।

'হ্যালো—হ্যাঁ, মানে ইয়েস—স্পিকিং।

লালমোহনবাবুরই ফোন। বোধ হয় পুলকবাবু। না, পুলকবাবু না। পুলকবাবু এমন কিছু বলতে পারেন না যাতে লালমোহনবাবুর মুখ অতটা হাঁ হয়ে যাবে, আর টেলিফোনটা কাঁপতে কাঁপতে কান থেকে পিছিয়ে আসবে।

ফেলুদা ভদ্রলোকের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে একবার কানে দিয়ে বোধহয় কিছু না শুনতে পেয়েই সেটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'সান্যাল কি ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতেও যেন কষ্ট হল ভদ্রলোকের। বুঝলাম মাসলগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে না।

'কী বলল ?' আবার ফেলুদা।

'বলল—' লালমোহনবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে মনে সাহস আনার চেষ্টা করলেন। 'বলল—মু-মুখ খুললে পেপ-পেট ফাঁক করে দেবে।'

'যাক্—ভালো কথা।'

'অ্যাঁ !'—বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন লালমোহনবাবু। আমার কাছেও এই অবস্থায় ফেলুদার হাঁপ ছাড়াটা বেয়াড়া বলে মনে হচ্ছিল। ফেলুদা বলল, 'শুধু গুলবাহারের গন্ধে হচ্ছিল না। ক্লু হিসেবে ওটা বড্ড পল্‌কা। এমন-কি লোকটা সত্যি করে বম্বে এসেছে না অন্য কেউ সেন্টটা ব্যবহার করছে, সেটাও বোঝা যাচ্ছিল না। এখন অন্তত শিওর হওয়া গেল।'

'কিন্তু আমার পেছনে লাগা কেন ?'

মরিয়া হয়ে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

'সেটা জানলে তো বাজিমাত হয়ে যেত, লালমোহনবাবু। সেটা জানার জন্য একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

॥ ৮ ॥

লালমোহনবাবু ডিনারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না, কারণ ওঁর নাকি একদম খিদে নেই। ফেলুদা বলল তাতে কিছু এসে যাবে না, কারণ দুপুরে কপার চিমনিতে পেট পুজোটা ভালোই হয়েছে। সত্যি বলতে কি, আমাদের মধ্যে লালমোহনবাবুই সবচেয়ে বেশি খেয়েছিলেন।

খাওয়ার পর গতকাল তিনজনেই বেরিয়ে গিয়ে পান কিনেছিলাম। আজ লালমোহনবাবু কিছুতেই বেরোতে চাইলেন না। বললেন, 'ওই ভিড়ের মধ্যে কে যাচ্ছে মশাই? সান্যালের লোক নির্ঘাত হোটেলে ওয়াচ করছে, বেরোলেই চাকু।'

শেষ পর্যন্ত ফেলুদাই বেরোল, লালমোহনবাবু আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে বসে রইলেন, আর বারবার খালি বলতে লাগলেন, 'কী কুক্ষণেই বইয়ের প্যাকেটটা নিয়েছিলাম।' ক্রমে বর্তমান সংকটের মূল কারণ খুঁজতে খুঁজতে 'কী কুক্ষণেই হিন্দী ছবির জন্য গল্প লিখেছিলাম', আর সব শেষে 'কী কুক্ষণেই রহস্য উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম' পর্যন্ত চলে গেলেন।

'আপনার একা শুতে ভয় করবে না তো?' ফেলুদা পান বিলি করে জিজ্ঞেস করল। লালমোহনবাবু কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না দেখে ফেলুদা আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমাদের ঘর থেকে বেরিয়েই প্যাসেজের ধারে একটা ছোট্ট ঘর আছে দেখেছেন তো? ওখানে সব সময় বেয়ারা থাকে। হোটেলে সারারাত কেউ না কেউ জেগে থাকে। এ তো আর শিবাজী কাসল না।'

শিবাজী কাসল নামটা শুনে লালমোহনবাবু আরেকবার শিউরে উঠলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে সাহস এনে দশটা নাগাদ গুড্‌নাইট করে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সারাদিন বম্বে চষে বেড়ানোর চেয়েও পুলকবাবুর ছবির অর্ধেক দেখে অনেক বেশি কাহিল লাগছিল, তাই জটায়ু চলে যাবার মিনিট দশেকের মধ্যেই শুয়ে পড়লাম। ফেলুদা যে এখন শোবে না সেটা জানি। ওর নোটবুকটা খাটের পাশেই টেবিলের উপর রাখা রয়েছে, সারাদিন খেপে খেপে তাতে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, হয়তো আরো কিছু লেখা হবে।

আমি অনেকদিন চেষ্টা করেছি রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে খেয়াল রাখতে ঠিক কোন সময় ঘুমটা আসে, কিন্তু প্রতিবারই পরদিন সকালে উঠে বুঝেছি ঘুমটা কখন জানি আমার অজানতেই এসে গেছে। আজও কখন ঘুমিয়েছি সেটা টের পাইনি। ঘুমটা ভাঙল দরজায় ঘন ঘন ধাক্কা, আর সেই সঙ্গে বোতাম টেপার চ্যাঁ শব্দে। উঠে দেখি ফেলুদার ল্যাম্প তখনো জ্বলছে আর বালিশের পাশে রাখা

আমার ঘড়িতে বলছে পৌনে একটা। ফেলুদা দরজা খুলতেই হুমড়ি দিয়ে প্রবেশ করলেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু হাঁপালেও তিনি যে খুব ভয় পেয়েছেন সেটা কিন্তু মনে হল না, আর যে-কথাটা বললেন ঘরে ঢুকেই, সেটাও ভয়ের কথা নয়।

'কেলেঙ্কারিয়াস ব্যাপার মশাই!'

'আগে খাটে এসে বসুন', বলল ফেলুদা।

'দূর মশাই, বসব কি—এই দেখুন—কাঠমাণ্ডুর কী মহামূল্য ধনরত্ন আমার হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছিল।'

লালমোহনবাবু ফেলুদার সামনে যেটা এগিয়ে ধরলেন সেটা একটা বই। ইংরিজি বই, আর নামকরা বই; ল্যান্সডাউনের মোড়ের দোকানে একটা রাখা ছিল সেদিনও দেখেছি। বইটা হল শ্রীঅরবিন্দের লেখা দ্য লাইফ ডিভাইন।

ফেলুদারও চোখ কপালে উঠে গেছে।

'তার উপর আবার বাঁধাইয়ের গণ্ডগোল', বললেন লালমোহনবাবু। 'প্রথম ত্রিশ পাতার পর কয়েকটা পাতা পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে। এ বই না দেখে কিনলে তো পুরো টাকাটা ডেড লস মশাই। পণ্ডিচেরীর বাইন্ডার এরকম কাঁচা কাজ করবে ভাবতে পারেন?'

'তাহলে সেদিন কী দিলেন লালশার্টের হাতে?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'জানেন কী দিলুম, ভাবতে পারেন? আমার নিজের বই মশাই, নিজের বই!—বোম্বাইয়ের বোম্বেটে। পুলককে তো পাণ্ডুলিপির কপি পাঠিয়েছিলুম, তাই এবার ভাবলুম এক কপি ছাপা বই দেব—উইথ মাই ব্লেসিংস অ্যান্ড মাই অটোগ্রাফ। আরো তিন কপি রয়েছে এখনো আমার ব্যাগে, প্রত্যেকটি ব্রাউন কাগজে মোড়া। আমার ভক্ত তো সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে রয়েছে—তাই ভাবলুম, বম্বে যাচ্ছি, যদি এক-আধজনের সঙ্গে আলাপটালাপ হয়ে যায়, তাই সঙ্গে এনেছিলুম, আর তারই কপি—হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!'

এত হালকা লালমোহনবাবুকে অনেকদিন দেখিনি।

বইটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে ফেলুদা বলল, 'কিন্তু সান্যাল যে টেলিফোনে হুমকি দিল সেটা কী ব্যাপার? এর সঙ্গে লাইফ ডিভাইন খাপ খাচ্ছে কি?'

লালমোহনবাবু এতেও দমলেন না।

'কে বলল সান্যাল? টেলিফোনে অত গলা চেনা যায় নাকি? কোনো উটকো বদমাস রসিকতা করছে হয়তো। বোম্বাইতে যদি তীরন্দাজ ছবি হিট হতে পারে তো সবই হতে পারে।'

'আর গাড়িতে গুলবাহার সেন্ট?'

'ওটা ওই ড্রাইভারই মাখে। কীরকম টেরির বাহার দেখেছেন? শৌখিন

লোক। ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে স্বীকার করলে না।'

'তাহলে আর কী, নিশ্চিন্তে ঘুমোন গিয়ে।'

'সে আর বলতে। মাথাটা ধরেছিল বলে ব্যাগটা খুলেছিলুম কোডোপাইরিনের জন্য, আর তাতেই এই হাই-ভোল্টেজ আবিষ্কার। যাক, রহস্য যখন মিটেই গেল, তখন আপনিও বরং একটু আধ্যাত্মিক বিষয় অধ্যয়নে মনোনিবেশ করুন। বইটা রেখে গেলুম। গুড নাইট।'

লালমোহনবাবু চলে গেলেন, আর আমিও আবার জায়গায় এসে শুলাম।

'যে লোক অরবিন্দের বইয়ের বদলে জটায়ুর বই পেল তার মনের অবস্থা কী হবে, ফেলুদা?'

'খেপচুরিয়াস', বালিশে মাথা দিয়ে বলল ফেলুদা। মাথার পিছনের বাতিটা ও জ্বালিয়েই রাখল। দেখে হাসি পেল ফেলুদা তার সবুজ নোটবই সরিয়ে রেখে অরবিন্দের লাইফ ডিভাইনের পাতা ওলটাল।

আমার বিশ্বাস ঠিক ওই সময়টাতেই আমার চোখ ঘুমে বন্ধ হল।

॥ ৯ ॥

বম্বে থেকে পুনা যাবার পথে খাণ্ডালা আর লোনাউলির মাঝামাঝি একটা লেভেল ক্রসিং-এর কাছে আমাদের যেতে হবে শুটিং দেখতে। ছবির এগারোটা ক্লাইম্যাক্সের শেষ ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য তোলা হবে আজ। একদিনে কাজ শেষ হবে না, পর পর আরো চারদিন যেতে হবে সবাইকে। আমরা ঠিক করেছি আজ যদি ভালো লাগে তাহলে বাকি ক'দিনও যাব। ট্রেনটা এই পাঁচদিনই পাওয়া যাবে, প্রতিদিনই ঠিক একটা থেকে দুটো—অর্থাৎ এক ঘন্টার জন্য। ডাকাতদলের ঘোড়া আর হিরোর লিংকন কনভারটিবল থাকবে সারাদিনের জন্য। ভিলেন ইঞ্জিন ড্রাইভারের জায়গা দখল করে ট্রেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই ট্রেনেরই একটা কামরায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে হিরোইন আর তার কাকা। মোটরে করে হিরো ট্রেনের উদ্দেশে ধাওয়া করছে। এদিকে হিরোর যে যমজ ভাই—যাকে ছেলেবেলায় ডাকাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর যে, এখন নিজেই ডাকাত—সে আসছে ঘোড়া করে দলবল নিয়ে ট্রেনটাকে অ্যাটাক করবে বলে। মোটরে হিরো এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাকাত ভাই ঘোড়া থেকে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে পড়ে। এঞ্জিনের ভিতর ফাইট হয়, ভিলেন-ড্রাইভার খতম হয়। সেই সময় মোটরে করে হিরো এসে পড়ে, আর তারপর...বাকি অংশ রূপালী পর্দায় দেখিবেন। আসলে শেষটা নাকি তিনরকম ভাবে তোলা হবে, তারপর পর্দায় যেটা বেশি ভালো লাগে সেটা রাখা হবে।

পুলকবাবু সকালে তিন মিনিটের জন্য ঢুঁ মেরে গেছেন। আমাদের ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক জেনে বললেন, 'লালুদা, আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি তীরন্দাজ আপনার খুব ভালো লেগেছে।'

আসলে লালমোহনবাবু সকাল থেকেই রাত্তিরের ঘটনাটা ভেবে ক্ষণে ক্ষণে আপন মনে হেসে ফেলছিলেন; পুলকবাবুর সামনে সেই হাসিটাই বেরিয়ে পড়েছিল। এখন পুলকবাবুর কথা শুনে আরো জোরে হেসে বললেন, 'ওঃ—গড়াপারের ছেলে—তুমি দ্যাখালে ভাই—হ্যাঃ।'

ফিরতে রাত হবে, তাই ফেলুদা বলল হাত-ব্যাগগুলো সঙ্গে নিয়ে নিতে। কালকের কেনা কমলালেবু, বিস্কুট, লজঞ্চুস ইত্যাদি তিন ব্যাগে ভাগ করে দেওয়া হল, আর লালমোহনবাবুর ক্যাশ দশ হাজার টাকা ম্যানেজারের জিম্মায় সিন্দুকে রেখে রসিদ নিয়ে নেওয়া হল। 'কী জানি বাবা', ভদ্রলোক বললেন, 'ফিলিমের ডাকাতের দলে আসল ডাকাতও যে ঢুকে পড়বে না এক-আধটা তার কী গ্যারান্টি?'

ফেলুদা সকালে একবার বেরিয়েছিল, বলল ওর সিগারেটের স্টক নাকি ফুরিয়েছে, যেখানে যাচ্ছি সেখানে কাছাকাছির মধ্যে নাও পাওয়া যেতে পারে। ও ফেরার দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। আজও দেখলাম গাড়িতে গুলবাহারের গন্ধ কিছুটা রয়ে গেছে।

বম্বে থেকে থানা স্টেশন প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার। সেখান থেকে রাস্তা ডাইনে ঘুরে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে পুনার দিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় আশি কিলোমিটার গেলেই খাণ্ডালা। আজ দিনটা ভালো, আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ হাওয়ার তেজে তরতর করে ভেসে চলেছে, তার ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে রোদ বেরিয়ে বোম্বাই শহরটাকে বার বার ধুয়ে দিচ্ছে। পুলকবাবু বলে গেছেন শুটিং-এর জন্য এটা নাকি আইডিয়াল ওয়েদর। লালমোহনবাবুর অবিশ্যি আজকে সব কিছুই ভালো লাগছে। খালি খালি বললেন, 'বিলেত যাবার আশ মিটে গেল মশাই। বাসে লোক ঝুলছে না সেটা লক্ষ করেছেন? ওঃ—কী সিভিক সেন্স এদের!'

থানা পৌঁছতে লাগল প্রায় এক ঘন্টা। এখন সোয়া ন'টা। হাতে সময় আছে, তাই আমরা তিনজন আর ড্রাইভার স্বরূপলাল একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে এলাচ দেওয়া চা খেয়ে নিলাম।

থানা ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাটস-এর পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলেছি। ট্রেন লাইন আর এখন আমাদের পাশে নেই; সেটা থানার পরেই উত্তরে ঘুরে চলে গেছে কল্যাণ। কল্যাণ থেকে আবার দক্ষিণে ঘুরে সেটা মাথেরান হয়ে যাবে পুনা, মাঝপথে পড়বে আমাদের লেভেল

ক্রসিং।

পথে লালমোহনবাবুর গলায় কমলালেবুর বিচি আটকে গিয়ে বিষম লাগা ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। ফেলুদার মনের অবস্থা কী সেটা ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না। ও গম্ভীর মানেই যে চিন্তিত, সেটা ফেলুদার বেলায় খাটে না এ আমি আগেও দেখেছি।

সাড়ে বারোটা নাগাদ খাণ্ডালা ছাড়িয়ে মাইলখানেক যেতেই সামনে দূরে রাস্তার ধারে একটা জায়গায় মনে হল যেন মেলা বসেছে। তারপর মনে হল মেলায় এত গাড়ি থাকবে কেন ? আরো কাছে যেতে গাড়ি আর মানুষ ছাড়া আরেকটা জিনিস চোখে পড়ল, সে হচ্ছে ঘোড়া। এবারে বুঝলাম ভিড়টা আসলে হচ্ছে জেট বাহাদুরের শুটিং-এর দল। সব মিলিয়ে অন্তত শ'খানেক লোক, বাক্সপ্যাটরা ক্যামেরা আলো রিফ্লেক্টর সতরঞ্চি—সে এক এলাহি ব্যাপার।

আমাদের গাড়িটা একটা অ্যাম্বাসাডার আর একটা বাসের মাঝখানে একটা ফাঁক পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে থেমে গেল। আমরা নামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলকবাবু এগিয়ে এলেন—তাঁর মাথায় একটা সাদা ক্যাপ আর গলায় ঝোলানো একটা দূরবীনের মতো যন্ত্র।

'গুড মর্নিং। সব ঠিক হ্যায় ?'

আমরা তিনজনেই মাথা নেড়ে ইয়েস জানিয়ে দিলাম।

'শুনুন—মিস্টার গোরের ইনস্ট্রাকশন—উনি মাথেরানে আছেন যেখান থেকে ট্রেন আসছে। রেল কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা আছে; কিছু পেমেন্টও আছে বোধহয়। উনি ট্রেনের সঙ্গেই চলে আসবেন, অথবা মোটরে করে আসবেন। আপনারা ট্রেনটা এলেই খবর পেয়ে যাবেন। মোট কথা, উনি আসুন বা না আসুন, আপনারা ফার্স্ট ক্লাসে উঠে পড়বেন। অল ক্লিয়ার ?'

'অল ক্লিয়ার', বলল ফেলুদা।

বোম্বায়ের ফিল্ম লাইনে যে এত বাঙালী কাজ করে এটা আমার ধারণা ছিল না। তার মধ্যে কেউ কেউ যে ফেলুদাকে চিনে ফেলবে তাতে আর আশ্চর্য কী ? ক্যামেরাম্যান দাশু ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হতেই তার চোখ কুঁচকে গেল।

'মিত্তির ? আপনি কি ডিটেক—?'

'ধরেছেন ঠিক, কিন্তু চেপে রাখুন', বলল ফেলুদা।

'কেন মশাই ? আপনি তো আমাদের প্রাইড। সেবারের এলোরার মূর্তি চুরির ব্যাপারটা—'

ফেলুদা আবার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ভদ্রলোককে থামাল।

দাশুবাবু এবার গলা নামিয়ে বললেন, 'আবার কোনো তদন্ত-টদন্ত করছেন

নাকি এখানে ?'

'আজ্ঞে না', ফেলুদা বলল, 'স্রেফ বেড়াতে এসেছি আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে।'

দাশু ঘোষ একুশ বছর বম্বেতে থেকেও নিয়মিত বাঙলা উপন্যাস পড়েন, এমন-কি জটায়ুর বইও পড়েছেন দু'তিনটে। এ দৃশ্যে অবিশ্যি উনি ছাড়া আরো দু'জন ক্যামেরাম্যান কাজ করছেন; তাঁরা অবাঙালী। পুলকবাবুর চারজন অ্যাসিসট্যান্টের দু'জন বাঙালী। যাঁরা অ্যাকটিং করবেন তাঁদের মধ্যে অবিশ্যি কেউই বাঙালী নেই। অর্জুন মেরহোত্রা ছাড়া আজ আছেন ভিলেনবেশী মিকি। শুধু মিকি; পদবী ব্যবহার করেন না। বোম্বাইয়ের উঠতি ভিলেনের মধ্যে টপ, একসঙ্গে সাঁইত্রিশটা ছবি সই করেছেন, যদিও তার মধ্যে উনত্রিশটার গপ্পো চেঞ্জ করে ফাইটের সংখ্যা কমাতে হচ্ছে। ভাগ্যে জেট বাহাদুর-এ মাত্র চারটে ফাইট, না হলে পুলকবাবু, আর মিস্টার গোরেকেও মাথা চুলকোতে হত।

এসব খবর আমাদের দিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার সুদর্শন দাস। ইনি

উড়িষ্যার লোক, অনেকদিন বম্বেতে রয়েছেন, তবে এ ছবিটা হয়ে গেলেই নাকি কটক ফিরে গিয়ে নিজে ওড়িয়া ছবি পরিচালনা করবেন।

ফেলুদা ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে আরেকটা জটলার দিকে। সেখানে ডাকাতের দলকে মেক-আপ করে পোশাক পরানো হচ্ছে। একজন ডাকাতের সঙ্গে ফেলুদাকে দিব্যি বাৎচিৎ করতে দেখে একটু অবাক হয়েই এগিয়ে গেলাম। তারপর ডাকাতের গলা শুনে বুঝলাম—ওমা, এ যে কুং-ফু এক্সপার্ট ভিক্টব পেরুমল। হিরোর যমজ ভাইয়ের মেক-আপ করা হয়েছে তাকে। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনের ছাতে পড়তে হবে, তারপর ছ'টা কামরার ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে একেবারে এঞ্জিনে পৌঁছে ভিলেনবেশী মিকিকে ঘায়েল করতে হবে। তারপর হিরো আর তার বিশ-বছর-না-দেখা ডাকাত-বনে-যাওয়া ভাইয়ের মধ্যে হাই-ভোল্টেজ সংঘর্ষ।

লালমোহনবাবু এই এলাহি ব্যাপার দেখে কেমন জানি চুপ মেরে গেছেন, যদিও ভেবে দেখলে তাঁর ফুর্তি হবাব কথা, কারণ তাঁর গল্পকে ঘিরেই এত হৈ-হল্লা। বললেন, 'একটা গল্প লিখে এতগুলো লোককে এত হ্যাঙ্গাম এত পরিশ্রম এত খরচের মধ্যে ফেলিচি এটা ভাবতে একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছে, তপশে। এক এক সময় নিজেকে রীতিমতো শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার গিলটি মনে হচ্ছে ; আবার সেই সঙ্গে এও মনে হচ্ছে যে এবা লেখককে কোনো সম্মান দেয় না। ক'টা লোক এখানে জটায়ুর নাম জানে সেটা বলতে পার ?'

আমি সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, 'ছবি যদি হিট হয তাহলে নিশ্চয়ই জানবে।'

'আশা করি !'—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন লালমোহনবাবু।

যেসব ডাকাতের মেক-আপ হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটোছুটি আবম্ভ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো একটা বিশাল বটগাছের তলায় জড়ো হয়েছিল। গুনে দেখলাম সবসুদ্ধ ন'টা।

মিনিটখানেকের মধ্যেই নীল কাচ তোলা একটা প্রকাণ্ড সাদা লিংকন কনভারটিবল গাড়িতে হিরো আর ভিলেন এসে হাজির হল। হিরোইনের দরকার লাগবে না, কারণ ট্রেনের কামরায় বন্দী অবস্থায় তাব শটগুলো নাকি স্টুডিওতে তোলা হবে। সেটা এক হিসেবে ভালো। এই দুই পুরুষ তারকা গাড়ি থেকে নামতেই চারিদিকে যা সোরগোল পড়ে গেল, হিরোইন থাকলে না জানি কী হত।

সুদর্শনবাবু চা এনে দিয়েছিলেন. আমরা খাওয়া শেষ করে পেয়ালা ফেরত

দিচ্ছি এমন সময় বাজখাঁই গলায় লাউডস্পীকারের হাঁক শোনা গেল—'ট্রেন কামিং ! ট্রেন আতি হ্যায় ! এভরিবডি রেডি !'

॥ ১০ ॥

ঝুক ঝুক শব্দের সঙ্গে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আটটা বোগি সমেত পুরানো টাইপের এঞ্জিনটা যখন লেভেল ক্রসিং-এর কাছে এসে দাঁড়াল তখন ঘড়িতে ঠিক একটা বাজতে পাঁচ মিনিট। ফার্স্ট ক্লাস কামরা যে মাত্র একটাই, আর সেটাও যে পুরানো ধাঁচের, সেটা দূর থেকেই বুঝতে পারছি। অন্য কামরাগুলোতে মাথেরান থেকেই প্যাসেঞ্জার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সবরকমই আছে। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই পুলকবাবুর ব্যস্ততা একেবারে সপ্তমে চড়ে গেছে। তিনি একবার এ ক্যামেরা থেকে ও ক্যামেরায় ছুটে যাচ্ছেন, একবাব হিবো থেকে ভিলেন, একবাব এ অ্যাসিসট্যান্ট থেকে ও-অ্যাসিসট্যান্ট। লালমোহনবাবু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন, 'না মশাই, শুধু টাকা দিয়ে ছবি হয় না এটা বোঝা যাচ্ছে।'

হিরোর গাড়ি রেডি, কালো চশমা পরে স্টিযাবিং ধবে বসে আছে অর্জুন মেরহোত্রা, পাশে তার নিজের মেক-আপম্যান আব দু'জন ছোকবা টাইপের লোক, বোধহয় চামচা-টামচা হবে। অর্জুনের সামনে একটা হুডখোলা জীপে তেপায়া স্ট্যান্ডের উপর ক্যামেবাও রেডি। ভিক্টব সমেত ডাকাতেব দল ঘোড়ার পিঠে আগেই এগিয়ে গেছে। তারা চলন্ত ট্রেন থেকে সিগন্যাল পেলে একটা বিশেষ পাহাড়ের বিশেষ জায়গা থেকে নেমে এসে ট্রেনের পাশে পাশে দৌড় আরম্ভ করবে। ভিলেন মিকিকে দেখলাম পুলকবাবুর একজন সহকারীর সঙ্গে এঞ্জিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আমাদের কী করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ মিঃ গোরের দেখা নেই। তিনি ট্রেনেই এসেছেন কিনা সেটাও বুঝতে পারছি না।

ভিড় পাতলা হয়ে গেছে অথচ আমাদের দিকে কেউ আসছে না দেখে লালমোহনবাবুর উসখুসুনি আরম্ভ হয়ে গেল। বললেন; 'ও ফেলুবাবু, এরা কি ভুলে গেল নাকি আমাদের ?'

ফেলুদা বলল, 'একটিই মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা ; কথা মতো সেটাতে গিয়েই ওঠা উচিত আমাদের। দেখি আরো দু' মিনিট।'

দু' মিনিটের আগেই, এঞ্জিন থেকে দুটো হুইসল শোনা গেল, আর সেই মুহূর্তেই সুদর্শন দাশের হাঁক।

'এই যে, আপনারা চলে আসুন, চলে আসুন !'

আমরা হাতে ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিলাম। সুদর্শনবাবু আমাদের ফার্স্ট ক্লাসের দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। বললেন, 'আমি তো কিছুই জানতাম না। এইমাত্র একজন লোক এসে খবর দিল—বললে গোরে সাহেব আধঘন্টার মধ্যেই এসে পড়বেন। প্রথম শটের পর ট্রেন আবার এইখানেই ফিরে আসবে।'

কামরায় উঠে দেখি একটা বেঞ্চির উপর বড় জলের ফ্লাস্ক, আর সাফারি রেস্টোর‍্যান্টের নাম লেখা চারটে সাদা কাগজের বাক্স। অর্থাৎ আমাদের লাঞ্চ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও ভদ্রলোকের আশ্চর্য খেয়াল সেটা স্বীকার করতেই হবে।

আরেকটা হুইসলের সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা তিনজনে জানালা দিয়ে বাইরের কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্য তৈরি হলাম। একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা, তাই মনে একটা বেশ রোমাঞ্চ ভাব হচ্ছিল।

গাড়ি ক্রমশ স্পীড নিচ্ছে। ডান পাশ দিয়ে রাস্তা গেছে, সেদিকের বেঞ্চিতেই বসেছি আমরা তিনজন। বাঁদিকে পাহাড় পড়বে, অর্থাৎ সেটা হল ডাকাতের দিক। ডান দিকটা হিরোর দিক।

আরো একটু স্পীড বাড়ার পর ডান দিকের রাস্তা দিয়ে প্রথমে ক্যামেরা সমেত জীপ, তারপর হিরোর গাড়ি আসতে দেখা গেল। এখন অবিশ্যি হিরো ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। ক্যামেরার মুখটাও যে তার দিকেই ঘোরানো সেটা বুঝতে পারলাম। যিনি ছবি তুলছেন তিনি ছাড়া আরো তিনজন লোক রয়েছেন, তার মধ্যে একজন হল পুলকবাবুর অ্যাসিসট্যান্ট। সে হাতে একটা চোঙা নিয়ে তার ভিতর দিয়ে হিরোকে 'ডাইনে তাকাও' 'বাঁয়ে তাকাও' ইত্যাদি নির্দেশ দিচ্ছে।

আর দুটো ক্যামেরার একটার সঙ্গে পুলকবাবু রয়েছেন—সেটা রয়েছে ট্রেনেরই একটা কামরার ভিতর। তৃতীয় ক্যামেরাটা রয়েছে ট্রেনের পিছন দিকের শেষ কামরার ছাতে।

হিরো তেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছে না দেখে দমে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা বলল ওটা ছবিতে নাকি জোরেই মনে হবে, কারণ ক্যামেরার স্পীড কমিয়ে শটটা নেওয়া হচ্ছে।

'তাছাড়া যতটা আস্তে ভাবছিস ততটা আস্তে কিন্তু যাচ্ছে না গাড়িটা, কারণ আমাদের ট্রেনটাও তো চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, আর চলেছে বেশ জোরেই।'

ঠিক কথা। এটা আমার খেয়াল হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যামেরার আর হিরোর গাড়ি আমাদের কামরা ছাড়িয়ে চলে গেল। পুরানো কামরা, তাই জানালায় গরাদ নেই; গলা বাড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'জেট বাহাদুর ছবি দেখতে গিয়ে যদি পর্দায় দেখিস তুই গলা বাড়িয়ে শুটিং দেখছিস, সেটা কি খুব ভালো

হবে।'

লোভ সংবরণ করে উল্টো দিকের জানালার ধারে বসব বলে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়েছি, ঠিক সেই সময় নাকে গন্ধটা এল।

ফেলুদা দেখি আমার পাশে নেই। তার দৃষ্টি বাথরুমের দরজার দিকে, সে এক লাফে উল্টোদিকে চলে গেছে, তার ডান হাত কোটের পকেটে।

'বন্দুক বার করে লাভ নেই, মিস্টার মিত্তির। অলরেডি একটি রিভলভার আপনার দিকে পয়েন্ট করা রয়েছে।'

এবার দেখলাম পাহাড়ের দিকে দরজাটা খুলে গেল। একজন লোক হাতে একটা রিভলভার নিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল। একে কি দেখেছি আগে? হ্যাঁ—এইতো সেই লালশার্ট! কিন্তু আজ এর পোশাক অন্য, আর চেহারায় যে হিংস্র ভাব দেখছি সেটা সেদিন এয়ারপোর্টে দেখিনি। আজ এই অবস্থায় দেখে বুঝছি লোকটা একেবারে নিখাদ খুনে। তার হাতের রিভলভারটা তাগ করা রয়েছে সোজা ফেলুদার দিকে।

এবার বাথরুমের দরজাটা অল্প ফাঁক অবস্থা থেকে পুরো খুলে গেল, আর সেই সঙ্গে কামরাটা গুলবাহারের গন্ধে ভরে গেল।

'সান...সান...'

লালমোহনবাবুর শরীর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে।

'সান্যালই বটে', বললেন আগন্তুক, 'আর আপনার সঙ্গেই আমার আসল দরকার, মিঃ গাঙ্গুলী। বইয়ের প্যাকেটটা নিশ্চয়ই ফেলে রেখে আসেননি। ব্যাগটা খুলুন, খুলে বার করে দিন। না-দিলে কী ফল হবে সেটা আর নাই বললাম।'

'প্যা-প-প্যাকেট...'

'কী প্যাকেটের কথা বলছি বুঝেছেন নিশ্চয়ই। আপনারই বই আপনার হাতে নিশ্চয়ই তুলে দিয়ে আসিনি সেদিন এয়ারপোর্টে। বার করুন, বার করুন।'

'আপনি ভুল করছেন। প্যাকেট ওঁর কাছে নেই, আমার কাছে।'

ট্রেনের শব্দের জন্য সকলকেই চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, কিন্তু ফেলুদার গম্ভীর গলা চাপা অবস্থাতেই ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে সান্যালের কানে পৌঁছেছে, কারণ চশমার পিছনে ভদ্রলোকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'লাইফ ডিভাইনের এতগুলো পাতা নষ্ট করে আপনার ঐশ্বর্য কিছু বাড়ল কি?'—ফেলুদার গলার স্বর এখনো ধীর, কথাগুলো মাপা।

'নিম্মো', গুণ্ডাটার দিকে আড় দৃষ্টি দিয়ে খসখসে গলায় বললেন সান্যাল, 'ইয়ে আদমি কোই ভি গড়বড় করনেসে ইনকো খতম কর না...হাত তুলে রাখুন, মিস্টার মিত্তির!'

'আপনার ঝুঁকিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি ?' ফেলুদা বলল। 'আপনি যে জিনিসটা চাইছেন সেটা পেলেই তো আর আমাদের ছেড়ে দেবেন না। খতম আমাদের এমনিতেই করবেন। কিন্তু ট্রেন থামলে পর আপনার কী দশা হবে সেটা ভেবে দেখেছেন ?'

'ভেরি ইজি', দাঁত বের করে বিশ্রী হেসে বললেন মিঃ সান্যাল, 'আমাকে আর কে চেনে বলুন ! এত প্যাসেঞ্জার রয়েছে ট্রেনে, তার মধ্যে মিশে যেতে পারব না ? আপনাদের লাশ পড়ে থাকবে, আমি বাইরে বেরিয়ে অন্য কামরায় চলে

যাব। ভেরি ইজি, ইজন্ট ইট ?'

ফেলুদার সঙ্গে অনেক রকম সঙ্কটের মধ্যে পড়ে আমার সাহস বেড়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটা কারণে এই মুহূর্তে সাহস আনার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বার বার আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কারণ আর কিছুই না—ওই নিগ্রো। এরকম একটা নিষ্ঠুর খুনে চেহারা গল্পেই পড়া যায়। কামরার বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ের ফিনফিনে ফুলকারি করা শার্টটা খোলা জানালা দিয়ে

আসা হাওয়াতে ফুরফুর করছে, ডান হাতটা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুললেও রিভলভারটা ঠিকই ফেলুদার দিকে তাগ করা রয়েছে।

সান্যাল এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন। নাক জ্বলে যাচ্ছে সেন্টের গন্ধে। সান্যালের দৃষ্টি ফেলুদার ব্যাগের দিকে। এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ, ফেলুদার সামনেই সিটের উপর রাখা। লালমোহনবাবুর কী অবস্থা জানি না, কারণ তিনি এখন আমার পিছনে। ট্রেনের আওয়াজের মধ্যেও ওঁর হাঁপানির টানের মতো নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ট্রেন ছুটে চলেছে। তার মানে শুটিংও হয়ে চলেছে নিশ্চয়ই। মিঃ গোরে কী সাংঘাতিকভাবে আমাদের ডোবালেন সেটা উনি জানেন কি?

সান্যাল সীটে বসে বাক্সটার ক্যাচ টিপলেন। ঢাকনা খুলল না। বাক্সে চাবি লাগানো।

'চাবি কোথায়? এটার চাবি কোথায়?'

মিঃ সান্যালের সমস্ত মুখ অসহিষ্ণু রাগে কুঁচকে গেল।—'কোথায় চাবি!'

'পকেটে', শান্তভাবে জবাব দিল ফেলুদা।

'কোন পকেটে?'

'ডান।'

আমি জানি ওই পকেটে ফেলুদার রিভলভার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন। রাগে ফুলছেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর—

'তুমি এসো!'—আমার দিকে ফিরে গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সান্যাল।

ফেলুদাও আমার দিকে চাইল। ইঙ্গিতে বুঝলাম সে আমাকে সান্যালের আদেশ পালন করতে বলছে।

যখন ফেলুদার দিকে এগোচ্ছি, তখন ট্রেনের শব্দ ছাড়া আরেকটা শব্দ কানে এল। ঘোড়ার খুরের শব্দ। এর মধ্যে কখন যে বাঁদিকে পাহাড় এসে গেছে তা খেয়ালই করিনি। ফেলুদার পকেটে যখন হাত ঢোকাচ্ছি তখন দেখলাম পাহাড়ের গা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ডাকাতের দল নামছে।

রিভলভারের পাশে হাতড়াতেই চাবি ঠেকল হাতে।

'দিয়ে দে।'

আমি চাবি দিয়ে দিলাম মিঃ সান্যালকে। ফেলুদার হাত দুটো এখনো মাথার উপর।

সান্যাল বাক্সের তলায় চাবি লাগিয়ে ঘোরালেন। বাক্স খুলে গেল। লাইফ ডিভাইন উপরেই রাখা। বাক্স থেকে বই বেরিয়ে এল।

জানালার ঠিক বাইরেই ঘোড়ার খুর। একটা নয়—অনেকগুলো—তীরবেগে

নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে, ছুটে চলেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

সান্যাল বইটা হাতে নিয়ে কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে যেখানে পৌঁছলেন তার পরে আর উল্টোন যায় না। কারণ সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সাঁটা। এবার উল্টোনোর বদলে সান্যাল একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। পাতার মাঝখানটা খামচিয়ে সেটাকে ছিঁড়ে ফেললেন, আর ফেলতেই তার তলায় একটা চৌকো খোপ বেরিয়ে পড়ল। পাতাগুলোর মাঝখানটা একসঙ্গে কেটে ফেলে খোপটা তৈরি করা হয়েছে।

খোপের ভিতর দৃষ্টি দিতেই সান্যালের মুখের অবস্থা দেখবার মতো হল। উনি ভিতরে কী আশা করেছিলেন জানি না, এখন বেরোল খান আষ্টেক সিগারেটের পোড়া টুকরো, ডজন খানেক পোড়া দেশলাই আর বেশ খানিকটা সিগারেটের ছাই।

'কিছু মনে করবেন না', বলল ফেলুদা, 'ওটাকে ছাইদান হিসাবে ব্যবহাব করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

এবারে সান্যাল এত জোরে চ্যাচালেন যে মনে হল সমস্ত ট্রেন ওব কথা শুনে ফেলবে।

'বেয়াদবিব আর জায়গা পাওনি? ভেতরেব আসল জিনিস কোথায়?'

'কী জিনিসের কথা বলছেন আপনি?'

'স্কাউন্ড্রেল!—তুমি জান না কিসের কথা বলছি?'

'নিশ্চয়ই জানি, তবু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই!'

'কোথায় সে জিনিস?'—আবার গর্জিয়ে উঠলেন মিঃ সান্যাল।

'পকেটে।'

'কোন পকেটে?'

'বাঁ পকেটে।'

ডাকাতের দল এখন জানালার ঠিক বাইরে কারণ পাহাড় আরো কাছে চলে এসেছে। ধুলো এসে ঢুকছে আমাদের কামরায়।

'ইউ দেয়ার!'

আমি জানি আমার উপব আবার হুকুম হবে।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি—যাও, হাত ঢোকাও।'

আবার আদেশ মানতে হল।

এবার পকেট থেকে যে জিনিস বেরোল তেমন জিনিস আমি কোনোদিন হাতে ধরিনি। হীরে আর মুক্তো দিয়ে গাঁথা এই আশ্চর্য হার রাজা-বাদশাদের হাতেই মানায়।

'দাও ওটা আমাকে।'

মিঃ সান্যালের চোখ জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু এবার রাগে নয়, উল্লাসে, লোভে।

আমার হাত সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। ফেলুদার হাত মাথার উপর তোলা। লালমোহনবাবুর মুখ দিয়ে গোঙানির মতো শব্দ বেরোচ্ছে। ডাকাতের দল—

দড়াম!

একটা ভারী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামরাটা যেন একটু কেঁপে উঠল, আর তার পরেই দেখলাম নিম্মো কামরার মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, কারণ একজোড়া পা জানালা দিয়ে ঢুকে সটান সজোরে লাথি মেরেছে তার গায়ে। ফলে নিম্মোর হাতের রিভলভার ছুটে গিয়ে সিলিং-এর বাতির কাচ চুরমার করে দিল, আর সেই সঙ্গে ফেলুদারও হাতে বিদ্যুদ্বেগে চলে এল তার নিজের রিভলভার।

এবারে পাহাড়ের দিকের দরজাটা আবার খুলে গেল, আর সেই দরজা দিয়ে ডাকাতের বেশে যিনি ঢুকলেন তাকে আমরা তিনজনেই খুব ভালো করে চিনি।

'থ্যাঙ্ক ইউ, ভিক্টর', বলল ফেলুদা।

॥ ১১ ॥

মিঃ সান্যাল সীটের উপর বসে পড়েছেন। এবার কাঁপুনিটা রাগের নয়, ভয়ের, কারণ তিনি জানেন তিনি জব্দ, তাঁর আর পালাবার পথ নেই।

এদিকে শুটিং-এ গণ্ডগোল বুঝে কেউ নিশ্চয়ই চেন টেনে দিয়েছে, কারণ ট্রেনটা যেভাবে থামল সেটা চেন টানলেই হয়।

থামার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সোরগোল শুনতে পেলাম। একই লোকের নাম ধরে অনেকে চিৎকার করছে।

'ভিক্টর! ভিক্টর! কোথায় গেল ভিক্টর?'

পুলকবাবুর গলা। যত গণ্ডগোল তো ভিক্টরকে নিয়েই, কারণ তার লাফিয়ে পড়ার কথা ছাতে, আর সে কিনা সোজা এসে ঢুকেছে আমাদের কামরায়।

ফেলুদা দরজা খুলে মুখ বার করে পুলকবাবুকে ডাকলেন।

'এই যে মশাই, এদিকে।'

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কামরায় উঠে এলেন। দেখে মনে হল তাঁর শেষ অবস্থা, কারণ শুনেছি এই ধরনের একটা শটে গণ্ডগোল হওয়া মানে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা জলে যাওয়া।

'ব্যাপারটা কী, ভিক্টর? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'আপনার ছবিতে জেট বাহাদুর আখ্যা একমাত্র ভিক্টর পেরুমলই পেতে পারে, পুলকবাবু।'

'তার মানে?' পুলকবাবু অবাক হয়ে দেখলেন ফেলুদার দিকে। তার ফ্যালফ্যালে ভাবটার মধ্যে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে বিরক্তি মেশানো রয়েছে।

'আর স্মাগলারের পার্টটা পরমেশ কাপুরকে না দিয়ে আপনার এঁকে দেওয়া উচিত ছিল।'

'কী সব উল্টোপাল্টা বকছেন। ইনি কে?' পুলকবাবু মিঃ সান্যালের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ইতিমধ্যে ডানদিকের রাস্তায় দুটো নতুন গাড়ির আবির্ভাব হয়েছে—একটা পুলিশ জীপ আব একটা পুলিশ ভ্যান। জীপটা আমাদের কামরার পাশেই এসে থামল। তার থেকে নামলেন ইনস্পেক্টর পটবর্ধন।

এইবার পুলকবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ফেলুদা মিঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই টানে তাঁর দাড়ি আর গোঁফ, আর দুই টানে তাঁর পরচুলা আর চশমাটা খুলে ফেলে দিয়ে বলল—

'আপনার গা থেকে গুলবাহারের গন্ধটাও টেনে খুলে ফেলতে পারলে খুশি হতাম মিস্টার গোরে, কিন্তু ওই একটি ব্যাপারে ফেলু মিত্তিরও অপারগ।'

* * *

'প্রোডিউসার মিসায় ধরা পড়লে ছবি বন্ধ হয়ে যাবে এ কথা আপনাকে কে বললে, লালুদা?'

প্রশ্নটা করলেন পুলকবাবু। লালমোহনবাবু কিছুই বলেননি, কেবল ঘাড় গোঁজ করে গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন; যদিও এটা ঠিক যে গম্ভীর হবার একটা কারণ হল জেট বাহাদুরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা।

'জেট বাহাদুরকে কেউ রুখতে পারবে না, লালুদা', বললেন পুলকবাবু। 'গোরে চুলোয় যাক, গোল্লায় যাক, হাজতে যাক, যেখানে খুশি যাক—প্রোডিউসার তো আর বম্বেতে একটা নয়। চুনি পাণ্ড্যোলি তো এক বছর থেকে আমার পেছনে লেগে আছে—দেখবেন আপনারা থাকতে থাকতেই নতুন ব্যানারে আবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।'

আজকের শুটিং অবিশ্যি সেই দেড়টায় বন্ধ হয়ে গেছে। গোরে আর নিম্মোর হাতে হাতকড়া পড়েছে, নানাসাহেবের নওলাখা হার পুলিশের জিম্মায় চলে গেছে। আজ যে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা ফেলুদা আগেই বুঝেছিল, আর তাই ও সকালে সিগারেট কিনতে যাবার নাম করে ইন্সপেক্টর

পটবর্ধনের সঙ্গে দেখা করে পুলিশের ব্যবস্থা করে এসেছিল। গোরে নাকি এককালে একটানা বারো বছর কলকাতায় ছিল, শুধু ডন বস্কো নয়, সেন্ট জেভিয়ার্সেও পড়েছে—তাই বাংলাটা সে ভালোই জানে—যদিও বম্বেতে সে সচরাচর হিন্দী, মারাঠী আর ইংরেজিটাই ব্যবহার করে।

আমরা বসে আছি খাণ্ডালা ডাকবাংলোর বারান্দায়। চমৎকার পাহাড়ে জায়গা, বাতাসে রীতিমতো ঠাণ্ডার আমেজ। বম্বের অনেকেই নাকি খাণ্ডালায় চেঞ্জে আসে। সাফারির মাটন দো পেঁয়াজি আর নান খাওয়া হয়ে গেছে আগেই, এখন বিকেল সাড়ে চারটে, তাই চা আর পকৌড়া খাচ্ছে সকলে।

আমাদের টেবিলে আমরা তিনজনই বসেছি। পুলকবাবু ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, এইমাত্র উঠে মেরহোত্রার টেবিলে চলে গেলেন। অর্জুন মেরহোত্রার একটা যেন মনমরা ভাব; তার একটা কারণ হয়তো এই যে, আজকের হিরো হচ্ছে নিঃসন্দেহে প্রদোষ মিত্তির। ইতিমধ্যে অনেকেই ফেলুদার সই নিয়ে গেছে, এমন-কি ভিলেন মিকি পর্যন্ত।

সেকেন্ড হিরো যে ভিক্টর পেরুমল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ফেলুদা ভিক্টরকে আগে থেকেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। বলেছিল— ঘোড়া নিয়ে যখন ট্রেনের ধারে পৌঁছাবে, তখন ফার্স্ট ক্লাস কামরার দিকে একটু চোখ রেখো। গোলমাল দেখলে সোজা দরজা দিয়ে ঢুকে এসো, ফেলুদার দু'হাত মাথার উপর তোলা দেখেই ভিক্টর ধরে ফেলেছে গণ্ডগোলের ব্যাপার। আশ্চর্য, এত বড় একটা কাজ করেও তার কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। সে এরই মধ্যে আবার বাংলোর সামনের মাঠে তার লোকজন নিয়ে ওয়ান-টু-থ্রী করে কুং-ফু অভ্যাস শুরু করে দিয়েছে।

'কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কী—'

লালমোহনবাবু এই এতক্ষণে প্রথম মুখ খুললেন। ফেলুদা ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আপনি এখনো যেই তিমিরে সেই তিমিরে—তাই তো?'

জটায়ু একটা গোবেচারা হাসি হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বোঝালেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনার মনের অন্ধকার দূর করা খুব কঠিন নয়। তবে তার আগে গোরে লোকটাকে একটু বুঝতে হবে, তাহলেই তার কার্যকলাপটা বোধগম্য হবে।

'প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে সে আসলে স্মাগলার, কিন্তু ভেক ধরেছে সম্ভ্রান্ত ফিল্ম প্রোডিউসারের। আপনার গল্প থেকে সে ছবি করছে। গল্পে আপনি শিবাজী কাস্‌লে স্মাগলাররা থাকে বলে লিখেছেন। স্বভাবতই গোরে তাতে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার মনে প্রশ্ন জাগে—আপনি শিবাজী কাস্‌ল

সম্বন্ধে কদ্দূর কী জানেন, কারণ সে নিজে স্মাগলার আর তার বাসস্থানও শিবাজী কাস্‌ল। এইটে জানার জন্য সে সান্যাল সেজে আপনার বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। আপনার সঙ্গে আলাপ করে সে বোঝে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, আপনি অত্যন্ত নিরীহ নির্লিপ্ত মানুষ এবং শিবাজী কাসল-এর ব্যাপারটা আপনার কাছে একেবারেই কাল্পনিক। সেই সময় তার মাথায় আসে আপনার হাত দিয়ে বইয়ের প্যাকেটে নওলাখা হার পাচার করার আইডিয়া। মালটা গোরে পাঠাচ্ছিল তারই এক গ্যাঙের লোককে—যে খুব সম্ভবত থাকে শিবাজী কাসলেরই সতের নম্বর তলার দু'নম্বর ফ্ল্যাটে। আপনি যদি ধরা পড়েন, তাহলে দোষ দেবেন সান্যালকে, গোরেকে নয়—তাই তো ? অর্থাৎ সান্যালকে খাড়া করে গোরে নিজে থাকছে সেফসাইডে।

'এদিকে হয়ে গেল গণ্ডগোল। আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকার হারের বদলে চালান করে বসলেন আপনারই পাঁচটাকা দামের বই। সেই বইয়ের প্যাকেট নিয়ে লালশার্ট অর্থাৎ নিম্মো শিবাজী কাস্‌লের লিফট দিয়ে উঠছিল সতেরোতলায় ; সেই সময় গোরেরই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাঙের লোক নিম্মোকে আক্রমণ করে প্যাকেট আদায় করার জন্য। নিম্মো তাকে খুন করে প্যাকেট যথাস্থানে চালান দিয়ে গা ঢাকা দেয়। এদিকে প্যাকেটে যে হার নেই সে খবর পেতেই গোরেকে চলে আসতে হল। সে তো বুঝেছে কী হয়েছে। তার এখন দুটো কাজ করতে হবে। এক, হার ফিরে পেতে হবে ; দুই, আমাদের খতম করতে হবে। তার একমাত্র ভরসা যে আমরা লাইফ ডিভাইনের রহস্য ভেদ করে হারটা পুলিশের হাতে জমা দিইনি। গোরে এসেই বুঝল যে সান্যালের পুনরাবির্ভাবের প্রয়োজন হবে। সান্যালই যখন মালটা পাঠিয়েছিল, তখন সান্যালকেই সেটা পুনরুদ্ধার করতে হবে, তাহলে গোরের নিজের উপর কোনো সন্দেহ পড়বে না।'

'কিন্তু গুলবাহার—'

'বলছি, বলছি—সব বলছি। গুলবাহার সেন্টের ব্যবহারটা গোরের শয়তানি বুদ্ধির আশ্চর্য উদাহরণ। এটার জন্য সে কলকাতা থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। সান্যাল মানেই গুলবাহার, আর গুলবাহার মানেই সান্যাল—এ ধারণা অন্তত আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ—তা একরকম হয়েছিল বৈকি।'

'বেশ। এবার মনে করে দেখুন—সেদিন গোরে আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—ভাবটা যেন আপনার জন্য টাকা আনতে গিয়েছে—কেমন ?'

'ঠিক।'

'সেই ফাঁকে লিফ্‌টে ঢুকে দু'ফোঁটা গুলবাহার সেন্ট ছিটিয়ে দেওয়া কি খুব কঠিন ব্যাপার ? উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সব ক'টা তলা শুঁকেও যখন কোনো সেন্টের গন্ধ পেলাম না, তখনই বুঝলাম যে গন্ধটা রয়েছে শুধু লিফ্‌টের ভিতর। অর্থাৎ সেটা হচ্ছে মানুষের গা থেকে নয়, এসেছে সেন্টের শিশি থেকে। ঠিক সেইভাবেই লোক লাগিয়ে লোটাস সিনেমার সামনে গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কয়েক ফোঁটা সেন্ট গাড়ির সিটে ছিটিয়ে দেওয়াও অতি সহজ ব্যাপার।'

ফেলুদা বুঝিয়ে দিলে সত্যিই সহজ। লালমোহনবাবুও যে ব্যাপারটা বুঝেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু তাঁর মুখে হাসি ফুটছে না দেখে বেশ অবাক লাগল। সেটা যে শেষ পর্যন্ত পুলকবাবুর একটা কথায় ফুটবে সেটা কী করে জানব ?

চা শেষ করে যখন শহরে ফেরার তোড়জোড় চলছে, সূর্যটা পাহাড়ের পিছনে নেমে যাওয়ায় হঠাৎ ঠাণ্ডা বেড়ে মাঝে মাঝে বেশ কাঁপুনি লাগিয়ে দিচ্ছে, তখন দেখি পুলকবাবু আমাদের দিকে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছেন।

'লালুদা, জেট বাহাদুরের বিজ্ঞাপন পড়ছে শুক্কুরবার—কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া দরকার।'

'কী ব্যাপার ভাই ?'

'আপনার কোন্ নামটা যাবে—আসল না নকল ?'

'নকলটাই আসল ভাই', একগাল হেসে বললেন লালামোহনবাবু, 'বানান হবে জে এ টি এ ওয়াই ইউ।'

শকুন্তলার কণ্ঠহার

শেষ পর্যন্ত লালমোহনবাবুর কথাই রইল। ভদ্রলোক অনেকদিন থেকে বলছেন, 'মশাই, সেই সোনার কেল্লার অ্যাডভেঞ্চার থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে রইচি, কিন্তু তার আগে লখ্নৌ আর গ্যাংটকে আপনাদের যে দুটো অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে তখন তো আর আমি ছিলাম না। কাজেই সে দুটো জায়গাও আমার দেখা হয়নি। বিশেষ করে লখ্নৌ-এর মতো একটা ঐতিহাসিক শহর। আপনারা তো গেছেন সেই কবে, চলুন না এবার পুজোয় আরেকবার যাওয়া যাক।'

ফেলুদার লখ্নৌ ভীষণ ভালো লাগে জানি, আর সেই সঙ্গে আমারও। আইডিয়াটা মন্দ না। প্রথমবার যখন যাই, আর আমাদের বাদশাহী আংটির অ্যাডভেঞ্চারটা হয়, তখন আমি খুব ছোট। এখন গেলে লখ্নৌ আরো ভালো লাগবে সেটা আমি জানি।

ফেলুদা বলল, 'আমারও লখ্নৌ-এর কথা হলেই মনটা চনমন করে ওঠে। আর অত সুন্দর শহর ভারতবর্ষে কমই আছে। শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে এ রকম ক'টা জায়গা পাবেন আপনি? ব্রিজের একদিকে শহরের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক অন্য দিকে। তাছাড়া নবাবী আমলের গন্ধটা এখনো যায়নি। চারিদিকে তাদের কীর্তির চিহ্ন ছড়ানো। তার উপর সেপাই বিদ্রোহের চিহ্ন। নাঃ—আপনার কথাই শিরোধার্য। ক'দিন থেকে ভাবছি কোথায় যাওয়া যায় এবার পুজোয়। লখ্নৌই চলুন।'

ফেলুদা আজকাল ভালো রোজগার করে। প্রাইভেট গোয়েন্দাদের মধ্যে ওর নামডাকই সবচেয়ে বেশি। মাসে অন্তত সাত-আটটা কেস আসে, আর প্রতি তদন্তের জন্য দু' হাজার করে পায়। অবিশ্যি রোজগারের দিক দিয়ে লালমোহনবাবুকে টেক্কা দেওয়া মুশকিল। একবার বলেছিলেন ওঁর বইয়ের

থেকে বার্ষিক আয় নাকি প্রায় তিন লাখ টাকা। তার উপরে নতুন নতুন বই প্রতি বছরই বেরোচ্ছে।

আমরা আর দ্বিধা না করে লখ্‌নৌ যাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। দুন এক্সপ্রেসে তিনটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট—রাত ন'টায় বেরোনো, পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পৌঁছানো। সেই সঙ্গে অবিশ্যি হোটেল বুকিংও টেলিগ্রাম করে ফেলা হল। ফেলুদা বলল, 'যাবই যখন তখন আরামে থাকব, নইলে ক্লান্তি যাবে না।'

'কোন্ হোটেলে উঠবেন?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'হোটেল ক্লার্কস-আওয়ধ।'

'আওয়ধ? আওয়ধ ব্যাপারটা কী?'

'আওয়ধ হল অযোধ্যার উর্দু নাম।'

'লখনৌ বুঝি অযোধ্যায়?'

'সেটাও জানেন না? লখ্‌নৌ নামটাও এসেছে লক্ষ্মণ থেকে।'

'রামের ভাই লক্ষ্মণ?'

'ইয়েস স্যার। আওয়ধ হল লখনৌ-এর সেরা হোটেল। একেবারে গুম্‌তীর উপরে। হোটেলের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে।'

'বাঃ—আইডিয়াল। আওয়ধ অন দি গুমতী। ঠাণ্ডা কেমন হবে?'

'সন্ধ্যের জন্য একটা পুলোভার নিয়ে নেবেন। অথবা আপনার গরম জহর কোট। আপনি সাহেব সাজবেন না বাঙালি সাজবেন তার উপর নির্ভর করছে।'

'দুটোই নেব।'

'ভেরি গুড।'

'ওখানে তো বাঙালি অনেক?'

'বিস্তর। ছ-সাত পুরুষ থেকে লখনৌতে প্রবাসী এমন বাঙালিও আছে। বেঙ্গলি ক্লাব আছে—সেখানে পুজো হয়। বলা যায় না—আপনার অনুরাগী পাঠকও সেখানে কিছু পেয়ে যেতে পারেন।'

'তাহলে আমার লেটেস্ট বই "সাংঘাইয়ে সংঘাত" কয়েক কপি সঙ্গে নিলে বোধহয় মন্দ হয় না।'

'কয়েক কপি কেন—এক ডজন নিয়ে নিন।'

৫ই অক্টোবর শনিবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে প্রচুর ভিড়। রিজার্ভেশন ক্লার্ক দেখলাম ফেলুদাকে দেখে চিনলেন—বললেন, 'চলুন স্যার, আপনাদের বোগি দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্টে তিনটে বার্থ—এই তো? এই যে আপনাদের বোগি। তিন নম্বর কামরা আপনাদের জায়গা—একটা লোয়ার, দুটো আপার বার্থ।'

আমরা গিয়ে আমাদের জায়গা দখল করলাম। বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে এসেছি, তাই ট্রেনে খাবার ঝামেলা নেই। একটা লোয়ার বার্থে আরেকজন ভদ্রলোক বসে আছেন, বছর পঞ্চাশ বয়স, মাঝারি হাইট, ঠোঁটের উপর একটা সরু গোঁফ। আমাদের দেখে একটু সরে বসে পাশে জায়গা করে দিলেন। ফেলুদা সেখানে বসল, আমরা দু'জন উল্টো দিকের বার্থে। দশ দিন থাকব আমরা লখ্‌নৌ। মালপত্র বেশি নিইনি ; আমার আর ফেলুদার জিনিস একটা বড় সুটকেসে আর লালমোহনবাবুর জিনিস তাঁর বিখ্যাত লাল জাপানী সুটকেসে। বলেন ওটা নাকি ওঁর পাড়ার এক ধনী ব্যবসাদার বন্ধু হৃষীকেশ চৌধুরী জাপান থেকে স্পেশালি লালমোহনবাবুর জন্য এনে দিয়েছেন।

আমাদের সহযাত্রীটি বাঙালি কিনা সে বিষয় একটু সন্দেহ ছিল। সেটা দূর হল ভদ্রলোক যখন নিজে আলাপ করলেন।

'আপনারা কদ্দূর যাবেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'লখ্‌নৌ', বললেন লালমোহনবাবু। 'আপনি ?'

'আমিও লখ্‌নৌ যাচ্ছি। ওখানেই থাকি। আমরা তিন পুরুষ ধরে ওখানেই আছি। আপনারা কি বেড়াতে যাচ্ছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললেন লালমোহনবাবু।

এবার ফেলুদা বলল, 'আপনার সুটকেসে দেখছি তিনটি ইংরিজি হরফ লেখা রয়েছে—এইচ. জে. বি.। এরকম অদ্ভুত ইনিশিয়ালস তো বড় একটা দেখা যায় না। আপনার নামটা জিজ্ঞেস করলে আশা করি আপনি বিরক্ত হবেন না।'

'মোটেই না। আমার নাম জয়ন্ত বিশ্বাস। এইচ-টা হল হেক্টর। আমি ক্রিশ্চান। আমাদের পরিবারের সকলেরই একটা করে ক্রিশ্চান নাম আছে।'

'ধন্যবাদ', বলল ফেলুদা। 'আপনার নামটা যখন বললেন তখন আমাদের নামও বলা সমীচীন। আমি প্রদোষ মিত্র, এটি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ, আর ইনি আমাদের বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার শাশুড়ির নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। উনি সাইলেন্ট যুগে ফিল্মে অ্যাকটিং করতেন। খুব পপুলার ছিলেন।'

'কী নাম বলুন তো ?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'শকুন্তলা দেবী।'

'আরেব্বাস', বললেন লালমোহনবাবু, 'তিনি তো যাকে বলে তখনকার দিনে একজন বিখ্যাত স্টার ! আমার এক প্রতিবেশী আছেন, নরেশ বোস—এখন বয়স হয়েছে, তবে যুবা বয়সে তিনি ফিল্মের পোকা ছিলেন। তাঁর কাছে বাঁধানো "বায়োস্কোপ" পত্রিকা দেখেছি। তাতে শকুন্তলা দেবীর বিস্তর ছবি রয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে লেখাও রয়েছে অনেক। তিনি বোধহয় বাঙালি ছিলেন না।'

'না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলতে পারেন। আসল নাম ছিল ভার্জিনিয়া রেনল্ড্স। তাঁর বাবা টমাস রেনল্ড্স ছিলেন আর্মিতে। তিনি লখ্‌নৌতেই পোস্টেড ছিলেন। চোস্ত উর্দু বলতে পারতেন। তিনি একজন মুসলমান বাঈজিকে বিয়ে করেন। তাঁরই মেয়ে হলেন ভার্জিনিয়া।'

'হাইলি ইন্টারেস্টিং', বললেন লালমোহনবাবু। 'কিন্তু তিনি তো বোধহয় টকিতে অভিনয় করেননি।'

'না। এদেশে টকি আসার আগেই তিনি বিয়ে করে ফেলেন একজন বাঙালি ক্রিশ্চানকে। তারপর প্রথম সন্তান হবার পরই শকুন্তলা দেবী ছবির কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম দুটি সন্তান ছিল মেয়ে, তৃতীয়টি ছেলে। আমি দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে করি ১৯৬০-এ। আমার বড় শালী বিয়ে করেন একটি গোয়ানকে। আমার ছোট শালা বিয়ে করেননি।'

এতদিন লখনৌতে থাকবার জন্যই বোধহয় ভদ্রলোকের বাংলায় একটা পশ্চিমা টান এসে গেছে। যদিও ভাষায় কোনো গণ্ডগোল নেই।

এবার ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

'কোনো এক মহারাজা শকুন্তলা দেবীকে একটা মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, তাই না?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বললেন জয়ন্তবাবু। 'মাইসোরের মহারাজা। শকুন্তলার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে একটি বহুমূল্য কণ্ঠহার উপহার দেন। তখনকার দিনেই দাম ছিল লাখখানেকের মতো। কিন্তু এটা আপনি কী করে জানলেন? যদ্দূর মনে হয় শকুন্তলা অভিনয় করতেন আপনার জন্মের আগে।'

'তা তো বটেই', বলল ফেলুদা। 'কিন্তু বছর পনের আগে আমি খবরের কাগজে একটা খবর পড়ি। এই হার চুরি হয়েছিল, তারপর পুলিশ সেটা উদ্ধার করে।'

'ঠিক কথা। তখনো শকুন্তলা দেবী বেঁচে। তিনি মারা গেছেন তিন বছর আগে আটাত্তর বছর বয়সে। মারা যাবার পরেও এই হারটার কথা কাগজে বেরিয়েছিল। কিন্তু আপনার সেই পনের বছর আগের খবরের কথা মনে আছে—আপনার মেমরি তো খুব শার্প দেখছি।'

'ক্রাইমের খবর আমি বহুদিন থেকেই খুব উৎসাহ নিয়ে পড়ি। আর পড়লে আমার মনেও থাকে। আসল কথাটা আপনাকে বলেই ফেলি। আমার পেশাটিও হচ্ছে ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত।'

ফেলুদা পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে জয়ন্তবাবুর হাতে দিল। ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল।

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর! তাই বলুন। আপনার নামটা চেনা চেনা

লাগছিল। আপনার তো একটা ডাকনামও আছে।'

'হ্যাঁ। ফেলু।'

'ফেলু। ইয়েস—ফেলুদা। আমার মেয়ে আপনার বিশেষ ভক্ত। আপনার সব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তার পড়া। বাংলা সে এমনিতে একেবারেই পড়ে না, কিন্তু আপনার বইগুলো পড়ে। যাক্, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগল।'

এবার ফেলুদা লালমোহনবাবুর পরিচয়টাও দিয়ে দিল। বলল, 'এঁর নাম লখ্নৌ অবধি পৌঁছেছে কিনা জানি না, তবে ইনি বাংলার একজন বিশেষ জনপ্রিয় থ্রিলার রাইটার। জটায়ু ছদ্মনামে এঁর উপন্যাস বেরোয়।'
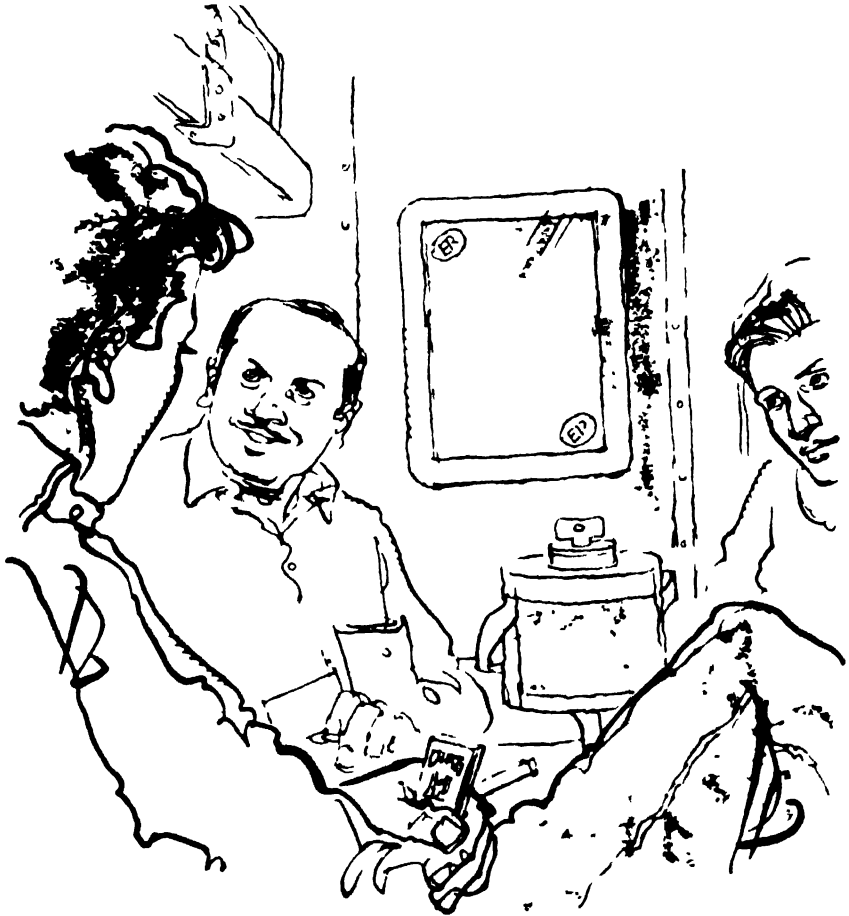
'বাঃ দু'জন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়ে গেল এতো আশ্চর্য ব্যাপার। লখনৌতে আপনারা উঠছেন কোথায়?'

'ক্লার্কস-আওয়ধ।'

'আমি থাকি নদীর ওদিকে—বাদশাবাগে। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। একদিন আমাদের বাড়িতে খেতে আসতে হবে আপনাদের। আমার স্ত্রী খুব ভালো মোগলাই রান্না রাঁধেন। তাছাড়া আমার মেয়ে তো ফেলুদাকে দেখে থ্রিলড হয়ে যাবে। আপনাদের তিনজনেরই আসা চাই কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই', বলল ফেলুদা। 'আর সেই সঙ্গে আশা করি বিখ্যাত কণ্ঠহারটাও একবার দেখা যাবে।'

'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। কারণ হারটা আমার কাছেই আছে। অর্থাৎ আমার স্ত্রীর কাছে।'

'কেন? ছোট মেয়ের কাছে কেন? বড় মেয়ের কাছে নয় কেন?'

'কারণ ভার্জিনিয়ার তাঁর ছোট মেয়ের উপর বেশি টান ছিল। আর অনেক গুণ ছিল এই ছোট মেয়ের—অর্থাৎ আমার স্ত্রী সুনীলার। অবিশ্যি সেসব গুণের সদ্ব্যবহার সে করেনি। বিয়ের পর পুরো গৃহিণী বনে গিয়েছিল। বিয়ে না করলে হয়তো ফিল্মে চান্স নিত, কারণ তার অভিনয় দক্ষতা ছিল যথেষ্ট।'

'আপনার স্ত্রীর নাম সুনীলা বললেন। ওঁনার কোনো ক্রিশ্চান নাম নেই?'

'হ্যাঁ। ওর পুরো নাম প্যামেলা সুনীলা।'

॥ ২ ॥

রাত্রে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে সকালে সাড়ে ছ'টায় উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে বক্সারে ব্রেকফাস্ট খেলাম। মোগলসরাই আসবে পৌনে ন'টায়। লাঞ্চ খাবো প্রতাপগড়ে সাড়ে বারোটার সময়।

জয়ন্তবাবু দেখলাম খুব সকালেই ওঠেন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বললেন, 'কাছেই কুপেতে আমার এক চেনা ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

লালমোহনবাবুও স্নানটান করে দাড়ি কামিয়ে একেবারে ফিটফাট। উনি 'বিক' রেজার দিয়ে দাড়ি কামান। এগুলো বার তিন-চার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়। কলকাতায় পাওয়া যায় না। লালমোহনবাবুর এক বন্ধু কাঠমাণ্ডু থেকে ওঁর জন্য চার প্যাকেট অর্থাৎ কুড়িটা এনে দিয়েছেন। বললেন, 'ভারী আরামে শেভ করা যায় মশাই।'

ফেলুদা বলল, 'দু' মাস পরে তো আবার দিশি ব্লেডে ফিরে যেতে হবে।'

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, 'নো স্যার। দাড়ি কামানোর ব্যাপারে আমি একটু লাক্সারি পছন্দ করি। আমি নিউ মার্কেট থেকে উইলকিনসন ব্লেড কিনি।'

'সে তো অনেক দাম।'

'সংসার করিনি, টাকা কার জন্যে জমাবো বলুন তো ? তাই নিজের পেছনেই খরচ করি।'

'আমাদের পেছনেও কম খরচ হয় না আপনার। আপনার গাড়ি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি।'

'মশাই, তিনজনের একজন মাস্কেটিয়ারের গাড়ি আর দু'জন চড়বে না—এ কেউ শুনেছে কখনো ?'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বাইরের প্যাসেজে পায়চারি করতে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বলল, 'এক নম্বর কুপেতে জয়ন্তবাবু তাঁর আলাপীর সঙ্গে দিব্যি গপ্পে মেতে আছেন। ইংরিজিতে কথা হচ্ছে, অর্থাৎ ভদ্রলোক অবাঙালি। দেখে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে মনে হল, যদিও রং আমাদেরই মতো।'

'কী কথা হচ্ছে শুনতে পেলেন নাকি ?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'আলাপী বললেন, "আই গিভ ইউ জাস্ট থ্রী ডেজ।" এর বেশি আর কিছু শুনিনি।'

'কথাটা কি হুমকি বলে মনে হল ?'

'ট্রেনের শব্দের জন্য গলা তুলতে হয় বলে সব কথাই হুমকির মতো শোনায়।'

একটু পরেই জয়ন্তবাবু তাঁর আলাপীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কামরায় এসে ফেলুদাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। দিস ইজ মিঃ সুকিয়াস—এ ওয়েলনোন বিজনেসম্যান অফ লাক্‌নাউ। তাছাড়া আর্টের সমঝদারও বটে।'

সুকিয়াস ইংরিজিতে বললেন, 'আশা করি আমাদের আবার লখ্‌নৌতে দেখা হবে। মিঃ বিসওয়াস আমার অনেকদিনের পুরানো বন্ধু।'

সুকিয়াস চলে গেলেন। জয়ন্তবাবু তাঁর বার্থের আধখানা দখল করে বসলেন। বাকি আধখানায় যথারীতি ফেলুদা বসেছে।

ফেলুদা জয়ন্তবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনার শাশুড়ির আসল নাম বলছিলেন ভার্জিনিয়া রেনল্ড্‌স। এই রেনল্ড্‌স পরিবার কবে থেকে আছে ভারতবর্ষে ?'

জয়ন্তবাবু বললেন, 'ভার্জিনিয়ার ঠাকুরদাদা জন রেনল্ড্‌স ভারতবর্ষে আসেন

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স উনিশ। তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। ১৮৫৭-র সেপাই বিদ্রোহের সময় তিনি লখনৌতে পোস্টেড ছিলেন। যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়ে একেবারে শেষদিকে সেপাইদের কামানের গোলায় প্রাণ দেন। তাঁর ছেলে টমাসও বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। তিনি উর্দু শিখে একদম ভারতীয় বনে গিয়েছিলেন। রাজার হালে থাকতেন। নিজের বাড়িতে রেগুলার বাঈনাচের আয়োজন করতেন। ফরসিতে তামাক খেতেন, পান খেতেন, আতর মাখতেন। এমনকি মাঝে মাঝে দিশি পোশাকও পরতেন। অবশেষে তিনি ফরিদা বেগম নামে এক কত্থক নাচিয়েকে ভালোবেসে ফেলে তাকে বিয়ে করেন। বাড়িতে মুসলমান কেতা চালু ছিল। লোকে টমাসকে বলত "টমাস বাহাদুর"। টমাসের প্রথমে দুটি ছেলে হয়, নাম এডওয়ার্ড আর চার্লস। এরাও ছেলেবেলা থেকেই উর্দু বলত। এরা কেউই আর্মিতে যোগ দেয়নি। এডওয়ার্ড উকিল হয়, আর চার্লস আসামের চা-বাগানে ম্যানেজারি করতে চলে যায়। সে আর লখনৌতে ফেরেনি। টমাসের তৃতীয় সন্তান অবশ্য ছিল ভার্জিনিয়া। উনি ছেলেবেলা থেকেই উর্দু আর ইংরিজি একসঙ্গে শিখেছিলেন। গায়ের রংটা ছিল সাহেবের মতো ফরসা, কিন্তু চুল আর চোখ ছিল কালো। তাই যখন ছবিতে দিশি চরিত্রে অভিনয় করতেন, তাঁকে বেমানান লাগত না।

'আগেই বলেছি ভার্জিনিয়া একজন বাঙালি ক্রিশ্চানকে বিয়ে করেন। এঁর নাম ছিল পার্সিভ্যাল মতিলাল ব্যানার্জি। আসলে ইনি ছিলেন শকুন্তলার ছবির প্রোডিউসর। ইনিই আমার শাশুড়িকে ছবিতে নামান। স্ত্রীর ছবি থেকে উনি অনেক টাকা করেন। সত্যি বলতে কি, ভার্জিনিয়ার বাবা টমাস নবাবি করে শেষ জীবনে বেশ অর্থকষ্ট ভোগ করেন। তখন ভার্জিনিয়া তাঁর ফিল্মের রোজগার থেকে বাবাকে সাহায্য করেন।

'পার্সিভ্যাল আর ভার্জিনিয়ার তিনটি সন্তান জন্মায়। বড় এবং মেজো হল মেয়ে, ছোটটি ছেলে। বড়টির নাম মার্গারেট সুশীলা। ইনি যে একজন গোয়ার অধিবাসীকে বিয়ে করেন সে কথা আগেই বলেছি। এঁর নাম স্যামুয়েল সালডানহা। এনার একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান রয়েছে।

'দ্বিতীয় মেয়ে প্যামেলা সুনীলাকে আমি বিয়ে করি ১৯৬০-এ। আমার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে। আমার মেয়ের কথা তো আগেই বলেছি। এ ছাড়া আমার একটি ছেলেও আছে। তার নাম ভিক্টর প্রসেনজিৎ। মেয়েটির নাম মেরি শীলা। ছেলেটিকে আমার আপিসে ঢোকাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সে নিজের পথে নিজের মর্জিমতো চলে। শীলা দু'বছর হল ইজাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছে। ভালো অভিনয় করতে

পারে—বাংলা ইংরিজি দুইই। তবে ওর আসল ইন্টারেস্ট হল জার্নালিজমে। দু' একটা ইংরিজি লেখা কাগজে বেরিয়েছে—বেশ ভালো লেখা।'

ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরালেন। লালমোহনবাবু যে সিগারেট খান না সেটা উনি জানেন।

ফেলুদা বলল, 'অদ্ভুত ইতিহাস।'

'হাইলি রোম্যান্টিক', বললেন লালমোহনবাবু।

'শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহারটা কী আপনার স্ত্রী কখনো পরেছেন?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'দু'-একটা পার্টিতে পরেছেন। তবে সচরাচর ওটা সিন্দুকেই তোলা থাকে। দেখলে বুঝবেন জিনিসটার কী মহিমা।'

'আমি তো না দেখে থাকতে পারছি না', বললেন লালমোহনবাবু।

'আর দিন চারেক ধৈর্য ধরুন', বললেন জয়ন্তবাবু।

॥ ৩ ॥

আমরা তিন দিন হল লখনৌতে এসেছি। প্রথমবারের কথা বার বার মনে পড়ছে। সেই বাদশাহী আংটি, মিঃ শ্রীবাস্তব, বনবিহারীবাবুর আশ্চর্য চিড়িয়াখানা, হরিদ্বার, আর লছমনঝুলার পথে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের শিহরন-জাগানো ক্লাইম্যাকস।

সেবার অবিশ্যি আমরা হোটেলে থাকিনি। খুব সম্ভবত ক্লার্কস-আওয়ধ হোটেল তখনো তৈরিই হয়নি। হোটেলটা সত্যিই ভালো। আমরা পাশাপাশি একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গল রুমে আছি। দু' ঘরের জানালা দিয়েই গুমতী নদী দেখা যায়। নদীর ওপারে পশ্চিমে যখন সূর্য অস্ত যায়, সে দৃশ্য দেখবার মতো। হোটেলের খাওয়াও দুর্দান্ত ভালো। আমরা অনেক জায়গায় অনেক হোটেলে থেকেছি, কিন্তু এত ভালো খাওয়া কোনো হোটেলে খাইনি।

এই তিন দিনে লালমোহনবাবু লখনৌ-এর প্রায় বেশির ভাগ দ্রষ্টব্যই দেখে নিয়েছেন। আমরা প্রথম গেলাম বড়া ইমামবাড়ায়। এর থাম-ছাড়া বিশাল হলঘর দেখে এবারও মাথা ঘুরে গেল। লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, কথা বেরোচ্ছে না, শুধু একবার বললেন, 'ব্রাভো নওয়াবস অফ লখ্‌নৌ।'

তারপর ভুলভুলাইয়া দেখে ভদ্রলোকের ভির্মি খাবার জোগাড়। এই গোলোকধাঁধায় নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন শুনে ওঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

আরো চমক এলো রেসিডেন্সিতে। 'এ যে ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে

উঠছে মশাই। গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি, বারুদের গন্ধ পাচ্ছি!' সেপাইদের এতো এলেম ছিল যে এরকম একটা বিল্ডিংকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল?'

চতুর্থ দিনে সকালে একটু বাজারে গিয়েছিলাম এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি ভুনা পেঁড়া কিনতে, হোটেলে ফিরে এসে দেখি ঘরে একটা ছাপানো নেমন্তন্ন চিঠি রয়েছে। পাঠিয়েছেন হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস। আগামী শুক্রবার, অর্থাৎ পরশু তাঁদের বিয়ের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে মিঃ অ্যান্ড মিসেস বিশ্বাস আমাদের ডিনারে ডেকেছেন। নেমন্তন্ন চিঠির সঙ্গে একটা আলাদা কাগজে রাস্তার প্ল্যান আর কোনখানে বাড়ি সেটা ছাপা রয়েছে। বাড়িটা যে নদীর ওদিকে সেটা ভদ্রলোক আগেই বলেছিলেন। প্ল্যান দেখে বাড়ি খুঁজে বার করায় কোনোই অসুবিধা হবার কথা নয়।

বিকেলবেলা জয়ন্তবাবু নিজে ফোন করলেন। ফোনের পর ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে বলল ভদ্রলোক বলে দিলেন যেন আমরা অবশ্যই যাই। ওখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে, তাছাড়া শকুন্তলার হারটাও দেখা যাবে ফেলুদা আরো বলল যে ভদ্রলোক বলে দিয়েছেন যে একেবারে ইনফরম্যাল ব্যাপার, কোনো বিশেষ পোশাক পরবার দরকার নেই।

'এইটেই আমার ভয় ছিল', বলল ফেলুদা। 'নেমন্তন্নে আপত্তি নেই, কিন্তু তার জন্য যদি সাহেব কিংবা বাবু সাজতে হয় তাহলেই গোলমাল।'

আমাদের হাতে একদিন সময় ছিল, তার মধ্যে ছোট ইমামবাড়া ছত্তর মঞ্জিল আর চিড়িয়াখানা দেখে নিলাম। খাঁচার বাইরে বাঘ সিংহ দেখে লালমোহনবাবু ভয়ানক ইমপ্রেসড। বললেন কলকাতাতে এরকম হওয়া উচিত

শুক্রবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা পৌনে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। প্ল্যান দেখে বাড়ি বার করতে কোনো অসুবিধা হল না। একতলা ছড়ানো বাড়ি সামনে বেশ বড় ফুলের বাগান। তার মধ্য দিয়ে নুড়ি ঢালা পথ চলে গেছে বাড়ির দরজা পর্যন্ত। আমরা দরজায় বেল টিপলাম, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একজন উর্দি পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল। বাড়ির ভিতর থেকে লোকজনের গলার শব্দ পাচ্ছিলাম, বেয়ারা ভিতরে গিয়ে বলাতেই জয়ন্তবাবু চটপট বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'আসুন, আসুন, মি মিত্র, আই অ্যাম সো গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম

আমরা তিনজন জয়ন্তবাবুর পিছন পিছন বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম দেখলাম পাঁচ-সাত জনের বেশি লোক নেই। হয়তো পরে আরো আসবে

এর পর আলাপ পর। প্রথমে জয়ন্তবাবুর স্ত্রী। দেখে বুঝলাম মহিলা এককালে সুন্দরী ছিলেন। তারপর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। মেয়েটি—নাম মেরি শীলা দেখতে সুশ্রী। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ, ছেলেটির একেবারে পাক স্ট্রিট

মার্কা চেহারা—দাড়ি, গোঁফ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তাতে চিরুনি পড়েনি। এরই নাম ভিক্টর প্রসেনজিৎ। তারপর জয়ন্তবাবু বললেন, 'মিঃ অ্যান্ড মিসেস সাল্‌ডান্‌হা।' অর্থাৎ জয়ন্তবাবুর বড় শালী এবং তাঁর স্বামী। ভদ্রমহিলা মোটা হয়ে গেছেন, ভদ্রলোক আবার তেমনই রোগা, দাড়ি গোঁফ কামানো, ষাটের কাছাকাছি বয়স। এই সাল্‌ডান্‌হারই বাজনার দোকান আছে—ইনি গোয়ার অধিবাসী। আপাতত এই ক'জনই রয়েছেন ঘরে।

ঘরটা বেশ বড়, আর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল দেখে যে ঘরের একদিকে একটা সিনেমা স্ক্রীন টাঙানো রয়েছে আর অন্যদিকে রয়েছে একটা প্রোজেক্টর। জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন ওঁদের কাছে শকুন্তলা দেবীর শেষ ছবির একটা প্রিন্ট আছে, সেটার একটা রীল নাকি ডিনারের আগে দেখানো হবে। এই ছবিতে নাকি শকুন্তলা দেবী তাঁর বিখ্যাত হারটা পরেছিলেন। গল্পটা কপালকুণ্ডলা, আর শকুন্তলা দেবী সেজেছিলেন লুতফ-উন্নিসা। আমার তো শুনেই মনটা চনমন করে উঠল।

ফেলুদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ শুনে সকলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। মেরি শীলা এসে বলল, 'আমি আপনার একজন ভীষণ অ্যাডমায়ারার। দুঃখের বিষয় আমার কোনো অটোগ্রাফ খাতা নেই। আমি আজকালের মধ্যেই একটা খাতা কিনে নিয়ে আপনার হোটেলে গিয়ে সই নিয়ে আসব।'

বাংলার মধ্যে অনেকগুলো ইংরিজি কথা ব্যবহার করছিল শীলা। সেটা এখানে প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ করছিলাম।

বেয়ারারা পানীয় পরিবেশন করছিল। আমরা তো মদ খাই না, তাই তিনজনে তিন গেলাস ফলের সরবৎ নিয়ে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিলাম। স্যামুয়েল সাল্‌ডানহা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'হজরতগঞ্জে আমাদের মিউজিক শপ। একদিন দোকানে এলে আমি খুব খুশি হব।'

'আপনার দোকানে দিশি যন্ত্রও বিক্রি হয়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আমরা এখন সেতারও রাখছি', বললেন ভদ্রলোক।

এবার একজন ভদ্রলোক এলেন তাঁকে দেখেই বুঝলাম তিনি জয়ন্তবাবুর শালা, কারণ তাঁর চেহারার সঙ্গে সুশীলা দেবীর খুব সাদৃশ্য। ইনি প্রায় সাহেবের মতোই দেখতে, কারণ এঁর চুল আর চোখও কটা।

ইনি একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার নাম রতনলাল ব্যানার্জি। আমি জয়ন্তর ব্রাদার-ইন-ল। আপনাদের পরিচয়..?'

এই সময় জয়ন্তবাবু এগিয়ে এসে আমাদের পরিচয় দিয়ে দিলেন।

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ ?' রতনলাল ভুরু কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি কি কোনো কেসের ব্যাপারে লখ্‌নৌতে এসেছেন ?'

ফেলুদা হেসে বলে, 'না, স্রেফ ছুটি।'

এই সময় একজন ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন বাড়ির ভিতর থেকে। বৃদ্ধই বলা চলে। সম্ভবত ষাটের উপর বয়স নিশ্চয়ই। বুঝলাম তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। ভদ্রলোকের চেহারাটা কী রকম যেন অপরিচ্ছন্ন। এই পার্টিতে তাঁকে মানাচ্ছে না। পোশাক অপরিষ্কার, দাড়িও অন্তত দু'দিন কামাননি, মাথার চুল লম্বা হয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে।

জয়ন্তবাবু ভদ্রলোকের পিঠে হাত দিয়ে আমাদের দিকে নিয়ে এলেন।

'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই', বললেন জয়ন্তবাবু। জানা গেল ইনি হচ্ছেন একজন চিত্রশিল্পী। নাম সুদর্শন সোম। এককালে খুব নাম করা পোর্ট্রেট পেন্টার ছিলেন, শকুন্তলা দেবীর অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলেন। এখন রিটায়ার করে জয়ন্তবাবুর বাড়িতেই গেস্ট হয়ে থাকেন। আর্টিস্টকে এই বয়সে রিটায়ার করতে শুনিনি কখনো, তাই একটু অবাক লাগল। এবার লক্ষ করলাম বৈঠকখানার দেয়ালে একটা ছবি—এক মহিলার, বছর চল্লিশেক বয়স—তার তলার কোণের দিকে লেখা এস. সোম। ইনিই কি শকুন্তলা দেবী ? বয়স বেশি হলেও চেহারায় বেশ একটা জৌলুস রয়েছে। তখন অবিশ্যি শকুন্তলা দেবী আর ছবি করেন না। সুদর্শন সোম এবার বেয়ারার ট্রে থেকে একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিলেন। ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি কষ্ট হচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কথা বলছিলেন স্যামুয়েল সালডানহা। ইনি রাজনীতি নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন রতনলাল ব্যানার্জির সঙ্গে। সেই তর্কে দেখলাম সুদর্শন সোমও যোগ দিলেন।

আমি খালি ভাবছিলাম শকুন্তলা দেবীর হারটা কখন দেখা যাবে। দুই গিন্নীকে দেখছি অতিথিদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলেছেন। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী সুনীলা দেবী ফেলুদাকে এসে বললেন, 'আপনি অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছেন, ব্যাপার কী—আপনি ড্রিংক করেন না বুঝি ?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'না, আমাদের পেশায় মাথাটা সব সময় ঠাণ্ডা রাখাই ভালো।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম প্রাইভেট ডিটেকটিভরা ভীষণ ড্রিংক করে।'

'সেটা আপনার ধারণা হয়েছে বোধহয় আমেরিকান ক্রাইম উপন্যাস পড়ে।'

'তাই হবে। আমি ভীষণ গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত।'

'ভালো কথা', ফেলুদা আর না বলে পারল না, 'আপনার স্বামী বলছিলেন আজ শকুন্তলা দেবীর হারটা একবার আমাদের দেখাবেন।'

'ও হ্যাঁ—তা তো বটেই—দেখেছেন, আমি একদম ভুলে গেছি। শীলা!'

শীলা তার মা-র দিকে এগিয়ে এল।

'কী মা?'

'যাও তো সোনা—তোমার দিদিমার হারটা একবার নিয়ে এস তো। জানো তো চাবি কোথায় আছে। মিঃ মিত্র একবার দেখতে চাইছেন।'

শীলা তক্ষুনি চলে গেল আদেশ পালন করতে।

'চাবি বুঝি আপনার কাছে থাকে না?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'না। ওটা থাকে আমার ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে। হারটা থাকে সিন্দুকে। এ বাড়িতে চুরি হবার কোনো ভয় নেই। আমার চাকররা সব পুরোনো। সুলেমান—যে আপনাদের দরজা খুলে দিল—সে আছে আজ ত্রিশ বছর। অন্য চাকরও সব পুরোনো আর বিশ্বস্ত।'

তিন মিনিটের মধ্যে শীলা ফিরে এল—তার হাতে একটা গাঢ় নীল মখমলের বাক্স। মেয়ের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে নিলেন সুনীলা দেবী। তারপর 'এই যে' বলে বাক্সটা খুলে এগিয়ে দিলেন ফেলুদার দিকে।

আমি আর লালমোহনবাবু বাক্সটার দু'দিকে দাঁড়ালাম, আর দু'জনের মুখ থেকে একই সঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক নিশ্বাস টানার শব্দ বেরিয়ে এল।

এমন অপূর্ব গয়না আমি কখনো দেখিনি। নকশাদার সোনার হার। তাতে হীরে থেকে শুরু করে যত রকম মণিমুক্তো হয় সব বসানো।

'আশ্চর্য জিনিস', বলল ফেলুদা। 'এরকম হার দুটি হয় না। এটার আজকের দর কত হতে পারে তা আন্দাজ আছে আপনার?'

'তা দুই আড়াই লাখ হবে নিশ্চয়ই।'

'থাক—এটা আর বেশিক্ষণ বাইরে রাখা ভালো না। নাও, শীলা, এটা আবার রেখে দিয়ে এস।'

শীলা হারটা নিয়ে চলে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম যে জয়ন্তবাবুর ছেলে আমাদের দিকে বেশি ঘেঁসছে না। দেখে মনে হল ছেলেটি মিশুকে নয়। আর পার্টিটাও যেন সে বিশেষ উপভোগ করছে না। অবিশ্যি এই টাইপের এই বয়সী ছেলেরা এরকমই হয়, এটা কলকাতাতেও লক্ষ করেছি। এরা নিজের দল ছাড়া কোনো দলের সঙ্গেই মিশতে পারে না।

ড্রিংকসের পর্ব বোধহয় শেষ হল, কারণ এবার একজন ভদ্রলোক এসে এক রোল ফিল্ম নিয়ে প্রোজেক্টরে চাপাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি রেডি আছি।'

জয়ন্তবাবু এবার ঘোষণা করলেন যে শকুন্তলা দেবী অভিনীত কপালকুণ্ডলা

ছবির একটা রীল দেখানো হবে। 'সুলেমান, ঘরের বাতিগুলো নিবিয়ে দাও তো।'

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে প্রোজেক্টর চলতে শুরু করল। পর্দায় ছবি নড়ে উঠল। সেই আদ্যিকালের ছবি। জয়ন্তবাবু বললেন, 'এটা ১৯৩০ সালের ছবি। ভারতবর্ষে টকি আসার ঠিক আগে।'

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম শকুন্তলা দেবীকে। দেখলে মেমসাহেব মনে হয় না। চেহারা সত্যি খুবই সুন্দর—আজকের দিনেও পর্দায় এত সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সাইলেন্ট ছবির যা দোষত্রুটি আর থিয়েটারি অভিনয় সেটাও যে নেই এই কপালকুণ্ডলায় তা নয়। তবুও জানা গেল শকুন্তলা দেবীর পপুলারিটির খানিকটা কারণ। মহারাজা থেকে শুরু করে পানবিড়িওয়ালা পর্যন্ত সকলকেই মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। সকলেই তাঁর ছবি দেখত আর বাহবা দিত

দশ মিনিট চলে ছবি বন্ধ হল।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। সকলে আবার কথাবার্তা শুরু করল।

এই অন্ধকার অবস্থাতেই যে আরেকজন ঘরে ঢুকেছে তা টের পাইনি। এঁকে আমরা চিনি। ইনি হলেন মিঃ সুকিয়াস। ইনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন পার্টির দিনে এসে পড়ার জন্য। অর্থাৎ ইনি নিমন্ত্রিত হননি—এমনি বোধহয় জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বেয়ারা এসে খবর দিল পাত পড়েছে—ডিনার ইজ সার্ভড।

চমৎকার মোগলাই রান্না খেয়ে আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন বেজেছে সোয়া এগারোটা পার্টি যে আরো কিছুক্ষণ চলে .তে

॥ ৪ ॥

পরদিন সকালে ফেলুদা আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

'কী ব্যাপার, ফেলুদা?'

ফেলুদার মুখ গম্ভীর।

'জয়ন্তবাবু ফোন করেছিলেন। এক্ষুনি। শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহার মিসিং।'

'সর্বনাশ!'

'তুই চট্ করে তৈরি হয়ে নে। আমি লালমোহনবাবুকে খবরটা দিয়ে আসছি। আমাদের ব্রেকফাস্ট খেয়েই যেতে হবে ওখানে। শুধু মিঃ সুকিয়াস ছাড়া আর সকলেই এসেছে ওখানে খবরটা পেয়ে।'

'পুলিশে খবর দেয়নি ?'

'দিয়েছে, কিন্তু আমাকেও চায়।'

আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে জয়ন্তবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। বাড়ির সবাই কেমন যেন পাথরের মতো চুপ। ফেলুদা ক্ষমা চাইল। 'কাল আমাদের দেখানোর জন্যই হারটা বার করা হয়েছিল। তার সঙ্গে এ চুরির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমি নিজে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছি বলে কথাটা বললাম।'

পুলিশের লোক আগেই এসে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যিনি কর্তা তিনি ফেলুদার দিকে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমি ইনস্পেক্টর পাণ্ডে। আপনি তো বোধহয় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মিঃ মিটার ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা।

'আই অ্যাম ফ্যামিলিয়ার উইথ ইয়োর নেম', বললেন পাণ্ডে। 'আপনার কয়েকটা সাক্সেসফুল ইনভেস্টিগেশনের কথা আমার মনে আছে। তা আপনি তো বোধহয় জেরা করতে চান ?'

'আগে আপনার কাজ শেষ হয়ে যাক,' বলল ফেলুদা। 'তারপর আমার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

প্রশ্ন করে জানা গেল যে কাল রাত্রে সবাই চলে যাবার পর বারোটা নাগাদ জয়ন্তবাবুর স্ত্রী তাঁর বেডরুমে গিয়ে শুতে যাবার আগে কেন জানি আরেকবার হারটা দেখার ইচ্ছা অনুভব করেন। হয়তো কপালকুণ্ডলা ছবিতে শকুন্তলা দেবীকে হার পরা অবস্থায় দেখেই সে ইচ্ছেটা জাগে। ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন, 'এটা একটা ভ্যানিটির ব্যাপার। আমার মা-র গলায় হারটা এত সুন্দর মানাতো, সেটা দেখেই আমার মনে একটা ইচ্ছে হল হারটা একবার পরে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি। মেয়েরা শুতে যাবার আগে বেশ খানিকটা সময় ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে কাটায়। সেই সময়ই দেরাজ থেকে চাবিটা বার করে সিন্দুক খুলে দেখি হারটা নেই। আমি তৎক্ষণাৎ আমার মেয়েকে ডাকি। মেয়ে জোর দিয়ে বলে যে সে সিন্দুকেই রেখে ছিল হারটা। সেখানে ছাড়া আর কোথায়ই বা রাখবে ? সিন্দুকেই তো চিরকাল থেকেছে হারটা।'

'আপনারা ভালো করে খুঁজে দেখেছেন হারটা ?' পাণ্ডে জিজ্ঞেস করলেন।

'কোথায় আর খুঁজব বলুন,' বললেন সুনীলা দেবী, 'ওটা যে কেউ সিন্দুক থেকে বার করে নিয়েছে তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই !'

'আপনাদের বাড়িতে কাল পার্টি ছিল, তাই না ?' পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ', বললেন জয়ন্তবাবু।

'কটা থেকে কটা পর্যন্ত ?'

'আটটা থেকে পৌনে বারোটা।'

'মিসেস বিশ্বাস, আপনি কি পার্টির পরেই আপনার ঘরে চলে যান ?'

'হ্যাঁ।'

'আর তার কতক্ষণ পরে আবিষ্কার করেন যে হারটা নেই ?'

'মিনিট পনের।'

'এর মধ্যে আপনি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোননি ?'

'না।'

'অর্থাৎ হারটা চুরি হয়েছে ডিউরিং দা পার্টি ?'

'তাই তো মনে হয়,' বললেন জয়ন্তবাবু। এখানে একটা কথা বলি—পার্টির

মধ্যে হারটাকে আমার মেয়ে একবার সিন্দুক থেকে এই ঘরে আনে—মিঃ মিত্রকে দেখানোর জন্য।'

'তার পরেই—তখনই কি আপনার মেয়ে হারটাকে আবার সিন্দুকে তুলে দেয়?'

'হ্যাঁ', বলল মেরি শীলা। 'আমি এক মুহূর্ত দেরি করিনি।'

'এখানে একটা জরুরী কথা বলা দরকার,' বললেন জয়ন্তবাবু। 'হারটা তুলে রাখার কিছু পরেই এ ঘরে একটা দশ মিনিটের ফিল্ম দেখানো হয়।'

'তার জন্য তখন বাতি নেবানো হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এ বাড়িতে চাকর ক'জন?

'তিনজন। একজন রান্না করে। আর দু'জন বেয়ারা।'

'কতদিনের লোক এরা?'

'কেউই পনের বছরের কম না। এরা অত্যন্ত বিশ্বাসী। সুলেমান তো আমার শ্বশুরের আমল থেকে আছে।'

'তাহলে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে,' বললেন পাণ্ডে। 'জিনিসটা শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে। এই বাড়ির লোক সমেত এই পার্টিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরই একজন হারটা নিয়েছেন।'

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল, আর আমার মনে হয় ফেলুদা আর লালমোহনবাবুরও তাই।

পাণ্ডে এবার ফেলুদার দিকে ফিরলেন।

'মিঃ মিটার, আপনার সঙ্গে যে দু'জন এসেছেন, তাঁদের পরিচয় পেতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই', বলল ফেলুদা। 'ইনি আমার কাজিন তপেশ মিত্র, আর ইনি আমার বন্ধু—বিখ্যাত লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী।'

'এই লেখকটিকে আপনি কতদিন হল চেনেন?'

'বছর পাঁচ-ছয়।'

আমি লালমোহনবাবুর দিকে দেখছিলাম। ভদ্রলোক ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন। আমি ওঁকে কণ্ঠহার চোর হিসেবে কল্পনা করলাম। এই সংকটের অবস্থাতেও আমার হাসি পেয়ে গেল।

এবার পাণ্ডে অন্য প্রশ্নে গেলেন।

'এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ক'জন এ বাড়িতে থাকেন?'

জয়ন্তবাবু বললেন, 'আমি, আমার স্ত্রী, আমার দুই ছেলেমেয়ে এবং আর্টিস্ট মিঃ সোম।'

মিঃ সোম আজও দাড়ি কামাননি। তাই তাঁকে আরো অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

'আর সকলেই বাইরের লোক?' পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। মিঃ সালডানহা থাকেন ক্লাইভ রোডে। উনি আমার ব্রাদার-ইন-ল। ওঁর স্ত্রী আমার স্ত্রীর বড় বোন।'

'আরেকজনকে দেখছি,' রতনলালের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন মিঃ পাণ্ডে।

'উনি রতনলাল ব্যানার্জি-- আমার স্ত্রীর ছোট ভাই।'

'এ ছাড়া আর কেউ ছিল?'

'একজন ছিলেন। লাটুশ রোডের মিঃ সুকিয়াস। উনি অবশ্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন না, এমনিই এসে পড়েন। তিনি এসেছিলেন যখন ফিল্মটা দেখানো হচ্ছে তার মাঝখানে। আলো জ্বালার পরে আমি তাঁকে দেখি।'

'এই সুকিয়াসের প্রোফেশন কী?'

'হি ইজ এ কালেক্টর অফ আর্ট অবজেক্টস। তাছাড়া জেজারতির কারবার আছে।'

'ইনি কি এই হারটা সম্বন্ধে কোনোদিন ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলেন?'

'উনি ওটা কিনতে চেয়েছিলেন। আমরা বিক্রি করিনি।'

'আই সী।'

ইনস্পেক্টর পাণ্ডে একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে কাল এখানে যারা ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন হারটা নিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে, সেই হারটা কোথায়।'

জয়ন্তবাবু গলা খাকরে নিয়ে বললেন, 'আপনি যদি সার্চ করতে চান তাহলে করতে পারেন। এমনকি ব্যক্তিগত খানাতল্লাসাতেও আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।'

পাণ্ডে বললেন, 'তা তো করতেই হবে। সার্চ থেকে মহিলারাও বাদ পড়বেন না। এবং তার জন্য আমি মেয়ে পুলিশের বন্দোবস্ত করছি। তা ছাড়া বাড়িটাও ভালো করে সার্চ করা দরকার।'

সার্চের ব্যাপারে দেখলাম কেউই আপত্তি করলেন না। খালি সালডানহা বললেন, 'আমার দোকান খুলতে হবে দশটার সময়। তার মধ্যে আমার সার্চ হয়ে গেলে ভালো।'

ফেলুদা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, 'এখানে সার্চ চলুক, আমি তাহলে এখন আসি। যদি হারটা পাওয়া যায় তাহলে অনুরোধ করি সেই খবরটা আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। না হলে আমি ও বেলা আবার আসব।'

আমরা তিনজনে হোটেলে ফিরে এলাম। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে আমাদের ঘরেই এলেন। ভদ্রলোক ঢুকেই বললেন, 'এ নিয়ে ক বার হল বলুন

তো, যে আমরা বেড়াতে গিয়ে কেসে জড়িয়ে পড়েছি ? এ জিনিস টেলিপ্যাথি ছাড়া হয় না।'

ফেলুদা বলল, 'দেখি আপনার স্মরণশক্তি কতদূর। তোপ্‌শেকে তো এর আগে অনেকবার পরীক্ষা করেছি, আপনাকে কখনো করা হয়নি।'

'ভেরি ওয়েল স্যার, আই অ্যাম রেডি', বললেন জটায়ু।

'আগে শকুন্তলা দেবীর ফ্যামিলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি।'

'করুন।'

'ভদ্রমহিলার তিন সন্তানের নাম বলুন তো।'

'বড় মেয়ে সুশীলা—'

'তার আগে একটা ক্রিশ্চান নাম আছে।'

'ও হ্যাঁ—ক্রিশ্চান নাম...ক্রিশ্চান নাম...'

'তোপ্‌শে, বলতে পারিস ?'

আমার মনে ছিল। বললাম, 'মার্গারেট।'

'ভেরি গুড। তার পরের মেয়ে, অর্থাৎ জয়ন্তবাবুর স্ত্রী ? এই প্রশ্নটা কিন্তু লালমোহনবাবুকে করছি।'

লালমোহনবাবু এটা ভোলেননি। বললেন, 'প্যামেলা সুনীলা।'

'গুড। তাঁর পরের ভাই ?'

'ইয়ে—রতনলাল। অ্যালবার্ট রতনলাল।'

'এবার সুশীলা দেবীর স্বামীর নাম ?'

'স্যামুয়েল সালডান্‌হা।'

'ভেরি গুড। সুনীলা দেবীর ছেলেমেয়ে ?'

'মেয়ে শীলা—মেরি শীলা। আর ছেলে প্রসেনজিৎ। ক্রিশ্চান নাম ভুলে গেছি।'

'ভিক্টর। আর কে ছিলেন কাল পার্টিতে ?'

'সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক। নামটা মনে পড়ছে না।'

'তোপশে ?'

'সোম। সুদর্শন সোম।'

'গুড।'

'কিছু মাইন্ড করবেন না মশাই', লালমোহনবাবু বললেন, 'ভদ্রলোককে কিন্তু আমার ভালো লাগল না।'

'কেন ?'

'কীরকম পাগলাটে চেহারা। দাড়ি কামাননি।'

'আর্টিস্টরা সব সময় সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলে না।'

'তা হতে পারে। মোট কথা, উনি আর আরেকজন আমার কাছে এই চুরির ব্যাপারে প্রাইম সাসপেক্টস।'

'আরেকজন কে?'

'জয়ন্তবাবুর ছেলে প্রসেনজিৎ। একেবারে কলকাতার পার্ক স্ট্রীটের বাউণ্ডুলেদের মতো চেহারা। অবশ্য মদ তো দেখলাম খায় না ছেলেটি।'

'খেলেও হয়তো বাপের সামনে খায় না।'

'এনিওয়ে, পার্টিতে কিন্তু আরেকজন ছিলেন।'

'মিঃ সুকিয়াস তো?'

'হ্যাঁ। এঁর কিন্তু হারটার উপর লোভ ছিল।'

'যে কোনো আর্ট কালেক্টরেরই থাকবে। সেটা কিছুই আশ্চর্য না। আর্ট কালেক্টর হলে কিনতে চাইবে। আর অভাবী লোক হলে হাতাতে চাইবে। এঁদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কোনো কিছুই জানি না। কাজেই এখন অন্ধকারে হাতড়ে লাভ নেই। বিকেলে জয়ন্তবাবু ফোন করবেন, তার আগে পর্যন্ত আমরা ফ্রী। চলুন, আপনাকে কাইজার-বাগটা দেখিয়ে আনি।'

'ভেরি গুড আইডিয়া', বললেন লালমোহনবাবু। 'তদন্তের চাপে যদি লখ্‌নৌ শহরটা দেখা সম্পূর্ণ না হয় তাহলে খুব আপসোস থেকে যাবে।'

॥ ৫ ॥

বিকেলে কথামতো জয়ন্তবাবু ফোন করলেন। পুলিশ সার্চ করে কিছু পায়নি। বাড়ির চাকরদের জেরা করা হয়েছে, তাতেও কোনো ফল হয়নি। ফেলুদা বলল, 'চল, এবার একবার জয়ন্তবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। এবার ফেলু মিত্তিরের কাজ শুরু। অবিশ্যি পুলিশ তাদের তদন্ত চালিয়েই যাবে, কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না।'

হোটেলেই ট্যাক্সি ছিল, একটা নিয়ে গুমতীর ব্রিজ পেরিয়ে জয়ন্তবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। আজ বাড়িটাকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল, বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

সুলেমান এসে দরজা খুলে দিল, আমরা তিনজন ভিতরে ঢুকলাম। জয়ন্তবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বৈঠকখানায়, আমাদের দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে এলেন।

'ওটা পাওয়া গেল না', প্রথম কথাই বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদা বলল, 'সেটা অস্বাভাবিক নয়। আমারও মনে হয়েছিল ওটা পাওয়া

যাবে না। যে নিয়েছে সে তো আর বোকা নয় যে হাতের কাছে রেখে দেবে জিনিসটা।'

'আপনিও কি আলাদা করে সার্চ করতে চান?'

'না,' বলল ফেলুদা। 'আমি আপনার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। এখন এ বাড়িতে কে কে রয়েছেন?'

'আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, ছেলে বোধহয় এখনো ফেরেনি। আর আছেন সোম—যাঁর সঙ্গে কাল আপনাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আমার কিন্তু মিঃ সাল্‌ডান্‌হার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। আর মিঃ সুকিয়াস।'

'সেটা কোনো অসুবিধা নেই। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দেব, আপনি ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে চলে যাবেন।'

'তাহলে আপনাকে দিয়ে শুরু করা যাক।'

'বেশ তো।'

আমরা সকলেই সোফায় বসলাম।

'একটু চা খাবেন তো?' জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'তা খেতে পারি।'

জয়ন্তবাবু সুলেমানকে ডেকে চার কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে তার প্রশ্ন শুরু করল।

'আপনি বলছিলেন সুকিয়াস আপনার শাশুড়ির হারটা কিনতে চেয়েছিলেন। সেটা কতদিন আগে?'

'বছরখানেক হবে।'

'সুকিয়াস জানলেন কী করে এই হারের কথা?'

'এটার কথা অনেকেই জানে। এককালে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল তো। আমার শাশুড়ি মারা যাবার পর তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানকার "পায়োনিয়ার" কাগজে বেরিয়েছিল। তাতে হারের কথাটা ছিল। সুকিয়াস এমনিতে মানিলেন্ডার, তেজারতির কারবার করে। ভাবলে মনে হয় এমন লোকের শিল্পের দিকে কোনো ঝোঁক থাকবে না। কিন্তু সুকিয়াস এ ব্যাপারে একটা বিরাট ব্যতিক্রম। আমি ওর বাড়িতে গিয়েছি, ওর সংগ্রহ দেখেছি। দেখবার মতো সব জিনিস আছে ওর কাছে। ওর রুচি অনবদ্য।'

'আপনি যখন হারটা বিক্রি করলেন না, তখন ওর প্রতিক্রিয়া কী হয়?'

'ও খুবই হতাশ হয়েছিল। ও দু' লাখ টাকা অফার করেছিল। আমি নিজে হলে কী করতাম জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী হারটার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। কোনো মতেই ওটা হাতছাড়া করবে না। আর সেই হারই...'

জয়ন্তবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আপনি কাউকে সন্দেহ করেন এই ব্যাপারে?'

'আমি সম্পূর্ণ হতভম্ব। চাকরবাকর কাউকেই আমার সন্দেহ হয় না। ওরা বেইমানী করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। অথচ তার বাইরে কে যে এটা নিতে পারে, এবং কেন, সেটা বোঝার সাধ্যি আমার নেই।'

'আপনি তো ব্যবসাদার', ফেলুদা বলল।

'ব্যবসাদার মানে আমার একটি ইমপোর্ট এক্সপোর্টের আপিস আছে।'

'কেমন চলে আপিস?'

'ভালোই। আমাদেরই কোম্পানি। আমার একজন পার্টনার আছে।'

'কী নাম?'

'ত্রিভুবন নাগর। এখানকারই লোক। আমার প্রথম জীবনে আমি ব্যবসায় ছিলাম না, একটা সওদাগরী আপিসে চাকরি করতাম। নাগর ছিল আমার বন্ধু। ত্রিশ বছর আগে নাগর আর আমি মিলে আমাদের ব্যবসা শুরু করি।'

'আপনাদের কোম্পানির নাম কী?'

'মডার্ন ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট।'

'কোথায় আপনাদের আপিস?'

'হজরতগঞ্জে।'

ইতিমধ্যে আমাদের চা এসে গেছে, আমরা খেতে শুরু করে দিয়েছি। ফেলুদা বলল, 'আরেকটা প্রশ্ন আছে।'

'কী?'

'কাল যখন ফিল্মটা চলছিল তখন আপনি কাউকে চলাফেরা করতে, কিংবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন?'

'উঁহু।'

'আপনার ছেলে কোনো চাকরি করে?'

'এখনো না। ওকে আমার আপিসে ঢোকানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু ও রাজি হয়নি।'

'ওর বয়স কত?'

'পঁচিশ।'

'ওর কোনদিকে ঝোঁক?'

'ঈশ্বর জানেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যায় কি?'

'নিশ্চয়ই। ও খুবই ডিপ্রেস্‌ড হয়ে পড়েছে, বুঝতেই পারেন।'

'আমি বেশি বিরক্ত করব না ওঁকে?'

চা খাবার পর জয়ন্তবাবু গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। ভদ্রমহিলা কান্নাকাটি করেছেন সেটা এখনো দেখলে বোঝা যায়। দিনের বেলা দেখে আরো বেশি করে মনে হল যে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে এঁর আশ্চর্য চেহারার মিল। ভদ্রমহিলা চাপা গলায় বললেন, 'আপনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিলেন... ?'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ। বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না। সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন।'

'বলুন।'

'আপনার মা যে হারটা আপনার দিদিকে না দিয়ে আপনাকে দিলেন তাতে আপনার দিদির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?'

'তিনি বোধহয় এ ব্যাপারটা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলেন।'

'কেন ?'

'দিদি ছিল আমার বাবার ফেভারিট, আর আমি ছিলাম মা-র। মা মারা যাবার তিন বছর আগে হারটা আমাকে দেন। দিদির মনের অবস্থা কী হয়েছিল বলতে পারব না, কারণ এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কখনো কোনো আলোচনা হয়নি।'

'আপনার দিদির সঙ্গে আপনার সদ্ভাব আছে ?'

'হ্যাঁ। যত দিন যাচ্ছে আমরা দু'জনে তত আরো কাছাকাছি এসে পড়ছি। যখন ইয়াং ছিলাম তখন দু'জনের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব ছিল।'

'আপনি তো অভিনয় করতে খুব ভালোবাসেন ?'

'হ্যাঁ। তাই তো মা আমাকে নিয়ে এত প্রাউড ছিলেন। এ ব্যাপারে দিদির কোনো শখ ছিল না।'

'আপনার মেয়ের ?'

'শীলা স্কুলে কলেজে অ্যাকটিং করেছে, ক্লাবে-টলাবেও দু'-একবার করেছে। তার বেশি নয়। ও ফিল্মে অফার পেয়েছে, কিন্তু নেয়নি।'

'ও কী করতে চায় ?'

'ও ওয়ার্কিং গার্ল হতে চায়। আপিসে কাজ করবে, নিজে রোজগার করবে। ও তো সবে বি-এ পাশ করেছে। এর মধ্যে কিছু জার্নালিজম করেছে, খবরের কাগজে ওর দু'-একটা লেখা বেরিয়েছে।'

'আপনি কি এই চুরির ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন ?'

'কাউকেই না। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে একেবারেই সাহায্য করতে পারব না।'

'কাল যখন ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল তখন কাউকে হাঁটাচলা করতে দেখেছিলেন ?'

'না। মনে হল সকলেই তন্ময় হয়ে ছবিটা দেখছে।'

'ঠিক আছে, মিসেস বিশ্বাস। আপনার ছুটি।'

মিসেস বিশ্বাস ধন্যবাদ দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

ফেলুদা জয়ন্তবাবুর দিকে ফিরল।

'আমি একবার মিঃ সোমের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বেশ তো, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জয়ন্তবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

দু' মিনিটের মধ্যে সুদর্শন সোম এসে হাজির হলেন। আজ তিনি দাড়ি কামিয়েছেন কোনো একটা সময়, তাই তাঁকে একটু ভদ্রস্থ লাগছে। তিনি ফেলুদার সামনের সোফায় বসলেন, তাঁর মুখে চুরুট। কাল পার্টিতেও এঁকে চুরুট খেতে দেখেছি। কড়া গন্ধে ঘরটা ভরে গেল।

ফেলুদা প্রশ্ন শুরু করল।

'আপনি কত দিন এ বাড়িতে রয়েছেন?'

বছর পনের হল। শকুন্তলা দেবীই আমাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেন।'

'আপনি এক কথায় রাজি হয়ে যান? পরের আশ্রিত হতে কোনোরকম দ্বিধা-সংকোচ বোধ করেননি?'

'তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আসছে। এখন আমার বয়স সাতষট্টি। তখনই আমি পঞ্চাশের উপর। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আরথ্রাইটিস, তাই ছবি আঁকতে পারছি না। শকুন্তলা দেবীর অনুগ্রহে আমার তবু একটা সংস্থান হল। তা না হলে আমি যে কী করতাম জানি না। আমায় না খেয়ে মরতে হত। অবশ্য পরের চ্যারিটি ভোগ করছি এই নিয়ে অনেকদিন খুব সচেতন ছিলাম, মনটা খচখচ করত। কিন্তু এঁরাও আমার উপস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন, শীলা আর প্রসেনজিৎ আমাকে খুব ভালোবাসত, তাই ব্যাপারটা ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।'

'আপনার নিজের রোজগার বলে তো কিছুই নেই।'

'দু' একটা পুরানো ছবি মাঝে মাঝে অল্প দামে বিক্রি হয়। সে তেমন কিছুই না। সত্যি বলতে কি, আই অ্যাম পেনিলেস। জয়ন্তবাবু আমাকে প্রতি মাসে হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দেন, আর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটা রয়েছে। চুরুটের অভ্যাসটা অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারিনি। তবে অনেক কমিয়ে দিয়েছি।'

'এই চুরির ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

মিঃ সোম একটু ভেবে বললেন, 'চাকরদের কাউকে হয় না।'

'তবে কাকে হয়?'

মিঃ সোম আবার চুপ কবে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি ইতস্তত করলে কিন্তু আমাব কাজটা আরো কঠিন হযে পডবে। আপনি নিশ্চয়ই চান যে শকুন্তলা দেবীব হারটা আবার উদ্ধাব হোক।'

'তা তো বটেই।'

'তাহলে বলুন আপনাব কাউকে সন্দেহ হয কিনা।'

'একজনকে হয।'

'কে সে?'

'প্রসেনজিৎ।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'প্রসেনজিৎ আব আগেব মতো নেই। সে অনেক বদলে গেছে। আমাব

ধারণা সে কুসঙ্গে পড়েছে। হয়তো জুয়া খেলে, নেশা করে, তার জন্য তার টাকার দরকার পড়ে। চাকরি-বাকরি তো কিছুই করে না। বাপ তাকে যা দেন তাতে তার চলে না। সে আমার কাছ থেকে পর্যন্ত টাকা ধার চায়। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার কথায় সে কানই দেয় না।'

'আই সী...। কাল যখন সিনেমা হচ্ছিল তখন কাউকে নড়াচড়া করতে বা জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে না। আমি পর্দায় ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।'

'ঠিক আছে, মিঃ সোম। অনেক ধন্যবাদ। এবার আপনি যদি শীলাকে একটু পাঠিয়ে দেন।'

মিঃ সোম শীলার খোঁজে চলে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীলা এসে পড়ল। তার পরনে সালওয়ার কামিজ, গায়ে কোনো গয়না নেই। একেবারে আধুনিকা।

'কী করছিলে, শীলা?' শীলা সোফায় বসার পর ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'একটা আর্টিকল লিখছিলাম।'

'খবরের কাগজের জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'কী বিষয়?'

'ঘর কী করে সাজাতে হয় তাই নিয়ে।'

'তুমি কি ইনটিরিয়র ডেকোরেশনে ইন্টারেস্টেড নাকি?'

'হ্যাঁ। ওটাকেই আমার প্রোফেশন করার ইচ্ছে আছে।'

'ও বিষয় শিখেছ কিছু?'

'এমনি কিছু শিখিনি, কিন্তু ও বিষয় অনেক বই পড়েছি।'

'আঁকতে পার?'

'মোটামুটি। ছেলেবেলায় সুদর্শনকাকু আমাকে খুব এনকারেজ করতেন। যখন আমার বারো-তেরো বছর বয়স।'

'তোমার দাদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কিরকম?'

'আগে দু'জনে খুব বন্ধু ছিলাম। এখন দাদা বদলে গেছে। আমার সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না।'

'তাতে তোমার খারাপ লাগে না?'

'আগে লাগত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'কাল রাত্রে হারটা আমাদের দেখিয়ে আবার ঠিক জায়গায় রেখেছিলে তো?'

'নিশ্চয়ই। চাবিও ঠিক জায়গায় রেখেছিলাম।'

'তারপর সেটা কীভাবে উধাও হল সে বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা

আছে ?'

'আমার কী করে থাকবে ?' শীলা একটু হেসে বলল। 'বরং আপনার থাকা উচিত। আপনি তো ডিটেকটিভ।'

'ডিটেকটিভরা তো প্রশ্ন করেই তাদের তদন্ত করে, সেটা নিশ্চয়ই তুমি জান।'

'তা জানি।'

এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় বেলের শব্দ হল। সুলেমান দরজা খুলে দিতে প্রসেনজিৎ ঢুকল। সে আমাদের দেখে যেন একটু হকচকিয়ে গেল, কিন্তু তার পরেই সামলে নিয়ে বলল, 'ডিটেকটশন চলছে বুঝি ?'

ফেলুদা বলল, 'তোমার বোনকে প্রশ্ন করছিলাম কালকের ব্যাপার নিয়ে। এবার ভাবছি তোমাকে করব, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি আছে বৈকি। পুলিশও আমাকে জেরা করার চেষ্টা করেছিল। আমি কোনো কথার জবাব দিইনি।'

'কিন্তু আমি তো পুলিশ নই।'

'ইট মেক্‌স নো ডিফারেন্স। কোনো কথার জবাব আমি দেব না।'

'তাহলে কিন্তু তোমার উপর সন্দেহ পড়তে পারে।'

'পড়ুক। আই ডোন্ট কেয়ার। শুধু সন্দেহে তো আর কিছু হবে না। প্রমাণ চাই, সেই হারটা খুঁজে পাওয়া চাই।'

'বেশ, তুমি যখন কো-অপারেট করবে না তখন আমাদের দিক থেকেও বলার কিছু নেই। আমরা তোমাকে ফোর্স করতে পারি না।'

ফেলুদা উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমরা দু'জনও।

কিন্তু ফেলুদার কাজ শেষ হয়নি। সে বলল, 'আমি এবার বাড়ির প্ল্যানটা দেখতে চাই।'

শীলা বলল, 'চলুন, আমি আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।'

যা দেখলাম তা মোটামুটি এই—বৈঠকখানার পরেই খাবার ঘর, তারপর জয়ন্তবাবু আর সুনীলা দেবীর বেডরুম, তার সঙ্গে বাথরুম। এই বেডরুমের দু'পাশে আরো দুটো বাথরুম সমেত বেডরুম, সে দুটোর একটাতে থাকে শীলা, অন্যটায় প্রসেনজিৎ। জয়ন্তবাবুর ঘর থেকে দুটো ঘরে যাবার জন্য দরজা আছে। প্রসেনজিতের ঘরের পাশে একটা ছোট্ট গেস্টরুম আছে তাতে থাকেন মিঃ সোম।

প্ল্যানটা দেখে বৈঠকখানায় ফিরে এলে শীলা ফেলুদাকে বলল, 'আমি কিন্তু দু'-একদিনের মধ্যেই অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে আসছি।'

'আমি তো বলেইছি।' ফেলুদা বলল, 'যখন ইচ্ছে এস—তবে একটা ফোন

করে এস। আমি তো এখন তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি—কখন কোথায় থাকি বলতে পারি না। ভালো কথা—তোমার বাবাকে একবার আসতে বলবে? একটু দরকার ছিল।'

শীলা জয়ন্তবাবুকে পাঠিয়ে দিল।

'হল আপনার কোয়েশ্চনিং?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'তা হল, তবে আপনার ছেলে কোনো প্রশ্ন করতে দিল না।'

জয়ন্তবাবু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'প্রসেনজিৎ ওরকমই। ওর আশা আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।'

'যাই হোক—আপনাকে ডাকার কারণ—মিঃ সালডানহা কি এখনো দোকানে থাকবেন?'

'এখন তো সাড়ে পাঁচটা—এখনও নিশ্চয়ই থাকবে।'

'তাহলে ওঁর দোকানের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা যদি দেন।'

জয়ন্তবাবু তখনই টেলিফোনের পাশে রাখা প্যাড থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে ফেলুদার হাতে দিলেন।

'এখান থেকেই ফোন করে নিই?' বলল ফেলুদা।

'সার্টেনলি।'

ফেলুদা ফোন করতেই ভদ্রলোককে পেয়ে গেল। উনি তখনই ফেলুদাকে চলে আসতে বললেন।

'আরেকজনের সঙ্গে কথা বলা বাকি থেকে যাচ্ছে', বলল ফেলুদা, 'তিনি হলেন আপনার শালা রতনলালবাবু। মিঃ সুকিয়াসকে কাল প্রশ্ন করব।'

'রতনলাল থাকে ফ্রেজার রোডে একটা ফ্ল্যাটে। তার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। তাকে পাবার ভালো সময় হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটার পর।'

॥ ৬ ॥

হজরতগঞ্জে সালডানহা অ্যান্ড কোম্পানিতে পৌঁছে একটু হকচকিয়েই গেলাম। এতো পুরানো দোকান সেটা ভাবতে পারিনি। আর পনের মিনিট পরেই দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ভদ্রলোক একটা ডেস্কের পিছনে বসে ছিলেন, দোকানে কোনো খদ্দের নেই, খালি একজন কর্মচারী এদিক ওদিক ঘুরছে। সালডানহা আমাদের দেখেই হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'আসুন, বসুন, মিঃ মিটার।'

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম।

'এখানে এসে আপনাকে অসুবিধায় ফেললাম না তো ?' ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'মোটেই না। এখন তো ক্লোজিং টাইম এসে গেল। এখানে আপনার কী কথা আছে বলে নিন, তারপর আপনাদের আমার গাড়িতে করে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। সেখানে কফি খাবেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'তাহলে ভালোই হবে,' বলল ফেলুদা, 'কারণ আপনার স্ত্রীকেও দু-একটা প্রশ্ন করার আছে। কালকের পার্টির সকলকেই আমরা প্রশ্ন করছি।'

'দ্যাট্‌স অল রাইট। আই ডোন্ট থিংক সি উইল মাইন্ড।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনার এ দোকান কতদিনের ?'

'তা প্রায় সত্তর বছর হল। আমার ঠাকুরদাদা দোকানটার পত্তন করেন। লখ্‌নৌ-এর প্রথম মিউজিক শপ।'

'কিন্তু এখন নিশ্চয়ই আরো মিউজিক শপ হয়েছে ?'

'আরো দুটো হয়েছে—দুটোই আমাদের জাতভাইদের করা। একটার মালিক ডিমেলো, আরেকটার নরোনহা। এদের মধ্যে একটা আবার হজরতগঞ্জেই—আমার দোকানের কাছেই। দুঃখের বিষয় আমরা ঠিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারিনি। সেটা বোধহয় দোকানের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন।'

'আপনাদের ব্যবসা তার মানে ভালো চলছে না ?'

'কি আর বলব, মিঃ মিটার। এটা কম্পিটিশনের যুগ। আমার ছেলেকে যদি দোকানে বসাতে পারতাম তাহলে তার ইয়াং আইডিয়াজ অনেক কাজে দিত। কিন্তু সে ডাক্তারি পাশ করে চলে গেল আমেরিকা। এখন অবশ্য সে সেখানে খুব ভালোই রোজগার করছে। আর আমি বুড়ো মানুষ একাই দোকান সামলাচ্ছি। বিক্রি যে একেবারে হয় না তা নয়, আমার কিছু ফেইথফুল কাস্টমারস আছে। কিন্তু আজকাল যুগ অনেক বদলে গেছে। অনেস্টির আর দাম নেই ; লোকে চায় চটক।'

ফেলুদা সহানুভূতি প্রকাশ করে আসল প্রশ্নে চলে গেল।

'কাল যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেটা সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে ?'

'কী আর বলব বলুন। ও হার যখন আমার স্ত্রী না পেয়ে আমার শালী পেল, তখন মার্গারেট একেবারে ভেঙে পড়ে। সী লাভ্‌ড দ্যাট নেকলেস। কার না ভালো লাগবে বলুন—এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর প্রাইসলেস জিনিস ?'

'আপনি বলছেন ঈশ্বরের চোখেও এটা একটা অন্যায় বলে মনে হয়েছিল ?'

'তা না হলে প্যামেলার এ ক্ষতি হবে কেন ? শকুন্তলা দেবীর পক্ষপাতিত্ব ভগবানের চোখেও দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কে এই হারটা নিতে পারে সে বিষয় আপনার কোনো ধারণা আছে ?'

'নো, মিঃ মিটার। সে বিষয় আমি আপনাকে কোনোরকম ভাবে সাহায্য করতে পারব না। আমার কোনো ধারণা নেই।'

'সুনীলা দেবীর ছেলে যে কুপথে যাচ্ছে সেটা আপনি জানেন ?'

'আমি সেটা আন্দাজ করেছি।'

'সে বোধহয় নেশা করে। আর তার জন্য তার প্রায়ই টাকার দরকার হয়।'

সাল্‌হাডন্‌হা চুক্‌চুক্ করে আক্ষেপসূচক শব্দ করলেন। তারপর বললেন, 'দ্যাট মে বি সো। কিন্তু তাই বলে সে তার মা-র এমন একটা সাধের জিনিস চুরি করবে ? এটা আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।'

'কাল ফিল্মটা চলার সময় কাউকে ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিলেন ?'

'নো। বাট আই স সুকিয়াস কামিং ইন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম।

মিঃ সাল্‌ডান্‌হার গাড়িতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখন সোয়া ছ'টা—সবে সন্ধ্যে হয়েছে।

সাল্‌ডান্‌হার বাড়ি জয়ন্তবাবুর বাড়ির তুলনায় অনেক ছোট। এটাও একতলা বাংলো টাইপের বাড়ি। ভেতরে ঢুকে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। এ বৈঠকখানায় জয়ন্তবাবুর বাড়ির বৈঠকখানার বাহার নেই। বোঝাই যায় সাল্‌ডান্‌হার অবস্থা তেমন ভালো না। এবং তাঁর গৃহিণীর বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার দিকে তেমন ঝোঁক নেই।

'মার্গারেট—ইউ হ্যাভ ভিজিটরস' বলে একটা হাঁক দিয়ে সালডানহা আমাদের পাশের সোফায় বসে পড়লেন। আমাদের অবিশ্যি পরমুহূর্তেই দাঁড়াতে হল। কারণ ঘরে মিসেস সাল্‌ডান্‌হা, অর্থাৎ মার্গারেট সুশীলা দেবী, এসে ঢুকেছেন।

'ও—মিঃ মিত্র !'

ভদ্রমহিলার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। তবে সে হাসি মুখ আলো করা হাসি নয়। কারণ হাসা সত্ত্বেও একটা অবসাদের ভাব মুখে থেকে গেল।

ফেলুদা বলল, 'বসুন, সুশীলা দেবী। আপনি বোধহয় জানেন না যে জয়ন্তবাবু কালকের চুরির ব্যাপারে আমাকে তদন্ত করতে বলেছেন।'

'সেটা আজ সকালেই আন্দাজ করছিলাম।'

'সেই ব্যাপারেই আমি আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

সাল্‌ডান্‌হা এই সময় উঠে পড়ে বললেন, 'আমি আপনাদের জন্য কফি বলছি, আর আমার পোশাকটা বদলে একটু মুখটা ধুয়ে আসছি। ততক্ষণ আপনারা কথা বলুন।'

সাল্‌ডান্‌হা চলে গেলেন ভিতরে।

সুশীলা দেবী বললেন, 'কী প্রশ্ন করবেন করুন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন?'

'পঁয়ত্রিশ বছর।'

'আপনার একটি ছেলে আমেরিকায় আছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ।'

'এ ছাড়া আর কোনো সন্তান আছে?'

'একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে কুলুতে থাকে। তার স্বামীর সেখানে অ্যাপল অর্চার্ড আছে।'

'আপনার বোনের চেয়ে আপনি কত বড?'

'দু' বছরের।'

'তার মানে আপনারা প্রায় পিঠোপিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাব বোনের প্রতি আপনার কীবকম মনোভাব ছিল?'

'একেবারে ছেলেবয়সে আমরা দু'জন ভীষণ বন্ধু ছিলাম। প্যামেব আমাকে ছাড়া চলতই না। আমরা দু'জনে একসঙ্গে পুতুল খেলতাম, নার্সাবি স্কুলে যেতাম, একরকম জামা কাপড় পবতাম।'

'তারপর?'

'আমার যখন বছর পনের বয়স তখন থেকেই আমি বুঝতে পাবি যে মা-ব টান আমার চেয়ে প্যামের উপর বেশি। তাছাড়া প্যামেব মধ্যে তখন থেকে অনেক গুণের প্রকাশ পেতে থাকে। ও খুব ভালো আবৃত্তি করত, অভিনয কবত, পড়াশুনায় আমার চেয়ে ভালো ছিল, দেখতেও আমার চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছিল। দেখলাম প্যামই মা-ব আদবের হয়ে উঠছে। আমার উপবে ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। অবিশ্যি বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু মা-র ভালোবাসা পেলাম না বলে আমার মনে একটা হিংসার ভাব জেগে ওঠে যেটা আমি তখন কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সব শেষে মা যখন তাঁর হারটা প্যামকে দিয়ে দিলেন তখন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এ দুঃখ ভুলতে আমার অনেক সময় লেগেছে।'

'এখন মনে হিংসের ভাব নেই?'

'না। এক এক সময় ছেলেবেলার কথা মনে হলে জেলাস লাগে। কিন্তু এমনিতে দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব আছে। কাল তো দেখলেন আমাদের—কী মনে হল?'

'দিব্যি সদ্ভাব।'

'শুধু তাই না। ওর সম্বন্ধে একটা অনুকম্পার ভাবও বোধ করি।'

'কেন বলুন তো?'

'কারণ আমার ভগ্নীপতি। তাঁর টাকার টানাটানি যাচ্ছে।'

'তাই বুঝি?'

'এটা কিন্তু আপনাকে গোপনে বলছি।'

'আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

'আমার ভগ্নীপতি অনেক দেনা করে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে ড্রিঙ্কিং বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু কাল ওরকম পার্টি দিলেন?'

'কী করে দিলেন জানি না। আমি এবং আমার স্বামী নেমন্তন্ন পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।'

'হয়তো এর মধ্যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু আমি দু' মাস আগের কথাও জানি। ও আমার বোন আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করেছে। তার উপর ওদের ছেলের গোলমাল তো আছেই। সে ব্যাপার জানেন তো?'

'শুনেছি।'

'আশা করি আপনার কথাই ঠিক—ওদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

'হারটা কে চুরি করতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে?'

'একেবারেই না। ওটা আমার কাছে একটা বিরাট রহস্য।'

'প্রসেনজিৎকে আপনার সন্দেহ হয় না?'

'প্রসেনজিৎ?'

ভদ্রমহিলা যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'একটা ব্যাপার আছে। ফিল্মটা যখন দেখানো হচ্ছিল তখন প্রসেনজিৎ আমার কাছেই ছিল। ফিল্ম চলা অবস্থায় সে উঠে কোথায় যেন যায়।'

'অন্য কোনো লোককে জায়গা বদলাতে দেখেছিলেন?'

'না। তাছাড়া আমার দৃষ্টি পর্দার উপর ছিল। প্রায় কুড়ি বছর পরে দেখছিলাম ছবিটা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সুশীলা দেবী—আমার প্রশ্ন শেষ।'

আমরা কফি খেয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ির বাইরে এসে ফেলুদা বলল, 'এবার অ্যালবার্ট রতনলাল। তাহলেই আজকের মতো আমার কাজ শেষ।'

সাল্‌ডান্‌হার বাড়ি থেকে আমরা রতনলালের ফ্ল্যাটে গেলাম। অত্যন্ত সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, আর একজনের পক্ষে বেশ বড়। ভদ্রলোক সোফায় বসে একটা হাই-ফাই স্টিরিওতে গজল শুনছিলেন, পরনে একটা বেগুনি ড্রেসিং গাউন, মুখে

পাইপ। ভদ্রলোক যে আতর ব্যবহার করেন সেটা জানতাম না। ঘরে বেশ ঝাঁঝালো আতরের গন্ধ।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে স্টিরিওটা বন্ধ করে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

ফেলুদা বলল, 'কালকে চুরির ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। আমরা সকলকেই করেছি।'

'এভরিওয়ান?'

'শুধু মিঃ সুকিয়াসকে বাকি। সেটা কাল করব।'

'আপনার কি ধারণা আমি চুরিটা করে থাকতে পারি ?'

'মোটেই না। তবে চোর ধরতে আপনি সাহায্য করতে পারেন।'

'আই অ্যাম নট ইন দ্য লীস্ট বিট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য থেফট।'

'এত দামী আর ভালো একটা জিনিস চুরি হল, আর তাতে আপনার ইন্টারেস্ট নেই ?'

'মাইসোরের দেওয়া জিনিস তো দামী হবেই, তাতে আশ্চর্যের কী আছে ?'

'আপনার মা-র এত সাধের জিনিস ছিল !'

'আমার মা-র ফিল্ম কেরিয়ার সম্বন্ধেও আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। আই থিংক অল ফিল্মস আর রটন। সাইলেন্ট ফিল্মস তো বটেই।'

'আপনার পেশাটা কী জানতে পারি ?'

'তা পারেন। আমি একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

'তাহলে আপনি আর কোনোরকমে সাহায্য করতে পারছেন না আমাদের ?'

'আই অ্যাম ভেরি সরি। আমার কিছু বলার নেই।'

'একটা শেষ প্রশ্ন আছে।'

'কী ?'

'কাল ফিল্মটা চলার সময় আপনি কাউকে জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন ?'

'আমি তো ফিল্ম দেখছিলাম না। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। আই স মিঃ সুকিয়াস কাম ইন।'

'ধন্যবাদ। আপনি দেখছি আপনার পিতামহের মতো হিন্দি গানের ভক্ত।'

রতনলাল কোনো মন্তব্য না করে আবার স্টিরিওটা চালিয়ে দিলেন। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ফেলুদা বলল, 'তোরা বরং দিলখুশাটা দেখে আয়। আমার একটু চিন্তা করার আছে, তাছাড়া দু'-একটা টেলিফোন করারও আছে। সুকিয়াসের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। ইনস্পেক্টর পাণ্ডেকেও একটা ফোন করব।'

আমরা দু'জনে আজ ট্যাক্সির বদলে একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরোলাম। লালমোহনবাবুর ভীষণ শখ টাঙ্গা চড়ার কারণ উনি জানেন বাদশাহী আংটির সময় আমরা টাঙ্গা চড়েছিলাম।

টাঙ্গা রওনা হবার পর লালমোহনবাবু বললেন, 'দিলখুশার ইতিহাসটা একটু

জেনে নিই।'

আমি বললাম, 'দিলখুশা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নবাব সাদাত আলির তৈরি একটা বাগানবাড়ি ছিল। এর আশেপাশে হরিণ চরে বেড়াত। এখন শুধু ব্যাপারটার ভগ্নাবশেষ রয়েছে, তবে তার পাশে একটা সুন্দর পার্ক রয়েছে যেখানে লোকে বেড়াতে যায়। দিলখুশার উত্তরে বিখ্যাত লা মার্টিনিয়ার ইস্কুল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্লড মার্টিনের তৈরি। মার্টিন ছিলেন মেজর জেনারেল। দিলখুশা থেকে এই ইস্কুলটা দেখতে পাবেন।'

টাঙ্গাতে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল—সত্যি, লখ্নৌ-এর মতো বাহারের শহর ভারতবর্ষে কমই আছে। লালমোহনবাবু অবশ্য বার বারই বলছেন, 'ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

দিলখুশার ভগ্নাবশেষ দেখতে বেশি সময় লাগে না। তাই আমরা সে কাজটা শেষ করে পার্কটায় একটু বেড়াতে গেলাম, আর সেখানে গিয়েই একটা বিশ্রী ঘটনায় আমাদের জড়িয়ে পড়তে হল।

প্রথমে মনে হয়েছিল পার্কে কোনো লোকজন নেই। লোক সচরাচর হয় বিকেলের দিকে। আমরা ফুলবাগানের মধ্যে দিয়ে খানিকদূর হাঁটার পর একটা গাছের পিছনে একটা বেঞ্চির খানিকটা অংশ দেখলাম, আর সেই সঙ্গে মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম। গাছটা পেরোতেই যে দৃশ্যটা দেখলাম তাতে আমাদের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

দেখি কি, প্রসেনজিৎ আর দুটি তারই ধাঁচের ছেলে বেঞ্চিতে বসে কী যেন খাচ্ছে। তিনজনেরই চুল উসকো খুসকো আর চোখ ঘোলাটে। ওরা যে নেশা করছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, আর এই নেশা বড় সহজ নেশা নয়। এ হল ড্রাগের ব্যাপার, যা খেয়ে মানুষ সম্পূর্ণ হুঁশ হারিয়ে খুন পর্যন্ত করতে পারে।

প্রসেনজিৎ এতো মশগুল ছিল যে সে আমাদের প্রথমে দেখতেই পায়নি। তারপর যখন দেখল তখন তার মুখে এক অদ্ভুত ক্রূর হাসি ফুটে উঠল।

'ডিটেকটিভের চেলাদের দেখছি, ডিটেকটিভ কোথায়?' প্রশ্ন করল সে জড়ানো গলায়।

'তিনি আসেননি', বললেন লালমোহনবাবু।

'আহা, এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন না।'

আমরা চুপ।

'চোর ধরা পড়ল?' বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল প্রসেনজিৎ।

'এখনো পড়েনি।'

'আমাকেই তো সকলে সন্দেহ করছে, তাই না? কারণ আমার টাকার অভাব। লোকের কাছে ধার চাইতে হয় ঘণ্টাখানেক স্বর্গবাসের জন্য।

শুনুন—আই ক্যান টেল ইউ দিস—হার চুরি করার মতো বোকা আমি নই। আমার লাক্ খুলে গেছে। আমি বেশির ভাগ টাকা পাই জুয়া খেলে। মাঝে মাঝে লোকের কাছে ধার করতে হয়, কারণ এ জিনিস একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। আপনি ধরলে আপনিও আর ছাড়তে পারতেন না, মিস্টার থ্রিলার রাইটার। একবার ট্রাই করে দেখুন না—আপনার লেখা অনেক ইমপ্রুভ করে যাবে। মাথার মধ্যে গল্পের প্লট ভিড় করে আসবে। কী, মিস্টার রাইটার—কী বলেন ?'

আমরা দু'জনেই নির্বাক। এরকম একটা দৃশ্যের সামনে পড়তে হবে ভাবতেই পারিনি।

'তবে একটা কথা বলে রাখি'—হঠাৎ তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে খসখসে ধারালো গলায় বলল প্রসেনজিৎ। তারপর তার জীনসের পকেট থেকে একটা ফ্লিক নাইফ বার করে খ্যাঁচ করে বোতাম টিপে ফলাটা বার করে সেটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'আজকের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে তাহলে

বুঝব সেটা আপনাদের কীর্তি। তখন বুঝবেন এই ছুরির ধার কত। নাউ ক্লিয়ার আউট ফ্রম হিয়ার!'

বেগতিক ব্যাপার। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আর কোনো প্রয়োজনও নেই। যা দেখার তা দেখে নিয়েছি, আর এ দৃশ্য শুধু আমরাই দেখেছি, আর কেউ দেখেনি। আমরা দু'জনে আবার টাঙ্গা করে হোটেলে ফিরে এলাম। সারা পথ দু'জনের মুখে একটিও কথা নেই।

হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের ঘরে শীলা বসে আছে, তার হাতে অটোগ্রাফ খাতা। আমাদের দেখে শীলা উঠে পড়ল। বলল, 'আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করে গেলাম। এনিওয়ে, সই-এর জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনার ডিটেকশন সফল হবে।'

শীলা চলে গেলে পর লালমোহনবাবুকেই বলতে দিলাম ফেলুদাকে দিলখুশার ঘটনাটা। ফেলুদা সব শুনে বলল, 'আমার ওর চোখের চাহনি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল ও ড্রাগ ব্যবহার করে। ও ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

'কিন্তু তাহলে ওই কি কণ্ঠহার চোর?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুদা কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'ভালো কথা, আপনাদের আরেকবার একটু বেরোতে হবে।'

'হোয়াই স্যার?'

'সুকিয়াসের টেলিফোন খারাপ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। আমিই বেরোতাম, কিন্তু শীলা এসে পড়ল। ওঁর বাড়িতে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। চট্ করে বেরিয়ে পড়লে এখনো ওঁকে বাড়িতে পাবার চান্স। আমার মাথায় একটা জিনিস দানা বাঁধছে তাই আমি বেরোতে চাচ্ছি না। যা তোপ্‌শে, ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়।'

লালমোহনবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'জেরা শুনতে শুনতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল, এবার তবু একটা কাজ পাওয়া গেল।'

আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। সাত নম্বর লাটুশ রোড বলতেই ট্যাক্সি আমাদের সোজা গন্তব্যস্থলে নিয়ে গেল। আমরা ট্যাক্সিটাকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বললাম।

বেশ বড় একতলা বাড়ি, গেটের গায়ে মার্বল ফলকে লেখা 'এস. সুকিয়াস'। গেট দিয়ে ঢুকে দু'দিকে বাগান। তাতে ফুল নানা রকমের। বাগানের মধ্যে দিয়ে পথ গাড়িবারান্দায় পৌঁছেছে। বাড়ির বয়স অন্তত পঞ্চাশ বছর তো হবেই।

আমরা কলিং বেল টিপতে একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ সুকিয়াস হ্যাঁয় ?'

'জি হাঁ হুজুর—আপকা সুভনাম ?'

'জারা বোলিয়ে মিঃ মিটারকে পাস সে দো আদমি আয়ে হ্যাঁয় এক মিনিট বাৎচিৎকে লিয়ে।'

হিন্দিতে কটা ভুল হল জানি না, কিন্তু বেয়ারা ব্যাপারটা বুঝে নিল। আমাদের এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে সে ভিতরে চলে গেল।

এক মিনিট পরে যে বেয়ারা বেরিয়ে এল তার চেহারাই পালটে গেছে। দৃষ্টি বিস্ফারিত, হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না।

'কেয়া হুয়া ?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'আপলোগ...অন্দর আইয়ে...' কোনোরকমে বলল বেয়ারা। আমরা বেয়ারার পিছন পিছন ভিতরে ঢুকলাম। বেয়ারা সেইভাবেই কাঁপতে কাঁপতে বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকালো আমাদের।

ঘরটা হল যাকে বলে স্টাডি। চারিদিকে নানারকম শিল্পদ্রব্য আর বইয়ে ঠাসা আলমারি। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। তার পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন মিঃ সুকিয়াস, পরনে সাদা শার্ট, তাঁর পিঠ রক্তে লাল। এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি কমই দেখেছি।

'কী হরিব্‌ল ব্যাপার !' বললেন লালমোহনবাবু। তারপর বেয়ারার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি শেষ কখন দেখেছ তোমার মনিবকে ?'

বেয়ারা আমতা আমতা করে যা বলল তাতে বুঝলাম মিঃ সুকিয়াস সকালে ব্রেকফাস্ট করে এই ঘরে চলে আসেন কাজ করতে। তিনি নিজেই সব করেন, তাঁর সেক্রেটারি নেই, বা বাড়িতে অন্য কোনো লোক নেই। বেয়ারা এই সময়টা প্রয়োজন না হলে তাঁকে ডিসটার্ব করে না। আজও সেই একই নিয়ম মানা হয়েছে।

'সকালে কোনো লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বেয়ারা মাথা নাড়ল।

'নেহি হুজুর। কোই নেহি আয়া।'

আমি বুঝতেই পারছিলাম যে বাইরে থেকে সামনের দরজা দিয়ে লোক আসার কোনো দরকার নেই, কারণ সুকিয়াসের চেয়ারের পিছনেই হাট করে খোলা একটা জানালা, তাতে শিক নেই। খুনী যে সেই জানালা দিয়েই ঢুকেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'তোমাদের টেলিফোন তো খারাপ, তাই না ?' লালমোহন্‌বাবু প্রশ্ন করলেন।

'হাঁ হুজুন—দো রোজসে খারাপ হ্যায়।'

'কিন্তু—'

আমি বললাম, 'পুলিশের কথা ভুলে গিয়ে চলুন ট্যাক্সি নিয়ে লে ফিরে গিয়ে ফেলুদাকে নিয়ে আসি। যা করার ওই করবে।'

'তাই চলো।'

॥ ৮ ॥

আমরা দশ মিনিটে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

ফেলুদাকে খবরটা দিতেই সে তার খাতাটা ফেলে দিয়ে কোনো কিছু না বলে জ্যাকেটটা চাপিয়ে নিয়ে আমাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার ভুরু ভীষণ কুঁচকে গেছে।

সুকিয়াসের বাড়ি পৌঁছে সে প্রথমেই বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ড্রাইভার আছে ?'

'হ্যায় হুজুর, গাড়ি ভি হ্যায় ।'

'ড্রাইভারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ।'

ড্রাইভার আসতে ফেলুদা তাকে তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দিতে বলল। ড্রাইভার চলে গেল ।

এবার আমরা গিয়ে স্টাডিতে ঢুকলাম ।

'ছুরি মেরেছে ভদ্রলোককে,' বলল ফেলুদা, 'অস্ত্রটা নিয়ে গেছে ।'

তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ভদ্রলোক চিঠি লিখছিলেন ।'

সেটা অবশ্য আমিও দেখেছিলাম । ইংরিজি চিঠির বেশ খানিকটা লেখা হয়ে গেছিল যখন ছুরিটা মারে ।

'একি—এ যে আমাকেই লেখা চিঠি ?' বলে উঠল ফেলুদা । তারপর বলল, 'যদিও পুলিশ আসার আগে এখানে কিছু নড়চড় করা উচিত না, চিঠিটা যখন আমার তখন সেটার উপর আমার নিশ্চয়ই একটা ক্লেম আছে ।'

এই বলে ফেলুদা চিঠিটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ভাঁজ করে পকেটে পুরে নিল । তারপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখল ।

জানালার বাইরে একটা হাত চারেক চওড়া প্যাসেজ, তার পরেই বাড়ির পাঁচিল । সেই পাঁচিল টপ্‌কে লোক আসা খুব কঠিন নয় ।

'বোঝাই যাচ্ছে খুনটা কোনো ভদ্রলোক করেননি ।'

ফেলুদা প্রায় আপনমনেই কথাটা বলল । তারপর বলল, 'যতদূর মনে হয় এ হল লখ্‌নৌইয়া ভাড়াটে গুণ্ডার কাজ । আর এখানে ডাকাতির কোনো প্রশ্ন আসছে না, কারণ এই একটা ঘরেই অন্তত লাখ টাকার জিনিস রয়েছে । প্রশ্ন হচ্ছে, এই শয়তানটিকে কিনি এমপ্লয় করেছিলেন । অর্থাৎ লোকটি কার অ্যাকমপ্লিস ।'

'সেটা অবশ্য মিঃ সুকিয়াসের ব্যক্তিগত ইতিহাস না জানলে বোঝা যাবে না', বললেন লালমোহনবাবু । 'তাই নয় কি ?'

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোকের বিষয় যে আমরা একেবারেই কিছু জানি না তা নয় । অদ্ভুত লোক ছিলেন সেটা তো জানি । চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার সঙ্গে উঁচু দরের শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ গড়ে তোলা সাধারণ লোকের কম্ম নয় । আমরা ধারণা চিঠিতেও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে ।'

'সেটা একবার পড়বেন না ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন ।

'চিঠিটার উপরে "কনফিডেনশিয়াল্‌" লেখা ছিল সেটা বোধহয় আপনি দেখেননি । ওটা পড়ব যথাস্থানে যথা সময়ে । আততায়ীকে সুকিয়াস

দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। কাজেই তার আইডেনটিটি তো আর চিঠিতে থাকবে না।'

দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। আবার ইনস্পেক্টর পাণ্ডে। ফেলুদার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আপনি তো আমাদের টেক্কা দিয়েছেন দেখছি।'

'তা দিয়েছি, কিন্তু এখন থেকে এ কেসের ভার সম্পূর্ণ আপনাদের উপর। আমি আর এতে নাক গলাতে চাই না, কারণ তাতে কোনো লাভ হবে না। শুধু আততায়ীকে ধরলে পরে আমাকে একটা খবর দেবেন।'

'আপনি তার মানে চললেন ?'

'হ্যাঁ। তবে আপনার সঙ্গে হয়তো দু'-একদিনের মধ্যেই আবার দেখা হবে। কারণ আমি সেই চুরির মামলটা মোটামুটি সল্‌ভ করে এনেছি।'

'বলেন কী !'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আমরা কিন্তু মিঃ বিশ্বাসের ছেলেকে সন্দেহ করছি। আপনিও কি তাই ?'

'সেটা এখনও বলতে পারছি না। আমায় মাপ করবেন।'

'আমরা ডেফিনিট প্রুফ পেয়েছি ও ড্রাগ্‌সের খপ্পরে পড়েছে। ওর পিছনে একজন লোকও লাগিয়ে দিচ্ছি আমরা।'

'ওয়েল, বেস্ট অফ লাক্। এখন তো আপনাদের হাতে আরেকটি ক্রাইম পড়ল। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আছে। গুণ্ডা লাগিয়ে খুন সবখানেই সম্ভব এবং সেটা লখ্‌নৌতেও সম্ভব বোধহয়।'

'খুব বেশি মাত্রায়।'

'থ্যাঙ্ক্‌স।'

॥ ৯ ॥

কোনো একটা মামলার মাঝখানে ফেলুদাকে এত নিষ্কর্মা হয়ে পড়তে দেখিনি কখনো। আমরা পর পর দু'দিন লালমোহনবাবুকে নিয়ে লখনৌ শহর দেখিয়ে বেড়ালাম। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ফেলুদা, কী ব্যাপার বলতো ? তুমি এত চুপচাপ বসে আছ কেন ?'

ফেলুদা বলল, 'অর্ধেক মামলার সমাধান হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক পুলিশের সাহায্য ছাড়া হবে না। আমি এর মধ্যে পাণ্ডের কাছ থেকে দু'বার ফোন পেয়েছি। মনে হয় পাকা খবর আর দু'দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব।'

'পুলিশের ব্যাপারটা কি সুকিয়াসের খুনের সঙ্গে জড়িত ?'

'ইয়েস', বলল ফেলুদা।

'আর হার চুরি ?'

'সেটা নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই।'

'আর সুকিয়াসের খুন সম্বন্ধে তোমার কি কোনো ধারণাই নেই ?'

'আছে, কিন্তু প্রমাণ চাই ? সেই প্রমাণটা পুলিশ গুণ্ডাটাকে ধরতে পারলেই পেয়ে যাব। কে খুন করিয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটা পরিষ্কার ধারণা আছে।'

আরো একটা দিন এই ভাবে কেটে গেল। আমরা জটায়ুকে নিয়ে মিউজিয়াম দেখিয়ে আনলাম। এখন জটায়ুর লখ্‌নৌ দেখা শেষ বললেই চলে। আমাদের কলকাতায় ফিরতে আর দু'দিন বাকি আছে।

দুপুরবেলা ফেলুদা যে ফোনটা আশা করছিল সেটা এল। মিঃ পাণ্ডের কাছ থেকে। কথা বলার পর ওকে জিজ্ঞেস করতে ফেলুদা বলল, 'কেস খতম্। ওরা গুণ্ডাটাকে ধরেছে। শম্ভু সিং বলে এক পাঞ্জাবী। সে আদালতে দোষ স্বীকার করেছে, আসল লোককে দেখিয়ে দেবে বলেছে। যে ছুরিটা দিয়ে খুনটা করা হয়েছিল সেটাও পাওয়া গেছে।'

'তাহলে এখন কী হবে ?'

'রহস্য উদ্ঘাটন। আজ সন্ধ্যা সাতটায় জয়ন্ত বিশ্বাসের বাড়িতে।'

এর পর ফেলুদাকে পর পর অনেকগুলো ফোন করতে হল। প্রথমে অবশ্য জয়ন্তবাবুকে। ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'বাকি সবাইকে তাহলে আপনিই খবর দিয়ে দিন। আপনি তো সকলের টেলিফোন নম্বরই জানেন।'

ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌনে সাতটার সময় হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ইনস্পেক্টর পাণ্ডেও এসে পড়লেন সাতটার পাঁচ মিনিট আগে—সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল, আর আরেকটি লোক যার হাতে হাতকড়া। বুঝলাম সেই হচ্ছে খুনী গুণ্ডা।

সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলে এসে পড়ল। সকলে বলতে তালিকাটা দিয়ে দিই—জয়ন্তবাবুর বাড়ির পাঁচজন, সালডানহার বাড়ির দু'জন আর রতনলাল ব্যানার্জি। প্রশস্ত বৈঠকখানায় সকলে চেয়ার আর সোফাতে ছড়িয়ে বসলেন। রতনলাল আগেই প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ইজ দিস ফার্স ?' ফেলুদা বলল, 'আপনি এটাকে প্রহসন বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু আর সকলের কাছে ব্যাপারটা বোধহয় খুবই সিরিয়াস।'

'হারটা পাওয়া গেছে কি ?' চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন সুনীলা দেবী।

'যথাসময়েই তার উত্তর পাবেন', বলল ফেলুদা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'রহস্যের সমাধান হয়েছে।

বলাই বাহুল্য, এটা পুলিশের সাহায্য ছাড়া হত না। আমি আপনাদের এখন ঘটনাটা বলতে চাই। আশা করি আপনাদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে তার জবাবও আমার কথায় পেয়ে যাবেন।'

'আই হোপ খুব বেশি সময় নেবেন না,' বললেন রতনলাল ব্যানার্জি, 'আমার একটা ডিনার আছে।'

'যতটুকু দরকার তার এক মুহূর্ত বেশি নেব না', বলল ফেলুদা।

সবাই চুপ।

'তাহলে এবার শুরু করি ?'

'করুন', বললেন জয়ন্তবাবু।

'গোড়াতেই বলে রাখি যে এখানে দুটো তদন্তের ব্যাপার নিয়ে আমাদের কারবার। এক হল শকুন্তলা দেবীর হার চুরি, আর দ্বিতীয় হল মিঃ সুকিয়াসের মার্ডার।

'এই তদন্তের ব্যাপারে আমি সকলকে জেরা করি। তার মধ্যে সকলেই যে সব সময় সত্যি কথা বলেছেন তা নয়। তাদের মিথ্যে কিছু ধরা পড়েছে অন্যের জেরাতে। কেউ কেউ কিছু কিছু জিনিস লুকোতে চেয়েছেন, কেউ কেউ আবার আমার প্রশ্নের জবাবই দেননি। হারের ব্যাপারে অনেককে সন্দেহ করা চলতে পারত। তার মধ্যে ছিলেন শ্রীমান প্রসেনজিৎ, যিনি ড্রাগের নেশা ধরেছেন এবং সে ড্রাগ কেনার জন্য তাঁর প্রায়ই টাকার দরকার হয়। সে টাকা তিনি এর-ওর কাছ থেকে ধার করেন এবং জুয়া খেলেও জোগাড় করেন। তারপর আরেকজনকে সন্দেহ করা চলতে পারে ; তিনি হলেন সুদর্শন সোম। পরের আশ্রিত তিনি, অভাবী লোক, হয়তো সে অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি হারটা চুরি করেছিলেন। তাছাড়া আছেন মিঃ সালডান্‌হা। তাঁর দোকান ভালো চলছে না, তিনি নিজের অবস্থার উন্নতি করার জন্য হারটা চুরি করতে পারেন। এক জনের উপর সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না, তিনি হলেন জয়ন্তবাবু। কারণ তাঁর জবানীতে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর ব্যবসা ভালোই চলছে, তাঁর টাকার কোনো অভাব নেই। কিন্তু আরেকজনের জবানীতে আমি শুনি যে তাঁর ব্যবসা মোটেই ভালো যাচ্ছে না, তিনি ফাস্ট্রেশন বশতঃ তাঁর মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবিশ্যি এই জবানী থেকে কিছু প্রমাণ হয় না, এটা ভুলও হতে পারে।

'এখানে সুকিয়াসের খুনের ব্যাপারে আমাকে আসতে হচ্ছে। তিনি যখন খুন হন তখন একটা চিঠি লিখছিলেন। চিঠিটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা আমাকে উদ্দেশ করে লেখা। এই চিঠি লেখার কারণ হল—তাঁকে হঠাৎ কানপুর চলে যেতে হচ্ছিল সেই সকালেই, তাই আমাকে তিনি কোয়েশ্চনিং-এর জন্য

সময় দিতে পারছিলেন না। কিন্তু কানপুর যাবার আগেই তিনি খুন হন।

'এই চিঠি থেকে আমি দুটো তথ্য জানতে পারি। এক হল এই যে শকুন্তলা দেবীর হারটা অবশেষে জয়ন্তবাবু তাঁকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন দু' লাখ টাকায়। এই হারটা আর তিনদিনের মধ্যেই সুকিয়াসের হস্তগত হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই হারটা চুরি হয়ে যায়।

'দ্বিতীয় তথ্য হল, এই ঘরে সমবেত সকলের মধ্যে একজন আছেন যিনি মিঃ সুকিয়াসের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করেন দেড় মাস আগে। তিনি বলেছিলেন টাকাটা এক মাসের মধ্যে সুদসমেত ফেরত দিয়ে দেবেন, কিন্তু দেননি। সুকিয়াস তাঁকে অনেক অনুরোধ করেও টাকাটা আদায় করতে পারেননি। তখন তিনি বলেন আইনের আশ্রয় নেবেন। এইসব তথ্য আমার জেরায় প্রকাশ পেয়ে যেত বলেই তাঁকে খুন করা হয়। অবিশ্যি যিনি খুনটা করিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে সুকিয়াসের চিঠির কথা জানার কোনো উপায় ছিল না, কারণ খুনের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যিনি উপস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ এই ভদ্রলোকের অ্যাকমপ্লিস, তাকে পুলিশ ধরেছে এবং সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। আর এটাও সে বলেছে যে, যে তাকে এমপ্লয় করেছিল তাকে সে দেখিয়ে দেবে।'

ফেলুদা এবার পাণ্ডের দিকে ফিরল।

'মিঃ পাণ্ডে—আপনি আপনার লোককে আনান তো।'

দু'জন কনস্টেবল গিয়ে শম্ভু সিংকে নিয়ে এল।

ফেলুদা বলল, 'তোমাকে যে খুনটা করতে বলেছিল সে লোক কি এখানে রয়েছে?'

শম্ভু সিং এদিক ওদিক দেখে বলল, 'হাঁ হুজুর।'

'তাকে দেখাতে পারবে?'

'ওই যে সেই লোক', বলে একজন বিশেষ ব্যক্তির দিকে শম্ভু সিং তার হাতকড়া পরা দুটো হাত একসঙ্গে তুলে দেখাল।

সকলে অবাক হয়ে দেখল, যে রতনলাল ব্যানার্জির মুখ থেকে তাঁর পাইপটা খসে ঠক্কাস শব্দে মাটিতে পড়ল।

'হোয়াট ননসেন্স ইজ দিস?' বলে উঠলেন রতনলাল ব্যানার্জি।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ননসেন্সই বলুন, আর ফার্সই বলুন, ইয়োর গেম ইজ আপ, মিঃ ব্যানার্জি।'

সমস্ত ঘরে একটা থমথমে ভাব, তার মধ্যে ফেলুদা কথা বলে চলল।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মিস্টার অ্যালবার্ট রতনলাল ব্যানার্জি। আপনার কিসের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করার প্রয়োজন হয়েছিল সেটা বলবেন কি?'

'আই উইল নট', এখনো তেজের সঙ্গে বললেন রতনলাল।

'তাহলে আমিই বলি', বলল ফেলুদা। 'আপনি যা রোজগার করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করতেন। সুকিয়াস লিখেছে আপনি বাঈজিদের পিছনে অঢেল টাকা ঢালতেন। আমরা যেদিন আপনার ঘরে গিয়েছিলাম সেদিন আতরের গন্ধ পেয়েছিলাম। আমার ধারণা আমরা আসার আগে আপনার ঘরে একজন বাঈজি ছিলেন, তাঁকে আপনি ভিতরে পাঠিয়ে দেন। আপনি নিজে আতর ব্যবহার করলে পার্টির দিনেও নিশ্চয়ই করতেন, কিন্তু সেদিন কোনো গন্ধ পাইনি। আমার মনে হয় আপনি আপনার পিতামহের স্বভাব পেয়েছিলেন। তাঁরও শেষ জীবনের অর্থাভাব হয়েছিল। আপনিও সেই একই কারণে সুকিয়াসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।'

'ও মাই গড!' মাথা হেঁট করে রুদ্ধস্বরে বললেন রতনলাল। 'আই অ্যাম ফিনিশ্‌ড।'

ইনস্পেক্টর পাণ্ডে ও একজন কনস্টেবল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আমার বক্তব্য অবিশ্যি এখনো শেষ হয়নি। এখনো একটা রহস্য উদ্‌ঘাটন হতে বাকি আছে, সেটা হল শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহার। সেটা

জয়ন্তবাবু নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি, কারণ সেটা তার আগেই অন্য একজনের হাতে যায়।'

'কার ?' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুনীলা দেবী।

'এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই', বলল ফেলুদা। 'একটা ধারণা হয়েছিল যে সেদিন পার্টিতে যখন ফিল্মটা দেখানো হচ্ছিল সেই অন্ধকার অবস্থাতেই বুঝি কেউ নিয়ে হারটা নিয়ে আসে। কিন্তু আসলে ফিল্ম যখন চলে তখন পর্দা থেকে প্রতিফলিত আলোয় ঘর আর সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে না। আমি সেদিন প্রোজেক্টরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার দৃষ্টি শুধু পর্দার দিকে ছিল না। ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে আমি নিশ্চয় দেখতে পেতাম। কেউ বেরোয়নি। প্রসেনজিৎ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সোফায় বসে আর ছবি চলার মধ্যে সুকিয়াস প্রবেশ করেন। ঘরে আর কোনো নড়াচড়া হয়নি।'

'তাহলে ?' সুনীলা দেবী হতভম্ব।

'তাহলে এই যে ছবি শুরু হবার আগেই হারটা সিন্দুক থেকে বার করে আনা হয়েছিল।'

'সে তো হয়েইছিল,' বললেন সুনীলা দেবী। 'শীলা এনেছিল আপনাকে দেখানোর জন্য এবং শীলাই সেটা আবার তুলে রাখে।'

'না। সেখানেই ভুল। শীলা হারটাকে আর সিন্দুকে তোলেনি। সে সেটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু কারণটা বুঝিনি। পরে রাত্রে সে সেটাকে একটা ফুলের টবে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখে। এ কথা শীলা নিজে আমাকে বলেছে। এই যে সেই হার।'

ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে হারটা বার করে ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখল। ঘরের সকলের মুখ থেকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

সুনীলা দেবী বললেন, 'কিন্তু...কিন্তু সে এরকম করল কেন ?'

'কারণ সে তার ঘর থেকে আপনার এবং আপনার স্বামীর মধ্যে কথোপকথন শুনে ফেলেছিল। তার শোবার ঘর তো আপনাদের শোবার ঘরের পাশেই এবং মাঝখানের দরজা খোলাই থাকে। মাঝরাত্রে তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন আপনি আপনার স্বামীকে বলছিলেন যে হারটা আপনি সুকিয়াসকে বিক্রি করতে রাজি আছেন। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অবিশ্যি আপনার অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আপনি রাজি হয়েছিলেন সেটা তো ঠিক। এমন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই শীলা হারটা সরিয়ে রেখেছিল, এবং সে এটা করেছিল বলেই আজও হারটা আপনাদের কাছে রয়েছে এবং আশা করা যায় থাকবে। এমন জিনিস হাতছাড়া করাও একটা ক্রাইম।'

হোটেলে ফিরে এসে লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'মশাই, লাক্‌নাউ মানে তো ভাগ্য এখনই। তা এখানে ভাগ্যটা কার সেটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'কেন পারছেন না? ভাগ্য আপনার, কারণ আপনি আবার ফেলু মিত্তিরের একটা তারাবাজি দেখতে পেলেন বিনে পয়সায়।'

আমি বললাম, 'তাছাড়া সুনীলা দেবীদেরই ভাগ্য ভালো যে হারটা তাদেরই রয়ে গেল। থ্যাংকস্ টু মেরি শীলা।'

'যা বলেছ,তপেশ ভাই', বললেন লালমোহনবাবু।

'শীলার মতো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না—তাই না,ফেলুবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'শকুন্তলা দেবীর হারটা যদি সত্যি করে কেউ কদর করে, সে হল মেরি শীলা বিশ্বাস।'

অলংকরণ সমীর সরকার

প্র ব ন্ধ

দা ভিঞ্চির খাতা

উপরে যে ছবিটা দেখছ সেটা তোমাদের অনেকেরই চেনা। এর নাম হল মোনালিসা, আর যিনি এই বিশ্ববিখ্যাত ছবিটি এঁকেছিলেন তাঁর নাম ছিল লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। এই দা ভিঞ্চির মতো এমন একজন মেধাবী পুরুষ ও কীর্তিমান শিল্পী পৃথিবীতে আর জন্মায়নি। এই মানুষটি আর তাঁর কয়েকটি আশ্চর্য খাতা সম্বন্ধে আজ কিছু বলব।

১৪৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল ইতালির বিখ্যাত ফ্লোরেন্স শহর থেকে মাত্র কুড়ি মাইল দূরে ভিঞ্চি নামে একটি ছোট শহরে লিওনার্দোর জন্ম হয়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, অর্থাৎ ভিঞ্চি শহরের লিওনার্দো।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ইতালিতে একটা নতুন যুগের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। এই যুগটাকে বলা হত রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগ। লিওনার্দোর উপর এই যুগের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল, তাই তাঁকে বুঝতে গেলে এই যুগটা সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

ঐতিহাসিকরা জানেন যে খ্রিষ্টপূর্ব যুগে গ্রীসের সভ্যতা থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তি। যীশুখ্রিষ্টের জন্মের আটশো বছর আগে থেকেই গ্রীস পশ্চিমের সভ্যতার ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। সামান্য কয়েকটি শহর নিয়ে গড়া এই গ্রীস সাম্রাজ্য বেশ কিছু অসামান্য প্রতিভাধর মনীষীর আবির্ভাবের ফলে শিল্প সাহিত্য দর্শন স্থাপত্য ভাস্কর্য রাজনীতি ইত্যাদিতে এমনই এক আশ্চর্য উন্নত চেহারা নিয়েছিল যেমন আর ইউরোপের কোথাও কখনো হয়নি।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৬ অব্দে রোমের হাতে গ্রীসের পরাজয় হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রীসের সংস্কৃতিকে রোম অগ্রাহ্য করতে পারেনি। গ্রীসের পরাজয়ের পরেও রোমের বহু ছাত্র দলে দলে যেত গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের অ্যাকাডেমিতে পড়াশুনা করতে।

এদিকে রোম সাম্রাজ্য ক্রমে বাড়তে বাড়তে পুবে মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, এমন কি ইংল্যান্ডেরও বেশ কিছুটা অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রোমানরা হিন্দুদেরই মতো অনেক দেবদেবীর পুজো করত। এদিকে ততদিনে খ্রিষ্টধর্মের প্রভাব বিস্তার হতে শুরু করেছে। চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সম্রাট কনস্টানটিন বুঝতে পারলেন যে পালা বদলের সময় এসেছে। কারণ খ্রিষ্টধর্মকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তিনি তাই রোম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ইতালি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন পুবে বাইজানটিয়াম প্রদেশে। কনস্টানটিনের নাম থেকে এই প্রদেশের রাজধানীর নাম হল কনস্টান্টিনোপল। এই কনস্টান্টিনোপলই হল রোম সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের ঘাঁটি।

অষ্টম শতাব্দী থেকে রোম সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরতে শুরু করে। অবশেষে মধ্য এশিয়ার তুর্কীদের দাপটে রোমের হাজার বছরের আধিপত্যের শেষ হয়। একমাত্র কনস্টান্টিনোপল শহর ছাড়া বাইজানটিয়ামের সব কিছুই তুর্কীদের অধিকারে চলে যায়। এর পরেই ক্রমে দেখা যাচ্ছে ইসলাম সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে মধ্য এশিয়ার সমরকন্দ-বোখারা থেকে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত।

ইউরোপে তখন ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম পাশাপাশি রয়েছে, এবং দুইয়ের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে। রোমের পতনের পর এই খ্রিষ্টধর্মই পশ্চিমের জনসাধারণকে

একসূত্রে বাঁধতে পেরেছিল। এই বিশেষ যুগে সবচেয়ে লক্ষ করার বিষয় হল ধর্মযাজকদের প্রতিপত্তি। পোপের স্থান ছিল সম্রাটেরও উপরে। সব ব্যাপারেই ধর্মযাজকদের বিধানকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হত। ফলে মানুষের স্বাধীন ভাবনা চিন্তার সুযোগ অনেকটা কমে গিয়েছিল। এই যুগকে ইউরোপে মধ্যযুগ বলা হয়। ইতালীয়রা একে বলত অন্ধকার যুগ।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইতালির মনীষীরা আবার নতুন করে সেই প্রাচীন গ্রীক আদর্শের কথা ভাবতে শুরু করেন। সে যুগে চিন্তার যে স্বাধীনতা ছিল সেটা যে ধর্মের গোঁড়ামির প্রভাবে মানুষ হারাতে বসেছে সেটা তাঁরা বুঝতে পারেন। মানুষকে আবার নতুন করে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে—এটাও তাঁরা বোঝেন। ধর্মপুস্তকে যা লেখে তা সব পুরনো কথা ; তাতে পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখার কথা বলা নেই, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যার সমাধানের কথা বলা নেই। শুধু ধর্মপুস্তক মেনে চললে মানুষকে একই অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে।

এই যে মানুষের মনে নানান প্রশ্ন, নানান জিজ্ঞাসার উদয়, এবং নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে সেই সব অজানা বিষয়কে জানার যে-প্রয়াস, সেটাই হল রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ।

এই বিশেষ যুগের এই বিশেষ পরিবেশেই লিওনার্দোর জন্ম। সত্যি বলতে কি, রেনেসাঁসের মানুষ কেমন ছিল তা বোঝাতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হয় লিওনার্দো দা ভিঞ্চির।

লিওনার্দোর যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন তাঁর বাবা তাঁকে পাঠিয়ে দেন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত শিল্পী ভেরোচ্চিওর স্টুডিওতে থেকে কাজ শেখার জন্য। তখন এ জিনিসটার খুব চল ছিল। এককেজন বড় বড় চিত্রকরের স্টুডিওতে অনেক অ্যাপ্রেনটিস তাঁদের সাহায্য করত আর সেই সুযোগে তাদের নিজেদেরও কাজ শেখা হয়ে যেত। হয়তো চিত্রকর একটা বড় ছবি আঁকছেন, তাতে লোকজন ঘরবাড়ি গাছপালা সবই আছে ; চিত্রকর সব ছবিটুকুই নিজে আঁকলেন, কেবল গাছপালাগুলো আঁকতে দিলেন সহকারীদের।

লিওনার্দো অল্পদিনের মধ্যেই আঁকিয়ে হিসেবে তাঁর গুরুকে ছাড়িয়ে গেলেন। গুরুমারা বিদ্যার উদাহরণ তখন আরো পাওয়া যায়। লিওনার্দোর সমসাময়িক ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী রাফেল। ইনিও এক নামকরা শিল্পীর শিক্ষানবিশী করে অল্প দিনের মধ্যেই সেই শিল্পীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

রাফেল ছাড়াও যে সব বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দোর সমসাময়িক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় বত্তিচেল্লি আর মাইকেল এঞ্জেলোর। রাফেল, বত্তিচেল্লি, মাইকেল এঞ্জেলো—এঁরা সকলেই অনেক ছবি এঁকে গেছেন ;

মাইকেল এঞ্জেলো তো সেই সঙ্গে ভাস্কর্য আর স্থাপত্যেও তাঁর কীর্তি রেখে গেছেন। সেই তুলনায় কিন্তু লিওনার্দোর কাজের সংখ্যা খুবই কম—সবসুদ্ধ গোটা দশেকের বেশি নয় যেগুলোকে তৈরি ছবি বলা যেতে পারে। তার মানে কি অধিকাংশ সময়টা তিনি অকাজে নষ্ট করেছেন ?

মোটেই নয়। এখানে বলা দরকার যে লিওনার্দো শুধুই চিত্রশিল্পী ছিলেন না ; তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, স্থপতি, ভাস্কর, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, এঞ্জিনিয়ার, শারীরবিদ্যাবিদ বা অ্যানাটমিস্ট ও আবিষ্কারক। এই প্রতিটি বিষয় নিয়ে তিনি সারা জীবন ছবি এঁকে গেছেন আর লিখে গেছেন। তাঁর লেখার ভাষা ছিল যেমন সুন্দর তেমনি সহজ। তাঁর মতো পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা খুব কম লোকের থাকে। আগেই বলেছি যে রেনেসাঁস ছিল অনুসন্ধিৎসার যুগ। যা শোনা কথা তাই যে মেনে নিতে হবে সেটা আর লোকে বিশ্বাস করত না। মানুষের অনেককালের কিছু বিশ্বাস রেনেসাঁসের যুগে এসে পালটে গিয়েছিল। তখনকার যুগে অনেকে বিশ্বাস করত যে পৃথিবীটা টেবিলের মতো চ্যাপ্টা এবং পৃথিবীর একটা সীমা বা কিনারা আছে যার বেশি আর যেতে গেলে মানুষকে অতল শূন্যে তলিয়ে যেতে হবে। রেনেসাঁসের যুগে কম্পাস আবিষ্কারের ফলে যখন সমুদ্রযাত্রা সহজ হয়ে গেল, তখন কলম্বাস স্পেন থেকে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত গিয়েও কিন্তু কিনারার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না। তারপর পর্যটক ম্যাগেলান তো সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে প্রমাণই করে দিলেন যে পৃথিবী চ্যাপ্টা নয়, গোল। তারপর, লোকে তখন মনে করত—এবং ধর্মযাজকেরাও এতে সায় দিতেন—যে পৃথিবীই স্থির, সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করে। এই রেনেসাঁসের যুগেই কোপারনিকাস প্রমাণ করলেন যে আসলে ব্যাপারটা উল্টো, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহরাই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সূর্য থাকে স্থির।

রেনেসাঁসের একটি আবিষ্কার সত্যিই যুগান্তর এনে দিয়েছিল, সেটা হল জার্মানির গুটেনবার্গের দৌলতে পশ্চিমে ছাপাখানার প্রবর্তন। পশ্চিমে বলছি এই কারণে যে চীনদেশে ছাপার যন্ত্রের আবিষ্কার হয় এরও চারশো বছর আগে, যদিও স্বভাবতই পশ্চিমে তার খবর পৌঁছয়নি। ছাপার প্রবর্তনের ফলে যে শিক্ষার বিস্তারও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল সেটা বলাই বাহুল্য।

লিওনার্দো নিজে যে খুব বেশি লেখাপড়া করেছিলেন তা নয়। তিনি লিখতে পড়তে পারতেন ঠিকই, আর অঙ্কটা কিছুটা জানতেন। কিন্তু এই সামান্য শিক্ষার ভিৎ যে তাঁকে কতদূর নিয়ে গিয়েছিল সেটা তাঁর খাতা দেখলে বোঝা যায়। এই খাতা ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ছবি আর লেখা পাশাপাশি চলত। তাঁর এই লেখাতেও একটা বিশেষত্ব ছিল। লিওনার্দো লিখতেন বাঁ হাতে, আর লেখা চলত ডানদিক থেকে বাঁ দিকে। অর্থাৎ সেটা পড়তে হলে তাকে আয়নার

দা ভিঞ্চিব খাতা

লিওনার্দোব হাতেব লেখা

আয়নাতে

সামনে ধরতে হত। আঁকাও অবশ্য বাঁ হাতেই হত।

সারা জীবনে লিওনার্দোর খাতায় লেখা এবং আঁকা একসঙ্গে জড়ো করলে তা অনায়াসেই ৬০০০ পাতার উপর হয়ে যায়। খাতা যখন লেখা হয় তার দেড়শ বছর পর অবধি এগুলির অস্তিত্বই কেউ জানত না। তারপর ক্রমে ক্রমে নানান জায়গা থেকে এগুলি বেরোতে থাকে। সবচেয়ে সম্প্রতি—অর্থাৎ বারো বছর আগে—যে দুটি খণ্ড পাওয়া গেছে সেগুলো পড়ে ছিল স্পেনের ম্যাড্রিড শহরের এক লাইব্রেরির এক কোনায়।

লিওনার্দো 'মোনালিসা', 'লাস্ট সাপার' ইত্যাদি যে দশ বারোটা পেন্টিং করে গেছেন, শুধু সেগুলির গুণেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। কিন্তু তাঁর খাতাগুলি তাঁকে শুধু শিল্পী হিসেবে নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে তাঁর স্থান করে দিয়েছে। এই খাতা দেখলে বোঝা যায় যে চিন্তাশক্তিতে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের চেয়ে কতদূর এগিয়ে ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যদি কোনো লোকের মাথায় যুদ্ধের আর্মার্ড ট্যাঙ্ক বা হেলিকপটারেব চিন্তা আসে, এবং সেই চিন্তাকে সে যদি নকশায় পরিণত করতে পারে, তাহলে সেটা একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয় না কি ?

যে সব প্রাকৃতিক ঘটনা মানুষ রোজ চোখে দেখছে, সেগুলোর পিছনে কোন্ গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লুকিয়ে আছে সেটা বোঝার চেষ্টাই ছিল লিওনার্দোর জীবনেব প্রধান লক্ষ। মানুষের জীবনীশক্তি কোত্থেকে আসে, সে চলাফেরা কবে কীভাবে, কীভাবে কথা বলে, কীভাবে কথা শোনে, তার শরীরে রক্ত চলাচলই বা হয় কীভাবে, সেটা জানার জন্য লিওনার্দো নিজে হাতে ছুরি দিয়ে শবব্যবচ্ছেদ করে হাড় মাংস স্নায়ু শিরা উপশিরার যে ছবি এঁকে গেছেন, তার চেয়ে ভালো
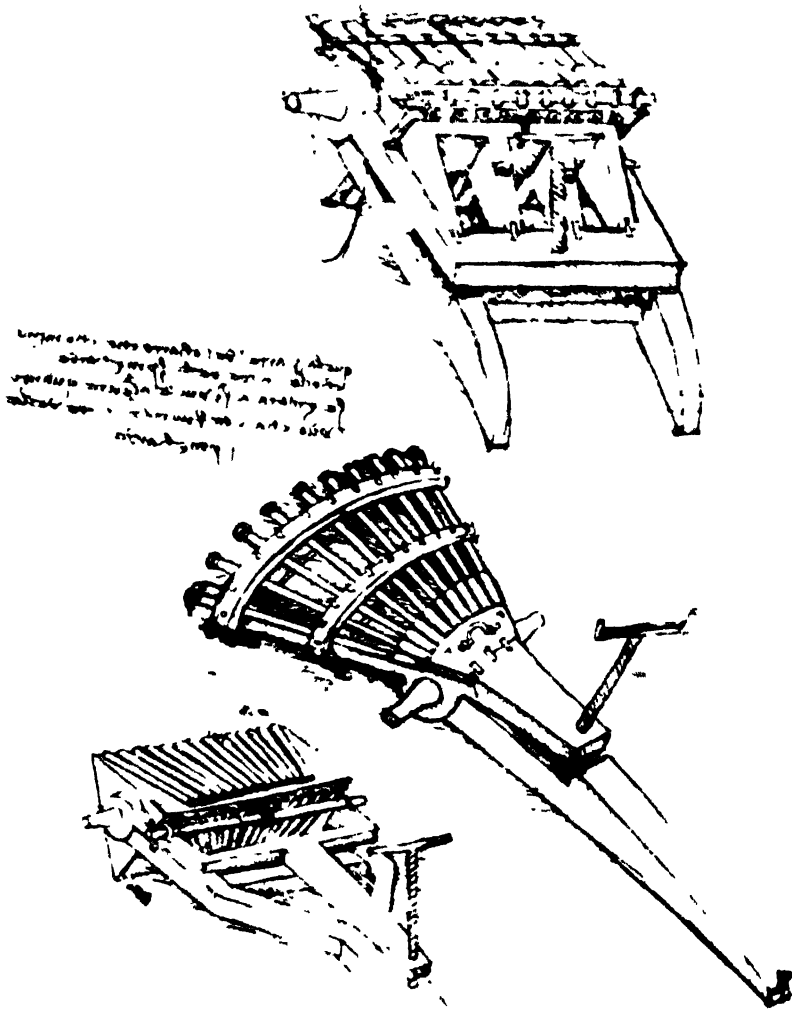
লিওনার্দো কল্পিত নতুন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র। এতে এক সঙ্গে অনেক দিকে গুলি ছোঁড়া যায়

অ্যানাটমিক্যাল ড্রইং আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি।

সেই সঙ্গে অবিশ্যি গাছ পালা ফুল ফলও বাদ যায়নি। পাখির ওড়ার ছবি এঁকে তিনি ওড়ার বৈজ্ঞানিক কারণ বার করেছিলেন, এবং সেইসঙ্গে মানুষ
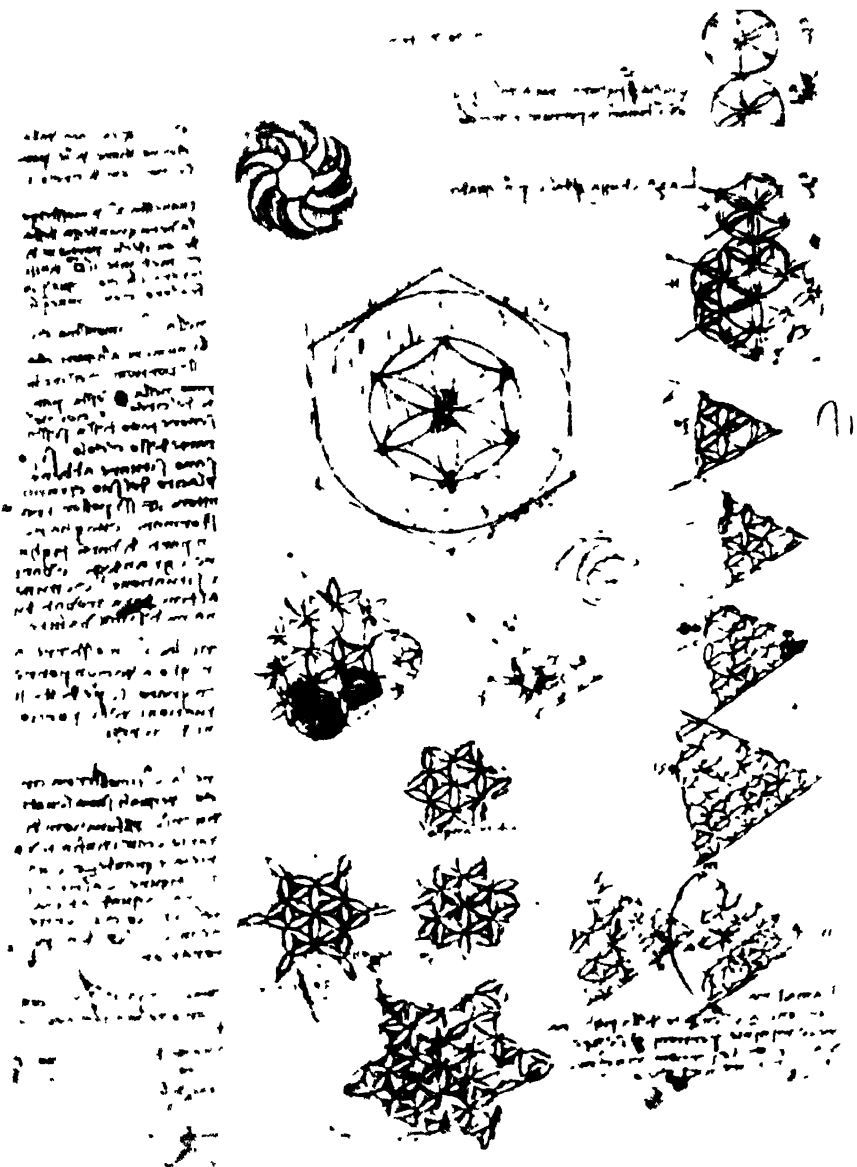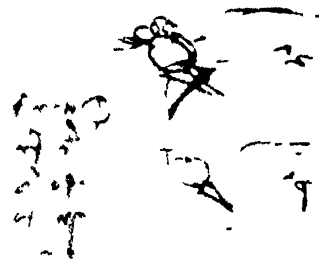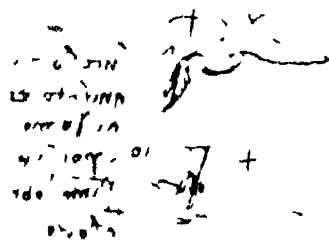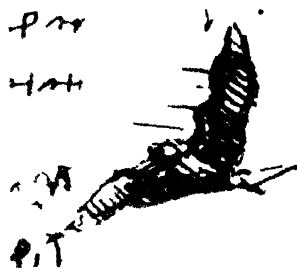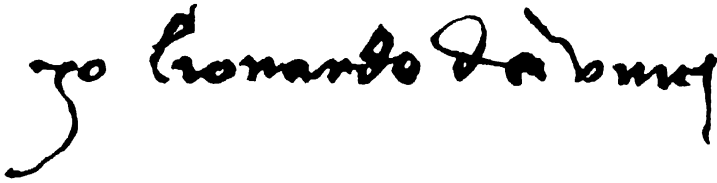
লিওনার্দোর নোটবুকের একটা পাতা

বাঁয়ে অ্যানাটমির দুই
ডাইনে পাখির ওড়ার স্টাডি

কীভাবে কীরকম ডানা লাগিয়ে উ তে পারে সেটাও ছ ব একে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

পশুপক্ষীর প্রতি লিওনার্দোর একটা স্বাভাবিক মমতা ছিল। তিনি প্রায়ই বাজারে গিয়ে খাঁচা সমেত পাখি কিনে খাঁচার দরজা খুলে পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। যুদ্ধ জিনিসটাকে লিওনার্দো তীব্র ভাষায় নিন্দা করে গেছেন,

কিন্তু এমনই ছিল তাঁর আবিষ্কারের নেশা যে তিনি যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নানারকম মারণাস্ত্রের নকশা এঁকে গেছেন তাঁর খাতায়। এছাড়া যন্ত্রপাতি যে কতরকম উদ্ভব করেছেন, আর তার বর্ণনা দিয়ে নকশা করে দেখিয়ে গেছেন তার তো হিসাবই নেই। এর মধ্যে নতুন ধরনের বাদ্যযন্ত্রও রয়েছে অনেক রকম।

লিওনার্দোর মৃত্যু হয় ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মে। মৃত্যুর কয়েক বছর আগেই তিনি নিজেই একটি নিজের ছবি এঁকেছিলেন।

তুতানখামেনের সমাধি

মিশর দেশে কোনো ফেরো (Pharaoh) বা সম্রাট মারা গেলে তাঁর সমাধি তৈরির কাজটা ছিল একটা এলাহি ব্যাপার। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর পর সম্রাটের আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য জীবিতকালে তাঁর যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন হত, মৃত্যুর পরেও তাঁর শবদেহের সঙ্গে সেইসব দৈনিক ব্যবহারের জিনিস সমাধিস্থ করতে হবে। তার মানে জামাকাপড় গয়নাগাটি বাসনকোসন আসবাবপত্র ইত্যাদি সবকিছুই। এমন কি খেলাধুলার জিনিসও বাদ যেত না। এর মধ্যে অনেক জিনিসই হত মহামূল্য ধাতু বা পাথরের তৈরি।

বোঝাই যাচ্ছে চোর ডাকাতের পক্ষে এইসব সমাধি ছিল অত্যন্ত লোভনীয় জিনিস। যখন থেকে এইভাবে সমাধি তৈরির কাজ চলে আসছে—অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর থেকে—তখন থেকেই সমাধি লুটতরাজের কাজও শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে পিরামিডেই থাকত সম্রাটের সমাধিকক্ষ, এবং সেই কক্ষে পৌঁছানো সহজ কাজ ছিল না। কারণ সমাধির দরজা বেমালুম পাথর দিয়ে ঢেকে ফেলা হত। কিন্তু মিশরের চোর এতই চতুর যে অল্পদিনের মধ্যেই তারা দরজা খুঁজে বার করে সেটাকে ভেঙে ভিতরে ঢুকে দামি জিনিস সব সরিয়ে ফেলত। এই চোরদের হাত থেকে সম্রাটের বহুমূল্য মমি বা কফিনগুলি বাঁচাবার জন্য মাঝে মাঝে সেগুলোকে অন্য নতুন কোনো জায়গায় সমাধিকক্ষ তৈরি করে তাতে রাখা হত। কিন্তু চোরবাবাজী সেই নতুন জায়গার খবরও পেয়ে যেতেন।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে পিরামিড তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে তখন থেকে সমাধির জন্য জায়গা বাছা হয় মিশরের প্রাচীন রাজধানী থীবিসের চুনা পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে তার ভিতরে কক্ষ তৈরি করে তাতে সব জিনিসপত্র পুরে আবার বাইরে থেকে প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হত।

কিন্তু এত করেও চুরির রাস্তা বন্ধ করা যায়নি।

তাই যখন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক হাওয়ার্ড কার্টার খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের মিশরের তরুণ সম্রাট তুতানখামেনের সমাধি খুঁজতে শুরু করেন, তিনি সম্রাটের শবদেহ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাবেন বলে আশা করেননি।

সম্রাট হিসেবে তুতানখামেনের স্থান খুব উঁচুতে ছিল না। তিনি বারো বছর বয়সে রাজা হয়ে আঠারোতে মারা যান, এইটুকুই শুধু জানা ছিল। আদৌ এঁর কোনো সমাধি খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল। থীবিসের আশেপাশে অন্য সম্রাটের সমাধি খননের সময় কিছু জিনিস পাওয়া যায় যাতে তুতানখামেনের নাম লেখা ছিল। এই থেকেই কার্টারের সন্দেহ হয় যে হয়তো এই অঞ্চলে খুঁজলে কিছু একটা পাওয়া যেতে পারে।

এখানে আরেকজনের নাম করতে হয় যিনি ছাড়া কার্টারের পক্ষে এই খননের কাজ করা সম্ভবই হত না। ইনি হলেন ইংলন্ডের লর্ড কারনারভন। কারনারভন মিশর-বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। ইনি ছিলেন নাম করা শিকারী ও পর্যটক। এঁকে মিশরে আসতে হয় ডাক্তারের পরামর্শে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য। কার্টার তখন তাঁকে তুতানখামেনের কথা বলেন। কারনারভন এককথায় এই খননের ব্যয় বহন করতে রাজি হয়ে যান।

কিন্তু মিশরদেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজ করতে গেলে সরকারের অনুমতি লাগে। অনেক তদ্বির তদারকের পর কারনারভন ও কার্টার ১৯১৪ সালে থীবিস অঞ্চলে খননকার্য চালানোর জন্য অনুমতি পেলেন। এই অনুমতির ইংরেজি নাম কনসেশন। এই বিশেষ কনসেশনটির মেয়াদ ছিল ন'বছর। অর্থাৎ ১৯১৪ থেকে ১৯২২-এর শেষ পর্যন্ত।

এদিকে ১৯১৪-তে লেগে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের কর্তব্য পালন করেও ফাঁক পেলেই কার্টার খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া যায়নি।

থীবিসের যে অংশে কাজটা চলছিল সেটাকে বলা হয় ভ্যালি অফ দ্য কিংস। বহু বিখ্যাত সম্রাটের সমাধিক্ষেত্র এটা। যেখানে তুতানখামেনের সমাধি পাওয়া যাবে বলে কার্টার আশা করছেন, সেখানেই কাছাকাছি আরো তিনজন সম্রাটের সমাধি পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন দ্বিতীয় রামেসিস, মেরেনপ্টা আর ষষ্ঠ রামেসিস। কার্টারের বিশ্বাস এই তিন সমাধির মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে তুতানখামেনের সমাধি।

যুদ্ধ শেষ হলে পর ১৯১৯-২০তে আবার খোঁড়ার কাজ শুরু হল। কিন্তু অনেক খুঁড়েও কোনো ফল হল না। যা পাওয়া গেল তা হল ষষ্ঠ রামেসিসের সমাধি তৈরির জন্য করা পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকটা মজুরদের ঘর। কার্টারের

রোখ চাপল এই ঘরগুলির নিচে কী আছে তা দেখাব জন্য। এদিকে এর মধ্যে আট বছর পেরিয়ে গেছে; কনসেশনের মেয়াদ আর মাত্র কয়েক মাস। কারনারভন ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন, কোনো খবর থাকলে কার্টার তাঁকে তৎক্ষণাৎ জানাবেন।

যে জায়গাটায় খোঁড়ার কাজ চলছিল তার নাম লাক্সর। এটা হল থীবিসের আধুনিক নাম। কার্টার ১৯২২ এর ২৮শে অক্টোবর লাক্সরে এসে পৌঁছলেন। ১লা নভেম্বর মজুরদের ঘরগুলোর নিচে কী আছে দেখার জন্য খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হল।

৪ঠা নভেম্বর সকালে কার্টার কাজের জায়গায় এসে বুঝতে পারলেন কিছু একটা ঘটেছে। কাজ বন্ধ, সকলেই কেমন যেন চুপচাপ, সকলের মধ্যেই যেন একটা চাপা উত্তেজনা। ব্যাপারটা কী?

কার্টার জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা জানতে পারলেন। প্রথম যে মজুরদের ঘরটা খোঁড়া হয়েছে, তারই ঠিক নিচে একটা পাথরের সিঁড়ির ধাপ বেরিয়েছে। সে সিঁড়ি কতদূর গেছে বা কোথায় গেছে সেটা আরো না খুঁড়লে বোঝা যাবে না।

কার্টারের পক্ষে এক অভাবনীয় সংবাদ। নিচে যদি কোনো সমাধি থেকে থাকে তাহলে তাতে ঢোকার জন্য সিঁড়ির প্রয়োজন হবে বৈ কি। কিন্তু এমন যদি হয় যে শুধু সিঁড়িই তৈরি হয়েছিল, বাকি কাজ আর হয়নি বিশেষ কোনো কারণে? অথবা হলেও এখানেও চোরবাবাজীদের দৌরাত্ম্যে আর বিশেষ কিছুই বাকি নেই?

যাই হোক না কেন, খোঁড়াব কাজ চালিযে যেতেই হবে। আরো কিছু খোঁড়ার পর দেখা গেল যে সিঁড়িটার উপরে একটা ছাত। অর্থাৎ সিঁড়িটা নেমেছে একটা প্যাসেজেব ভিতর দিয়ে।

বারো ধাপ সিঁড়ি পেরোনোর পর হঠাৎ দেখা গেল সামনে একটা প্লাস্টারে ঢাকা, সীলমোহর মারা দরজা। এ এক আশ্চয আবিষ্কার! এমন দরজা এক সমাধিকক্ষেরই হওয়া সম্ভব। এবারে দেখা দরকার সীলমোহরে কারো নাম লেখা আছে কিনা।

না, তা নেই। তবে যা আছে তাতেও বোঝা যায় যে কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সমাধিগৃহ থাকার সম্ভাবনা ওই দরজার পিছনে। দবজার সামনে এখনো অনেক আবর্জনা, তাই সেটা খুলতে দেবি হবে, কিন্তু সই ফাঁকে কার্টার একটা কাজ করলেন। কাঠের দরজার ওপর দিকে একটা ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে টর্চ ফেলে দেখলেন যে ভিতরের প্যাসেজ পাথরেব খণ্ড আর মাটি দিয়ে মেঝে থেকে মাথা অবধি ঠাসা।

কার্টার পারলে সেই দিনই দরজার সামনে থেকে আবর্জনা সরিয়ে ফেলে

লকুর পাহাড়ের গায়ে তুতানখামেনের সমাধির প্রবেশ পথ
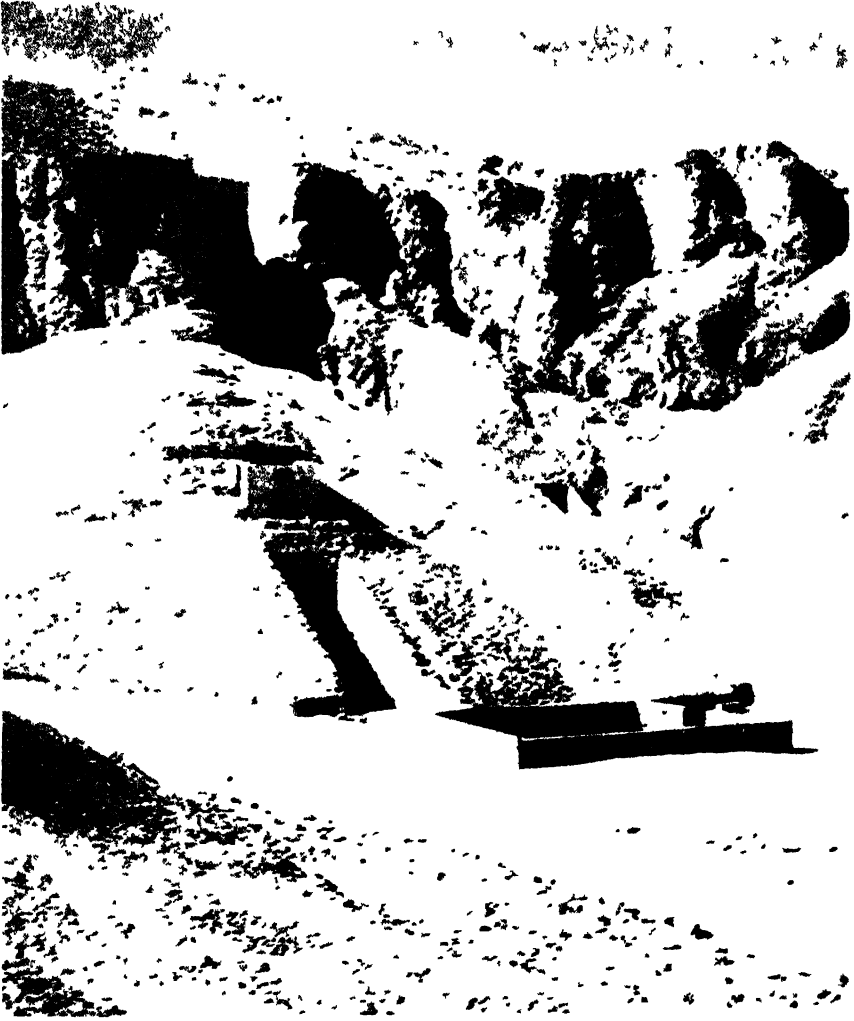
ভিতরে ঢোকার কাজ শুরু করবেন, কিন্তু সেটা অন্যায় হবে। লর্ড কারনারভন রয়েছেন ইংলণ্ডে। এতদিনের পরিশ্রম যখন মনে হয় সার্থক হতে চলেছে, তখন এই অবস্থায় কারনারভনেরও এখানে থাকা দরকার। কার্টার পরদিনই তাঁর পৃষ্ঠপোষকের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন—‘একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার হয়েছে—অক্ষত সীলমোহর সমেত একটি সমাধিকক্ষের দরজা। বাকি কাজ আপনি এলে হবে।’

কারনারভন না আসা পর্যন্ত যে অংশ খোঁড়া হয়েছিল সেটা আবার বেমালুম বুজিয়ে দিয়ে কার্টার অধীর অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগলেন।

২৩শে নভেম্বর লর্ড কারনারভন তাঁর মেয়ে লেডি এভলিন হার্বার্টকে নিয়ে লাক্সর এসে পৌঁছালেন। কারনারভন আসছেন খবর পেয়েই দরজা পর্যন্ত আবর্জনা সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

সমাধিকক্ষে ঢোকার দরজার বাইরে লর্ড কারনারভন ও হাওয়ার্ড কার্টার

এবারে দরজার সামনেটা পরিষ্কার করে ফেলায় একটা জিনিস আবিষ্কার করা গেল। যে সীলমোহরটা আগে পাওয়া গিয়েছিল সেটা ছিল দরজার উপর দিকে ; এবার নিচের দিকে দেখা দিল আরেকটা সীলমোহর যাতে স্পষ্ট লেখা তুতানখামেনের নাম। দুটো সীলমোহরের মানে একটাই হতে পারে। এই দরজা উপর দিক দিয়ে আরেকবার খোলা হয়েছিল—সম্ভবত সমাধি-চোরদের দ্বারা। তারা তাদের কাজ হলে পর ফুটো বন্ধ করে আবার সীল লাগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার বন্ধ করার মানে একটাই হতে পারে—চোরেরা তাদের লুটের কাজ শেষ করতে পারেনি ; পরে আরেকবার এসে কাজটা শেষ করবে এই ভেবেই দরজাটাকে আবার বন্ধ করে দেওয়া।

যাই হোক, এবার দরজাটা খুলে তার পিছনের পাথরকুচি দিয়ে ভরাট করা প্যাসেজটাকে পরিষ্কার করার পালা শুরু হল। প্যাসেজটা এখানে সমতল নয়—ঢালু হয়ে নিচের দিকে চলে গেছে। পাথরকুচির মধ্যে কিছু দামী পাত্র, ফুলদানি ইত্যাদি ছিল যার থেকে চুরির ধারণাটা আরো বদ্ধমূল হল। চোরেরা এইসব মাল নিয়ে পালাতে গিয়ে কোনো কারণে বাধা পেয়ে এগুলো যেমন তেমনভাবে ফেলে রেখে চলে গেছে।

২৫শে নভেম্বর রাত অবধি কাজ করেও প্যাসেজের শেষে পৌঁছানো গেল না। সেটা হল ২৬শে, কার্টার যাকে বলেছেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন।

বিকেল নাগাৎ প্রথম দরজা থেকে ত্রিশ ফুট নিচে একটি দ্বিতীয় বন্ধ ও সীল করা দরজায় পৌঁছানো গেল। সীলমোহরে তুতানখামেনের নাম। এই দরজাও যে আগে একবার খুলে তারপর আবার বন্ধ করা হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এ থেকে মনে হচ্ছিল যে এটা হয়তো সমাধি নাও হতে পারে ; হয়তো সম্রাটের ধনরত্ন লুকিয়ে রাখার গোপন কক্ষ। এ প্রশ্নের উত্তর অবিশ্যি দরজা খুলে তবে পাওয়া যাবে।

ক্রমে দরজার সামনে থেকে সমস্ত পাথর সরিয়ে ফেলা হল। তারপর কার্টার প্রথমে দরজার উপর দিকে একটা গর্ত করে তার মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা লোহার রড চালিয়ে দিলেন। রড দিব্যি ঢুকে গেল। অর্থাৎ প্যাসেজটা যেমন পাথর দিয়ে ভরা ছিল, এটা তেমন নয়।

এবারে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফুটোর মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে বোঝা গেল ভিতরে কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই। তারপর গর্তটা আরেকটু বড় করে মোমবাতিটা ঢুকিয়ে দিয়ে কার্টার গর্তে চোখ লাগালেন। চোখটা অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময় নিল ; তারপর কার্টার দেখলেন যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে সেটা হল সোনার ঝলমলানি। এদিকে কারনারভন দাঁড়িয়ে
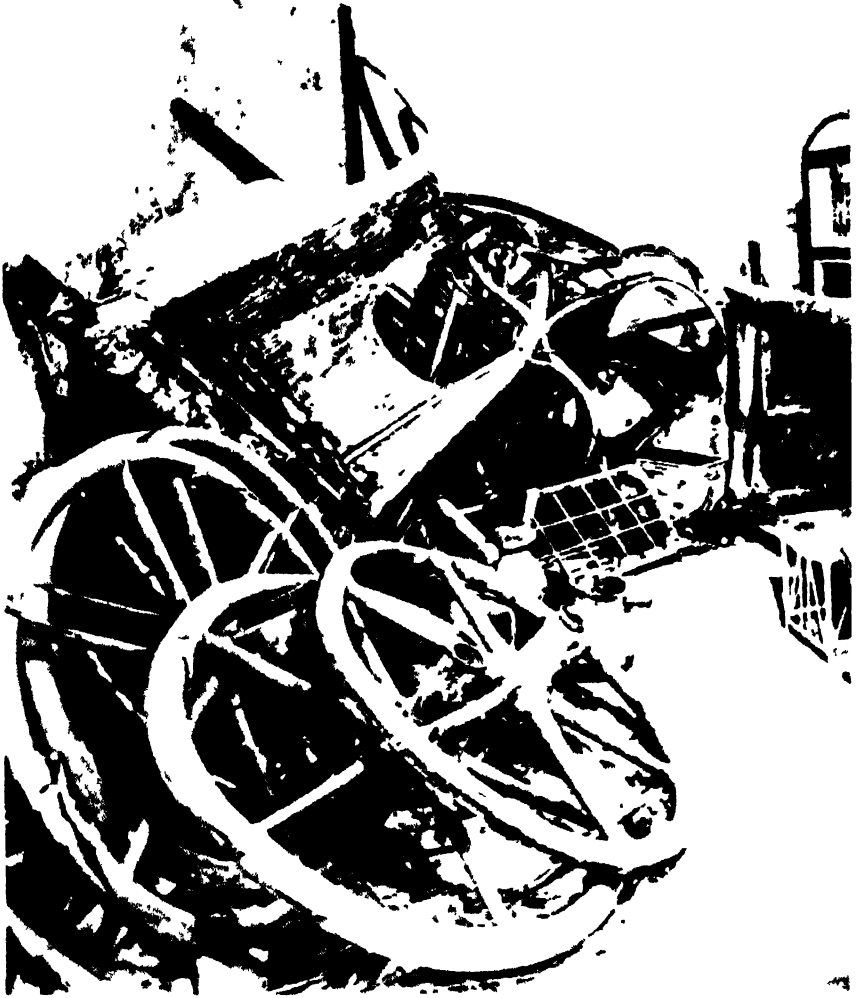
সমাধির একটি ঘর খোলার পর যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল

রয়েছেন পিছনে। তিনি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বললেন, 'কী হে, কিছু দেখতে পাচ্ছ ?'

'পাচ্ছি', বললেন কার্টার, 'আশ্চর্য সব জিনিস।' তারপর গর্তটাকে একটু বড় করে একটা ইলেকট্রিক টর্চ ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

সমাধির এই প্রথম ঘরের পর পাশাপাশি আরো তিনটি ছোট-বড় ঘর পাওয়া গিয়েছিল। এই ঘরগুলি যে সমস্ত মহামূল্য জিনিসে ভর্তি ছিল তেমন আর কখনো কোনো মিশরীয় সম্রাটের সমাধিতে পাওয়া-যায়নি। মানুষ ও

জানোয়ারের মূর্তি, চেয়ার, টেবিল, টুল, খাট, বাক্স, ফুলদানি, নানারকম পাত্র, সোনার কাজ করা সিংহাসন, রথ—জিনিসের কোনো অভাব নেই। আর প্রত্যকটি জিনিসেই তুতানখামেনের নাম লেখা।

প্রথম ঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে রাখার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল আরেকটা সীল করা দরজা, আর তার নিচের দিকে একটা মানুষ ঢোকার মতো গর্ত। এটা যে চোরের সিঁধ কাটা গর্ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গর্তের মধ্যে দিয়ে দরজার পিছনের ঘরটাও দেখা গেল। প্রথমটার তুলনায় ঘরটা ছোট হলেও জিনিসপত্রের সংখ্যা এতে আরো অনেক বেশি। সব কিছুই লণ্ডভণ্ড হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে আছে; দেখলে মনে হয় চোরেরা যেন পাগলের মতো জিনিসপত্র হাতড়েছে। অথচ যা ঐশ্বর্য এখনো রয়েছে তাতে মনে হয় না তারা বিশেষ কিছু সরিয়েছে। তাদের মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যাবার কারণ অবিশ্যি জানা গেল না।

অন্যান্য ঘরে কী আছে তা খুলে দেখার আগে যে ঘর দুটো পাওয়া গেল সেগুলো থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে, পরিষ্কার করে তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ছবি তুলতে সময় লেগে গেল আড়াই মাস।

এইবার তৃতীয় ঘরটি খোলা হবে। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের দৌলতে সে খবর ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের চতুর্দিকে। বিলেত থেকে কারনারভন ও তাঁর মেয়ে আবার এসেছেন, এবং সেই সঙ্গে এসেছেন আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

কার্টার নিজেই দরজার উপরের অংশে আবার হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে একটা গর্ত করলেন। তার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। সামনে কয়েক হাতের মধ্যেই এক নিরেট সোনার দেয়াল।

গর্ত আরো বড় করে বোঝা গেল যে এই তৃতীয় ঘরটিই আসলে সমাধিকক্ষ এবং তুতানখামেনের সমাধিস্তম্ভ পুরোটাই সোনা দিয়ে তৈরি। এই সমাধি লম্বায় ১৭ ফুট, চওড়ায় ১৬ ফুট আর উচ্চতায় ৯ ফুট। প্রায় সমস্ত ঘরটাই ভরে আছে এই একটা জিনিস, চার পাশে রয়েছে মাত্র দু'ফুট করে জায়গা।

কিন্তু সমাধিস্তম্ভে সম্রাটের শবের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত কফিন জিনিসটাকে পাওয়া গেল চতুর্থ ঘরে। এই ঘর আয়তনে ছোট কিন্তু সম্পদে বিশাল। শবাধার বা কফিন তো পাওয়া গেল, কিন্তু এও এক বিশাল বস্তু। একটা কফিনের মধ্যে আরেকটা কফিন, তার মধ্যে তৃতীয় কফিন, আর তার ভিতর সোনার মুখোশ পরা মামিকৃত রাজার শবদেহ।

তৃতীয় কফিনটা ছ'ফুটের উপর লম্বা, আর পুরোটা তিন মিলিমিটার পুরু নিরেট সোনার তৈরি। একসঙ্গে এত সোনা পৃথিবীর আর কোনো জিনিসে
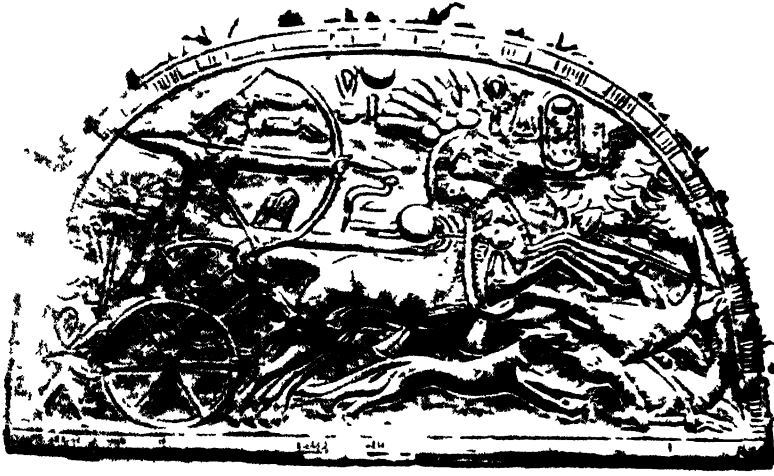
রাজার শিকারের দৃশ্য খোদাই করা হাতির দাঁতের হাত পাখা

নেই। আর এই তৃতীয় কফিন খুললে পরে যে মামি পাওয়া গেল, সেটার মুখোশ পাথর বসানো নিরেট সোনার তৈরি। কারুকার্যের দিক দিয়ে এটা মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। তিন হাজার বছর আগে মিশরের কারিগরের শিল্প কোন স্তরে পৌঁছেছিল তার নমুনা এই মুখোশে যেমন পাওয়া যায় তেমন আর কিছুতে যায় না। আশ্চর্য এই যে মামির উপরে যে তিন রকম ফুলের মালা রাখা ছিল—কর্নফ্লাওয়ার, লিলি ও পদ্ম—তিন হাজার বছর পরেও সে ফুলে রঙের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তুতানখামেনের এই একটি সমাধি থেকেই খ্রিষ্টপূর্ব আমলে মিশরের সম্রাটদের জীবনযাত্রা ও তাদের মৃত্যুকালীন আচার-অনুষ্ঠানের প্রচুর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। পৃথিবীর আর কোনো প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো উপায়ে এত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি।

এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার উদ্‌ঘাটনের জন্য অবিশ্যি দায়ী একটিমাত্র মানুষ। তিনি হলেন হাওয়ার্ড কার্টার।

তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের পর কতকগুলি ঘটনা ঘটে যা থেকে মৃত সম্রাটের আত্মার অভিশাপের ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এই বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি আছে কিনা সেটা আজ অবধি জানা যায়নি। কিন্তু যা
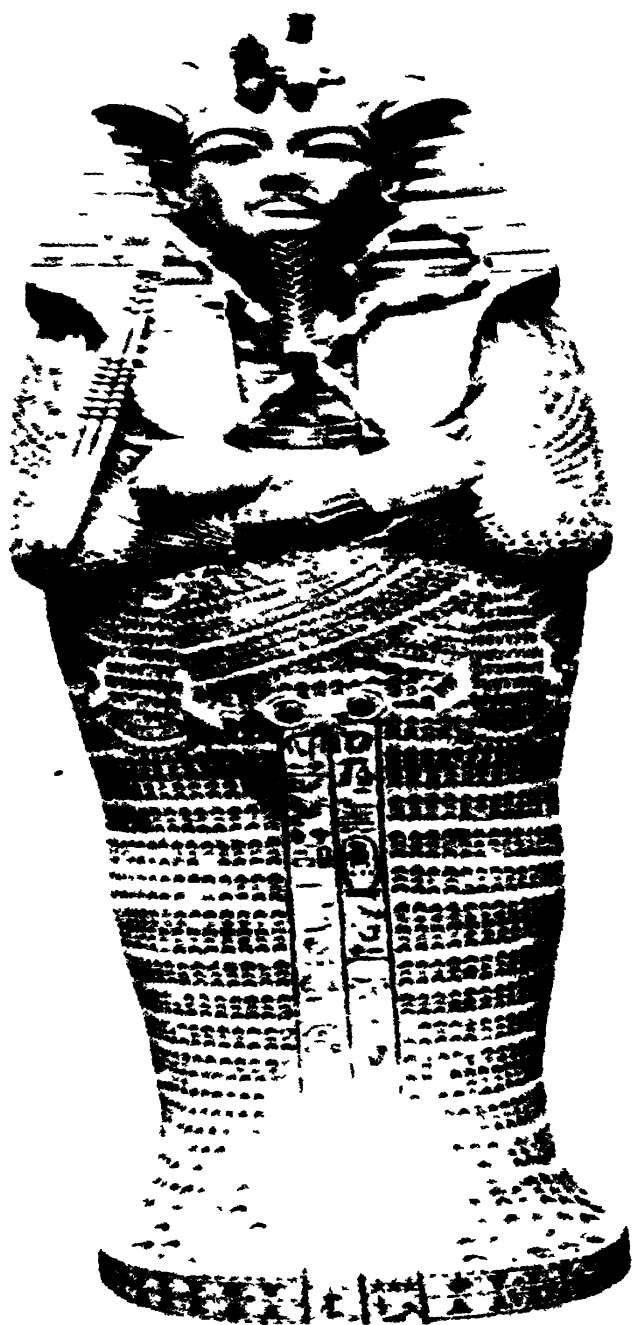
তুতানখামেনের মমির মুখোশ --নিরেট সোনার তৈরি
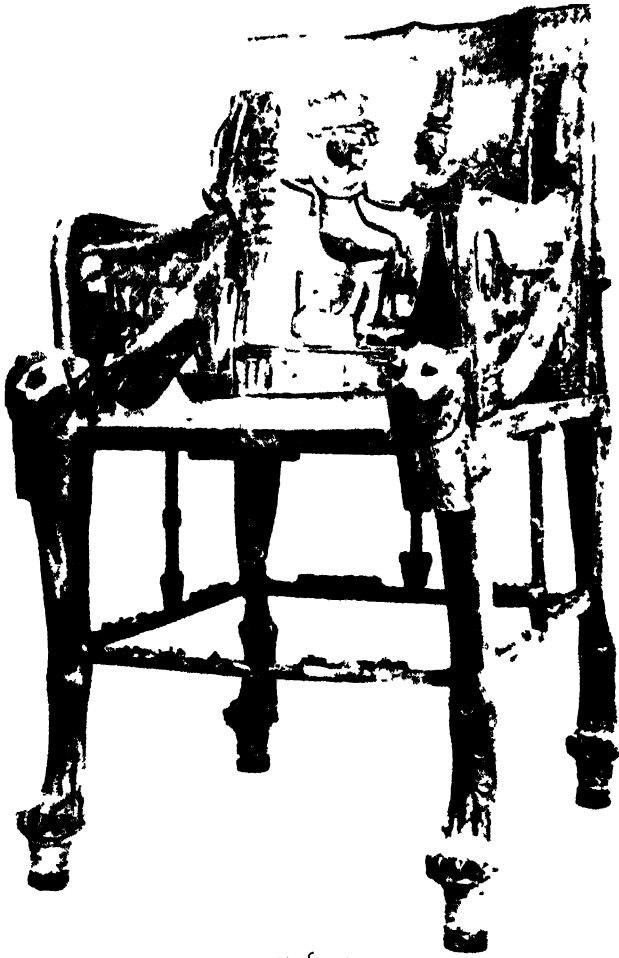
সোনার সিংহাসন

ঘটেছিল তা এতই আশ্চর্য যে সেগুলো না বললে তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের ঘটনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক দল সমাধিতে ঢোকার পাঁচ মাসের মধ্যে ৫৭ বছর বয়সে এই অভিযানের পৃষ্ঠপোষক লর্ড কারনারভনের নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু হয় কায়রো শহরে। তাঁর মৃত্যুর সময় ছিল রাত একটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট। ঠিক একই সময় লন্ডনে কারনারভনের প্রিয় কুকুরটি বিনা রোগে মারা যায়।

এই কয়েক মাসের মধ্যে সমাধিকক্ষে যাঁরা ঢুকেছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয় নানারকম ভাবে। কারনারভনের এক ভাই অব্রি হার্বার্ট

মারা যান পেরিটোনাইটিস রোগে।

মিশরের এক সম্মানিত ব্যক্তি প্রিন্স আলি ফার্মি বে লন্ডনের এক হোটেলে খুন হন, এবং তাঁর ভাই আত্মহত্যা করেন। বলা বাহুল্য এঁরা দুজনেই তুতানখামেনের সমাধিকক্ষে ঢুকেছিলেন।

মার্কিন দেশীয় ধনী ব্যবসাদার জর্জ জে গুল্ড সমাধিকক্ষে ঢুকে ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যান। আর দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রোড়পতি উলফ জোয়েল পড়ে গিয়ে জখম হয়ে মারা যান।

কার্টারকে যিনি সমাধিকক্ষে পাওয়া সম্পদগুলির ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন, সেই রিচার্ড বেথেল আত্মহত্যা করেন। তার কয়েকমাসের মধ্যে বেথেলের বাবা তাঁর বাড়ির জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।

কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি এই অভিশাপের কথায় আমল দেননি, অথচ তাঁর উপরই অভিশাপ বর্ষণের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ হাওয়ার্ড কার্টার। কার্টারের মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে সমাধি খননের সতের বছর পরে।

৩০০০ বছরের পুরোন ফুলের তোড়া

ক বি তা

ভিড়

বাপরে কী ধাক্কার ধুম দেখো চৌমাথে
কাতারে কাতারে লোকে গুঁতোগুঁতি মাতামাতি,
ফুলবাবু বেচারি মুখখানি পেঁচার-ই
রদ্দায় গোঁত্তায় প্রাণ যায় ফুটপাথে ।

ওই দিকে একবার দেখো কারবারটা
আপট্রাম ডাউনট্রাম সব ট্রাম ঠাসাঠাসি
তাও দেখো চারচোখো বলে, 'আরে, থোড়া রোকো,'
ভ্রূক্ষেপ করে নাকো কন্‌ডাক্‌টারটা ।

ভিড় দেখো বাস-স্টপে ঘিরে ওই বাসটায়
পা-দানিতে ঠাঁই নিতে হাতাহাতি লাথালাথি,
টেকো বুড়ো মোক্তার বুঝে দেখো রোখ তার
ঝাঁপ দিয়ে ঝুপ ক'রে ঝুলে পড়ে পাশটায়,
ভীমবপু ভ্যাবাচ্যাকা পড়ে থাকে রাস্তায় ॥

———

PRESIDENTS SPEAK TO THE NATION

REPUBLIC DAY SPEECHES

(1950 - 2000)